দিনাজপুর জেলার ইতিহাস

"সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মা গো
তোমায় ভালবেসে।"

—রবীন্দ্রনাথ

দিনাজপুর জেলার ইতিহাস

ধনঞ্জয় রায়

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০০

DINAJPUR JELAR ITIHAS
(A History of Dinajpur District by Dhananjoy Roy)

প্রকাশক
কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
২৮৬, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২

টাইপসেট
টাইপ স্টাইল
১০৮/২, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৪
অভিনব মুদ্রণ
৭২, শরৎ বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৬৫

মুদ্রক
দে'জ অফসেট
৩/২, মঠেশ্বরতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৬

যাঁদের জীবন-সাধনা আমাকে

দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালবাসতে শিখিয়েছে

আমার পিতা প্রয়াত মতিলাল রায়

ও

মাতা প্রয়াতা রানিবালা রায়ের

উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি

সূচিপত্র

দ্বিতীয় পর্ব ঃ মধ্যযুগ

তৃতীয় পর্ব : আধুনিক যুগ

নিবেদন

প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে পুরনো জন-অধ্যুষিত এলাকা দিনাজপুর জেলা। আড়াই হাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক ছিল দিনাজপুর ভূখণ্ড সহ বাংলার বাসিন্দারা। সাবেক গ্রিক ঐতিহাসিকরা দু'টি রাষ্ট্রের কথা বর্ণনা করেছেন। একটি গঙ্গারিদয় (Gangaridai) অপরটি প্রাচ্য (Prasioi)। এ দু'টি রাষ্ট্রের ঐক্য ও শক্তির কথা জানতে পেরে ভারতজয়ী আলেকজান্ডার এদিকে আসেন নি সেকালের গ্রিক ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে এর আভাস পাওয়া যায়। প্রাচীন পুন্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ ও খননের পর সেখান থেকে বাংলার উত্তরাংশের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের অসংখ্য প্রত্নবস্তু থেকে সভ্যতা সংস্কৃতির প্রমাণ পাওয়া যায় এবং দিনাজপুর সহ বাংলার উত্তরাঞ্চলে যে একদা উন্নত জনপদ ও শাসকদের দ্বারা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুত, সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল ছিল নিঃসন্দেহে তা প্রমাণিত হয়। দিনাজপুর জেলার যেখানে সেখানে এতসব অনাবিষ্কৃত প্রাচীন নগরী ও কীর্তির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে সে সবের মধ্যে কোন্‌টি মৌর্য বা তার আগের সময়ের এবং কোন্‌টি গুপ্ত, পাল বা সেন আমলের তার অনেক তথ্যই পাওয়া যায়নি। দিনাজপুরের পূর্ব অংশ যা সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের অধীনে ছিল, বৈজ্ঞানিক উপায়ে খননের অভাবে বড় বড় আয়তন বিশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ যেমন, বোদেশ্বরী গড় (পঞ্চগড় থানা), জগদল-ধর্মগড় (রানিশংকৈল) কান্তনগর দুর্গ (দিনাজপুর সদর), কীচক রাজার গড় (পার্বতীপুর), বামনগড় (ফুলবাড়ি), সীতাকোট বিহার (বিরামপুর), পল্লগড় ও পাইকের গড় (ঘোড়াঘাট) ইত্যাদি ধ্বংসাবশেষগুলিতে বিজ্ঞান পদ্ধতি অনুযায়ী খননকার্য হলে বাংলার ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান মিলত। ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর নেতৃত্বে ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বাণগড় খননকার্যের ফলে মৌর্য, শুঙ্গ, পাল, সেনযুগ থেকে আরম্ভ করে মুসলমান অধিকার পর্যন্ত বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি সর্বভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে সরাসরি যে যুক্ত ছিল এখান থেকে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলায় পাল রাজারা প্রায় চারশো বছর রাজত্ব করেন। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে সেন বংশীয় নৃপতিদের অভ্যুদয়ের ফলে পাল রাজত্বের অবসান ঘটে। বাংলার উত্তর অংশে সেন বংশের অবসান ঘটে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে তুর্কিবীর ইখতিয়ার-উদ-দীন-বিন-বখ্‌তিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পর। বাংলায় মুসলমান অধিকারের সূচনা সে সময়েই। বঙ্গ বিজয়ের কয়েক মাস পরেই বখ্‌তিয়ার লখনৌতি থেকে দেবকোটে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং সেখান থেকে তিনি তিব্বত অভিযান

করেন। তিব্বত অভিযান ব্যর্থ হলে বখ্‌তিয়ার খিলজী আবার দেবকোটে ফিরে আসেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় (১২০৬)। তাঁর মৃত্যুর পর মোহাম্মদ শিরান খিলজী এবং আলীমর্দান খিলজী, এ দুই শাসনকর্তা দেবকোটেই রাজত্ব করেন। পরবর্তী শাসনকর্তা সুলতান গিয়াস-উদ্‌-দীন-ই-ওয়াজ খিলজীর শাসনকালের (১২১২-১২২৭) প্রথম দিকেও দেবকোটই ছিল তাঁর রাজধানী এবং পরে তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেন লখনৌতিতে।

বাংলায় ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মুসলমান আধিপত্যের সূচনাকাল থেকে শুরু করে সুলতান আলা-উদ্‌-দীন হোসেন শাহ্‌র (১৪৯৩-১৫১৯) পুত্র সুলতান গিয়াস-উদ্‌-দীন-মাহমুদ শাহ্‌র রাজত্ব সময় (১৫৩৩-১৫৩৮) পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালকে বাংলার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসে 'সুলতানি আমল' বলে চিহ্নিত করা হয়। এই সুদীর্ঘ সময়ে দিনাজপুর অঞ্চলের অধীনে দেবকোট যে মুসলমান আমলে একটি উল্লেখযোগ্য জনপদ ছিল তা সেখানকার আবিষ্কৃত বিভিন্ন শিলালেখ ও ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রমাণিত হয়েছে। সুলতানি আমলে দেবকোট একটি শক্তিশালী দমদমা ও উন্নত কসবাহ্‌ ছিল। দিনাজপুর জেলার অধীনে একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল মাহীসন্তোষ। সুলতান রুকন-উদ্‌-দীন বারবক শাহ্‌র আমলে (১৪৫৯-১৪৭৬) মাহীসন্তোষ 'বারবকাবাদ' নামে পরিচিতি লাভ করে। সুলতান রুকন-উদ্‌-দীন বারবক শাহের আমলে এখানে একটি টাঁকশাল নির্মিত হয়। মোগল সম্রাট আকবরের আমলে (১৫৫৬-১৬০৫) সমগ্র মোগল সাম্রাজ্য কয়েকটি 'সুবা'য় বিভক্ত ছিল। 'সুবা-ই-বাংলা' ছিল তারমধ্যে অন্যতম। 'সুবা-ই-বাংলা' তখন ১৯টি সরকার নিয়ে গঠিত ছিল। তারমধ্যে তাজপুর, ঘোড়াঘাট, পাঞ্জরা, বারবকাবাদ ও জন্নতাবাদ (কিছু অংশ), এই পাঁচটি সরকার ছিল দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত। জন্নতাবাদ সরকারের অংশ বিশেষ গঙ্গারামপুর ও বংশীহারী থানার অঞ্চলগুলির অধীনে ছিল। দিনাজপুর জেলার উত্তরাঞ্চল নিয়ে সরকার পাঞ্জরা, পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে সরকার তাজপুর, দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে সরকার বারবকাবাদ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল সরকার ঘোড়াঘাট। মোগল ও নবাবি আমলের প্রথম দিকেও এ সব স্থানের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। দিনাজপুর নামে সে সময় কিছু ছিল না। ঘোড়াঘাটই ছিল একটি সরকারের শক্তিশালী শাসনকেন্দ্র এবং একটি উন্নত শহর। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে দিনাজপুর নামটির প্রচলন হয় এবং ঘোড়াঘাটের গুরুত্ব কমে গিয়ে ক্রমে দিনাজপুর উন্নত জনপদ ও দিনাজপুর রাজের শাসনকেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুবা বাংলার প্রশাসনের দায়িত্বভার লাভ করেন। দিনাজপুর জেলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনভুক্ত হয়। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর সদরে এসে উপস্থিত হন প্রবল প্রতাপশালী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তত্ত্বাবধায়ক এইচ. কটরেল এবং সেই সঙ্গে সূচিত হয় দিনাজপুর জেলায় ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কালেক্টর জর্জ হ্যাচের (G. Hatch) আগমনে শুরু হয় দিনাজপুর জেলার জয়যাত্রা।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে

ইংরেজের ভারত জয় সমাধা করতে প্রায় দুশো বছর লেগেছিল। এর মধ্যে একশো বছর ভারত মুক্তি সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল, আর একশো বছর লেগেছিল ইংরেজের ভারত জয় সমাধা করতে। একটির পর একটি উত্থান ও সশস্ত্র সংগ্রাম, সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ, ওয়াহবি বিদ্রোহ, প্রজা বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মোপলা বিদ্রোহ, গদর আন্দোলন, উত্তর ভারতের সেনা ছাউনিগুলিতে রাসবিহারী বসুর বিদ্রোহের প্রচেষ্টা, বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহে বিপ্লবীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা, পাঞ্জাব, দিল্লি, মহারাষ্ট্র ও বাংলায় অবিরাম আঘাত, যার শেষ পরিণতি নেতাজীর আজাদ-হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ। এই দু'শো বছরের দীর্ঘ পরিক্রমা লেগেছিল দু'টি বৃত্তের পরিসমাপ্তিতে। বাংলার অন্যান্য জেলার মত দিনাজপুর জেলারও একটি বিশিষ্ট অবদান রয়েছে দুশো বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় ওই দু'টি বৃত্তের সমাধায়। ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ও ইংরেজের ভারত জয় সমাপ্তিতে অহিংস ও সশস্ত্র আন্দোলনে দিনাজপুর জেলার ইতিহাসও তাই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সুদুর প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তিমূল গড়ে তুলেছে জেলার বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ। আবহাওয়া, শস্য, শিল্প ও বাণিজ্যে তা এক ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সামন্ত চরিত্র জেলার সমাজ জীবনকে বিভক্ত করেছে। এখানকার সমাজ বিন্যাস ও সমাজ কাঠামোয় এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় ছিল সামন্ততান্ত্রিকতা। অসম এই আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক জেলার নিম্নবর্গের মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। পরিণামে বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট গণমুখী আন্দোলন দিনাজপুর জেলার ইতিহাসে আরও এক আলোকিত পর্ব।

১৯৭২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অখণ্ড দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও রংপুর, এ তিনটি জেলার কৃষক আন্দোলন বিষয়ে গবেষণাধর্মী কাজ করার সময় দিনাজপুর জেলার প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের দেশভাগ কাল পর্যন্ত মানুষের জীবন ও কর্ম, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন, ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবর্তন, প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে জানার প্রতি আমার আগ্রহ জন্মায়। দিনাজপুর আমার জন্মভূমি, এ আগ্রহ সৃষ্টির অন্তরালে ছিল জন্মভূমির টান। সে কারণে দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণার আলোকে এ অঞ্চলের একটি বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস লেখার জন্য ১৯৯৫ সালে কাজটি শুরু করি এবং কাজটি সম্পন্ন করতে প্রায় আট বছর লেগে যায়। এর জন্য ১৯৯৫, ১৯৯৭ ও ২০০৩ সালে আমাকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দিনাজপুর জেলায় যেতে হয়। কারণ পুরনো বইপত্র ও দরকারি কাগজপত্র এবং ইতিহাসের কিছু নিদর্শন দেখার জন্য। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে দিনাজপুরে গিয়েছিলাম সে লক্ষ্য আমার তেমনভাবে পূরণ হয়নি। কারণ, পুরনো বইপত্র ও দরকারি কাগজপত্র কারও কাছে পাই নি, এমনকি বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিতেও। মুক্তিযুদ্ধকালে সে সব নষ্ট হয়ে গেছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ ও ঘরবাড়িগুলিও ধ্বংসপ্রায়। দিনাজপুর জেলা নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ও বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত এপার বা ওপার বাংলায় খুব বেশি বই নেই। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দিনাজপুর জেলা থেকে কিছুদিন আগে *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র* নামে পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত হবে এমন একটি বইয়ের আমি

চতুর্থ ও পঞ্চম এই দুটি খণ্ড সংগ্রহ করি। খণ্ড দুটির একটি দিনাজপুর শহর ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে, অপরটি দিনাজপুর রাজবংশের ইতিহাস। কিন্তু সে ইতিহাস আমাকে তেমন কোনও উদ্বুদ্ধ করে নি। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সময় ও ধারাবাহিকতা রক্ষার যে শর্ত একজন ঐতিহাসিককে মেনে চলতে হয় সেখানে তা খুঁজে পাই নি। বরং বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা নিয়ে সম্প্রতি 'বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি' ঢাকা থেকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ও বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি সংকলিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শরীফ উদ্দীন আহমেদ সম্পাদিত *দিনাজপুর ঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য*। বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাল ও বিষয়ের পুস্তকগুলির মধ্যে এ গ্রন্থটি নির্ভরশীল। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত *দিনাজপুর পত্রিকা* বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আকর সূত্র বলা যায়। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এই পত্রিকাটি কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহশালায় (পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা) অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী রচিত *দিনাজপুর জেলার রাজনৈতিক ইতিহাস* পুস্তকটি বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার অপর একটি আকর গ্রন্থ। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দিনাজপুর জেলার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থেকে প্রকাশিত মৃণাল চক্রবর্তী সম্পাদিত *দধীচি* 'উত্তরাধিকার বালুরঘাট' পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটির কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

'দিনাজপুর প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ' পুস্তকটির কাজ করতে গিয়ে বহু মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। মূল্যবান তথ্য, দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্রপত্রিকা দিয়ে এই ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেছেন সুশীল সেন, শচীন্দু চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্র কুমার ব্যানার্জি, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, দীনেশ রায় ও বসন্তলাল চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা প্রত্যেকেই আজ প্রয়াত। তাঁদের জানাই আমার পুষ্পিত প্রণাম। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধীনে দিনাজপুর শহরের শাহজাহান শাহ, শাহ মোবিন জিন্না, মোহনকুমার দাস, কাশীকুমার দাস, বৈদ্যনাথ রায় ও মোবারক আমার এ কাজে বিভিন্ন সময়ে নিজেদের কাজ ফেলে রেখে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তার ঋণও অপরিশোধ্য। আমি কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে। গ্রন্থে ব্যবহৃত আলোকচিত্রগুলি মূলত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, দীনেশ রায় ও নিত্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি এবং অনেকগুলি নিজস্ব সংগ্রহ থেকে। বইটি লেখার কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য আরও যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন সাত্যকি চক্রবর্তী, চিন্ময় দাস, মৃন্ময় দাস, দেবলীনা দাস (রায়), শ্রীলেখা রায় ও সুষমা রায়। পরিশেষে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি সেই মানুষটির কথা যাঁর উদারতা ও দান শেকড় ফেলে মাটিতে অপরদিকে মাটিও পায় সে দানের সজল সংস্পর্শ, তিনি হলেন দিনাজপুরের মাটিরই সন্তান শ্রদ্ধেয় কনক বাগচী মহাশয়। যাঁর আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে এ পুস্তক প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভবপর হত না। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার মানবজীবনের যে চিত্রপট বা মানবতার যে স্বরূপ ও ইতিহাস এ পুস্তকে তুলে ধরা হল যদি কোথাও কোনও তার তথ্যগত ভুল বা অসঙ্গতি থেকে যায় তার জন্য দায়ি আমিই।

ধনঞ্জয় রায়

কান্তজীর মন্দির
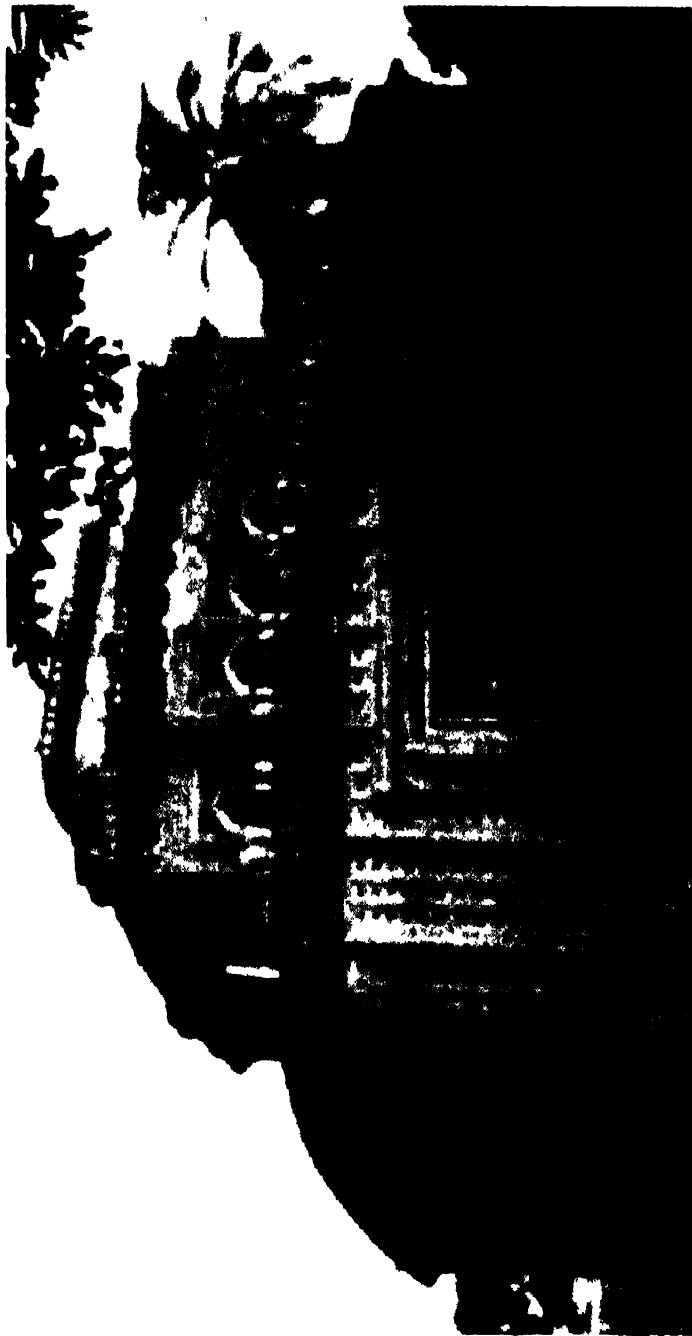
কান্তজীর মন্দিরে টেরাকোটায় নৃপতির শিকার চিত্র

ধ্বংসপ্রাপ্ত দিনাজপুরের রাজবাড়ি

মহারাজা গিরিজানাথ রায়

ঘোড়াঘাট দুর্গ

দিনাজপুর পৌরসভা ভবন। ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত।

জাতীয়তাবাদী নেতা যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ি।
দিনাজপুরের নবজাগরণ এই বাড়িটিকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছিল।

সার্কিট হাউস সংলগ্ন তেভাগা লড়াই-এর স্মারক।

দিনাজপুর শহরের নক্শা - ১৮৯০
নিষ্কাশনের (ড্রেইনেজ) প্রধান প্রধান শাখা
সূচক
শহর সীমানা
সড়ক পথ
রেল পথ
নদী
বাঁধ
রাজবাড়ী
মীর্জাপুর রোড
কাঁচাই নদী
কবরস্থান
শ্মশান
মল পরিখা
পুনর্ভবা নদী
দার্জিলিং রোড
চকবাজার
জেলখানা
বাঁধ
মল পরিখা
(ট্রেনচিং গ্রাউন্ড)
জেলা স্কুল
রেলওয়ে স্টেশন
নর্থ বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে
জজকোর্ট
ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট
পোস্ট অফিস
জুলুম সাগর
ঘাঘরা নদী
উঃ
০
১/২ মাইল
বিঃ দ্রঃ তীর চিহ্ন নিষ্কাশনের গতিপথ নির্দেশ করছে ১৮৯০

প্রথম পর্ব

প্রাচীন যুগ

প্রথম অধ্যায়

গোড়ার কথা

১. মিথ-পুরাণে দিনাজপুর

কাহিনি ও কিংবদন্তিতে মিথ-পুরাণের দিনাজপুর জ্যোতিষ ভূমিরূপে পরিচিত। একবার অন্ধ দীর্ঘতমা ঋষি তাঁর পুত্রদের হাত-পা বেঁধে সঙ্গে নিজেও একত্রে গঙ্গার জলে ঝাঁপ দেন। তাঁরা ভাসতে ভাসতে ক্ষত্রিয় রাজ বলির প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাজা গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে অন্ধ দীর্ঘতমাকে দেখে জল থেকে তুলে এনে নিজের প্রাসাদে আনেন। ক্ষাত্রিয়রাজ বলি ছিলেন নিঃসন্তান। বলিরাজের পত্নী সুদেষ্ণার সঙ্গে দীর্ঘতমা ঋষির মিলন হয়। ফলে, সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুক্ষ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরা নিজের নিজের নামে পাঁচটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলের অধীশ্বর হন পুণ্ড্র এবং এই দেশ পুণ্ড্রদেশ নামে পরিচিতি লাভ করে।

মহাভারতের যুগে বাসুদেব নামে একজন পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজা এই দেশ শাসন করেন। তিনি নিষাদ রাজা একলব্য ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ[১] রাজা নরকের বন্ধু ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে পুণ্ড্রদেশ থেকে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বেষী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হয়েছিলেন।[২]

দিনাজপুর অঞ্চল প্রভাবশালী পরশুরামের শাসনাধীন ছিল। তিনি জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ ও শিবের ভক্ত। শিবঠাকুর তাঁকে 'পরশু' নামে এক অস্ত্র দান করেছিলেন। পরশুরামের পিতার নাম জমদগ্নি মুনি। মায়ের নাম রেণুকা। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে পরশুরাম একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন করেছিলেন। পরশুরাম বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার বলে কথিত।[৩]

রামায়ণের কালে দিনাজপুর অঞ্চলেই রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বনবাস দিয়েছিলেন বলে কথিত। লক্ষ্মণ নদী পার হয়ে পূর্বদিকে এক বনে সীতাকে রেখে যান। পরে বাল্মীবি মুনি জানতে পেরে সীতাকে নিজ তপোবনে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেন। কিংবদন্তি অনুযায়ী বাল্মীকি মুনি এই এলাকার করতোয়া নদীর তীরে বাস করতেন। এই নদীতে তিনি প্রতিদিনই ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন। যেখানে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত সে স্থান এখনও তর্পণঘাট নামে পরিচিত। এর কাছেই রয়েছে, সীতাকোট ও সীতাকুণ্ড নামে একটি জায়গা। রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাদেবী সেখানেই বাস করতেন এবং সেই জলাশয়ে স্নান করতেন।[৪]

মহাভারতের যুগে বিরাট রাজার সঙ্গে এই অঞ্চলের নানান কাহিনি জড়িয়ে আছে। বিরাট রাজার অশ্বশালা ছিল ঘোড়াঘাট অঞ্চলে। রাজার অশ্বগুলিকে করতোয়ার জলে স্নান করানো হত বলে তখন এই স্থানের নাম ছিল 'বাজিঘট্ট'। বিরাট রাজার গোশালা ও রাজপ্রাসাদ ছিল এ জেলারই 'বৈরাট্টা'[৫] অঞ্চলে। এখানে পথের ধারে রয়েছে ছায়া সুনিবিড় অতি প্রাচীন সেই শমীবৃক্ষটি। পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাস কালে এখানে এসে বিরাট রাজার গোশালায় ছদ্মবেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বলে কথিত। নকুল, অর্জুন ও অন্যান্য ভাইদের অস্ত্র যুধিষ্ঠির তখন ওই শমীবৃক্ষের কোটরে রেখে দিয়ে যান। ওই বিস্তীর্ণ পল্লব সমন্বিত শমীবৃক্ষের কোটরে লুকানো পঞ্চপাণ্ডবের শর, কার্মুক, দিব্য কবচ, মহাবীর অর্জুনের আদেশমত একদিন বিরাট রাজার পুত্র উত্তর শমীবৃক্ষের কোটর থেকে অস্ত্রগুলি নামিয়ে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে যাত্রা করেন।

কথিত যে, অজ্ঞাতবাস কালে দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডব পায়ে হেঁটে কালিন্দী নদী পেরিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মৎস্য দেশে প্রবেশ করেছিলেন। মৎস্যরাজ বিরাটের রাজধানী বৈরাট্টা নগরে তাঁরা এসেছিলেন। কিংবদন্তির এই বৈরাট্টা নগর বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার অধীনে বৈরাট্টা অঞ্চল। স্থানীয় মানুষ বলেন, ওই যে বিরাট রাজা্র দেশ, তাঁর রাজপ্রাসাদ, দক্ষিণে গোগৃহ। রাজার গোশালার অসংখ্য গরুর জলপানের জন্যই যেন খনন করা হয়েছিল একাধিক বিশাল দিঘি, গড়দিঘি, আলতাদিঘি, মলিয়ানদিঘি ইত্যাদি যেগুলি আজও রয়ে গেছে। অদূরে হাতিডোবা বাঁধানো ঘাটটি রানি ও রাজকন্যাদের স্নানের জন্য ব্যবহার হতো।

পঞ্চপাণ্ডবেরা এই বৈরাট্টা নগরে প্রবেশের আগে দেবী চন্ডীর পুজো দিয়েছিলেন। স্বয়ং যুধিষ্ঠির এই পুজো করেন। বিরাট রাজার শ্যালক কীচক রাজাও শ্রীমতী নদীর ধারে দেহাবন্দে[৬] প্রাসাদ নির্মাণ করে বসতি গড়েছিলেন। কথিত যে, বিরাট রাজার প্রাসাদে ছদ্মবেশ ধরে দ্রৌপদী রাজার মহিষী সুদেষ্ণার পরিচারিকারূপে বাস করছিলেন। সেই সময় দ্রৌপদীকে অপমান করবার জন্য ভীম কীচক রাজা ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিহত করেন। তাদের দেহ এখানেই দাহ করা হয়। যে জলাশয়ের সামনে তাদের দাহ করা হয়েছিল, বৈরাট্টা গ্রামে ওই জলাশয়টি আজও কীচককুণ্ড নামে স্মৃতি বহন করে চলেছে।

কংস রাজার দেহ নারায়ণের সুদর্শন চক্রে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে তিনখণ্ডে নানান জায়গায় ছিটকে পড়েছিল। তার একটি খণ্ড পড়েছিল দিনাজপুর জেলার করঞ্জী গ্রামে।[৭] এখানে রাজার মুণ্ডটি পড়েছিল। কংসরাজার এই মুণ্ডের চিহ্ন বহন করে চলেছে করঞ্জী গ্রামে উঁচু ঢিবি, ভাঙা স্তূপ ও অজস্র পাথরের টুকরো। মাঘ মাসের পূর্ণিমায় প্রতিবছর কংসব্রত বা কাসব উৎসব পালিত হয়ে আসছে এখানে।

পৌরাণিক যুগে এই জেলার শাসনকর্তা ছিলেন বলিরাজা। বলির মৃত্যুর পর এই জেলা শাসিত হয় তার পুত্র বাণ কর্তৃক। সুপ্রসিদ্ধ বাণের নামে তার রাজ্যের নাম হয় বাণ রাজ্য এবং রাজধানীর নাম হয় বাণনগর,[৮] বর্তমান বাণগড়। নিকটেই পুনর্ভবা ও ব্রাহ্মণী নদী। এই নদীর তীরে রয়েছে বাণের কন্যা উষার ঘর যা উষাতিটি নামে পরিচিত। নারায়ণপুরের[৯] অদূরে একটি বিশাল ঢিপিকে লোকেরা এখনও উষাতিটি বলে।

কথিত যে, দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধ বাণনগরে এসেছিলেন কৃষ্ণের আদেশে দৌতকার্য করতে। তাঁর সঙ্গে বাণদুহিতা ঊষার দেখা হলে অনিরুদ্ধ ও ঊষা পরস্পর প্রেমাসক্ত হন। রাজা-রানির অনুমতি ছাড়াই সখী-চিত্রাঙ্গদার মধ্যস্থতায় তাঁদের গোপনে গান্ধর্ব বিবাহ হয়। তারপর একদিন অনিরুদ্ধ ঊষাকে নিয়ে কাউকে কিছু না বলে রাত্রির অন্ধকারে পলায়ণ করেন। যে রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন সেই রাস্তার নাম 'ঊষাহরণ রোড'[১০] নামে এখনও পরিচিত।

বাণরাজা কন্যার পলায়নের কথা জানতে পেরে অনিরুদ্ধকে ধরার জন্য লোক পাঠালেন এবং অনিরুদ্ধকে ধরে এনে কারাগারে বন্দি করে রাখেন। পরে এই সংবাদ পেয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সৈন্য সামন্ত সহ অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করতে আসেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বাণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। বাণ অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণের হাতে পরাজিত হন। তার নিহত সেনাদের পুনর্ভবার তীরে 'করদাহ' নামক স্থানে দাহ করা হয়। কথিত যে, বাণ রাজার এক হাজারটি হাত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ বাণের মাত্র দুটি হাত রেখে ৯৯৮টি হাত কেটে সেই হাতগুলোকে আঙুলসহ দাহ করেন। যে স্থানে দাহ করা হয় সেই স্থানটি এখনও পর্যন্ত 'করদাহ'[১১] নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে জয়লাভ করে শ্রীকৃষ্ণ শেষে অনিরুদ্ধ ও ঊষাকে নিয়ে দ্বারকায় চলে যান।

লোকপ্রবাদে রয়েছে, মহাভারতের ভীম দিগ্বিজয়ে বের হয়ে পূর্বদিক হয়ে দিনাজপুর অঞ্চলে আসেন। তিনি পুণ্ড্রদেশের রাজা বাসুদেবকে মেরে ফেলে পুণ্ড্রদেশ জয় করেন। বাসুদেবের সেনাপতি ছিলেন ব্যাধ একলব্য, যিনি অনার্য বলে দ্রোণাচার্য তাঁকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন নি। তখন পুণ্ড্রদেশের রাজধানী ছিল পুলিন্দ নগর, পরবর্তীকালে যার নাম পুণ্ড্রবর্ধণ নগর। যার বর্তমান নাম মহাস্থানগড়।

ভীম ভীষণ যুদ্ধে যখন পুণ্ড্ররাজ বীর বাসুদেবকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হলেন, পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব তখন একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। যুদ্ধে শত্রু ও মিত্র পক্ষের সেনাদের চেনা দুষ্কর হয়ে উঠলে পুণ্ড্ররাজ স্বীয় পক্ষের সৈন্যদের চিনবার জন্য তাদের কপালে নরম মাটির রেখাচিহ্ন লেপন করার নির্দেশ দিলেন। এই চিহ্নের নাম হল পুণ্ড্র। পরবর্তীকালে কপালে পুণ্ড্র ধারণের ব্যবস্থা হয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই পুণ্ড্রই বর্তমানে কপালের তিলক। গীতায় আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে হৃষিকেশ 'পাঞ্চজন্য', অর্জুন 'দেবদত্ত' এবং ভীম 'পৌণ্ড্র' নামে মহাশঙ্খ বাজিয়েছিলেন। এই পৌণ্ড্র শব্দটি ভীম পুণ্ড্রদেশ থেকেই নিয়ে গিয়েছিলেন।

দিনাজপুরের কিছু অংশ অঙ্গরাজ্যের রাজা মহীবীর কর্ণের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁর একটি দিঘি এখনও কর্ণ বা করণদঘি[১২] নামে রাজা কর্ণের স্মৃতি বহন করে চলেছে। কথিত যে, মহীবীর কর্ণ বিরাটগড় আক্রমণের সময় এই দিঘির পাড়ে তর্পণ করেছিলেন। বৈশাখ মাসে এখানে কর্ণের পুজো ও মেলা হয়। দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর[১৩] এলাকায় রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে অসু, বেনু, বারজন, নান্হা ও কান্হা নামে পাঁচভাই নিজেদের বাসের জন্য এখানে রাতারাতি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। তাই, দুর্গের নাম অসুরাগড়।

মহাভারতের যুগে এই অঞ্চলে পাণ্ডবদের অজ্ঞাত বাসকালে শকুনি গুপ্তচর রূপে থাকার সময় প্রাচীদেশের যে বর্ণনা দেন তার সঙ্গে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক মিল রয়েছে। এই অঞ্চলের নামই পুণ্ড্র দেশ। পুণ্ড্র রাজার নামেই স্থানের নাম পুণ্ড্র। এই দেশের প্রাচীন বিখ্যাতনগরী পুণ্ড্রবর্ধন।[১৪] পুণ্ড্রদেশের দুটি প্রাচীন নগরের মধ্যে একটি কোটিবর্ষ বা বাণগড় অপরটি গৌড়পুর। এই কোটিবর্ষ নগরই সমগ্র দিনাজপুর অঞ্চল।

২. কোটিবর্ষ পরিচিতি

পুণ্ড্রনগরের পরেই এই অঞ্চল কোটিবর্ষ নগর[১৫] নামে পরিচিতি লাভ করে। হেমচন্দ্রের *অভিধান চিন্তামণি, পুরুষোত্তমের ত্রিকাণ্ডশেষ,* এই দুটি গ্রন্থ থেকে দেবীকোট, বাণপুর উমাবন, শোণিতপুর প্রভৃতি কোটিবর্ষেরই বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। জৈন কল্পসূত্রের মতে, 'গোদাস' নামে যে জৈন সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন জৈনগুরু গোদাস, সেই সম্প্রদায় চারটি শাখায় বিভক্ত ছিল। তার মধ্যে তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়, পুণ্ড্রবর্ধনীয় শাখা খ্রিস্টপূর্ব যুগেই প্রাচীন বঙ্গের তিনটি অঞ্চলের নামে প্রচলিত ছিল। কোটি অর্থ, অনন্তকাল, চিরদিনের জন্য। বর্ষ, বৎসর। পুরাকথায় আছে, ব্রহ্মার একদিন, মানবের চারশো বত্রিশ কোটি বছর (৪৩২০০০০০০০)। ব্রহ্মার এক কোটি দিন, মানবের চারশো বত্রিশ কোটি কোটি বছর। অর্থাৎ দীর্ঘকাল মর্যাদা ও গৌরবের সঙ্গে টিকে থাকে যে নগর তারই নাম কোটিবর্ষ নগর। অভিধানকারদের মতে, কোটিবর্ষের খ্যাতি ও মর্যাদা কৌশাম্বী, প্রয়াগ, মথুরা, উজ্জয়িনী, কান্যকুব্জ, পাটলীপুত্র প্রভৃতি নগরের চেয়ে কম ছিল না। *বায়ুপুরাণ* শাস্ত্রে কোটিবর্ষ নগরের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। পঞ্চম শতক হতে আরম্ভ করে পাল আমলের শেষপর্যন্ত কোটিবর্ষ নগরই পুণ্ড্রদেশের প্রধান জেলারূপে চিহ্নিত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধনের শাসন কাজ এখান থেকেই পরিচালিত হত। বাংলায় তুর্কি আফগান অধিকারের পর পুরাতন কোটিবর্ষ নগর দেবীকোট, দীবকোট, ইত্যাদি নামে পরিচিতি লাভ করে। একাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে সন্ধ্যাকর নন্দী কোটিবর্ষ নগরের প্রশস্তি উচ্চারণ করে এই নগরের অসংখ্য পূজারী ও পূজক মুখরিত মন্দির এবং পদ্মফোঁটা দিঘির বর্ণনা রেখে গেছেন। ষোড়শ শতক পর্যন্ত মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় দীবকোট-দীওকোট-এর পরিচয় পাওয়া যায়।

কথিত যে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর পুণ্ড্রদেশে এসেছিলেন ধর্ম প্রচার করতে। এখানে এসে তিনি কোটিবর্ষ নগরের অধিবাসী সুধর্মা নামে জনৈক ব্যক্তিকে জৈন ধর্মে দীক্ষিত করেন। মহাবীরের শিষ্য সুধর্মা আবার এই নগরের অধিবাসী জম্বুস্বামী নামে জনৈক ব্যক্তিকে জৈন ধর্মে দীক্ষা দেন। কালক্রমে কোটিবর্ষ জেলা এবং পুণ্ড্রদেশের সর্বত্র জৈনধর্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। জম্বুস্বামী নির্গ্রন্থধর্ম প্রচার করে এই অঞ্চলের মানুষের কাছে দেবতার মত হয়ে ওঠেন। কোটিকপুরে তিনি মারা যান এবং কোটিবর্ষে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।[১৬] কোটিকপুরে জম্বুস্বামীর সমাধি থাকায় এই নগরী একটি জৈনতীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালে কোটিবর্ষ নগরে নির্গ্রন্থধর্ম যে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল তা হরিষেণ রচিত *বৃহৎকথা কোষ* গ্রন্থ থেকে জানা যায়। কোটিবর্ষ নগরে বহুকাল থেকে পদ্মরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রানির নাম ছিল পদ্মশ্রী। এই রাজার আশ্রিত সোমশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সোমশর্মার একমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করেন কোটিবর্ষ নগরীতে। পুত্রের নাম ভদ্রবাহু। মেধাবী ভদ্রবাহুর শৈশবকাল থেকেই লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক ছিল অপরিসীম। তাঁর একমাত্র কাজই ছিল মানুষের কল্যাণ সাধন করা। জৈনাচার্য চতুর্থ শ্রুতকেবলী শ্রীগোবর্ধনাচার্য তীর্থযাত্রা উপলক্ষে একবার কোটিবর্ষ নগরীতে আসেন। ভদ্রবাহুর প্রতিভা দেখে শ্রীগোবর্ধনাচার্য প্রীত হয়ে তাঁকে জৈনধর্মে দীক্ষা দেন। পরে শ্রীগোবর্ধনাচার্য মারা গেলে ভদ্রবাহু জৈনধর্মের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন। এইসময় মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বৈরাগ্য দেখা দেয়। এই অবস্থায় চন্দ্রগুপ্ত ভদ্রবাহুর কাছে দীক্ষা নেন।[১৭] মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহু ছিলেন পঞ্চম শ্রুতকেবলী। তীর্থঙ্কর মহাবীরের মৃত্যুর পর তাঁর দুই জন শিষ্য এবং একজন প্রশিষ্য এই তিনজন 'কেবলী' ছিলেন। কেবলী অর্থ পূর্ণজ্ঞানী। এঁদের পরে আরও পাঁচজন 'শ্রুতকেবলী' ছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কোটিবর্ষ থেকে ভদ্রবাহু মোট ১২ হাজার ভিক্ষুসহ ওই সময় দক্ষিণ ভারতে যান। ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে সেই সময় যাঁরা দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন, তাঁরা 'দিগম্বর' নামে পরিচিত হন।[১৮] ভদ্রবাহু মহীশূর রাজ্যের অধীনে বেলগোলা পাহাড়ে ২৯৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মারা যান। ভদ্রবাহুর চারজন শিষ্য ছিলেন। এঁরা হলেন, গোদাস, অগ্নিদত্ত, জনদত্ত ও সোমদত্ত। এঁদের মধ্যে গোদাস পুণ্ড্রবর্ধণীয় শাখা গড়ে তুলেছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে,[১৯] পালযুগের শেষের দিকে জৈনরা অবদূত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। পাল ও সেন আমলে কোটিবর্ষে জৈনদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় মূর্তি প্রতিমার মাধ্যমে। নবম থেকে দ্বাদশ শতকের তৈরি ঋষভনাথ, আদিনাথ, নেমিনাথ, শান্তিনাথ, পার্শ্বনাথ বিভিন্ন জৈনমূর্তি দিনাজপুর অঞ্চলে পাওয়া যায়। কোটিবর্ষে গুপ্তযুগ থেকেই একেশ্বরবাদী বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম এবং বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবল হয়ে ওঠার ফলে নিরীশ্বরবাদী জৈনধর্ম তার জনপ্রিয়তা ক্রমশই হারাতে থাকে। তাছাড়া, জৈনধর্ম এখানকার রাজ-রাজড়াদের পৃষ্ঠ-পোষকতা পায়নি বললেই চলে।

জৈন গ্রন্থকার ভদ্রবাহুর *কল্পসূত্র* গ্রন্থে 'কোটিবর্ষ'কে 'কোডিবরিসি' (কোটিবর্ষীয়) রূপে পূর্ব ভারতীয় জৈন সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। *বিষ্ণুপুরাণ* ও *শ্রীমদ্ভাগবত*-এও শোণিতপুরের উল্লেখ আছে। *বায়ুপুরাণ* এবং *বৃহৎ সংহিতা*-য় কোটিবর্ষের যে শুধু বর্ণনাই দেওয়া হয়েছে তাই নয়, *বায়ুপুরাণ*-এ একে নগর বলেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দিনাজপুর জেলার দামোদরপুর থেকে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে দেখা যায়, কোটিবর্ষ পুণ্ড্রবর্ধণ নামক প্রদেশের অধীনে একটি বিষয় (জেলা) এবং বিষয়াধিকরণ (জেলার প্রধাননগর) বলে চিহ্নিত। পাল আমলেও কোটিবর্ষের পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*-এ শোণিতপুরের বিপুল ঐশ্বর্যের কথা বর্ণিত আছে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে

মুসলমান আক্রমণের ফলে কোটিবর্ষ নগরী বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আক্রমণকারীদের কাছে কোটিবর্ষের পরিবর্তে নগরটি দেবীকোট বা দেবকোট নগর নামে পরিচিত ছিল।

৩. দেবকোট পরিচিতি

দেবকোট প্রাচীন বাণগড়েরই কাছাকাছি, অভিন্ন স্থান, দেবকোট বাণগড় সংলগ্ন একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ নাম। পালবংশের তৃতীয় রাজা দেবপালের নামে জনপদটি দেবকোট বলে পরিচিতি লাভ করে। পুনর্ভবা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই সমৃদ্ধ নগর শুধু গুপ্ত যুগ থেকে শাসনকেন্দ্র রূপেই নয়, ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে এবং আন্তর্জাতিক স্থলপথ ও বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র রূপেও এই নগরের পরিচিতি ও মর্যাদা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সু-প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাল-সেন রাজন্যবর্গের নির্মিত পরিখাবেষ্টিত দুর্গ ছিল এই নগরে। ছিল রাজকীয় প্রাসাদ, ছিল হিন্দু-বৌদ্ধদের মন্দির বিহার, ছিল অনেক বড় বড় দিঘি জলাশয়। রাষ্ট্রের অধিকরণ গৃহ, কোষ্ঠাগার, সার্থবাহ বণিক নাগরিকদের বাসগৃহ ও সৈন্য সামন্তদের আবাসস্থল ছিল এখানে। মন্দিরের শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিতে সন্ধ্যাবেলা মুখরিত হয়ে যেত নগরটি। পৌণ্ড্রবর্ধণের অধীনে এই দেবকোট জনপদে পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামে এক রাজা বাস করতেন। মৌর্য আমলে দেবকোটের নাম ছিল কোটিকপুর যার অপর নাম কোটিবর্ষ নগর। পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অধীনে কোটিবর্ষ বিষয়ের সমৃদ্ধনগর এই দেবকোট। মৌর্যযুগ থেকে শুরু করে বঙ্গদেশে যে ক'টি স্থানে নগরায়ণের কাজ শুরু হয়েছিল তার মধ্যে প্রাচীনতম ছিল মহাস্থানগড়। তারপরেই ছিল দেবকোট।

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "মুসলমান অধিকারের পর পুরাতন কোটিবর্ষ নগরই দেবীকোট-দীবকোট-দীওকোট নামে নূতন নগরের পত্তন হয়।"[২০] ড. নীহাররঞ্জন রায়ের এই মত নিয়ে বিতর্ক আছে। তাঁর এই উক্তি যথার্থ নয় বলে মনে করি। কারণ, তুর্কিবিজয়ের অনেক আগে থেকেই দেবকোট ছিল এক সমৃদ্ধ জনপদ। গঙ্গারামপুর থানার অধীনে রাজীবপুর থেকে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে, মদনপালদেবের ৩২ তম রাজ্য বর্ষের ভূমিদান হয়েছিল কোটিবর্ষ বিষয়ের অধীনে হলবর্ত্ত মণ্ডলে দেবীকোটের কোষ্ঠাগার সংলগ্ন। এই ভূমিদান করা হয়েছে দেবীকোট নিবাসী ব্রাহ্মণ মহেশ্বর রত্তি শর্মাকে।[২১] তাছাড়া, আনুমানিক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে পালরাজাদের শক্তির প্রথম অভ্যুদয়ের কালে বাংলার মাটি থেকে ধর্মকে নিয়ে হানাহানি বলা যায় সম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে ছিল সহজ ও স্বাভাবিক ভ্রাতৃত্ববোধ। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণু মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বল্লাল সেনের সময়ে। তিনি নাস্তিক বৌদ্ধদের উচ্ছেদের জন্য প্রজানুরঞ্জক রাজার ভূমিকা ভুলে গিয়ে হিন্দুত্বের পতাকা উড়িয়ে এমন এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন যা বাঙালির জীবনযাত্রায় অন্তরায় সৃষ্টি করল। তাই, পালশক্তির অন্তিম লগ্নে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে অতীতের সহজ ও স্বাভাবিক ভ্রাতৃত্ববোধের শোচনীয় সমাধি ঘটে গেল। এই সময় শৈব-শাক্ত-তন্ত্রের মধ্যে প্রচলিত

'কামবিলাস' (মৈথুন) পন্থার ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে গিয়ে বৌদ্ধদের মধ্যে 'মহাসুখবাদ'-এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। স্ত্রী-পুরুষের যৌনমিলনে যে সুখ, নিরাত্মা ও বোধিচিত্তের মিলনেও সেই সুখ। এই মহাসুখবাদের কবলে পড়ে বৌদ্ধ-দর্শনের মূলতত্ত্বটাই ধামাচাপা পড়ে গেল। বাঙালি জাতির আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে এই সময় নেমে এল চরম বিপর্যয়, যা রোধ করবার ক্ষমতা রইল না কারও।

বাংলার শেষ স্বাধীন নরপতি লক্ষ্মণ সেন রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে তাঁর পিতার পথে না হেঁটে, বৌদ্ধদের সঙ্গে অসহযোগিতা করে ইসলামপন্থী সুফিসাধকদের সঙ্গে আপস রফার মনোভাব নিয়ে শাসনকাজ চালাতে থাকলেন। তিনি শেখ মখদুম শাহজালাল তাব্রিজীকে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও তাঁর অনুরোধে বাইশ হাজার পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয় এই রকম গ্রাম সমূহ দান করেন। এই সময় দিনাজপুর অঞ্চলে শুধু নয় সমগ্র উত্তরবঙ্গেই অনেকেই শেখের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও কর্মক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন। দেবকোটে বখ্‌তিয়ারের বসতিস্থাপনের অনেক আগে থেকেই তাঁরা ধর্মান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন।[২২] ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের ১০মে তারিখে তুর্কিবীর বখ্‌তিয়ার যেদিন দেবকোটে আসেন, সেদিন তাঁকে তাই স্বাগত জানানোর লোকের অভাব ছিল না। ওই দিনই বখ্‌তিয়ার দিনাজপুরের মাটিতে বিজয় পতাকা প্রোথিত করেন এবং দেবীকোট তুর্কিদের মুখের উচ্চারণে পরিবর্তিত রূপ নিয়ে বাংলার মানচিত্রে দেখা দেয় দেওকোট-দেবকোট-দীওকোট রূপে।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, কট্টরপন্থী হিন্দুত্ববাদীরা এবং বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতেরা আগেই এখানকার আস্তানা গুটিয়ে নিয়ে পূর্ববঙ্গে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ সেন, সেদিন কি করলেন? লক্ষ্মণ সেন সেদিন সোনার থালাবাটিতে পরিবেশিত খাদ্যসামগ্রী নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনে বসে যখনই শুনলেন অষ্টাদশ অশ্বারোহী সেনা নিয়ে 'নওদীয়াহ' শহরের প্রবেশদ্বারে বখ্‌তিয়ার উপস্থিত হয়েছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই সবকিছু ফেলে রেখে খালি পায়ে খিড়কি দরজা দিয়ে পালিয়ে নৌকা চড়ে পূর্ববঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করলেন। বিনা রক্তপাতে তিনি গৌড় রাজ্য বিজয়ের পর দেবকোট জয় করলেন। দেবকোটে এসে বৌদ্ধ চৈত্যকে বা অঘোরপন্থী মত্ত ময়ূর সম্প্রদায়ভুক্ত শৈবদের শিব-ভবানী মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করতে তাঁর কোনই অসুবিধা হল না। দেবকোটে সুফি সাধকদের কল্যাণে ইসলামীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা গেল না। বখ্‌তিয়ার এখানকার বৌদ্ধবিহার ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করলেন।

দেবকোট থেকেই বখ্‌তিয়ার তিব্বত অভিযানে যান (১২০৬ খ্রিস্টাব্দ)। প্রচুর সেনা নিয়ে তিব্বত জয় করতে গিয়ে পথে বাধা পেয়ে বখ্‌তিয়ার আবার দেবকোটে ফিরে আসেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বখ্‌তিয়ার দেওকোটে ফিরে এসে বিন্দুমাত্র শান্তি পেলেন না। নিহত সেনাদের বিধবা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের অভিশাপ বখ্‌তিয়ারকে দিনরাত্রি দগ্ধ করতে লাগল। ঘর থেকে বেরনোর পথ তাঁর বন্ধ হয়ে গেল। অভিশপ্ত বীর আততায়ীর অতর্কিত ছুরিকাঘাতে, মতান্তরে রোগে ভুগে দেবকোটের ভেজামাটিতে চিরনিদ্রায়

শায়িত হলেন।[২৩] মুসলমান আমলেই দেবকোটের নাম বদল হয়ে আবার 'দমদমা' নামে পরিচিতি লাভ করে। দমদমাতে সুলতানেরা সেনা ছাউনি বা সেনানিবাস তৈরি করেন এবং রণনীতির কারণেই দেবকোট পুনরায় গুরুত্ব লাভ করে। ১২১০ খ্রিস্টাব্দে ইউয়জ খিলজীর শাসনকালে দেবকোট থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ে লখনৌতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনও দেবকোটের গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। লখনৌতি থেকে দেবকোটের মধ্যে যোগাযোগের একটি দীর্ঘ রাজপথ তৈরি করে দেন হুসামুদ্দীন ইউয়জ খিলজী। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। মোঘল আমল থেকে দেবকোটের গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ হতে শুরু করে। বাংলাকে ২৪টি সুবায় বিভক্ত করে মোগলরা দেবকোটকে সেই সুবার মধ্যে একটি অংশ হিসেবে রেখেছিলেন। অত্যাচার, উৎপীড়ন, শাসকদের ঘন ঘন উত্থান ও পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেবকোটের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে তখনও দেবকোট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল রূপে পরিচিত ছিল। দেবকোটের চটবস্ত্র ও গুড় সেই সময় চীনে রপ্তানি হত।[২৪]

মুসলিম রাজধানী রূপে দেবকোট বা দমদমায় মুসলমানদের যাবতীয় কীর্তিকলাপ গড়ে উঠলেও মুসলমান বিজেতারা পুরাতন বাণগড়কে কিন্তু রাজধানী মনোনীত করেন নি। ধ্বংসপ্রাপ্ত বাণগড় নগরে মুসলমান কীর্তির সম্পর্ক নেই বললেই চলে। এই দেবকোট নগরী কোথায়? এ বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও সাবেক দেবকোট যে ধলদিঘির[২৫] উত্তরপারে অবস্থিত ছিল, নিঃসন্দেহে বলা যায়। কালদিঘি ও ধলদিঘি, এই দুটি জলাশয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কথিত যে, বাণরাজা তাঁর দুই রানিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে রানিদের অনুরোধেই কালদিঘি ও ধলদিঘি খনন করেছিলেন। বাণগড়ের রাজপ্রাসাদ থেকে সুড়ঙ্গপথে ধলদিঘির পারে এসে দুই রানি ও তাঁদের সহচরীরা প্রতিদিন ধলদিঘির শীতল জলে স্নান করতেন এবং সুড়ঙ্গপথেই আবার ফিরে যেতেন প্রাসাদে। এই ধরনের জনশ্রুতি আসলে ছিল নিছক কল্পকথা, ইতিহাস নয়। দেবকোটে এই ধরনের কল্পকথা প্রচারিত হয়েছে এখানকার শিবভবানী মন্দিরের সঙ্গে জড়িত শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীর দ্বারা। বাস্তবে যার আদৌ কোনো ভিত্তি ছিল না।[২৬]

কালদিঘি ও ধলদিঘি ছিল আসলে পুনর্ভবা নদীর পরিত্যক্ত খাত। পাল বংশের রাজারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবিলায় সামরিক প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে পরিত্যক্ত নদীখাতটিকে দিঘিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। সেই সময়কার যুদ্ধবিদ্যা বিশারদদের নির্দেশে এখানে এক বিশেষ ধরনের প্রযুক্তি অনুসৃত হয়েছিল। প্রথমে মাটি কেটে নদী খাতের গভীরতা সৃষ্টির পর নদী সন্নিহিত দিকে গভীর খাল কেটে পুনর্ভবা নদীর সঙ্গে দিঘির সংযোগ সাধন করা হয় এবং দিঘির নদী অভিমুখী দিকে জলকপাট যাকে বলে 'লক্-গেট' বসানো হয়। দিঘির মধ্যে প্রস্তুত থাকত সমর উপকরণ সহ নৌবহর। নৌবহর নিয়ে যুদ্ধযাত্রার প্রয়োজনেই দিঘি অভিমুখী জলকপাটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সে কারণেই সেই দিকের পারের দু'পাশের কিছুটা অংশ উঁচু করে বাঁধানো হলেও মধ্যভাগের বেশ খানিকটা অংশ তাই বাঁধানো হয়নি।[২৭] ধলদিঘির পাড়ে যে সুড়ঙ্গগুলি আজও দেখা যায় সেগুলি ছিল আসলে সমর উপকরণ নিয়ে সামরিক

বাহিনীর যাতায়াতের পথ। এই পথ সুগম ও সুরক্ষিত রাখার জন্য পাথর কেটে সিঁড়ি বানিয়ে সুন্দরভাবে ধলদিঘির ঘাট ও সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছিল। পালযুগে বাংলার নৌ-বাহিনীর খ্যাতি ছিল ভুবনজোড়া। খাদ্য ও যুদ্ধের রসদ সহ নৌবহর নিয়ে সুরক্ষিত জয়স্কন্ধাবার থেকে যুদ্ধযাত্রা এবং যুদ্ধশেষে নৌবহর নদীর বুকে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে নৌ-বাহিনীর সেনাদের আবার সেনানিবাসে নিশ্চিন্তে ফিরে আসা, এই বিশেষ প্রয়োজনের কথা ভেবেই দিঘি দুটোকে পাল রাজারা খনন করেছিলেন।[২৮] কালদিঘি ও ধলদিঘি ছিল পালরাজাদের নৌবহর রাখা ও নৌসেনা রণতরী নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে যাওয়ার মূল কেন্দ্রস্থল। চাষ আবাদ বা জলসেচের প্রয়োজনে দিঘি দুটি কাটা হয়নি। পুনর্ভবা নদী সংলগ্ন এলাকায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনে এত গভীর ও বিরাটাকার দিঘি খননের অন্য কোনও তাৎপর্য ছিল না বললেই চলে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয়, কালদিঘি ও ধলদিঘি, দু'টি দিঘিরই সুউচ্চ বাঁধানো পার আছে তিনদিকে, একদিকে নেই। ধলদিঘির পশ্চিম পার আর কালদিঘির উত্তর পার নেই। দিঘি দুটো প্রদক্ষিণ করলে স্পষ্টতই মনে হয় যেন পরিত্যক্ত নদীখাত।

ধলদিঘির উত্তর পারেই পাল যুগের বিখ্যাত দেবকোট মহাবিহার অবস্থিত ছিল। লামা তারানাথের মতে, পালরাজা ধর্মপাল এই বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ করেছিলেন। এই বৌদ্ধধর্ম বিদ্যায়তনে একদা আচার্য অদ্বয়বজ্র, উধিলিপা, ভিক্ষুণী মেখলা প্রমুখ জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিতেরা জ্ঞানসাধনা করেছিলেন। বাঙালি বৌদ্ধপণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর, বর্তমান যেখানে মৌলানা আতা শাহ্-র দরগা, সেখানে বসেই আচার্য অদ্বয়বজ্র, উধিলিপা, ভিক্ষুণী মেখলা প্রমুখ জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন। ধলদিঘির উত্তর পারেই আজ যেটি মৌলানা আতা শাহ্-র দরগা, পালযুগের বৃহদায়তন বৌদ্ধবিহার ছিল এটি। এখানেই তুর্কিবীর বখ্‌তিয়ার ইসলামের বিজয় পতাকা উড়িয়েছিলেন। এখানকার বৌদ্ধবিহার এবং হিন্দু দেব-দেবীর মন্দিরগুলিকে তিনি খানকাহ্, মুসাফিরখানা, মহাফেজখানা ও মাদ্রাসায় পরিণত করেছিলেন। বখ্‌তিয়ারের ইতিহাস রচনাকার মিনহাজ-এর বিবরণে এই সত্য ফুটে ওঠে যে, বখ্‌তিয়ার সুরক্ষিত দেওকোটে মসজিদ, মাদ্রাসা ও উপাসনালয় স্থাপন করেছিলেন। ধলদিঘির পারে আতা শাহ্ ফকিরের দরগার প্রশস্ত চত্বর আজ যেখানে রয়েছে, সেখানেই অতীতের দেওকোট মহাবিহার, নিঃসন্দেহে বলা যায়। ওই বৌদ্ধ মহাবিহারটি দখল করে বখ্‌তিয়ার মসজিদ, মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, বাংলার প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত ধলদিঘি অঞ্চলে। অর্থাৎ অতীতের দেবকোট নগরী থেকে। এর প্রবর্তক ছিলেন তুর্কিবীর বখ্‌তিয়ার। এখানেই ধলদিঘি ও কালদিঘির পাড়ে বখ্‌তিয়ার সেনানিবাস (দমদমা) স্থাপন করেছিলেন। মেচ উপজাতির প্রধানকে এখানেই তিনি ধর্মান্তরিত করেন। ধর্মান্তরিত মেচ প্রধানের নাম ছিল আলীমেচ।[২৯]

বর্তমান মৌলানা আতা শাহ্-র দরগাটি যে অতীতের অর্থাৎ একাদশ দ্বাদশ শতকের বৌদ্ধবিহার তার চিত্র ধরা পড়ে দরগাটির স্থাপত্যরীতিতে। দিঘির ঘাটের চওড়া

সিঁড়িগুলির পশ্চিমপাশে পাথর দিয়ে বাঁধানো ভিত্তিগাত্রে প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের নকশা, স্বস্তিকা জাতীয় চিহ্ন, দরগার সম্মুখভাগের দেওয়ালের উপরিভাগে পোড়ামাটির ফলকে রূপায়িত পদ্মফুল এবং সমাধি কক্ষের অভ্যন্তরে লতাপাতার নকশা ও অন্যান্য অলংকরণ দেবকোটে পালযুগের বৃহদায়তন বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্বের কথাই প্রমাণিত করে। এই বৌদ্ধবিহারটিরই সামান্য পরিবর্তন সাধন করে তুর্কি বিজয়ের পর ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজী মসজিদে রূপান্তরিত করেন। রুক্‌ন-উদ্দীন কাইকাউস-এর সময় (৬৯০ হতে ৬৯৮ হিজরীবর্ষ[৩০]) সাধক মৌলানা আতা শাহ ইস্‌লাম ধর্ম প্রচার ও আরবি-ফার্সি ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দেওকোটে এসেছিলেন। লখনৌতির সুলতান রুক্‌ন-উদ্দীন কাইকাউস কর্তৃক ওই সময় মসজিদটি নির্মাণ হচ্ছিল। এই মসজিদটিকে কেন্দ্র করে সাধক আতা শাহের তত্ত্বাবধানে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সুপরিকল্পিতভাবে ধলদিঘির উত্তরপাড়ে গড়ে উঠেছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মসজিদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিদ্যাবত্তা, জ্ঞানগরিমা ও চারিত্রিক গুণাবলির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন তুলনাহীন। ক্ষমতাবান এই সাধকের নির্দেশে মসজিদ চত্বরেরই এক কোণে তাঁকে সমাহিত করা হয় এবং এই দরগার খাদেম নিযুক্ত হন গিয়াস নামে একজন সাধক। সুলতান সিকান্দার শাহ-র রাজত্বকালে (৭৬৫ হিজরী বর্ষ) খাদেম গিয়াসের উদ্যোগে, বর্তমানে আতা শাহ-র দরগায় যে গম্বুজ দেখা যায়, ওই গম্বুজ শোভিত সমাধিকক্ষের নির্মাণ কাজ সাধিত হয়। সাধারণতঃ মসজিদের ভেতরে কাউকে দাফন করা অত্যন্ত আপত্তিজনক কিন্তু এখানে তাই করা হয়েছে। সম্ভবতঃ সাধক মৌলানা আতার মৃত্যুর পর তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে বান্দা গিয়াস অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে একত্রে মিলিত হয়ে মসজিদ কক্ষেরই এককোণে তাঁকে দাফন করেছিলেন। এই হল মসজিদটি দরগায় পরিণত হওয়ার ইতিহাস। মৌলানা আতা শাহ-র[৩১] এই হল দেওকোটে অবস্থানের প্রেক্ষাপট।

৪. বাণগড় পরিচিতি

হেমচন্দ্রের *অভিধানচিন্তামণি* এবং পুরুষোত্তমের *ত্রিকান্ডশেষ* পুস্তকে পুনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত কোটিবর্ষ এবং বলিরাজপুত্র বাণাসুরের ও উষা-অনিরুদ্ধের মিথ-পুরাণ স্মৃতি বিজড়িত, বাণপুর-ই হল বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধীনে গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত বাণগড়। সমস্ত বাণগড় ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি জুড়ে এক বৃহৎ সমৃদ্ধ নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পুরাকাহিনি থেকে জানা যায়, এখানে বাণ নামে এক রাজা বাস করতেন। শিব তাঁকে পুত্রের মত মনে করতেন। এমনকি নিজের পুত্র কার্তিকের চেয়েও তাঁকে বেশি ভালবাসতেন। এই বাণরাজা ছিলেন সে যুগের এক কীর্তিমান পুরুষ। আবার, লামা তারানাথের বিবরণ থেকে জানা যায়, পাল রাজাদের মধ্যে অনেকেই প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। বাণপাল পুনর্ভবা নদী তীরে দেবকোটে রাজত্ব করতেন। লোককথায় প্রচলিত আছে, দেবকোটেই ছিল বাণরাজার পুরী। রাজা লক্ষ্মণ সেনের শাসন আমলে রচিত

পুরুষোত্তমের *ত্রিকাণ্ডশেষ* পুস্তকে দেবকোটকে, 'বাণাসুরের পুরী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সাবেক কালে দেবীকোট, উমাবন, উষাবন, কোটিবর্ষ, শোণিতপুর, বাণপুর ইত্যাদি নামে বাণগড়কে অভিহিত করা হত।

বাণগড়ের আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রায় আঠারোশো (১৮০০) ফুট এবং প্রস্থে পনেরোশো (১৫০০) ফুট বিস্তৃত ছিল। নগরটি ছিল চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের পূর্বে, উত্তরে ও দক্ষিণে, এই তিনদিকে পরিখা এবং পশ্চিমে পুনর্ভবা নদী ছিল। পূর্বদিকে প্রধান নগরদ্বার এবং নগর হতে নগরের উপকণ্ঠে যাবার জন্য পরিখার উপরে সেতুর ব্যবস্থা ছিল যা বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। নগরের কেন্দ্রস্থলে একটি সুউচ্চ স্তূপ আছে, এই স্তূপই রাজবাড়ি নামে পরিচিত। এই স্তূপটি কালের মহিমায় এখনও টিকে আছে। নগরের ভেতরে এবং প্রাচীরের বাইরে নগর উপকণ্ঠে এখনও অনেকগুলি স্তূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখনও এই স্তূপগুলি সমতল ভূমিতে পরিণত হয়নি। রাজবাড়ি স্তূপের দক্ষিণ-পূর্বদিকে জীবৎকুণ্ড ও অমৃতকুণ্ড নামে দুটি পুরাতন কুণ্ড এখনও আছে। এই দুটি কুণ্ড নিয়ে লোক প্রবাদ আছে যে, জীবৎকুণ্ডের জল ব্যবহারে মরা মানুষ জীবন ফিরে পেত। মৃত সন্তানকে ওই জলে শুইয়ে দিলে নারীরা জীবন্ত সন্তান ফিরে পেত। অমৃতকুণ্ডের জল ব্যবহারে লোক মৃত্যুকে জয় করত। বর্তমানে কুণ্ড দুটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। ময়লা-আবর্জনায়, গাছের পাতায় আর মাটিতে প্রায় ভরে গিয়েছে। এখন গরু বাছুর স্নান করানো কুণ্ড দুটির নিত্যচিত্র।

বাণগড়ের যত্রতত্র অসংখ্য মূর্তি, মন্দির, প্রাসাদের ভগ্নপ্রস্তর, ইটের খণ্ড এখনও পাওয়া যায়। এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে কম্বোজ রাজবংশ ও পালবংশের শিলালিপি। কম্বোজ রাজবংশের লিপিতে খোদিত যে মন্দির নিদর্শনটির কথা জানা যায়, সমসাময়িক সাহিত্যে তাকে 'পৃথিবী ভূষণ শিবমন্দির' বলা হয়েছে। এই মন্দির দ্বারে যে প্রস্তর নির্মিত ও সাপের ভাস্কর্য খচিত চৌকাঠ ছিল, সেই সর্পদেবতা কিন্তু বিষ্ণুর প্রতীক নয়, শিবের কণ্ঠভূষণ। কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির দ্বারা 'ভূ-ভূষণ' এই শিবমন্দিরটি অপূর্বকারুকাজ সমন্বিত। প্রস্তর নির্মিত ও মাপের ভাস্কর্য খচিত নাগদরজা এবং গ্রেনাইট প্রস্তর নির্মিত (৬ ফুট উচ্চ গোলাকার এবং ৪ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট) অতি মসৃণ একটি স্তম্ভ দিনাজপুর রাজবাড়ির রাজউদ্যান সম্মুখে ছিল।[৩২] স্থাপত্যপ্রিয় ও প্রত্নবিলাসী রাজা রামনাথ রায় বাণগড় থেকে এগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন দিনাজপুর রাজবাড়িতে। বুকানন সাহেব লিখেছেন, দিনাজপুর জেলায় বড়বড় বাড়িতে যে সব প্রস্তর শিল্পের নিদর্শন দেখা যায়, সে সমস্তই বাণগড় হতে নেওয়া হয়েছিল এবং গৌড়নগরী নির্মাণের মূল্যবান আসবাবপত্রও বাণগড়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। বাণগড় থেকে প্রাপ্ত 'পৃথিবীভূষণ শিবমন্দির'টির নিদর্শন এখনও বাণগড়ের অদূরে শিববাটী গ্রামে লাল গ্রেনেট পাথরের চারটি সুন্দর বড় থাম যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তারই মধ্যে রয়ে গেছে।

বাণগড়ের পূর্ব দিগন্তে ইতালীয় মিশন সংলগ্ন ভূমি হতে পাওয়া গেছে পালবংশীয় রাজা তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালের লিপিযুক্ত শিলাময় সদাশিব মূর্তি। পালরাজা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপালদেবের সময়ের আরও একটি তাম্রশাসন বাণগড় থেকে পাওয়া

গেছে। এর থেকে পালবংশের এবং বঙ্গদেশের অনেক অজানা ঐতিহাসিক তথ্য জানতে পারা যায়। *রামচরিত* কাব্যে সন্ধ্যাকর নন্দী বাণগড় সম্পর্কে লিখেছেন, "কোটিবর্ষ জেলাতে জগদ্দল মহাবিহার, রামাবতী জয় স্কন্দবার, বোধিসত্ত্ব লোকেশ ও তারার মন্দির ছিল। এর বুকে ছিল স্কন্দনগর ও বহু মন্দির শোভিত শোণিতপুর নগর যার বুকে ছিল অসংখ্য ব্রাহ্মণের বাস। এই অঞ্চলের দুই প্রান্ত বিধৌত করে প্রবাহিত ছিল গঙ্গা ও করতোয়া নদী এবং পুনর্ভবা নদীর তীরে ছিল প্রসিদ্ধ তীর্থঘাট। তাছাড়া, কোটিবর্ষ জেলায় ছিল অসংখ্য বড় বড় জলাশয় এবং বলভী ও ক্ষীণতোয়া কালিন্দী প্রভৃতি নদীর উৎপত্তিস্থল ছিল ঐ সব বিশালকায় দিঘি-পুষ্করিণী।

এই অঞ্চলের বহু স্থানে কোকিল কূজিত, স্কন্দ-লুকচ শ্রীফল লবণী প্রিয়ালা বৃক্ষ শোভিত অসংখ্য মনোরম উদ্যান ছিল। মাঠে মাঠে ছিল ধানক্ষেত, এলারক্ষেত, প্রিয়াঙ্গুলতা এবং ইক্ষু ও বাঁশঝাড়, অগণিত মহুয়া, সুপারি ও নারিকেলের গাছ। তাছাড়াও ছিল নীল লাল পদ্ম হসিত অসংখ্য বড় বড় দিঘি পুষ্করিণী, আরো ছিল কনক বা চম্পক ও কেতক ফুলগাছ সজ্জিত গৃহ প্রাঙ্গণ এবং ছিল আকাশ ভরা বিস্তৃত ও দ্রুত সঞ্চারমান প্রচুর বারিবর্ষী মেঘ।"

বাণগড় নগরী ছিল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। পরিখা দিয়ে ঘেরার বাইরে ছিল দেবকোটের প্রধান নগরী। এই নগরী প্রসারিত ছিল বাণগড়ের মূল ধ্বংসস্তূপ থেকে পুনর্ভবা নদীর পূর্বধার দিয়ে শিববাটি হাট পার হয়ে আরও উত্তরে ব্রাহ্মণী, গোয়ালফেলানী খাড়ীর এপার-ওপার জুড়ে। পশ্চিমদিকে নারায়ণপুর, ঊষাগড়, দেবকোট প্রভৃতি মৌজাগুলি জুড়ে। দক্ষিণে বিশালকায় কালদিঘি, ধলদিঘির পারভূমি সহ প্রায় আট বর্গমাইল এলাকা নিয়ে। বাণনগরের ভূমি নকশা থেকে জানা যায়, বাণগড় ছিল একটি উচ্চভূমি কাঠামোর উপর নির্মিত নগর। পুনর্ভবা নদীর ধার দিয়ে গড়ে ওঠা শহরটি যখন তখন নদীর বন্যা প্লাবনে যেন ভাসিয়ে দিতে না পারে, নগর রক্ষার নিরাপত্তার কারণে সেদিকে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দশম শতকের বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচী উল্লেখিত হয়েছিল বাণগড় থেকে প্রাপ্ত একটি স্তম্ভলিপিতে। দিনাজপুরের রাজা রামনাথ ওই স্তম্ভটি আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেছিলেন। প্রায় সোয়া দু'শো বছর ধরে স্তম্ভটি দিনাজপুর রাজার রাজ্যোদ্যানে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি সময়ে পরিত্যক্ত রাজবাড়ি থেকে ওই স্তম্ভ এবং নাগদরজাটি ঢাকায় জাতীয় সংগ্রহশালায় নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরে নিযুক্ত ইংরেজ কালেক্টর এবং ওয়েস্ট মেক্ট সাহেব একদিন সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য রানিমাতা শ্যামমোহিনী দেবীর সঙ্গে দেখা করেন। তখন রাজা গিরিজানাথ রায় নাবালক ছিলেন, তাই রাজ-অভিভাবিকা ছিলেন রানিমাতা শ্যামমোহিনী দেবী। ওয়েস্ট মেক্ট সাহেব রাজোদ্যানে ঘোরার সময় স্তম্ভটি দেখেন। স্তম্ভের উপর খোদিত লিপিটির প্রতিলিপি সত্বর নেবার জন্য তিনি ব্যবস্থা করেন এবং বিশিষ্ট সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে দিয়ে তার অনুবাদ করে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে *ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারী* পত্রিকায় একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। লিপিটি সংস্কৃত

ভাষায় লেখা, পণ্ডিতেরা এই ভাষাকে সিদ্ধমাতৃকা ভাষা বলে অভিহিত করেন। স্তম্ভলিপিতে যে চার-চরণ বিশিষ্ট শ্লোক উৎকীর্ণ আছে, তা এই রকম ঃ

"দুর্বারারি বরুথিনী প্রমংগণে দানে চ বিদ্যাধরেঃ
সানন্দং দিবিষস্য মাগগণ-গুণ গ্রামগ্রহো গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা-তেনেন্দু মৌলেয়রং
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটা বর্ষেণ ভূ-ভূষণঃ।।"

বাংলা অনুবাদ এইরকম ঃ "আনন্দে বিদ্যাধরিগণ স্বর্গলোকে যার দুর্দমণীয় শত্রু সৈন্যদমনে দক্ষতা এবং দানকালে গ্রহিতার গুণগ্রাহিতার বিষয় গীত হয়, কাম্বোজান্বয়জ সেই গৌড়পতি কর্তৃক কুঞ্জরঘটা বর্ষে (৮৮৮ শকাব্দে) ইন্দুমৌলির (শিবের) উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীভূষণ মন্দির নির্মিত হয়েছিল।" [৩৩]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ইতিহাসবিদ্ কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর নেতৃত্বে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাণগড়ের খনন কাজ শুরু হয়েছিল। যদিও বাণগড় খননের প্রারম্ভিক কার্যাবলী সূচিত হয়েছিল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে। মুখ্যত বাণগড় খননের কাজ চলে ১৯৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪০-৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। দুই থেকে তিন মাসের মত ওই সময় খনন কাজ চলত। ১৯৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাণগড় গবেষণা পর্যবেক্ষণ খননের কাজে যুক্ত ছিলেন কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, সরসীকুমার সরস্বতী, তারাচাঁদ ঘোষাল ও সন্তোষ কুমার বসু। ১৯৩৮-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে নিয়োজিত ছিলেন, কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, সরসীকুমার সরস্বতী, অমল রায়চৌধুরী, শান্তি নন্দী, অশোককুমার ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ গুহ ও নীরেন মল্লিক। ১৯৩৯-১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ছিলেন কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, অমল রায়চৌধুরী, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, দিলীপ কুমার ব্যানার্জী, দিনেশচন্দ্র দাস, জীতেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, কৃষ্ণচন্দ্র সরকার। ১৯৪০-৪১ খ্রিস্টাব্দে ছিলেন কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, অমল রায়চৌধুরী, সুধাকর চ্যাটার্জী, কেশবচন্দ্র রায় ও কৃষ্ণচন্দ্র সরকার।[৩৪] খননের জন্য পাহাড়পুর[৩৫] থেকে কয়েকজন অভিজ্ঞ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের পুরুষকে আনা হয়েছিল। যাদের পাহাড়পুর স্তূপ খননের অভিজ্ঞতা ছিল। এঁদের মধ্যে বিধু সর্দার ও তাঁদের দলের কয়েকজন প্রথম বাণগড় খননকাজ শুরু করেন। প্রথম প্রথম খনন কাজের জন্য স্থানীয় শ্রমিকদের কেউই কাজ করতে রাজী হত না। স্থানীয় লোকেদের একটা বিশ্বাস ছিল যে, বাণরাজার গড়ে খনন করলে অমঙ্গল হবে। পরে অবশ্য খনন কাজের জন্য দলে দলে লোক এসে ভিড় করত। আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে জানাই যে, বাণগড়ের খনন বিষয় দিনাজপুর শহরের বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক ও উকিল যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, দিনাজপুরের তৎকালীন জেলা সমাহর্তা এ.ডি.খাঁ, শিক্ষা বিভাগের ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর ফকিরদাস ব্যানার্জী, শিক্ষা বিভাগের জেলার ইন্সপেক্টর সমরেন্দ্র নাথ দত্ত, দিনাজপুরের মহারাজা জগদীশনাথ রায়, বিদ্যোৎসাহী ও ইতিহাসপ্রেমী সুশীল চন্দ্র গুহখাসনবীশ প্রমুখ নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।[৩৬]

বাণগড়ের ভেতরে প্রথমে রাজবাড়ির স্তূপে খননের কাজ শুরু হয়। সেখানে গুপ্তযুগের একটি বৃহৎ দেয়ালের চিহ্ন পাওয়া যায় এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু পুরা-

বস্তু ও তামার একটি চতুষ্কোণ ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রা পাওয়া যায়। আরও কিছুটা খননের পর ভূগর্ভ থেকে শিলাস্তম্ভের একটি পাদপীঠ পাওয়া গেলে তাতে কোনও লিপি না থাকায় ওই স্থানের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ওখানে খনন কাজ বন্ধ রেখে গড়ের ভেতরে, কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে একটা অল্প উঁচু স্তূপে খনন আরম্ভ করা হয়। বর্তমান যেখানে বাণগড় প্রবেশের মুখে প্রথম পুরাতন ইটের সংস্কারযুক্ত স্তূপটি রয়েছে, সেই স্তূপটিই পূর্বে কৃষিখেত ছিল। এখানেই প্রথম পাওয়া যায় পালযুগের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এখানেই পাওয়া যায় ক্রুশচিহ্ন বিশিষ্ট ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে ইটের তৈরি সাড়ে পাঁচ ফুট ব্যাসের এক অগভীর কুণ্ড। যার উপরের ভাগে ছিল যোড়শদল পদ্ম এবং নীচে আটকোণ বিশিষ্ট জলাধার। আরও গভীরে খনন করে পাওয়া যায় বড় ও ভারী ইটের তৈরি নগর বেষ্টনকারী প্রাচীর। ইতিহাসবিদ্‌দের মতে এই প্রাচীরটি মৌর্যযুগের। খননের ফলে পাওয়া যায় পাতকুয়া, বিভিন্ন ধরণের লাল ও চক্‌চকে কালরঙের মৃৎপাত্র, মৃন্ময়ীমূর্তি ও তাঁর ছাঁচ, রৌপ্য ও তাম্রের কার্ষাপণ, বিভিন্ন ধরনের পাথরের মালা, ঢালাই করা তামার মুদ্রা ইত্যাদি।

তাছাড়া, শুঙ্গযুগের নিদর্শন স্বরূপ পোড়ামাটির স্ত্রীমূর্তি, ব্রাহ্মীলিপি যুক্ত পোড়ামাটির শিলিং, বিভিন্ন আকারের মৃৎপাত্র, চকচকে কালো মৃৎভাণ্ড, নগর রক্ষার জন্য নির্মিত পোড়ামাটির ক্ষেপণী ইত্যাদি পাওয়া যায়। এইসব মূলত মৌর্য-শুঙ্গ যুগের মৃৎশিল্পকলার বৈশিষ্ট্যের বার্তা বহন করে চলেছে। মাটির কড়া, ঘট, পানপাত্ররূপে মাটির ভাঁড়, মালসা, গ্লাস, বাটি, এইসব মৃৎপাত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। মাটির গেলাসের মত ছড়ানো ছিটানো পাত্র দেখে খনন কাজের সময় রসিক দর্শকদের কেউ কেউ বলেন, 'বাণরাজার কন্যা উষার বিয়েতে যে শত শত মানুষ খেয়েছিল এত ভাঁড় দেখলে সে কথাই মনে হয়।' এখানকার মৃৎপাত্রে পাওয়া গেছে শঙ্খ ও পদ্মচিহ্ন, যা গুপ্তযুগে প্রচলিত ছিল বলে খনন বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন।[৩৭]

বাণগড়ের খনন কাজ যেখানে করা হয়েছিল তা সাড়ে সাতফুট থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দফুট পর্যন্ত গভীর ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী *রামচরিত* কাব্যে লিখেছেন, বাণগড় ছিল মন্দির নগরী। সততই বাণগড় ছিল মন্দির নগরী। অসংখ্য মন্দির শোভিত এই নগরের প্রধান দেবালয় ছিল বোধিসত্ত্ব লোকেশ মন্দির ও তারার মন্দির। তাছাড়া, মূর্তি শিব মন্দির ও ভূ-ভূষণ মন্দির, এই দুটি মন্দিরের পূজা-পার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠানাদি ছিল ভুবন খ্যাত। বাণ নগরী খননের ফলে চিকন পাতলা ইট, সরু দেয়াল, দোচালা ছাঁদ এইসব নিদর্শন গুপ্ত আমলের স্থাপত্যের পরিচায়ক। বাণগড়ের দালান-কোঠা নির্মাণে যে মশলা ব্যবহার করা হয়েছিল তাতে ছিল সুরকি মিশ্রিত এঁটেল মাটির কাদা, গাঁথুনিতে চুন ও সুরকি মিশ্রিত মশলা। ধ্বংসাবশেষের দ্বিতীয় স্তরে পাওয়া যায় পালযুগের সভ্যতার নিদর্শন। এই স্তরে দালান-কোঠা নির্মাণের যে নকশা ও নির্মাণ পদ্ধতি পাওয়া যায় তা ছিল আরও উন্নত। চারদিক বেষ্টিত পাকা প্রাকার, প্রাচীর বেষ্টিত চত্বর, বাসভবন, বিচরণ পথসহ দেবালয়, শস্যাগার, স্নানাগার, ক্রীড়ামঞ্চ, পয়ঃপ্রণালি, পাতকুয়ো, এইসব নিদর্শন পালযুগেরই স্থাপত্যশৈলীর পরিচয় বহন করে। বাণগড়ের দ্বিতীয় স্তরের

খননে স্থাপত্য কাজে বিভিন্ন মাপের ইটের ব্যবহার দেখা যায়, যেমন, সাড়ে আট ইঞ্চি × সাড়ে আট ইঞ্চি × দুই ইঞ্চি ইট। এই পর্বে নির্মাণ স্থাপত্যে ভিত নির্মাণ, গ্রন্থিবন্ধন, দেয়াল দৃঢ়করণ, এইসব কাজে বিভিন্ন আকারের ছোটবড় পাথরের ব্যবহার দেখা যায়। আট থেকে দশফুট পাথরের উঁচু স্তম্ভ, কোনটার নীচের অংশগুলি স্থূলকার ও চতুষ্কোণিক, মধ্যস্থলে অষ্টকোণ বিশিষ্ট, পাদদেশ ও পিঠের অংশ গোলাকার। পাথরের স্তম্ভযুক্ত নির্মাণ কাজের জন্য বাণগড়ের স্থাপত্যের সুনাম ছিল। কঠিন বেলে পাথরের ছিল স্তম্ভগুলি। প্রস্তর ভাস্কর্য শিল্পে বাণগড়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরব ছিল অতুলনীয়।[৩৮]

বাণগড় খননে টেরাকোটা শিল্পের আলোকিত দিক আবিষ্কৃত হয়েছিল। এখানকার শিল্পীরা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে দক্ষ হাতে সূক্ষ্ম ও শৈল্পিক অলংকরণের মাধ্যমে টেরাকোটা ফলকগুলিতে তাঁদের স্ব স্ব প্রতিভার যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা কালের মূল্যবান প্রাপ্তি। দেবদেবী, রাজা-জমিদারদের প্রতিকৃতি, যোদ্ধা, কুস্তিগীর, গায়ক, বাদক, নর্তক, বিভিন্ন পশুপ্রাণী, কীটপতঙ্গ, পাখি, বৃক্ষলতা, ফলফুল ইত্যাদি মূর্তি খচিত টেরাকোটা শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই শিল্প কলাগুলি বেশিরভাগই কুষাণযুগীয়। উৎকৃষ্ট মানের মনোমুগ্ধকর বাংলার টেরাকোটা শিল্প কত যে উন্নতমানের ছিল, বাণগড় থেকে পাওয়া কুষাণ যুগের টেরাকোটা ফলকগুলিই তা প্রমাণ করে। বাণগড় থেকে পাওয়া উভয়পার্শ্বে সহচরীসহ মেঘবর্ষিত জলে স্নানরতা নারীমূর্ত্তি খচিত বিশেষ ফলকটি বাংলার টেরাকোটা শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন।

বাণগড় প্রাচীন ইতিহাসেরই একটি সুবিশাল পড়োভূমি। আমাদের অতীত ইতিহাসের একটি অফুরন্ত তথ্য ভাণ্ডার। প্রাচীন বাংলার মানুষের জীবনযাত্রা, শিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্ম-কর্ম, আচার অনুষ্ঠান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি কেমন ছিল তার সবিশেষ তথ্য ও তত্ত্ব এই বিশাল ধ্বংসস্তূপের অন্ধকার থেকে খুঁজে পেয়েছি আমরা। তাই, সাধারণ দৃষ্টিতে বাণগড় শুধু একটি মাটির ধ্বংসস্তূপ মাত্র নয়, বাণগড় হল প্রাচীন বাংলার একটি অনাবিষ্কৃত অলিখিত সভ্যতার বিশাল ইতিহাস। বস্তুত বাণগড় দুর্গকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল বিশাল বাণগড় নগর। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের ছোঁয়ায় অসংখ্য অট্টালিকারাশির মাধ্যমে সে নগর সুসজ্জিত ছিল। জৈন ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে জানা যায় এই নগরে বসত বাড়ির সংখ্যা ছিল ৬১ হাজার। সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত রহস্য নগরী এখন আর নেই। ইতিহাসের গতি কোনও এক সময় দুরন্ত বেগে এসে তাকে যেন স্তব্ধ করে দিয়ে গেছে। আশ্রয় নিয়েছে ধ্বংস ও বিনাশের গর্ভে। কালের বিবর্ণ পাতায় অতীত বাণগড় এখন কিংবদন্তি মাত্র।

৫. বরেন্দ্রভূমি পরিচিতি

বরেন্দ্রভূমির পরিচয় নিয়ে পণ্ডিত মহলে তর্ক-বিতর্ক রয়েছে অনেক। পূর্বে প্রাচীন করতোয়া নদী, পশ্চিমে মহানন্দা, গঙ্গা ও পদ্মা, দক্ষিণে পদ্মা, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ, চারদিকে এই বিচ্ছিন্ন ভূভাগই 'বরেন্দ্রী' নামে পরিচিত। বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন নাম পুণ্ড্র বা গৌড়দেশ নামে চিহ্নিত। প্রভাস চন্দ্র সেনের মতে, "বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত

রাজশাহী বিভাগই সেকালের বরেন্দ্রদেশ।"[৩৯] বাৎস্য গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের 'পৌণ্ড্রবর্ধনী' নামক 'গাঞি' এখানকার প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায়ের মতে, "বগুড়া-রাজশাহীর উত্তর, দিনাজপুরের পূর্ব এবং রংপুরের পশ্চিম স্পর্শ করে পুরা রেখার একটি বিস্তৃত স্ফীতি, উচ্চ গৈরিকভূমি দেখতে পাওয়া যায়, এটিই মুসলমান ঐতিহাসিকদের বরিন্দ, বরেন্দ্রভূমির কেন্দ্রভূমি।"[৪০] পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্র বা হৃদয়স্থানে খ্রিস্টীয় দশম শতক থেকে একটি বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী নামে নাম পাওয়া যায়। ৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রাপ্ত একটি দক্ষিণী লিপিতে 'বারেন্দ্র দ্যুতিকারিণ' এবং 'গৌড় চূড়ামণি' নামে জনৈক ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী *রামচরিত* কাব্যের কবি প্রশস্তিতে বরেন্দ্রীকে পাল রাজাদের 'জনকভু' অর্থাৎ পিতৃভূমি বলে ইঙ্গিত করেছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী গঙ্গা-করতোয়ার মধ্যে বরেন্দ্রভূমির অবস্থিতি নির্দেশ করেছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে বরেন্দ্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সিলিমপুর শিলালিপি, তর্পণদিঘি এবং মাধাইনগর তাম্রলিপিতে বরেন্দ্রী পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অধীনে ছিল।[৪১] হরিষেণ রচিত *বৃহৎ কথাকোষ* নামক জৈন গ্রন্থে আছে ঃ

পূর্ব্বদেশে বরেন্দ্রস্য বিষয়ে ধনভূষিতে।
দেবকোট্ট পুরং রম্যং বভূব ভূমি বিশ্রুতম্।।

এই দুটি উক্তির বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, পূর্বদেশে ধনশালী বরেন্দ্র বিষয়ে বহু বিশ্রুত রমণীয় নগর দেবকোট অবস্থিত ছিল। সেন রাজাদের তাম্রলিপিতে বরেন্দ্রীর অন্তর্গত স্থানগুলির অবস্থিতি ছিল বর্তমান বগুড়া-দিনাজপুর, রাজশাহী জেলা এবং পাবনা। মধ্যযুগীয় মুসলমান ঐতিহাসিকদের কাছে বরেন্দ্রীই বরিন্দ্ নামে পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিক মিন হাজ-উদ্দিনের লেখা *তবাকৎ-ই নাসিরি* গ্রন্থে বলা হয়েছে গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী এবং লক্ষণাবতী রাজ্যের একটি অংশ মাত্র ছিল বরেন্দ্রভূমি। তিনি লিখেছেন, লক্ষ্মণাবতী-রাজ্যের দুটি বিভাগ গঙ্গার দুই তীরে, পশ্চিমে রাল্ অর্থাৎ রাঢ় দেশ, পূর্বে বরিন্দ্ অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমি।

কোনও কোনও অভিধানে বরেন্দ্র বলতে সাধারণভাবে উত্তরবঙ্গকে বলা হয়েছে। এই বরেন্দ্রভূমি বলতে সমগ্র উত্তরবঙ্গ এই অভিধা সঠিক নয়। উত্তরবঙ্গের অন্যতম জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার রাজ্য (বর্তমানে জেলা) কোনও কালেই বরেন্দ্রভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বরং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অংশ বিশেষ বরেন্দ্রভূমির অধীনে ছিল। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অংশ বিশেষ বলতে বালুরঘাট মহকুমা এবং রায়গঞ্জ মহকুমার অধীনে বংশীহারী থেকে ইটাহার থানা পর্যন্ত বরেন্দ্রের বিস্তার ছিল। রায়গঞ্জ মহকুমার বাকী থানাগুলি এবং ইসলামপুর মহকুমা অঞ্চল বরেন্দ্রের অধীনে ছিল না। মালদহ জেলার যে অংশগুলি মহানন্দা নদীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সেসব অঞ্চলও বরেন্দ্রের অধীনে ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বরেন্দ্রের সীমারেখা বলা যায় অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের রাজশাহী জেলা, রংপুর ও বগুড়া এবং পাবনা জেলার যে অংশ করতোয়া নদীর পশ্চিমে অন্তর্ভুক্ত, মালদা জেলার যে অংশ মহানন্দার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এবং দিনাজপুর জেলার যে অংশ বাণগড় ও তার দক্ষিণ অংশ, এই অঞ্চলগুলি নিয়েই ছিল বরেন্দ্রভূমি।[৪২]

মুসলিম শাসকরা এই বরিন্দ্রী মণ্ডলকে 'বসুধা শির' বলেছেন। এই অঞ্চলের জমি গঙ্গার কাদায় গঠিত এবং উর্বর। সে কারণে নানা বিজয়ী শক্তি উত্তরবঙ্গে এসে বরাবর এই উর্বর অঞ্চলে বরেন্দ্রভূমিকে নিজেদের দখলে রেখে বসতি গড়েছে। কথিত যে, বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের বরে এই অঞ্চল সুজলা-সুফলা হয়েছে, সে কারণেই এর নাম বরেন্দ্র হয়েছে। বরণ অর্থ শ্রেষ্ঠ বা বরণীয়, এই শব্দ থেকে বরিন্দ্ বা বরেন্দ্র নামটি উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এর মাটি শুধু ফসলের পক্ষে উর্বরা নয়, এই ভূমি যুগে যুগে বহু জ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও ধর্ম প্রবক্তাদের জন্ম দিয়েছে। উন্নত শিল্প, সাহিত্য ও রাগ-রাগিণীর ঘরানা এই অঞ্চলকে সমৃদ্ধ এবং পুষ্ট করেছে। সেজন্যই এই বিশেষ স্থানটির নাম 'বরিন্দ্' বা 'বরেন্দ্রভূমি' নামে খ্যাত।[৪৩] গুপ্ত, পাল ও সেন রাজত্বকালে এই উত্তরীয় দেশে ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে যে সব ভূমি দান করা হয়েছে তার অধিকাংশই দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, মালদহ ও পাবনা জেলার সেই সব অঞ্চল, যে অঞ্চলগুলি উর্বরতার জন্য খ্যাত। দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল। এই অঞ্চলগুলিই বরেন্দ্র।

পাল নৃপতি দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে বাংলার কৈবর্ত নেতা দিব্বোকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল এই বরেন্দ্রভূমিতে। দ্বিতীয় মহীপাল ওই প্রজা বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে প্রাণ হারান। এর ফলে বরেন্দ্রে দিব্বোকের কৈবর্তরাজ কায়েম হয়। দিব্বোকের পর তার ভাই রুদোক এবং ভাইয়ের ছেলে ভীম উত্তরবঙ্গ শাসন করেছিলেন। দ্বিতীয় মহীপালের ছোটভাই রামপাল পরবর্তীকালে হারানো রাজ্য আবার পুনরুদ্ধার করেন এবং কৈবর্তরাজ ভীমকে রামপাল বন্দী করেন। যার স্মৃতি আজও বালুরঘাট শহর থেকে ২৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে মৌড়াদিবর গ্রামে দিবরদিঘি নামে এক জলাশয়ের মধ্যে ৪১ ফুট উচু ও ১০ ফুট ব্যাস নিয়ে অষ্টকোণ প্রস্তরখণ্ডে মহারাজ দিব্বোর জয়স্তম্ভে কীর্তিত।

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. দিনাজপুর তখন জ্যোতিষপুর নামে পরিচিত ছিল। দিনাজপুরের পূর্ব দিকে অবস্থিত বলে স্থানটি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে পরিচিতি লাভ করে।
২. প্রভাসচন্দ্র সেন, *বগুড়ার ইতিহাস,* পৃ. ১৮৪।
৩. হীরেন্দ্র-নারায়ণ সরকার, *দিনাজপুর জেলার ইতিহাস,* পৃ. ১৭,১৮।
৪. সীতাকোট ও সীতাকুণ্ড ঃ স্থানটি বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধীনে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত।
৫. বৈরাট্টা ঃ বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার অধীনে। প্রাচীন সমীবৃক্ষটি মরে গিয়ে তার গা থেকে বেরিয়েছে বর্তমান গাছটি। এই গাছটিকে দেখলেও মনে হয় অতি পুরনো।
৬. দেহাবন্দঃ বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার অধীনে।
৭. করঞ্জী গ্রাম ঃ বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার অন্তর্গত।

৮. বাণনগর ঃ বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অধীনে বাণগড়।
৯. নারায়ণপুর ঃ বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অধীনে।
১০. উষাহরণ রোড ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার অধীনে ফতেপুর অঞ্চলের অদূরে।
১১. করদাহ ঃ বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধীনে তপন থানার অন্তর্গত। স্থানটি বর্তমানে কবরদহ নামে পরিচিত।
১২. করণদিঘিঃ বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার অধীনে করণদিঘি থানা।
১৩. গোয়ালপোখর ঃ বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার অধীনে গোয়ালপোখর থানার অন্তর্ভুক্ত।
১৪. পুণ্ড্রবর্ধণ ঃ বর্তমান নাম মহাস্থানগড়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধীনে বগুড়া জেলায় এর ধ্বংসস্তূপ আজও রয়েছে।
১৫. কোটিবর্ষ নগর ঃ বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধীনে গঙ্গারামপুর থানার বাণগড় অঞ্চল। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব), পৃ. ৩০১।
১৬. মহাবীরের শিষ্য সুধর্মা এবং সুধর্মার শিষ্য জম্বুস্বামী যে কোটিবর্ষ নগরের বাসিন্দা, তার কোনও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই, লোককথা। জম্বুস্বামীর সমাধির নির্দিষ্ট জায়গাটি দেবকোট নগরীর কোনখানে, তারও কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। রচনাকার।
১৭. আদিনাথ নেমিনাথ উপাধ্যায় সম্পাদিত, *বৃহৎকথা কোষ*।
১৮. দুর্ভিক্ষ নিবারণে ওই সময় আরও একটি দল আচার্য স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতে না গিয়ে উত্তর ভারতে যান। দুর্ভিক্ষের দরুন এই ভিক্ষুগণ সঙ্গের কিছু নিয়ম শিথিল করে ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য নানা দিকে বের হতে বাধ্য হওয়ায় তাঁরা বস্ত্র পরিধান শুরু করলেন। এঁরা হলেন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়।
১৯. Rama Chaterji, *Religion in Bengal*, p. 357.
২০. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১।
২১. অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী, 'ইতিকাহিনী', শারদীয় *দধীচি* ১৪০৫, পৃ. ১৩৬-৩৭।
২২. অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী, ঐ, পৃ. ১৩৮-৩৯।
২৩. রজনীকান্ত চক্রবর্তী, *গৌড়ের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড)।
২৪. প্রণব সরকার সম্পাদিত, *লোক-বাংলার জনপদসংখ্যা*, পৃ. ৬৫।
২৫. ধলদিঘি ও কালদিঘি ঃ বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধীনে গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত।
২৬. অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী, প্রাগুক্ত, ১৪০৫, পৃ, ১৫৬।
২৭. দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বরণীয় ব্যক্তিত্ব সুপণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ্ পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে আলোচনা। তারিখ ১৯৯৮ সালের ৭ ডিসেম্বর।
২৮. অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী, প্রাগুক্ত, ১৪০৫ পৃ. ১৫৮।
২৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (মধ্যযুগ), পৃ. ১-৫।
৩০. সুলতান সিকান্দর শাহ ঃ আনুমানিক ১৩৫৮ হইতে ১৩৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭; আবার কেউ কেউ বলেন সুলতান সিকান্দর শাহ-এর রাজত্বকাল ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।
৩১. মৌলানা আতা শাহ ঃ আনুমানিক ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৬৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ছিল ধলদিঘির পারে তাঁর অবস্থান। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুফি সাধক শেখ জালাল-উদ্দীন তাব্রিজীর

মত তিনিও ছিলেন সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার সাধক।

৩২. ১৯৫৯ সালে দেখেছি। রচনাকার।

৩৩. রমাপ্রসাদ চন্দ্র, *গৌড় রাজমালা।*

৩৪. Kunjagobinda Goshwami. *Excavations at Bangarh (1938-41)*. p iii.

৩৫. বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জয়পুরহাট জেলার অধীনে।

৩৬. কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, *প্রত্নতীর্থ পরিক্রমা;* পার্থসারথী মৈত্র, *ইতিহাসের পথে পথে, অকপট*, পৃ. ১৫০।

৩৭. কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, প্রাগুক্ত।

৩৮. Kunjagobinda Goshwami. *Excavations at Bangarh (1938-41),* p.iii.

৩৯. প্রভাসচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।

৪০. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

৪১. ঐ, পৃ. ১১৬।

৪২. হিমাংশুকুমার সরকার, 'বরেন্দ্রের ঐতিহাসিক পরিচয়', শারদীয় *কালিয়াগঞ্জ বার্তা,* ১৩৮৪,পৃ.২।

৪৩. *দৈনিক বসুমতী*, শিলিগুড়ি সংস্করণ, ২৮ অক্টোবর ২০০১, পৃ. ৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লোকপ্রকৃতি

১. প্রাচীন যুগ

বরেন্দ্র ভূমির উত্তরদিকে বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিয়ে গঠিত হয়েছিল দিনাজপুর জেলা। এই জেলার বিস্তৃত দক্ষিণ অঞ্চল নিয়ে মালদহ ও রাজশাহী জেলা গঠিত। ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী বরেন্দ্র অতি প্রাচীন ভূমি। এই ভূমির ইতিহাসও অতি প্রাচীন। এখানকার মাটি পুরাতন শিলাখণ্ড মিশ্রিত। বঙ্গদেশের বিশেষত যে সব অঞ্চল ব-দ্বীপ অঞ্চলে বেষ্টিত, এই অঞ্চল সেইরকম সমতল নয়। ভৌগোলিক দিক থেকে দিনাজপুর অঞ্চল সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে চুরাশি ফুটের বেশি উঁচু নয়। ছোট বড় নদী-শাখানদী-উপনদী জলপ্রবাহের জন্য এখানে প্রায় সবস্থানেই নিম্ন সমতল ভূমির সৃষ্টি হয়েছে। আবার, জেলার দক্ষিণ অংশে যে বরেন্দ্র অঞ্চল তা তুলনায় কম উঁচু ও সমতলময়। সমতলভূমি দ্বারা বেষ্টিত এই ভূমির পূর্বদিকে যমুনা অববাহিকা এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে গাঙ্গেয় অববাহিকা। এখানে বড়বড় বিল ও জলাশয় রয়েছে। প্রাচীন যুগে এই জেলা পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। এর পশ্চিমে মহানন্দা, পূর্বে করতোয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গা এবং উত্তরে তিস্তা ও এর উপনদী দিয়ে ঘেরা অঞ্চলগুলিই ছিল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির উঁচু ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডই পাল শাসনকাল থেকে বরেন্দ্র অঞ্চল নামে খ্যাত।

দিনাজপুর ভূভাগে অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে প্রবাহিত তিনটি নদী। নদীগুলি হল, করতোয়া, আত্রাই ও পুনর্ভবা। প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে এ সব নদীর মহিমাকীর্তন করা হয়েছে। *মহাভারত*-এ করতোয়া নদীর কথা বলা হয়েছে। এই নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী বরুণ দেবতার রাজ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। *পদ্ম, মার্কণ্ডেয়, যোগিনী* ও *কালিকাপুরাণ*-এ এই নদীর যশ কীর্তনের কথা উচ্চারিত হয়েছে। *অমরকোষ* নামক গ্রন্থে, রাজশেখর রচিত, *কাব্য মীমাংসায়*, মধ্যযুগে রচিত *করতোয়া মাহাত্ম্য* ইত্যাদি পুস্তকে করতোয়া নদীকে পূর্বদেশের অন্যতম নদীরূপে বলা হয়েছে। আমাদের প্রাণ প্রবাহদায়িনী গঙ্গা নদীর পরেই বঙ্গদেশের পবিত্র নদী রূপে কীর্তিত পবিত্র নদী করতোয়া। পুণ্যসলিলা আমাদের জননীসমা। স্মরণাতীত কাল থেকেই আমাদের সুজলা-সুফলা ভূখণ্ডে আত্রাই নদীকে ঘিরে এক বিরাট সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। *দেবীপুরাণ* গ্রন্থে দুর্গাপুজার মহাস্নান মন্ত্রে যে কয়েকটি পবিত্র স্রোতস্বিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তারমধ্যে কল্লোলিনী আত্রাই এর নাম প্রথমেই উচ্চারিত হয়েছে ('আত্রেয়ীভারতী

গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী')। *মহাভারত*-এর বনপর্বে এই নদী পবিত্র তীর্থপীঠ রূপে পরিচিত। এর মাহাত্ম্যও পবিত্র জলগুণের জন্যই হিন্দুদের মহাতীর্থ ছিল এই নদী ভূখণ্ড। রেনেলের মানচিত্রে এই স্রোত বহাকে তিস্তা নদীর সবচেয়ে বড় জলধারা রূপে দেখানো হয়েছে।[১] পুরাকাহিনি অনুযায়ী পুনর্ভবা নদী পবিত্র নদী রূপে পরিচিত। দিনাজপুর জেলার তৃতীয় উল্লেখযোগ্য এই কুলবতী। এর তীরেই অবস্থিত ছিল কোটিবর্ষ নগরী। মুসলিম শাসনকালে এই অপগার তীরেই গড়ে উঠেছিল তুর্কি আক্রমণকারীদের দুর্গ দমদমা। *রামচরিত* পুস্তকে সন্ধ্যাকর নন্দী এই নদীকে 'অতিভয়ঙ্করী' বলে উল্লেখ করে গেছেন। মানিক দত্তের *চণ্ডীমঙ্গল* এবং জগজ্জীবন ঘোষালের *মনসামঙ্গল*-এ এই নদীপথে বাণিজ্যপোতের সাগরযাত্রার কথা আছে।[২] এই সব নদী ছাড়াও এ জেলায় রয়েছে আরও ছোট বড় ক্ষুদ্র নদী। এই সব নদীর তীরে সাবেককালে বৌদ্ধবিহার, হিন্দুমন্দির, স্থানীয় শাসনকেন্দ্র নির্মিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে নাগর, কুলীক, টাঙ্গন, ছিরামতী, ঢেপা, গভুরা, যমুনা, বালিয়া, পিতানু, রুহিতা, কুমড়ী, গামারি, তুলাই, ডাহুক, গান্ধার ইত্যাদি। পুরনো নদীগুলি নাব্য ছিল এবং সমগ্র দিনাজপুর অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থাকে উন্নত করে রেখেছিল।

দিনাজপুর ও তার আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সাবেক ইতিহাসের প্রধান উপাদান পাওয়া যায় মুলত বিভিন্ন রাজবংশের শাসনকালের প্রাপ্ত তাম্রশাসন, শিলালেখ, সাহিত্য ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলী, প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ এবং পাশ্চাত্য পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে। দিনাজপুর জেলা থেকে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের উৎকীর্ণ যে তাম্রলেখ ও শিলালেখ পাওয়া গেছে, সেইসব থেকে যেমন, স্থানীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দিক জানা যায় অপরদিকে, আর্থ-সামাজিক দিকেরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এখানে পুরাকীর্তির বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রচুর দেবদেবীর মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রস্তর নির্মিত মূর্তিগুলির পাদপীঠে কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নৃপতির নামেরও উল্লেখ আছে। প্রচুর বৌদ্ধবিহার ও স্তূপের সন্ধানও পাওয়া গেছে বৃহত্তর দিনাজপুর ভূখণ্ডের যত্রতত্র। এইসব নিদর্শনের বেশিরভাগই রয়েছে বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সেন্টার, ঢাকার জাতীয় সংগ্রহশালা, কলকাতার ভারতীয় জাতীয় সংগ্রহশালা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা, বেহালা প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা, গুরুসদয়দত্ত সংগ্রহশালা ও মালদহ মিউজিয়ামে। তুলনায় কম আরও কিছু নিদর্শন আছে, বালুরঘাট মহাবিদ্যালয় মিউজিয়াম, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্ষয়কুমার মৈত্র সংগ্রহশালা, রায়গঞ্জ প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা, বাণগড় ইতালীয় মিশন চত্বর, শিববাটি প্রশান্ত নন্দীর সংগৃহীত সংগ্রহশালা ও কালিয়াগঞ্জ বার্তার প্রত্ন সংগ্রহশালায়। বিশেষ করে দিনাজপুর জেলার প্রাচীন সংস্কৃতি, ধর্ম, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প, টেরাকোটা শিল্প, মূর্তিশিল্পকলা ইত্যাদি আলোচনার ক্ষেত্রে এই চিরত্নসমূহের অবদান অসীম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারত তীর্থকে অগণিত জাতির মিলনক্ষেত্র কল্পনা করে বলেছিলেন ঃ

কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা,
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা।

ভারত তীর্থের অন্যতম প্রান্তিক অঞ্চল দিনাজপুর সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। সাবেক কাল থেকে শুরু করে তুর্কি অভ্যুদয় পর্যন্ত কত বিভিন্ন জন, কত বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা এই ভূমিতে বয়ে এনেছে এবং ধীরে ধীরে কোথায় কীভাবে যে তা বিলীন হয়ে গিয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। কিন্তু মানুষ তার রক্ত, দেহগঠন, ভাষা, সভ্যতার বাস্তব উপাদান, সংস্কৃতির ধারা এ-সবের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রেখে গেছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ভারতের উত্তর হিমালয় পাদদেশ সন্নিহিত অঞ্চলের মোঙ্গল জাতি গোষ্ঠীর বসবাস এই জেলার উত্তর দিক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীতে দক্ষিণ দিক থেকে বাঙালি জনগোষ্ঠীর সম্প্রসারণের দরুন মোঙ্গল জাতিগোষ্ঠী হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের বনাঞ্চলে পালিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। আবার, সুযোগ পেলেই দিনাজপুরের উত্তরাংশে মোঙ্গল অধ্যুষিত রাজ্য সমূহে তারা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করত। এখানকার প্রাপ্ত ও আবিষ্কৃত প্রাচীন লিপিতে উচ্চারিত বিভিন্ন গ্রাম নামের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত করেছে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ জেলায় মোঙ্গল জনগোষ্ঠীর বসতি স্থাপন হয়েছিল। যেমন, প্রাচীন কোটিবর্ষ জেলার অধীনে 'ডোঙ্গা' নামে একটি গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্ত শাসন কালে দুটি তাম্রশাসন থেকে নামটি পাওয়া যায়। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে 'ডোঙ্গা' নামটি অনার্য সম্ভূত।

প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি পুণ্ড্ররা উত্তরীয় দেশে[৩] আর্য সভ্যতা বিস্তারের বহু পূর্বেই এই অঞ্চলে বসতি বিস্তার করেছিল। পুণ্ড্রজনদের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বৃহৎসংহিতা পুরাণ, মনুসংহিতা* এবং *বোধায়ণ ধর্মসূত্র*-এ। পুণ্ড্রদের নাম অনুযায়ী দেশের নাম হয় পুণ্ড্রদেশ। কোনও কোনও শাস্ত্রীয় গ্রন্থে পুণ্ড্রদের অসুর বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। কালের মহিমায় পুণ্ড্রদের মধ্যে আর্যসংস্কৃতি বিস্তার লাভ করতে থাকে। এখানকার বিভিন্ন নদ-নদী করতোয়া, আত্রাই, পুনর্ভবা, মহানন্দা পুণ্ড্রদের মধ্যে পবিত্র নদী রূপে পূজিত হতে থাকে। এই সব নদীর তীরে বহু তীর্থস্থান গড়ে ওঠে। ক্রমে বৈদিক, বৌদ্ধ এবং জৈন এই তিনটি ধর্ম এবং এদের শাখা প্রশাখা এখানে বিস্তার লাভ করে। এভাবেই একদা দিনাজপুর আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। মৌর্য শাসন কালে পুণ্ড্রদেশ ঐশ্বর্যপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়েছিল। মৌর্যশাসনের পূর্বেই দুর্গনগরী পুণ্ড্রনগর প্রতিষ্ঠিত হলেও মৌর্যযুগেই পুণ্ড্রনগরে, পুণ্ড্রভুক্তি বা পুণ্ড্রদেশের রাজধানী বা প্রধান শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য এই যে, প্রাচীন ভারতের মৌর্য সাম্রাজ্য যে উত্তরীয় দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ফার্গুসনের মতে, দিনাজপুর, রংপুর এবং বগুড়া প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের অধীনে ছিল।[৪] করতোয়া নদীর বিশাল জলপ্রবাহ পুণ্ড্রনগরকে সুজলা সুফলা করে তুলেছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে তিস্তানদীর অন্যতম গতিপথ ছিল এই অপগা। দিনাজপুরের উত্তর অঞ্চল ও দক্ষিণ অঞ্চলের নৌ-যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম ছিল করতোয়া নদী। আঠারো শতক পর্যন্ত করতোয়া এক বিশাল আকারের নদী ছিল এই তথ্য পাওয়া যায় ফান্-ডেন্-ব্রুক-এর মানচিত্রে। বিভিন্ন শিলালেখ ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিতে যে বহু বৌদ্ধদের আবাস

ছিল তা জানা যায়। আবার, কোটিবর্ষ নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে শুঙ্গ যুগের নির্দশন পাওয়া গেছে। এরমধ্যে পোড়ামাটির তৈরি নারীমূর্তিও রয়েছে।

এখানে কোন্ সময় থেকে গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইতিহাস তার সঠিক হদিশ দিতে পারেনি। অনেকে ধারণা করেন যে, পুণ্ড্ররাজ্য সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালের পূর্বেই গুপ্ত সম্রাটদের অধীনস্থ হয়েছিল। গুপ্ত আমলে পুণ্ড্রবর্ধন উত্তরদিকে হিমালয় এবং দক্ষিণ দিকে পদ্মার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় দামোদরপুর তাম্রশাসনে। দিনাজপুর জেলার অধীনে ফুলবাড়ি' স্টেশনের কাছে রয়েছে দামোদর নামে একটি গ্রাম। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই গ্রামের সমীরুদ্দীন মণ্ডল নামে জনৈক ব্যক্তি দুটি পুকুরের মাঝখান দিয়ে একটি রাস্তা নির্মাণের সময় পাঁচখানি তাম্রলিপি আবিষ্কার করেন। এই সব লিপির পাঠোদ্ধার করেন অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক। তাম্রলিপিগুলি বর্তমানে রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সেন্টার-এর চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। দামোদরপুর থেকে বাণগড় নিকটেই অবস্থিত। তাম্রশাসন ছাড়াও গুপ্তযুগের মুদ্রাও বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া যায়। দামোদরপুর তাম্রলিপি সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র সম্রাট কুমারগুপ্ত এবং সম্রাট বুধগুপ্তের রাজত্বকালের। ৪৪৪ খ্রিস্টাব্দে কুমার-গুপ্তের তাম্রলিপিটি কোটিবর্ষ বিষয়-এর অধিকরণ থেকে প্রচারিত। তাম্রলিপিটিতে পুণ্ড্রবর্ধনের সেই সময়কার শাসনকর্তা চিরাতদত্তের নাম পাওয়া যায়। চিরাতদত্ত সম্রাট কর্তৃক নিয়োজিত হয়েছিলেন, তাম্রলিপিতে তারও উল্লেখ আছে। তাম্রলিপি থেকে আরও জানা যায় যে, পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ জেলার (বিষয়) প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন কুমারামাত্য বেত্রবর্মণ। অন্য আরও একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় কুমারামাত্য বেত্রবর্মণ চিরাতদত্ত কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ৪৪৮ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ দামোদরপুর থেকে প্রাপ্ত আরও একটি তাম্রশাসনে জানা যায় এগুলির প্রচারের স্থান, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও জেলার প্রধান শাসনকর্তার নাম। যেমন, সম্রাট বুধগুপ্তের তাম্রশাসনটি কোটিবর্ষ জেলার (বিষয়) অধিকরণ থেকে প্রচারিত এবং মহারাজ জয়দত্ত পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির প্রদেশপাল ছিলেন। ওই একই গ্রাম থেকে পাওয়া বুধগুপ্তের অপর একটি তাম্রশাসন পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অধীনে 'পলাশবৃন্দ' নামক শাসনকেন্দ্র থেকে উৎকীর্ণ হয়। দামোদরপুর গ্রামে প্রাপ্ত সম্রাট দামোদর গুপ্তের তাম্রশাসন থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায় ওই সময় পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির 'প্রাদেশিক শাসনকর্তা' ছিলেন 'মহারাজ রাজপুত্র দেবভট্টারক'। তখন কোটিবর্ষ জেলার (বিষয়) শাসনকর্তা ছিলেন স্বয়ম্ভদেব। তিনি প্রদেশপাল মহারাজ রাজপুত্র দেব ভট্টারক কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৮] তাম্রশাসনটি কোটিবর্ষ নগরের সচিবালয় হতে উৎকীর্ণ হয়েছিল।

দিনাজপুর জেলার দামোদর গ্রাম থেকে পাওয়া তাম্রলিপিগুলি থেকে জানা যায় যে, গুপ্তযুগে বঙ্গদেশ দুটি বিভাগ বা ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। একটি পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি অপরটি বর্ধমান ভুক্তি। এরমধ্যে পুণ্ড্রবর্ধন বিভাগের অধীনে তিনটি জেলা (বিষয়) ছিল। এগুলি হল, কোটিবর্ষ খারট পাড়া এবং পঞ্চনগরী। কোটিবর্ষ জেলার সদর ছিল বর্তমান বাণগড়। খারট পাড়া কোথায় তা এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি।

ধনাইদহ থেকে পাওয়া তাম্রলিপিতে (৫ম শতক) এ জেলার নাম পাওয়া যায়।[৭] ইতিহাসবিদ্‌দের কারও কারও মতে, পঞ্চনগরী ছিল ফুলবাড়ি স্টেশনের কাছাকাছি হতে আরম্ভ করে দক্ষিণে পাঁচবিবি এবং পাহাড়পুর পর্যন্ত যমুনার তীরবর্তী স্থান। বৈগ্রাম তাম্রশাসনে (৪৪৭ খ্রিঃ) পঞ্চনগরীর উল্লেখ আছে। গ্রিক লেখকদের লেখায় এই নগরীর নাম 'Pentapolis'। এর সঙ্গে পঞ্চনগরীর কোন রকম যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে। দামোদরপুর তাম্রলিপি থেকে সেকালের শাসনবিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, প্রাদেশিক শাসনকর্তার নাম (ভুক্তি) ভুক্তিপতি বা উপরিক এবং জেলার (বিষয়) শাসনকর্তার নাম ছিল বিষয়পতি। তাঁর অধীনে শাসনকার্য করতেন নগরশ্রেষ্ঠী প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ এবং প্রথম সার্থবাহ। জেলার (বিষয়) অধীনে থাকত মণ্ডল, মণ্ডলের অধীনে বীথি এবং বীথির অধীনে থাকত গ্রাম। মণ্ডলের শাসকের উপাধি ছিল মণ্ডলপতি, বীথির ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব বা মহত্তর এবং গ্রামের শাসক হলেন গ্রামিক। দিনাজপুর জেলার বৈগ্রাম তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, তখন প্রতি কুল্যবাপের মূল্য ছিল দুই দিনার। এক কুল্যবাপ ভূমির পরিমাণ প্রায় ১২৫ বিঘার মত। সহায়ক ও উপদেষ্টারূপে জনসাধারণ তাঁদের মতামত, ইচ্ছা, দায় ও অধিকার কার্যকর করবার সুযোগ পেত। এই যুগে বাঙলায় বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রভাব, দেবদেবীর মূর্তিপূজা, মন্দির নির্মাণের বিশেষ প্রচলন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির সবিশেষ উন্নতি হয়েছিল। রাজা বা রাজকর্মচারীগণ প্রজার উপর অত্যাচার করতেন না, দণ্ডবিধি কঠোর ছিল না। প্রজাদের উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজকর হিসাবে দিতে হত। তখন মুদ্রা হিসাবে কড়ির ব্যবহার ছিল। ধর্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা ছিল না। গুপ্তশাসন আমলে উল্লেখযোগ্য শাসনকেন্দ্র ও বর্ধিষ্ণু নগরী হিসাবে কোটিবর্ষ নগরীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। এই নগরীই ছিল কোটিবর্ষ জেলার প্রধান শাসনকেন্দ্র।

ভারতীয় ইতিহাসে গুপ্তযুগকে 'সুবর্ণযুগ' বলা হয়। এই যুগেই ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, শিল্প, চিকিৎসাবিদ্যা, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ ও সাহিত্য প্রভৃতির অভূতপূর্ব উন্নতিলাভ ঘটে। এ-যুগে আর্থিক কাঠামোর মূল বনিয়াদ ছিল কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য। এই যুগেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের নবজাগরণ ঘটে। সমাজে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, ত্রিমূর্তির পূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়েছিল। বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত ধর্মের স্ফুরণ গুপ্তযুগেই বিশেষভাবে হয়েছিল। তন্ত্রসাধনা ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রাবল্যও বেড়ে গিয়েছিল। বুদ্ধদেবকে এই সময় হিন্দুরা অন্যতম অবতার বলে গ্রহণ করে ও তাঁর মূর্তি পূজার প্রচলন করে। এই সময়কার হিন্দুধর্ম হল পৌরাণিক ধর্ম যার মধ্যে আর্য ও অনার্য ধর্মের সম্মেলন ঘটেছে। দিনাজপুরের সীতাকোট নামক স্থানে একটি স্তূপ খননের ফলে গুপ্ত আমলে নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐতিহাসিক এই স্তূপটি দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানার অধীনে। এই মহাবিহার অতি প্রাচীন বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধজ্ঞানকেন্দ্র। বৌদ্ধকেন্দ্রটি আকার ও আয়তনে ছিল চতুষ্কোণিক এবং প্রতিটি বায়ুর দৈর্ঘ্য ছিল ২১৩ ফুট। বিহারটির সর্বমোট আয়তন ৪৫৩৬৯ বর্গফুট। চারদিকে প্রাচীরাকারে বেষ্টিত স্তূপটি উচুঁপাড় ঘেরা একটি দিঘির মত দেখতে। সাধারণ সমতল

ভূমি থেকে স্তূপটি কুড়ি ফুটের মত উঁচু। বিহারটির চারদিক ঘিরে ভেতরমুখী দুয়ার বিশিষ্ট কক্ষগুলি অবস্থিত। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বাসের জন্য তৈরি এইসব বাসকক্ষের সামনে টানা লম্বা বারান্দা ছিল। মধ্যখানে সমতল আঙ্গিনার অস্তিত্ব থেকে প্রমাণিত হয় যে সীতাকোট বিহারে কোনও কেন্দ্রিয় মঠ বা মন্দির ছিল না। বিহারের উত্তর প্রান্তে ছিল ৬ ফুটের মত প্রশস্ত প্রবেশ পথ। সীতাকোট বৌদ্ধ বিহার খননের ফলে আকর্ষণীয় বহুমূল্যবান পুরাবস্তু পাওয়া যায়। এসবের বেশিরভাগই হল বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসংস্কৃতিমূলক সামগ্রী। তারমধ্যে ব্রোঞ্জ নির্মিত বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি, মঞ্জুশ্রী মূর্তি দুটি পাওয়া যায়। পাওয়া যায় একটি ভোটিভ স্তূপের অংশ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির স্মৃতি চিহ্ন বিজড়িত পোড়ামাটির ভাস্কর্য। দ্বিতীয় পর্যায়ের খননে পাওয়া যায় ৪৬টি বাসকক্ষ, বারান্দা, স্নানঘর, রান্নাঘর, পূজাকক্ষ, গৃহপ্রাচীর, পয়প্রণালী, চত্বর ইত্যাদি। তাছাড়া বৌদ্ধচিহ্ন যুক্ত পোড়ামাটির নানান ধরনের ভাস্কর্য, প্রাচীন প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ও সংস্কৃতির পরিচয়বাহী নানান প্রত্নদ্রব্যও পাওয়া যায়। সীতাকোটে আবিষ্কৃত প্রত্ন দ্রব্যাদি, বাসগৃহ প্রভৃতি নিদর্শন থেকে ইতিহাসবিদ্‌দের কেউ কেউ এখানকার বিহারটি পাহাড়পুর, নালন্দা ও শালবন বিহারের তুলনায় প্রাচীনতর বলে উল্লেখ করেন।[৮]

হিউয়েন সাং-এর বিবরণে জানা যায়, পুণ্ড্রবর্ধনে তখন বৌদ্ধদের ত্রিশটি সংঘারাম, দুই কোটি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও হিন্দু সম্প্রদায়ের একশোটি মন্দির ছিল। এখানে সে সময় নির্গ্রন্থ জৈনরা অনেক বাস করতেন। পুণ্ড্রবর্ধনে নীল স্ফটিক নির্মিত একটি সুন্দর বৌদ্ধমূর্তি দেখে হিউয়েন সাং মুগ্ধ হন। উল্লেখ্য এই যে, সম্রাট অশোকের আমলের আগে থেকেই বরেন্দ্রী অঞ্চলে বৌদ্ধমতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার যে ঘটেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার আগে ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে পুণ্ড্র নগরের পাঁচ হাজার বৌদ্ধ শ্রমণের প্রাণদণ্ড প্রদান করেছিলেন। এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে সম্রাট অশোকের পূর্ববর্তীকালের পুণ্ড্র তথা বরেন্দ্র অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর বসতি ছিল। বরেন্দ্রভূমির মাটিতে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের কিছু স্মৃতিচিহ্ন যার প্রাচীনত্ব বুদ্ধের সমকালীনত্বের সঙ্গে তুলনীয়। ভগবান তথাগত বরেন্দ্রীর যে স্থানের উপর উপবেশন করে অহিংসবাণী প্রচার করেন, পরবর্তীকালে সম্রাট অশোক ওই স্থানের উপর একটি স্মারক-স্তম্ভ নির্মাণ করিয়ে বরেন্দ্রীতে বুদ্ধের আগমন স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রেখেছিলেন বলে কথিত। এই লুপ্তস্মৃতির অনতিদূরে একটি বোধিসত্ত্ব মন্দিরের নাম 'কুয়ান-জু-সাই'। আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম জায়গাটি পরিদর্শনকালে বোধিসত্ত্ব ওই মন্দিরের উচ্চতা ৩০ ফুট ছিল বলে উল্লেখ করেন। বরেন্দ্রভূমিতে এই রকম অনেক লুপ্ত ও বিস্মৃত বৌদ্ধকীর্তি ছিল, যা এই অঞ্চলে সম্রাট অশোকের দ্বারা যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল তা প্রমাণ করে। হিউয়েন সাং যখন বরেন্দ্রীতে আসেন তখন এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ও প্রচারের কথা এবং বরেন্দ্রীতে যে বহু বৌদ্ধ মন্দির ছিল তার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী সময়ের উল্লেখিত মন্দির বা স্তূপ কোনটিরই কথা তাঁর বিবরণে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত নেই। হয়ত এদেশে হিউয়েন সাং-এর আগমনের আগেই ওই সব বৌদ্ধ চিহ্নের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বলেই সমকালীন চৈনিক বিবরণে তার উল্লেখ বাদ পড়ে গেছে।

পুণ্ড্রবর্ধনে যে নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের প্রভাব ও আধিক্য একদা বেড়ে গিয়েছিল তার হদিশ পাওয়া যায় বৌদ্ধগ্রন্থ *দিব্যাবদান*-এ। ওই গ্রন্থে উল্লেখিত একটি কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, সম্রাট অশোক চণ্ডাশোক থাকাকালে পুণ্ড্রনগরে নির্গ্রন্থ উপাসকরা বুদ্ধদেবের একটি চিত্র অঙ্কিত করে তাঁকে নির্গ্রন্থের চরণে পতিত অবস্থায় দেখিয়েছিলেন। এই সংবাদ অশোকের কাছে পৌঁছানোর পর ক্রোধে তিনি নির্গ্রন্থদের হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। এর ফলে, একদিনে ১ হাজার ৮ শত নির্গ্রন্থকে হত্যা করা হয়েছিল। এই তথ্যের সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রাচীনযুগ) গ্রন্থে। সেখানে তিনি লিখেছেন, একদিনে পুণ্ড্রবর্ধনের ১৮,০০০ আজীবিকদের সম্রাট অশোক নিধন করেন। বৌদ্ধগ্রন্থ *অবদান কল্পলতা* পুস্তকে জানা যায় যে, শ্রাবস্তি নগরীর অনাথপিন্ডদের কন্যা সুমাগধা ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁর বিয়ে হয়েছিল পুণ্ড্রবর্ধনের বৃষভদত্তের সঙ্গে। তখন পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম ছিল না। সুমাগধার আহ্বানে বুদ্ধদেব স্বয়ং পৌণ্ড্রবর্ধনে এসে ছয়মাস ধরে তার ধর্মপ্রচার করেছিলেন। হিউয়েন সাং-এর বিবরণ থেকেও জানা যায় যে, বুদ্ধদেব পুণ্ড্রবর্ধনে ধর্মপ্রচারে এসেছিলেন। অশোকের পূর্বে উত্তরবঙ্গে যে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় *সংস্কৃত বিনয়* গ্রন্থে। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে আর্যাবর্তের পূর্বসীমা পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এইসব তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে অশোকের আগেই পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছে।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে পুণ্ড্রবর্ধনে কিভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হয়েছিল তার বড় প্রমাণ চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং। তিনি পুণ্ডবর্ধনে অশোক স্তূপ দেখেছিলেন, যার কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে যে, গৌতম বুদ্ধের শেষ চারজন অবতার পুণ্ড্রনগরে দেহরক্ষা করেছিলেন। লামা তারানাথের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, গৌড়দেশে চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের জন্ম হয়। এই গৌড়দেশ সংকীর্ণ অর্থে যদি বর্তমান মালদহ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ জেলা সংলগ্ন বীরভূম, বর্ধমান ও নদীয়া জেলা তিনটির কথা বোঝায়, তাহলে গৌড়দেশে বিন্দুসারের জন্ম হলে তা চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল যা উত্তরাধিকার সূত্রে বিন্দুসার ও অশোক পেয়েছিলেন।[৯] আরও একটি বিষয়, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বিখ্যাত বৌদ্ধ সাঁচী স্তূপ তৈরির সময় পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসী ধর্মদত্তা নামে একজন নারী এবং ঋষি নন্দন নামে জনৈক পুরুষ ওই স্তূপ নির্মাণে কিছু দান করেছিলেন। বৌদ্ধ সাঁচী স্তূপের দুটি দানলিপি থেকে এই তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক ঐতিহাসিক এই ঘটনাকে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধ প্রচারের প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ওই দুই দাতা যে বৌদ্ধ ছিলেন একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

গুপ্ত শাসনের পতনের পর উত্তরবঙ্গ বিদেশী আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এই সময় পরবর্তী গুপ্তবংশ নামে পরিচিত এক বংশের গুপ্ত উপাধিধারী রাজারা এই সাম্রাজ্যের এক অংশ অধিকার করেন। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে বঙ্গদেশের এই অঞ্চল গৌড় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। গুপ্তরাজাদের অধীনে গৌড় একটি বিশিষ্ট জনপদ রূপে পরিচিতি লাভ করে। এই সময় যুক্ত প্রদেশের পরাক্রান্ত রাজা ঈশান বর্মা গৌড়রাজ্য দখল করে উত্তরবঙ্গে মৌখরি বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। অল্পদিন মৌখরি রাজবংশের

আধিপত্য বজায় রাখার পর গুপ্তরাজ কুমারগুপ্ত ঈশান বর্মাকে পরাজিত করেন এবং কুমারগুপ্তের পুত্র দামোদরগুপ্ত মৌখরিদের পরাজিত করে যুদ্ধে জয়লাভ করেন।[১০] পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিতে মৌখরি আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারও কারও মতে, দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মণের (৫৬৭-৫৯৮ খ্রিঃ) আক্রমণের ফলে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিতে মৌখরি আধিপত্যের অবসান ঘটেছিল বলে জানা যায়। ষষ্ঠ শতকের শেষদিকে মালবরাজ মহাসেনগুপ্ত কামরূপ অভিযান চালিয়ে কামরূপের রাজা সুস্থিতবর্মণকে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে পরাজিত করেন। অনেকে মনে করেন, এই যুদ্ধের পূর্বে মহাসেন-গুপ্ত পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি অধিকার করে নিয়েছিলেন। গৌড় ও মগধ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে জানা যায়। পুণ্ড্রবর্ধনে মালবরাজের আধিপত্যও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পঞ্চদশ বছর সংঘর্ষের ফলে উত্তর দিক থেকে তিব্বতিদের আক্রমণ এবং দক্ষিণ দিক হতে চালুক্যরাজের আক্রমণে পরবর্তী গুপ্তরাজাদের শাসন ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগ নিয়ে গৌড় দেশে শশাঙ্ক নামে এক পরাক্রমশালী রাজা এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

৬০৬ অব্দের পূর্বেই শশাঙ্ক একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে[১১] তাঁর রাজধানী ছিল। আবার কারও মতে, শশাঙ্কের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধন। দক্ষিণে মেদিনীপুর (দণ্ডভুক্তি), উৎকল ও গঞ্জাম জেলার অধীনে কোঙ্গোদ রাজ্য তিনি জয় করেছিলেন। শশাঙ্কই ছিলেন প্রথম বাঙালি যিনি বঙ্গ দেশের বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। এর পূর্বে বাঙালির এত বড় রাজ্য ছিল না। সেই সময় বঙ্গদেশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি ও সমতট। একমাত্র সমতট ছাড়া সবই শশাঙ্কের রাজ্যের অধীনভুক্ত হয়। এর থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দিনাজপুর জেলাও তাঁর শাসনাধীনে ছিল। তিনি গৌড়ের চিরশত্রু মৌখরিদের দমন করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে মৌখরিরাজ গ্রহবর্মাকে পরাজিত করেন। এই সময় কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মাও তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। মৌখরিরাজ গ্রহবর্মা পরাক্রান্ত থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিয়ে করেন। গ্রহবর্মার হত্যার প্রতিশোধ নিতে থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন এবং রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর ছোটভাই হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধের ফলাফল বিষয়ে ইতিহাস তার সঠিক হদিশ দিতে পারেনি। বাণভট্টের *হর্ষচরিত* গ্রন্থে উৎসাহী পাঠকেরা এ বিষয়ে বিস্তৃত ইতিহাস জেনে নিতে পারেন।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর স্বাধীনরাজ্য কিছুদিন শাসন করেছিলেন তাঁরই পুত্র রাজপুত্র মানব। রাজা শশাঙ্কই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টি বাঙলায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন শিবভক্ত। তাঁর সময়ে দেশে ধর্ম ও সংস্কৃতির উন্নতি ও প্রসার ঘটেছিল। রাজা শশাঙ্ক সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে কোনও কিছু বলা সম্ভব নয়। কারণ, ইতিহাস তাঁর বিস্তৃত পরিচয় আমাদের জন্য রেখে যায়নি। আমাদের পরিতাপের বিষয় এই যে, মহাপরাক্রান্ত এই রাজা শশাঙ্কের সম্বন্ধে এবং তাঁর সাম্রাজ্যের বিষয়ে কোনও বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণও পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার

তাঁর *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রাচীনযুগ) গ্রন্থে লিখেছেন, বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ও লেখক বাণভট্ট এবং চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং উভয়েই শশাঙ্কের পরম বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁদের বিবরণের নানা স্থানে শশাঙ্ক সম্বন্ধে তাঁরা উভয়েই নানা কুরুচিপূর্ণ উক্তি ও কল্পকাহিনীর মাধ্যমে রাজা শশাঙ্কের উপর বিদ্বেষ ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন।[১২] শশাঙ্কের পুত্রের রাজত্বকালেই শশাঙ্কের বৃহৎ রাজ্য ভেঙে পড়ে। শশাঙ্কের পুত্র মানবের পর গৌড় বা বঙ্গদেশে কারা রাজত্ব করেছিলেন ইতিহাস তার কোন সন্ধান দিতে পারেনি। তার ইতিহাস আমাদের কাছে অজ্ঞাত। গৌড়ে পালবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব অবধি প্রায় একশো বছর কাল এক অন্ধকারময় যুগ।

এই অন্ধকারময় যুগে বঙ্গদেশ একাধিক বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। রঘোলি তাম্রশাসনের বিবরণ অনুসারে হিমালয়ের উপত্যকাবাসী শৈলবংশীয় জনৈক রাজা এই অন্ধকারময় যুগে পৌণ্ড্রাধিপতিকে পরাজিত করে পৌণ্ড্রদেশ অধিকার করে নেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর কনৌজরাজ যশোবর্মণ আবার গৌড়রাজকে পরাজিত করে মেরে ফেলেন। এই ঘটনার তথ্য কনৌজরাজের সভাকবি বাক্‌পতির রচিত *গৌড়বহো* নামক ঐতিহাসিক কাব্য থেকে জানা যায়। আবার, কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য (৭২৪-৭৬০ খ্রিঃ) যশোবর্মণকে পরাজিত করেন। এই অবস্থায় যশোবর্মণের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়লে গৌড়রাজ্য ললিতাদিত্যের অধীনে চলে যায়। রাজা ললিতাদিত্য গৌড়রাজকে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে হত্যা করেন। এই হত্যার প্রতিবাদে গৌড়রাজের কিছু অনুচর কাশ্মীরে গিয়ে কাশ্মীর রাজের দেববিগ্রহ ধ্বংস করার চেষ্টা করলে ধরা পড়েন এবং নিহত হন।

কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কহ্লন্ তার *রাজতরঙ্গিনী* কাব্যে লেখেন, রাজা ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় বিনয়াদিত্য গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন। উত্তরবঙ্গ তখন জয়ন্ত নামক এক রাজার অধীনে ছিল। জয়াপীড় রাজা জয়ন্তর কন্যা কল্যাণ দেবীকে বিয়ে করেন এবং পঞ্চগৌড়ের পঞ্চরাজকে পরাজিত করে শশুর জয়ন্তকে গৌড়েশ্বর পদে অধিষ্ঠিত করেন। দিনাজপুর তখন রাজা জয়ন্তর শাসনাধীন হয়েছিল। এরপর কামরূপ রাজ্যের ভগদত্ত বংশীয় রাজা শ্রীহর্ষ গৌড় রাজ্যে অভিযান করেছিলেন। ক্রমাগত এই সমস্ত আক্রমণের ফলে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। দেশে অরাজকতা দেখা দেয়; আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। উত্তরবঙ্গে 'মাৎস্যন্যায়' নামক এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

২. পাল-সেন যুগে দিনাজপুর

পালযুগ

মঞ্জুশ্রী মূল কল্পগ্রন্থ এবং ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত খালিমপুর[১৩] তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ লিপি থেকে গৌড়ে পালবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় একশো বছর যে অন্ধকারময় যুগ বাসা বেঁধেছিল তার সন্ধান পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকরা এই অবস্থাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলেছেন। বঙ্গদেশে যে সেই সময় বহু অঞ্চলেই অরাজকতা ছিল সে

খবর তিব্বতীয় লেখক লামা তারানাথ জানিয়েছেন। এই রকম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে মাৎস্যন্যায় অর্থাৎ সেই অন্ধকারময় পরিবেশকে বিদূরিত করে গোপাল কর্তৃক শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায়। পালরাজা ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রলিপি অন্তত সেই হদিশ দেয়।

মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ
করং গ্রাহিতঃ
শ্রী গোপাল ইতি ক্ষিতীশ শিরসাং চূড়ামণিস্ত্য সুত।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতন যশোরাশি দির্শামাশয়ে ’
শ্বেতিষা যদি পৌর্ণমাস রজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া।।

উত্তরবঙ্গের কোন্ স্থানে গোপাল তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। গোপালের উত্তর পুরুষদের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, তাঁর রাজ্য দক্ষিণে সমুদ্রতীর অর্থাৎ পদ্মাতীর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। উত্তর দিকে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা সঠিক বলা যায় না। তবে একথা বলা যায় যে, সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* কাব্যে বরেন্দ্রভূমিকে ‘পালজনকভূঃ’ অর্থাৎ পাল রাজাদের আদিপুরুষদের ভূখণ্ড বলা হয়েছে। সে কারণে দিনাজপুর জেলার একাংশ রাজা গোপালের অধীনস্থ ছিল। আমাদের বিশ্বাস, তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেবকোটে, বর্তমান বাণগড়। পরবর্তীকালে পালরাজাদের একাধিক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় পুণ্ড্রবর্ধন ও গৌড়ে। পাল শাসনকালে দিনাজপুর জেলা সামগ্রিক ভাবেই হোক আর আংশিক ভাবেই হোক পালরাজাদের রাজ্যাধীন ছিল এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই।

গোপাল রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রথমেই দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর পাঁচ বছরের শাসনকাল গুপ্তযুগের শাসন প্রণালীতেই চলেছিল। রাজ্য ছিল ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল ও বীথিতে বিভক্ত। তিনি ছিলেন ধর্মে বৌদ্ধ। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সতেরো জন বংশধর বাঙলাদেশে পর পর চারশত বছর রাজত্ব করেন। এই সুদীর্ঘ পালশাসন আমাদের দেশের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ। গোপালের পুত্র মহারাজাধিরাজ ধর্মপাল একজন দিগ্বিজয়ী নৃপতি ছিলেন। উত্তর ভারতের এক বিস্তৃত ভূখণ্ডে তিনি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গৌড় অধিপতি হিসাবে তিনি পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি অর্থাৎ দিনাজপুর সমেত সমগ্র উত্তরবঙ্গ আপন রাজ্যাধীন করেছিলেন। পাল নরপতি ধর্মপাল প্রায় চল্লিশবছর রাজত্ব করেন। প্রজাকুল তাঁকে ‘পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ’ উপাধি দিয়েছিলেন। সোমপুরী মহাবিহার[১৪] ও বিক্রমশীল মহাবিহার[১৫] তাঁরই সুকীর্তি।

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল ইতিহাস প্রসিদ্ধ নাম। তিনি কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করেছিলেন। দেবপালের নামেই তাঁর রাজধানীর নাম হয় দেবকোট। দেবপাল তাঁর পিতা ধর্মপালের আদর্শ ও নীতি বজায় রেখে রাজ্য পরিচালনা অটুট রেখেছিলেন। তাঁর সময়ে সুমাত্রার শৈলেন্দ্র বংশীয় এক বৌদ্ধরাজা নালন্দায় একটি বৌদ্ধ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচখানি গ্রাম চেয়ে দেবপালের কাছে একজন দূত প্রেরণ করেন। রাজা দেবপাল সুমাত্রা রাজের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। দেবপাল চল্লিশ বছর

রাজত্ব করেছিলেন। দেবপালের সময় করতোয়া নদী কামরূপ ও পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির সীমারেখা ছিল। কামরূপের রাজাকে পরাজিত করে দেবপাল দিনাজপুর ও তার সন্নিহিত অঞ্চল কামরূপ রাজ্যের আক্রমণ থেকে মুক্ত করেছিলেন বলে মনে হয়। দেবপাল যে কামরূপ রাজকে পরাজিত করেছিলেন সেই পরাজয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় পাল নৃপতি নারায়ণপালের তাম্রশাসনে। দেবপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহেন্দ্রপাল রাজধানী স্থানান্তর করেন টঙ্গিল নদীর তীরে অর্থাৎ বর্তমান টাঙ্গন নদীর তীরে কুর্দ্দালখাতক নামক স্থানে। কুর্দ্দালখাতক দিনাজপুরের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একই নামের একটি জেলার (বিষয়) প্রধান শাসন কেন্দ্র ছিল।

শ্রীপুণ্ড্রবর্ধনভুক্তৌ কুর্দ্দালখাতক বিষয়ে
নন্দাদীর্ঘিকো দ্রঙ্গে সীমা।

অর্থাৎ নন্দদীর্ঘিকা নামে উদ্রঙ্গ, অর্থাৎ কল্পিত পুরটি দান করার সময় মহেন্দ্রপাল যে জয়স্কন্ধাবারে ছিলেন তার নাম 'কুর্দ্দলিখাতক'। আমাদের বিশ্বাস যে, দেবপালের পুত্র মহেন্দ্রপালদেবের রাজধানী কুর্দ্দালখাতক কুশমণ্ডী থানার অধীনে বিস্তীর্ণ মহীপাল অঞ্চল, দক্ষিণে বংশীহারী থানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১৬] ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ, মালদহ জেলার হাবিবপুর থানার অন্তর্গত জগজ্জীবনপুর নামে একটি মৌজার তুলাভিটা নামে একটি উঁচু স্তূপ থেকে মহেন্দ্রপালদেবের একটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাম্রলিপিটি আবিষ্কৃত ও পাঠোদ্ধারের ফলে এই প্রথম জানা গেল যে, দেবপালের পর শূরপাল পালবংশীয় রাজা হয়েছিলেন, এই তথ্য সঠিক নয়। দেবপালের পর তাঁর পুত্র মহেন্দ্রপাল পালবংশীয় নরপতি ছিলেন। শূরপাল ছিলেন মহেন্দ্রপালের সহোদর ভাই। পরে শূরপাল রাজা হন। তাম্রশাসন থেকে আরও জানা যায় যে মহেন্দ্রপাল প্রায় সাত বছর রাজত্ব করেছিলেন।[১৭] মহেন্দ্রপালদেবের তাম্রলিপির কিছু অংশঃ

.....নন্দদীর্ঘিকোদ্রঙ্গে, মহাবিহারঃ কারিতঃ তত্র যথোপরি
লিখিত নন্দদীর্ঘিকো দ্রঙ্গং ভগবতো বুদ্ধ ভট্টারকস্য
প্রজ্ঞাপারমিতাদি সকল ধর্মনেত্রী স্থানস্য আর্যা বৈবর্ত্তিক
বোধিসত্ত্ব গণস্যাষ্ট মহাপুরুষ পুঙ্গলার্য ভিক্ষু সংখস্য
যথার্হং পূজানলখাদ্যান্নাদ্যর্থং...... ।।[১৮]

মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর পর তাঁর সহোদর ভাই বিগ্রহপাল যিনি শূরপাল নামেও পরিচিত ছিলেন, তিনিই গৌড়ের শাসন ক্ষমতা পরিচালনার অধিকারী হন। শূরপাল ছিলেন শান্তিপ্রিয় ও সংসার বিরাগী। অল্পকাল রাজত্ব করার পর তিনি তাঁর পুত্র নারায়ণপালের (৮৫০-৮৫৪) হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। নারায়ণপাল ৫৪ বছর রাজত্ব করেন। ধর্মপাল ও দেবপাল বাহুবলে যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বিগ্রহপাল ও নারায়ণপাল পঞ্চাশ বছরের কিছু অধিককাল পর্যন্ত রাজত্ব করেও সেই বিশাল পাল সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারলেন না। পাল সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল। এমনকি বিহার ও বাংলাদেশের কোনও কোনও অংশ যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে বাহির শত্রুরা দখল করে নিলেন। নারায়ণপালের রাজত্বকালে তাঁর মন্ত্রী গুরব

মিশ্র দিনাজপুরের অধীনে বাদাল নামক স্থানে একটি স্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ করান। এই স্তম্ভলিপিতে নারায়ণপাল পর্যন্ত পালবংশের এবং নারায়ণপালের মন্ত্রী গুরব মিশ্র পর্যন্ত ব্রাহ্মণমন্ত্রীদের বংশানুক্রমিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়।

নারায়ণপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজ্যপাল (৯০৮-৯৪০) ও তাঁর পুত্র দ্বিতীয় গোপাল (৯৪০-৯৬০) রাজত্ব করেন। রাষ্ট্রকূট রাজ অমোঘবর্ষ, রাষ্ট্রকূট রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ, প্রতীহার রাজ ইন্দ্র, এই সব বাহির শত্রুর আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য নিদারুণ বিপর্যয়ের ফলে ধ্বংসের মুখে পড়েছিল। রাজ্যপালের রাজত্বকালে তাঁর সঙ্গে কামরূপ রাজের সংঘর্ষ হয়। ভাতুরিয়া তাম্রশাসন অনুযায়ী রাজ্যপাল কামরূপ রাজকে পরাজিত করেছিলেন। রাজ্যপালের পুত্র দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালে বটপর্বতিকায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইতিহাসবিদ্‌দের কেউ কেউ অনুমান করেন যে, বটপর্বতিকা দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থেকে ইটাহার থানার মালদহ সীমান্তের উচ্চভূমিতে অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয় গোপালের জাজিলপাড়া তাম্রশাসনটি মালদহ সীমান্তে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় গোপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (৯৬০-৯৮৮) রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চল আক্রমণকারী কম্বোজদের দ্বারা অধিকৃত হয়। বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত গৌড়পতি কম্বোজান্বয়ের একটি প্রস্তরস্তম্ভ পাওয়া যায়। ওই স্তম্ভের পাদলিপিতে কম্বোজ রাজার কীর্তির কথা লেখা আছে। ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রমাপ্রসাদ চন্দের মতে, স্তম্ভলিপির বিবরণে ৮৮৮ শকাব্দ (৯৬৫-৬৬ খ্রিঃ) পাওয়া যায়। আক্রমণকারী কম্বোজরাজ কোটিবর্ষ নগরীতে রাজধানী স্থাপন করে নিজেকে গৌড়ের রাজারূপে ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য এই যে, বহু প্রাচীন কাল থেকে কোচ, মেচ, পলিয়া, রাজবংশী ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর মানুষেরা এই বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। এঁদের সঙ্গে ভোট চৈনিক, তিব্বতীয়, মোঙ্গোলীয় বা কম্বোজীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এথনিক (Ethnic) মিল ও সাদৃশ্য রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করেন যে, নবম শতকে বরেন্দ্রীর বুকে কম্বোজ অভিযানের সময় অনুগামী হয়ে ওই গোষ্ঠীর বহু লোক সমতলের দিকে নেমে আসে এবং তারা পুনরায় পাহাড় ও বনভূমির দিকে ফিরে না গিয়ে তিস্তা-করতোয়া-পুনর্ভবা-আত্রাই-মহানন্দা প্রভৃতি নদীর তীরে বসতি স্থাপন করে। পঞ্চদশ শতকে উত্তবঙ্গে যাদের দ্বারা শক্তিশালী কামতা-কামরূপ বা কোচ-হাজো রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দের মতে, নৃতত্ত্বের দিক থেকে রাজবংশী গোষ্ঠীর মানুষেরা কম্বোজ বংশীয় কোচ রাজবংশীদেরই উত্তরপুরুষ ছিলেন।[১৯] ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রাচীনযুগ) গ্রন্থে লিখেছেন "পালসম্রাট রাজ্যপালের মাতা সম্ভবতঃ কাম্বোজবংশীয়া রাজকন্যা ছিলেন ....।"[২০] বাংলার এই কম্বোজবংশের রাজা মনে হয় ওই জনগোষ্ঠীরই প্রতিনিধি রাজানয়পাল। কারও কারও ধারণা, কম্বোজ রাজের আক্রমণে রাজা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের অধিকার থেকে দিনাজপুরের অধিকাংশ অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কম্বোজ রাজের আক্রমণে যে পালরাজ্যের ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে পড়েছিল ইতিহাসেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য পুনরায় উদ্ধার করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন ৯৮৮ শকাব্দে। তাঁর অর্ধ শতাব্দীব্যাপী রাজত্বকাল পালরাজবংশের সৌভাগ্যরবিকে আবার আলোক উজ্জ্বল করে তুলেছিল। রাজা মহীপালের বিয়ালা তাম্রশাসন (রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে উৎকীর্ণ), পঞ্চম বর্ষে উৎকীর্ণ বেলওয়া তাম্রশাসন[২১] এবং বাণগড় তাম্রলিপির (রাজত্বের নবমবর্ষে উৎকীর্ণ) বর্ণনা থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে প্রমাণিত হয় যে, রাজা মহীপাল কম্বোজ শক্রদের বিতাড়িত করে কোটিবর্ষ থেকে মহাস্থানগড় পর্যন্ত সমগ্র দিনাজপুরে আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহীপালের বাণগড় লিপিতে কোটিবর্ষ বিষয়ে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। লামা তারানাথ লিখেছেন, মহীপাল বাহান্ন বছর রাজত্ব করেছিলেন, এই দীর্ঘ রাজত্বকালে বিদেশীয় আক্রমণকারীর হাত থেকে রাজ্যরক্ষার জন্য পুনরায় তাঁকে অস্ত্র ধরতে হয়েছিল।

মহীপালের সুকীর্তি রূপে বর্তমানে কুশমণ্ডী থানার অন্তর্গত মহীপালদিঘি তাঁরই স্মৃতি বহন করে চলেছে। দিঘিটি দৈর্ঘে ১৩৪০ গজ, প্রস্থে ৩৭০ গজ। দিঘিটির খননকাজ হয়েছিল ৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে। দিনাজপুর জেলায় মহীপাল, মহীপুর, মহীনগর, মহীসন্তোষ প্রভৃতি এখনও মহীপালের কীর্তিকে স্মরণীয় করে রেখেছে। রাজা মহীপাল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের রাজা রাজেন্দ্র চোল বঙ্গদেশ আক্রমণ করলে মহীপাল সেই আক্রমণ প্রতিহত করেন। আমাদের এই দিনাজপুর জেলার মাটি থেকেই রাজা মহীপাল তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সব রকম ব্যবস্থা করেছিলেন। দিনাজপুর জেলার মানুষের কাছে এটা কম গৌরবের বিষয় নয়। প্রথম মহীপালের পুত্র ছিলেন রাজা নয়পাল। নয়পালের একটি তাম্রশাসন বাণগড় থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। নয়পাল ষোল বছর রাজত্ব করেছিলেন (১০৩৮ - ১০৫৪ খ্রিঃ)। কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র লক্ষ্মীকর্ণের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ হয়েছিল। পরে উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়। কিন্তু এই সন্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। নয়পালের সময় বাঙালি বৌদ্ধপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে ধর্মপ্রচারের জন্য গিয়েছিলেন।

নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল পরবর্তীতে শাসনক্ষমতার অধিকারী হন। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (১০৫৪-১০৭২) রাজা কর্ণ পুনরায় বঙ্গদেশে যুদ্ধাভিযান করেন। এই যুদ্ধে কর্ণ জয়লাভ করলেও পরবর্তীতে বৈবাহিক সূত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সুদীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে পাল রাজশক্তি ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ে। তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুকালে পালরাজ্য বৈদেশিক শক্রর আক্রমণে ও অন্তর্বিপ্লবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র ছিল, দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপাল। দ্বিতীয় মহীপাল পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের বেলওয়া তাম্রশাসন এবং আমগাছি তাম্রশাসন দিনাজপুর জেলায় পাওয়া গেছে। দিনাজপুর জেলায় পালশাসন যে অব্যাহত ছিল এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোনও সন্দেহ বা দ্বিমত থাকে না। কোটিবর্ষ বিষয়ে আমগাছি তাম্রশাসনে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। বেলওয়া তাম্রশাসনটি বিলাসপুর নামক শাসনকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়।[২২]

পাল বংশের তৃতীয় বা শেষ আঘাত আসে দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে দিব্বোক কর্তৃক। সন্ধ্যাকর নন্দী-রচিত *রামচরিত*-এর বর্ণনা অনুসারে তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল একজন অত্যাচারী-শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে বরেন্দ্রে প্রজাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। বরেন্দ্রে প্রজাবিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কৈবর্তরাজ দিব্বোক। দিব্বোকের বাসস্থান ছিল ধামর থানার[২৩] মঙ্গলবাটীতে। রাজা দ্বিতীয় মহীপাল তাঁর রূপসী বোন চন্দ্রমতিকে হরণ করে নীতপুরের প্রমোদভবনে নিয়ে গিয়েছিলেন। দিব্বোকের রাজদ্রোহী হওয়ার এটাই অন্যতম কারণ। দিব্বোক জাতিতে ছিলেন কৈবর্ত। তাই তাঁর নেতৃত্বে প্রজাপুঞ্জের বিদ্রোহ ইতিহাসে 'কৈবর্ত, বিদ্রোহ' নামে প্রসিদ্ধ। বরেন্দ্রভূমির এই প্রজাবিদ্রোহ সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম প্রজা বিদ্রোহ। দিব্বোক ছিলেন নৌ-সেনাপতি এবং দ্বিতীয় মহীপালের অধীনে উচ্চ রাজকাজের একজন সুপরামর্শদাতা। দ্বিতীয় মহীপাল যখন পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসলেন, সেইসময় তাঁর সাম্রাজ্যের চারদিকেই বিশৃঙ্খলা ও ষড়যন্ত্র চলছিল। দুষ্টু লোকের কুমন্ত্রণায় রাজার বিশ্বাস হল যে, তাঁর দুই ভাই শূরপাল ও রামপাল তাঁরই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। তাই তিনি তাঁদের কারারুদ্ধ করে রাখলেন। কিন্তু শীঘ্রই বরেন্দ্রের সামন্তবর্গ দিব্বোকের নেতৃত্বে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হয়ে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হন। প্রধানত দিনাজপুর জেলায় এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। বিদ্রোহীরা পাল শাসনের অবসান ঘটিয়ে সমগ্র উত্তরবঙ্গে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। প্রজাদের সম্মতিক্রমে দিব্বোক বরেন্দ্রভূমির অধীশ্বর হন। *রামচরিত* কাব্যগ্রন্থের কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা প্রজাবিদ্রোহের সময় দ্বিতীয় মহীপালের শাসন বিভাগের একজন উচ্চরাজকর্মচারী ছিলেন এবং তিনি নিজেও এই বিদ্রোহ প্রত্যক্ষভাবে দেখেছিলেন।[২৮]

দিব্বোক যে স্থানে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন সে স্থানের বর্তমান নাম সোনাডাঙার মাঠ। গ্রামের নাম দিবর। দিব্বোকের বিজয় চক্ররূপে এখানে একটি দিঘির মাঝখানে অষ্টকোণী প্রায় ৩৪ ফুট উঁচু ও ১০ ফুট বেড়ের একটি প্রস্তর স্তম্ভ আজও রয়েছে। এই স্তম্ভের মাথায় লোহার আভরণ রয়েছে কিন্তু কোনো লিপি উৎকীর্ণ নেই।[২৭] দিবর গ্রাম ও দিবর দিঘির নাম অনুসারে 'দিবরস্তম্ভ' বা 'দিব্বোক স্তম্ভ'। দিব্বোকের নেতৃত্বে যে প্রজাবিদ্রোহ হয় তা হয়েছিল মূলত আর্থিক কারণে এবং তাঁর নেতৃত্বের অন্তরালে ছিল মানুষের প্রতি ভালোবাসা। অত্যাচারী রাজা মহীপালকে পরাজিত করে দেশকে তিনি রক্ষা করেছিলেন। তাঁর এই মহৎ কাজের জন্য প্রজাসাধারণ দিব্বোককে রাজা নির্বাচন করেছিলেন। এমন কি দিব্বোককে তাঁরা মহাপুরুষপদে উন্নীত করে প্রতিবছর দিব্বোকস্মৃতি উৎসব পালন করতে থাকেন। ইতিহাসের ট্রাজেডি এই যে, পাল শাসনের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গের এই প্রজা বিদ্রোহ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। দিব্বোক যখন উত্তরবঙ্গের অধীশ্বর সে সময় পূর্ববঙ্গের বর্মবংশীয় রাজা জাতবর্মণ দিনাজপুর আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ দিব্বোক অনায়াসেই প্রতিহত করতে পেরেছিলেন কিন্তু তিনি বেশিদিন রাজভোগ করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর ভাই রুদ্রোক বরেন্দ্রের রাজা হন।

রুদ্রোকের পর তাঁর পুত্র ভীম সিংহাসনে বসেন। দিনাজপুর ও পার্শ্ববর্তী একাধিক জেলায় তাঁর কীর্তি বর্তমান। জনশ্রুতি আছে যে, বিদ্রোহী নেতা ভীম তাঁর জয়ের স্মারক হিসাবে 'ভীমের পণ্ডী' নামে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন। ভীম বিজয়স্তম্ভ তৈরি করেছিলেন এই ধারণা সঠিক নয় বলে অনেকে মনে করেন। এর কারণ, বিদ্রোহের স্বল্পকালীন সময়ে এই রকম শিল্পকর্মমণ্ডিত স্তম্ভ নির্মাণ করা সম্ভব নয়। ভীম যদি বিজয়স্তম্ভ তৈরি করেও থাকেন, তবে পাল শাসনের পুনরুদ্ধারকারী রাজা সেটি যে ভেঙে ফেলতেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। স্তম্ভটির গায়ে কোনও লিপি উৎকীর্ণ না থাকার কারণে স্তম্ভ নির্মাণকারীর সঠিক পরিচয়ও জানা যায় না। দিনাজপুর ও তার আশপাশ অঞ্চলে 'ভীমের জাঙ্গাল', 'ভীম সাগর', 'ভীমের পান্‌ঠি' ইত্যাদি ভীমের স্মৃতি বলে অনেকে মনে করেন।

দ্বিতীয় মহীপালের পুত্র রামপাল পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সাহায্যে দিব্বোকের বরেন্দ্র জয়কে প্রতিহত করেছিলেন। তাঁর পিতা দ্বিতীয় মহীপালের হাতছাড়া রাজ্যকে তিনি পুনরুদ্ধার করেন। *রামচরিত* কাব্যের বর্ণনা অনুযায়ী রামপাল কামরূপ অধিপতিকে পরাজিত করেছিলেন। এর থেকে মনে হয়, কামরূপের সঙ্গে পালরাজের সংঘর্ষ হয়েছিল। এই সংঘর্ষের সঠিক কারণ কি, তা জানা যায় নি। রামপাল বহু সামন্ত ও তাঁর মাতুলের সাহায্যে ভীমকে পরাস্ত ও নিহত করে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তারপক্ষে কামরূপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কামরূপ রাজের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নয় বলে অনেকে মনে করেন। অনেকের ধারণা, প্রজা বিদ্রোহজনিত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগে কামরূপ অধিপতি করতোয়া নদী অতিক্রম করে রংপুর ও দিনাজপুরের উত্তরাঞ্চল অধিকার করেছিলেন। প্রজা বিদ্রোহ দমনের পর রামপাল কামরূপের সেনাবাহিনীকে উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চল থেকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন। এই তথ্যের পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনে (বারাণসী)। এই তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, রামপাল তাঁর রাজ্যের পূর্ব অঞ্চলের মন্ত্রী ও সেনাপতি বৈদ্যদেবের সাহায্যে 'তিমখ্যাদেব' নামে একজন সামন্তের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।[২৬] ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত বৈদ্যদেবের কমৌলী তাম্রশাসনের কিছু অংশঃ

তস্যোর্জ্জ্বল পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোহ ভবৎ পুত্রঃ
পালকুলাব্ধি শীতকিরণঃ সাম্রাজ্য বিখ্যাতিভাক্।
ত নে যেন জগত্রয়ে জনকভু লাভ্যদৃ যথাবদ্যশঃ
ক্ষৌণী নায়ক ভীম-রাবণ-বধাদুদ্ধর্মবেলিখনাৎ।।

পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের পর রামপাল নিজনামে রামাবতীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামপালের মন্ত্রী ও সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী *রামচরিত* নামক ঐতিহাসিক কাব্যে ভীমের সঙ্গে রামপালের যুদ্ধ এবং রামপালের পিতৃভূমি উদ্ধারের উল্লেখ করেছেন। তাছাড়াও এই কাব্যে রামপালের চরিত্র বর্ণনা, রামাবতী নগরের বর্ণনা, জগদ্দল মহাবিহার প্রতিষ্ঠার বর্ণনা এবং কিছু কিছু পালরাজার কথাও আছে। *রামচরিত* কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি শ্লোক ঃ

অথভীমানীকং তেন মহাভরসা. শনৈরমেয় বল্‌ম।
সমচীয় ত হবিসুহৃদা সুবিহিত. পর মণ্ডলাবরোধেন।।
বদ্ধরুধির স্রোতবহমবধূত কবন্ধ মূর্ধ্বচয়চিতম্।
কাসর বাহন কবলক্ষিপ্ত মহাশর কলাপমিতি।।

রামপালের রামাবতী নগরী কোথায়? সাবেক সময়ে রচিত ইতিহাস তার সঠিক সন্ধান দিতে পারেনি। এ বিষয়ে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার পূর্ণদাস লেনে (ত্রিকোণপার্ক) আমার শিক্ষক পূজ্যপাদ আচার্য নীহাররঞ্জন রায়ের বাড়িতে বিশেষ কাজে গিয়েছিলাম। আলোচনার সময় রামাবতী নগরীর অবস্থিতি কোথায় তাঁকে বলেছিলাম। তিনি বাড়ির পরিচারককে চা দেবার নির্দেশ দিয়ে আসছি বলে উঠে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে হাতে করে তাঁরই লেখা *বাঙালীর ইতিহাস* (আদিখণ্ড, সাবেক সংস্করণ) গ্রন্থখানি আমার সামনে এনে কয়েকটি পৃষ্ঠা দেখে নিয়ে বললেন, "রামাবতী নগরের অবস্থিতি কোথায় সঠিক করে বলা সম্ভব নয়?" পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের পর রামপাল নিজ নামে রামাবতীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মদনপালের মনহলি লিপিতেও এই নগরের উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ও লিখেছেন, "রামাবতী এবং *আইন-ই আক্‌বরী* কথিত রামাউতি যে এক এবং অভিন্ন নগর, এ সম্বন্ধে সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নাই। পরবর্তী সেন আমলের গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী নগরের অদূরে গঙ্গা-মহানন্দার সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে ছিল রামাবতীর অবস্থিতি।"[২১] রামাবতীর অবস্থিতি *আইন-ই-আকবরী*-র যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। *আইন-ই আকবরী*-তে রামাবতীকে সরকার লখনৌতির অন্তর্ভুক্ত মহল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে দিনাজপুর জেলার ইতিহাসের বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ মনে করেন যে, রামপাল প্রতিষ্ঠিত রামাবতী নগরটি ছিল বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার অধীনে ইটাহার থানার অন্তর্গত 'আমাতি' গ্রামে। এখানে প্রাপ্ত ভগ্নমূর্তি, প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবালয়, সাবেক ইট, স্তূপ এবং স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান, স্থান নাম ইত্যাদি ক্ষেত্রসমীক্ষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণা করে তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। রামপালই সম্ভবত বরেন্দ্রের জগদ্দল বিহারের প্রতিষ্ঠাতা। এই বিহারের চার মাইল দূরে রামপাল রামাবতী নগরী স্থাপন করে এখান হতে রাজকাজ পরিচালনা করতেন। বর্তমান ইটাহার থানার অধীনে আমাতি গ্রামের চারমাইল দূরে জগদ্দল নামে একটি প্রত্নস্মৃতিময় জায়গা দেখা যায়। আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিক কাব্যকার সন্ধ্যাকর নন্দীর বাসস্থান ছিল বহদ্বটু নামক গ্রামে। অনেকের ধারণা, এই গ্রামটি হল বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধীনে বটুন গ্রাম। রামপালের মৃত্যুর পর আবার পালশক্তির পতন শুরু হয়। রামপাল এবং তাঁর পুত্র কুমারপালের রাজত্বকালে দিনাজপুর জেলায় পালশাসন অব্যাহত ছিল। কুমারপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তৃতীয় গোপাল স্বল্পকাল রাজত্ব করেন। তৃতীয় গোপালের পর তাঁর পিতৃব্য মদনপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধীনে তপন থানার অন্তর্গত মনহলি গ্রামে মদনপালের তাম্রপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বাণগড়ের ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত মনহলি

গ্রাম থেকে পাওয়া তাম্রলিপিতে কোটিবর্ষ বিষয়ের উল্লেখ থাকায় অনেকে ধারণা করেন যে, দিনাজপুরে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি তাঁর নাম অনুসারে মদনাবতীতে[২৮] রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। *আইন-ই আকবরী*-তে যে মদনাবতীর উল্লেখ পাই সেখানে মদনাবতীকে সরকার লখনৌতির অন্তর্গত একটি পরগণা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মদনপালই ছিলেন পালবংশের সর্বশেষ নরপতি।

বঙ্গদেশের ইতিহাসে পালরাজাদের আধিপত্যের চারশো বছর নানা দিক থেকে গভীর ও ব্যাপক অর্থ বহন করে। বাংলায় পালশাসন নিরুপদ্রব ছিল না একথা সত্য, কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বর্তমান বাংলা ও বাঙালিজাতির গোড়াপত্তন সূচিত হয় পালযুগ থেকেই। এই যুগই ছিল প্রথম বৃহত্তর সামাজিক সমীকরণ ও সমন্বয়ের যুগ। উত্তরভারতের উচ্চাভিলাষী রাজন্যবর্গের আক্রমণ ও প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের সামরিক অভিযানের দরুন যদিও পালরাজ্য বহুবার বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, ইতিহাসের পাতাতেই এর প্রমাণ রয়েগেছে, বহুবার রাজধানী পরিবর্তনই এর একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। খুব স্বাভাবিক যে রাজনৈতিক এই অস্থিতিশীলতার প্রভাব দিনাজপুর জেলার উপরেও পড়েছিল। দিনাজপুর জেলার উত্তর প্রান্ত বহুবার কামরূপ রাজের আক্রমণ স্থলে পরিণত হয়েছিল। পালরাজ্যের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ ছিল দিনাজপুর জেলা। প্রকৃতপক্ষে এই জেলা ছিল পালরাজ্যের ভিত্তিভূমি। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ সংঘ ও বিহারগুলির বেশির ভাগই এখানে পালশাসনামলে নির্মিত হয়েছিল। পালযুগেই দিনাজপুর জেলা একটি গৌরবময় স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি পালশাসনামলেই এখানে অধিক পরিমাণে বিকাশ লাভ করেছিল। বাঙালির স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধের মূল যে সামগ্রিক ঐক্যবোধ তা এই সময়েই গড়ে ওঠে এবং এটাই বাঙালির এক জাতীয়ত্বের ভিত্তি। পালযুগের এটিই হল সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

একথা সত্য যে, পালরাজবংশের দীর্ঘ শাসনকালে দিনাজপুর জেলা নগর, বর্ধিষ্ণু গ্রাম, বিহার ও মন্দিরে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এ জেলায় এমন গ্রাম কমই আছে যেখানে প্রত্নকীর্তির কিছু না কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় না। বাণগড়ই তার বড় প্রমাণ। পাল আমলের সবচেয়ে বেশি প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে এখান থেকে। গুপ্তযুগ থেকে পালযুগ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বেশ কয়েকটি রাজধানী ও শাসনকেন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায় ইতিহাসে, কিন্তু বাণগড় ও মহাস্থানগড় ছাড়া অন্য কোনও স্থানে নগর নির্মাণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ওই সময়ের নির্মিত দালানকোঠাগুলির মধ্যে বিশেষ করে গুপ্ত যুগে একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সাধারণতঃ সরু দেয়ালের উপর টালির ছাদ দিয়ে গৃহ নির্মাণ পদ্ধতি। আবার, বৃহদাকারের অট্টালিকা নির্মাণেরও প্রচলন ছিল নিবাসিক ব্যবহারের পরিবর্তে। সেই সব বড় বড় দালান নির্মাণের অন্তরালে থাকত বৃহত্তর প্রয়োজন। বাংলায় মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে যে টেরাকোটা শিল্পের সূত্রপাত হয় তা দিনাজপুর জেলার বাণগড় থেকে পাওয়া গিয়েছিল। বাণগড় সভ্যতার সময় সেই শিল্প কি পরিমাণ উন্নত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল তা এই উপমহাদেশের টেরাকোটা শিল্পের আলোচনা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়।

গুপ্ত থেকে পালযুগ পর্যন্ত এখানকার সামাজিক কাঠামোয় জনজীবনের চিত্র ছিল খুবই উন্নত। বাণগড়বাসীদের জন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল গড়ের পাশ দিয়ে প্রান্তবাহী পুনর্ভবা নদী থেকে। তাছাড়া ছিল পাতকুয়োর প্রচলন। সাধারণভাবে ভাতই ছিল জনগণের প্রধান খাদ্য। মাছ খাওয়ার প্রচলন ছিল না। পুরুষেরা ধুতি, চাদর, জামা ও পাগড়ী পরিধান করত। নারীদের পরিধেয় বস্ত্র ছিল শাড়ি, ফোতা, ওড়না, সায়া (ঘাঘরা) ইত্যাদি। মূল্যবান প্রস্তর নির্মিত অলংকার ব্যবহারের প্রচলন ছিল মেয়েদের মধ্যে। দুধের মত রঙের স্ফটিক পাথর, পদ্মরাগমণি, নীলচে সাদাপাথর, দামি কঠিন পাথর, রক্তবর্ণপাথর প্রভৃতি মূল্যবান পাথর দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পুঁতির মালা নির্মিত হতো। স্বর্ণালংকারের ব্যবহার সেইসময় বিশেষ ছিল না বলেই মনে হয়। কারণ, এই বিষয়ে ইতিহাস সঠিক কোনও সন্ধান দিতে পারে নি। নিম্নবর্গের মহিলারা সাধারণত শঙ্খচুড়ি, কাঁচের গহনা, মল, কোমরে বিভিন্ন অলংকার গ্রথিত কটিবন্ধ বা মেখলা ব্যবহার করত। বস্ত্র বয়ন শিল্প ছিল ব্যাপকভাবে প্রচলিত। টাকুর সাহায্যে বয়ন চলত। সূক্ষ্ম শৌখিন বস্ত্র উৎপাদন হতো বিপুল পরিমাণে। পরিবহন হিসাবে সেইসময় গরুর গাড়ি ও ঘোড়ার প্রচলন ছিল বেশি। পালকি, ডুলি ইত্যাদি বাহন ছিল কিনা তার হদিশ ইতিহাসে পাওয়া যায়নি। তবে পালকি, ডুলি ইত্যাদির বাহন তো এদেশে প্রচলিত প্রাচীন যানবাহনগুলির অন্যতম। তাই এই সব যানবাহন প্রচলন না থাকার কারণ নেই। আরও একটি বিষয়, এই অঞ্চলের লেখ্য অক্ষর ছিল সেই সময় ব্রাহ্মীলিপি এবং জনসাধারণের কথ্য ভাষা ছিল প্রাকৃত। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ ফলকটির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

সেনযুগ

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মদনপালের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১১৩০-১১৫০ খ্রিঃ) সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন উত্তরবঙ্গ জয় করলে দিনাজপুর জেলা সেন শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, ১১৬২ খ্রিস্টাব্দে পাল রাজ্য বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল ও রামপালের স্মৃতি বিজড়িত পালরাজ্যের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেউ কেউ আবার, পলপাল, ইন্দ্রদ্যুম্নপাল প্রভৃতি দুই একজন পরবর্তী পাল উপাধিধারী রাজার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এঁদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইতিহাসে সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় নি। পালরাজাদের দুর্বলতার সুযোগে বিজয় সেন বঙ্গদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিজয় সেন ছিলেন কর্ণাট দেশীয় নান্যদেব। তিনি মিথিলায় রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। বিজয় সেনের দেওপাড়া শিলালিপি থেকে জানা যায়, বঙ্গদেশ অধিকার করার আগে তিনি কামরূপরাজকে দূরীভূত, কলিঙ্গরাজকে পরাজিত এবং গৌড়রাজকে দ্রুত পলায়ন করতে বাধ্য করেছিলেন। বিজয় সেনের দ্বারা পরাজিত এই গৌড়রাজ যে মদনপাল, ইতিহাসেই তার হদিশ পাওয়া যায়। রাজশাহী জেলার অধীনে দেওপাড়া শিলালিপি থেকে জানা যায় প্রদ্যুম্নেশ্বরের এক প্রকাণ্ড মন্দির তিনি করেছিলেন। এর থেকেই প্রমাণিত

হয় যে বরেন্দ্রের অন্তত এক অংশ যে বিজয় সেনের রাজ্যভুক্ত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিজয় সেনের মৃত্যুর পর (১১৫৮ খ্রিঃ) তাঁর পুত্র বল্লাল সেন তাঁর রাজ্যকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছিলেন —রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা। বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন ১১৭৯ খ্রিঃ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালের আটখানি তাম্রশাসনের মধ্যে একখানি পাওয়া যায় আদি দিনাজপুর জেলায়। লক্ষ্মণ সেনই সম্ভবত সম্পূর্ণরূপে গৌড়দেশ জয় করেছিলেন। গৌড়ের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী সম্ভবত লক্ষ্মণ সেনের নাম অনুসারেই হয়েছিল। তাঁর তাম্রশাসনে সেনরাজাদের নামের আগে গৌড়েশ্বর এই উপাধি ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষ্মণ সেনের তর্পণদিঘি তাম্রশাসনে কোটিবর্ষের পরিবর্তে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তপাতি বরেন্দ্রীর উল্লেখ করা হয়েছে। এই সঙ্গে এই প্রথম সরকারিভাবে কোটিবর্ষ নামের অবসান ঘটে। এই তাম্রশাসন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের দ্বিতীয়বর্ষ আরম্ভ হওয়ার আগেই দিনাজপুর সমেত বরেন্দ্র তাঁর অধীনস্থ হয়েছিল। পাবনা জেলার অন্তর্গত মাধাইনগর তাম্রশাসনে বরেন্দ্রের অধীনে কান্তাপুরে রাজা লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক ভূমিদানের উল্লেখ আছে। পণ্ডিতদের কেউ কেউ কান্তাপুর বর্তমান দিনাজপুর জেলার অধীনে কাঁটাদুয়ারের প্রাচীন নাম বলেছেন। লক্ষ্মণ সেন যে দিনাজপুরে অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল, এর ফলে আর সন্দেহ থাকে না। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে (সম্ভবত) তুর্কি সেনাপতি অতর্কিতে নদীয়া আক্রমণ করে রাজা লক্ষ্মণ সেনকে নুদীয়া (নদীয়া) থেকে পলায়ন করতে বাধ্য করেন। বখ্তিয়ার খিলজি রাজধানী গৌড় জয় করে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রা জারি করেন। আরও উত্তরদিকে অভিযান চালিয়ে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ[২৯] বখ্তিয়ার দেবকোট দখল করে নিয়ে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। আর এরই সঙ্গে সঙ্গে দিনাজপুরেও সেন শাসনের অবসান ঘটে এবং সেখানে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. পাল-সেন যুগের প্রশাসনিক বিভাগ ও তাম্রলিপি-স্তম্ভলিপি

গুপ্তযুগে উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি ছিল সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। মৌর্যযুগে পুণ্ড্রবর্ধনের যে প্রাধান্য ছিল, গুপ্তযুগে তা ভালভাবেই পরিচালিত ও রক্ষিত হয়েছিল বলে জানা যায়। আবার, পাল-সেন যুগে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি আকারে ও আয়তনে অনেক বড় ছিল। প্রতিটি প্রদেশ (ভুক্তি) ছিল কয়েকটি বিষয়ে বা জেলায় বিভক্ত। এদের মধ্যে যে সব জেলার নাম পাওয়া যায় সেগুলিঃ

এক. কোটিবর্ষ, দুই. পঞ্চনগরী, তিন. ফণিত বীথি, চার. শিলবর্ষ,
পাঁচ. মহন্তা প্রকাশ, ছয়. স্থালীকট, সাত. খাড়ী, আট. কুর্দ্দালখাতক।

এদের মধ্যে কোটিবর্ষ, পঞ্চনগরী, ফণিত বীথি ও কুর্দ্দালখাতক, এই চারটি বিষয় আদি দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রতিটি জেলার অধীনে (বিষয়) থাকত কয়েকটি মণ্ডল। মণ্ডলগুলি ছিল আয়তনে

ব্রিটিশ আমলে মহকুমা শহরের চেয়ে কিছু ছোট এবং থানা থেকে কিছু বড়। আদি দিনাজপুর জেলায় কোটিবর্ষ ছিল একটি বড় জেলা। কোটিবর্ষ জেলার (বিষয়) অধীনে যে সব মণ্ডল ছিল সেগুলি হল, গোকলিকা মণ্ডল ও হলাবর্ত মণ্ডল। সম্প্রতি গবেষণায় কোটিবর্ষ জেলার অধীনে উড্রগ্রাম মণ্ডল আবিষ্কৃত হয়েছে। এই উড্রগ্রাম মণ্ডলের সীমানা বাণগড়ের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরে টাঙ্গন নদীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। বর্তমানে যা কালিয়াগঞ্জ থানার অধীনে রাধিকাপুর ৩নং অঞ্চলের অন্তর্গত উদ্‌গ্রাম। ইতিহাসের উড্রগ্রাম মণ্ডল যে উদ্‌গ্রাম এ বিষয়ে বিস্তৃত জানার জন্য উৎসাহী পাঠকেরা *লোক পত্রিকা*-র জনপদ সংখ্যাটি দেখে নিতে পারেন।[৩০] খালিমপুব তাম্রলিপির তাম্রষণ্ডিকা মণ্ডল যা উড্রগ্রাম মণ্ডলের সীমাবর্তী পালীক্কট' জেলার অন্তর্গত ছিল বলে নীহাররঞ্জন রায় *বাঙালীর ইতিহাস*-এ লিখেছেন। এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। প্রত্যেকটি মণ্ডলে থাকত কয়েকটি বীথি (গ্রামের সমষ্টি)। ভুক্তি (প্রদেশ), বিষয় (জেলা), মণ্ডল, বীথি, প্রতিটি বিভাগেরই একটি কেন্দ্র থাকত। সেই কেন্দ্রকে অধিকরণ বলা হত। মুসলিম শাসন আমলে যা দপ্তর এবং ব্রিটিশ শাসন আমলে যা আফিস নামে পরিচিত।

ভুক্তির শাসনকর্তার উপাধি ছিল উপরিক বা উপরি মহারাজ। স্বয়ং সম্রাট ভুক্তিপতিকে নিযুক্ত করতেন। কখনও কখনও কোন রাজপুত্রকেও ভুক্তির শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ করা হত। তবে এই রকম নিয়োগের ঘটনা ছিল খুব কম। জেলার শাসনকর্তাকে বলা হত বিষয়পতি। ভুক্তিপতি তাঁকে নিয়োগ করতেন। আবার এমনও হত যে রাজা নিজে ভুক্তিপতিকে নিযুক্ত করতেন। এ ঘটনাও খুব কম দেখা গেছে। মণ্ডলপতিকে কে নিয়োগ করতেন ইতিহাস তার হদিশ দেয়নি। তবে, বিষয়পতিই তাঁকে নিয়োগ করতেন বলে মনে হয়। বীথিপতির নিয়োগের ক্ষেত্রেও তাই, সে সম্বন্ধে কোনও তথ্যই পাওয়া যায় না। সেই সময় 'দশগ্রামিক' নামে একজন কর্মকর্তার কথা জানা যায় কোনও কোনও পাট্টালিতে। উল্লেখ্য যে, ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বীথি এই চারটি ভাগে গুপ্ত যুগের প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলি বিভাজিত থাকলেও, পালযুগে কিন্তু ভুক্তির প্রাধান্য বজায় থাকলেও বিষয় ও মণ্ডলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে মাঝে মাঝে হেরফের দেখা যায়। এর থেকে মনে হয় গুপ্তযুগের মত তা সুশৃঙ্খল ছিল না। পালযুগের কোনও কোনও তাম্রশাসনে মণ্ডলের অধীনে বিষয়কে আবার কোনও কোনও তাম্রলিপিতে বিষয়ের অধীনে মণ্ডলকে দেখানো হয়েছে গুপ্তযুগের মত। গুপ্ত আমলে রাজকর্মচারীদের সংখ্যা ছিল সীমিত। ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল ও বীথির শাসনকর্তা ছাড়াও ছিলেন নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ, পুস্তপাল, মহপ্রতীহার, মহাপিলুপতি, পঞ্চাধিকরণোপারিক, পাট্যুপরিক, পুরোপালোপরিক, কুমারামাত্য প্রভৃতি।[৩১] গুপ্তযুগের তুলনায় পালযুগে রাজকর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী পালরাজাদের বিভিন্ন তাম্রশাসনে রাজকর্মচারীদের যে তালিকা পাওয়া যায় তার সংখ্যা আরও ব্যাপক। সেনযুগে এই তালিকা আরও বিস্তারিত ও স্ফীত হয়।

রাজ্যকর্মচারীরা রাষ্ট্রযন্ত্রে বিভিন্ন বিভাগে কাজ করতেন। প্রতিটি বিভাগে যোগ্যতা

সম্পন্ন রাজকর্মচারীদের নিয়োগ করে রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থাকে পরিচালনা করা হত। সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলির মধ্যে ছিল সাধারণ প্রশাসন ও শান্তিরক্ষা বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, ভূমি প্রশাসন ও কৃষি বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, পররাষ্ট্র, সমর বিভাগ, হিসাব রক্ষণ বিভাগ এবং রাজার ব্যক্তিগত বিভাগ। জেলা শাসনের ব্যাপারে জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ, মহা-মহত্তর, মহত্তর এবং দশগ্রামিক প্রভৃতি বিষয় ব্যবহারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠকায়স্থ ও দশগ্রামিক উভয়েই ছিলেন রাজপুরুষ। পালযুগের স্থানীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে স্থানীয় জন-প্রতিনিধিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে, কিন্তু গুপ্তযুগে স্থানীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে জন-প্রতিনিধিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়।

সেনযুগের রাষ্ট্রযন্ত্র সাধারণত পালযুগের রাষ্ট্রযন্ত্রের আদর্শই স্বীকৃতি লাভ করেছিল। রাষ্ট্র-বিন্যাসের আকৃতি - প্রকৃতিও মোটামুটি ছিল একই রকম। তবে রাজকর্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধি ও স্ফীত হয়েছিল ব্যাপকভাবে। রাজা ও রাজপরিবারের মর্যাদা, মহিমা ও আড়ম্বর আরও বেড়েছিল। প্রশাসনের একাংশে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিততন্ত্র জাঁকিয়ে বসেছিল। এই যুগে রাষ্ট্রযন্ত্র বিভাগ বৃহত্তম গ্রামগুলিকে বিভক্ত করে একেবারে পাঠক বা পাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল। ছোটবড় রাজপদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল এবং নতুন নতুন পদের সৃষ্টি হয়েছিল। সেনরাজারা যেমন পালরাজাদের রাজা উপাধিগুলি ব্যবহার করতেন, তেমনি উপরন্তু নামের সঙ্গে তাঁরা নিজ নিজ বিরুদগু ব্যবহার করতেন। যেমন, অরিবৃষভ শঙ্কর, অরিরাজ নিঃশঙ্ক-শঙ্কর, অরিরাজ মদন-শঙ্কর, অরিরাজ বৃষভাস্ক-শঙ্কর, অরিরাজ অসহ্য-শঙ্কর ইত্যাদি। সেনযুগের শেষপর্যায়ের রাজারা আবার এই সব বিরুদের সঙ্গে সঙ্গে অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজএয়াধিপতি প্রভৃতি উপাধিও ব্যবহার করতেন। আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, পালযুগে যেমন ভুক্তিপতির শাসনাধীনে ভুক্তি, মণ্ডলপতির শাসনাধীনে মণ্ডল, বিষয়পতির শাসনাধীনে বিষয় ছিল। সেনযুগে কিন্তু বিষয় বা মণ্ডলের নীচের গ্রাম সংক্রান্ত স্থানীয় বিভাগ ও উপবিভাগের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল এবং ছোট ছোট একাধিক নতুন বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল। মোটামুটি পাল-সেন পর্বের রাষ্ট্রবিন্যাসের পরিচয় ছিল এই রকমই। এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে সেই পরিচয় দেওয়া হল।

তাম্রশাসন ও স্তম্ভলেখ

পালরাজাদের রাজত্বকালে আদি দিনাজপুর জেলা থেকে অনেক তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত এই সব তাম্রশাসন থেকেই জানা যায় যে, সাবেককাল থেকেই বাংলার মানুষ সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করত, তাদের সমাজ ছিল, রাজা ছিল, রাষ্ট্রও ছিল। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসনিক রীতিনীতি, রাজকর্মচারী নিয়োগ, তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রদান ইত্যাদি প্রায় সব বিষয়ে তাম্রলিপিগুলিতে পাওয়া যায়। গুপ্তদের সময়কাল থেকে শুরু করে তের শতকের সূচনায় মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত প্রশাসনিক ইতিহাসের সবকিছুই প্রায় পাওয়া যায় তাম্রলেখগুলিতে। আদি দিনাজপুর জেলায় পালদের প্রথম

তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয় প্রাচীন গৌড় নগরীর নিকটে বর্তমান মালদহ জেলার অধীনে খালিমপুর নামক স্থানে। এই স্থানটি আদি দিনাজপুর জেলার মধ্যেই ছিল বলে অনেকে মনে করেন। নারায়ণ পালদেবের গড়ুর স্তম্ভলিপি পাওয়া যায় বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার ধামুইর হাট থানার অন্তর্গত মঙ্গলবাড়ি গ্রামের নিকটে। বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নওঁগা জেলার অধীনে। স্তম্ভটি মসৃণ কালো পাথরের প্রায় আট হাত উঁচু এবং গোড়ায় বেড় চার হাত। স্তম্ভশীর্ষের একাংশ বজ্রপাতে ভেঙে যায়। স্তম্ভগাত্রে ১৭ ইঞ্চি দৈর্ঘের সাড়ে ২৮টি লাইন বিশিষ্ট লিপি খোদিত আছে। লিপি হতে দেবপাল, শূরপাল ও নারায়ণ-পালের বংশ তালিকা ও পালদের সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। বিষ্ণুভদ্র নামে একজন শিল্পী স্তম্ভলিপিটি উৎকীর্ণ করেন। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে স্তম্ভটি আবিষ্কার করেন ঐতিহাসিক কিলহর্ণ সাহেব। তিনি লিপিটির পাঠোদ্ধারও করেছিলেন।

কম্বোজদের কোটিবর্ষ স্তম্ভলিপি

দিনাজপুর জেলার বাণগড় বা বাণনগর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে এই স্তম্ভলিপিটি। অতিমূল্যবান গ্রেনাইট পাথর নির্মিত ৬ ফুট উচ্চ গোলাকার এবং ৪ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট স্তম্ভটি অতি মসৃণ ও কারুকাজ মণ্ডিত সুচারুভাবে নির্মিত। স্তম্ভটি হালকা সবুজ রঙের মত দেখতে। দিনাজপুরের রাজা রামনাথ রায় বাণগড় স্তূপের কোনও অংশ থেকে এটি উদ্ধার করে অতি যত্নে তাঁর রাজপ্রাসাদে আয়নামহলের সম্মুখে বাগানের মধ্যে একটি উঁচু বেদি নির্মাণ করে স্তম্ভটিকে রেখেছিলেন। এই স্তম্ভলিপি থেকে কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির আবির্ভাব কাল জানা যায়।

প্রথম মহীপালদেবের বিয়ালা তাম্রশাসন

আদি দিনাজপুর জেলার ক্ষেতলাল (বর্তমানে কালাই) থানার অধীনে নাথরাই বলিগ্রাম থেকে চার কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত বিয়ালা গ্রাম থেকে তাম্রশাসনটি পাওয়া যায়। বিয়ালা গ্রাম বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধীনে। এই তাম্রশাসন থেকে মহীপাল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত অতিপ্রাচীন অমলকী মণ্ডলের কোটিবর্ষ বিষয়ে মাতাপিতা ও নিজের পুণ্য অর্জনের জন্য ভগবান বুদ্ধদেবের দেবগৃহ নির্মাণের জন্য গ্রাম দান করেন। এই তাম্রলিপিতে মহীপালের রাজত্বকালের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। তাম্রলিপিটি অতি সম্প্রতি পাওয়া গেছে বলে জানা যায়।

প্রথম মহীপালদেবের বাণগড় তাম্রশাসন

এই তাম্রলিপিটি পাওয়া যায় দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাণগড় থেকে। এই লিপি থেকে জানা যায় কোটিবর্ষ বিষয় পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত। কোটিবর্ষ বিষয়ের অধীনে ছিল গোকলিকা মণ্ডল।

প্রথম মহীপালদেবের বেলওয়া তাম্রশাসন

আদি দিনাজপুর জেলার বেলওয়া নামক গ্রাম থেকে মাটি খুঁড়তে গিয়ে এই তাম্রশাসনটি

আবিষ্কৃত হয়েছে। তাম্রলিপিটি থেকে জানা যায় যে, পঞ্চনগরী বিষয়ের অধীনে 'পুণ্ডরিকা মণ্ডল' এবং 'ফানিত' বীথি বিষয় দুটি অবস্থিত। পঞ্চনগরী ছিল প্রাচীন যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। গুপ্তযুগের শুরু থেকে পালযুগের প্রথম মহীপালের সময় পর্যন্ত বিষয় হিসাবে এর অস্তিত্ব ছিল । অথচ মহীপালদেবের রাজত্বের বিশ বছর পরেও বিষয় হিসাবে পঞ্চনগরীর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। বিশ বছর আগেও যা ছিল সামান্য একটি বীথিমাত্র ফানিত বীথি, তা তৃতীয় বিগ্রহ পালদেবের শাসনামলে 'ফানিত বীথি' বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের বেলওয়া তাম্রশাসন

আদি দিনাজপুর জেলার বেলওয়া গ্রাম থেকে তাম্রশাসনটি পাওয়া যায়। এই তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে ফাণিত বীথি বিষয়ের অধীনে ছিল পুণ্ডরিকা নামে একটি মণ্ডল।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের আমগাছি তাম্রশাসন

আদি দিনাজপুর জেলার আমগাছি নামক স্থানে মাটির নীচ থেকে তৃতীয় বিগ্রহপাল-দেবের দানপত্র তাম্রশাসন পাওয়া যায়। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে এটি আবিষ্কৃত হয়। এই তাম্রলিপিতে রয়েছে কোটিবর্ষ বিষয়ের নাম এবং পিপ্পলাদি শাখ্যাধ্যায়ী জয়ানন্দ শর্মাকে রাজা এই দানপত্র প্রদান করেন। তাম্রলিপিটি উৎকীর্ণ করেন শিল্পী মহীধরের পুত্র শশিদেব। তাম্রলিপিটি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে।

মদনপালদেবের মনহলি তাম্রশাসন

বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধীনে তপন থানার অন্তর্গত মনহলিগ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে মদনপালদেবের তাম্রশাসন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে এই তাম্রলিপিটি পাওয়া যায়। এই তাম্রলিপি থেকে জানা যায় কোটিবর্ষ বিষয়ের অধীনে হলাবর্ত মণ্ডলের কথা। আমাদের মনে হয় গুপ্তযুগের বিষয় ও মণ্ডলের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি পালযুগে পুরোপুরি বজায় থাকেনি, এই তাম্রলিপি থেকে সেই চিত্র পরিষ্কার বোঝা যায়। অনেক ক্ষেত্রে বিষয়ের অধীনে মণ্ডলকে রাখা হলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে মণ্ডলের অধীনে বিষয়কে রাখা হয়েছিল। এইসব পরিবর্তনের অন্তরালে কোন কারণ ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু কি কারণ ছিল ইতিহাসে তার সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় নি। বহু শতাব্দী ধরে কোটিবর্ষ বিষয় ছিল রাজ্যের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং জেলা হিসাবে এর অস্তিত্ব ছিল সম্ভবত গুপ্তযুগের প্রারম্ভ থেকেই। অথচ, এই কোটিবর্ষকেই প্রথম মহীপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে বহুপুরাণ প্রসিদ্ধ অমলকী মণ্ডলের অধীনে রাখা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, মালদহ জেলার খালিমপুর থেকে আবিষ্কৃত ও ধর্মপালদেবের তাম্রশাসন (১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে), গাজোল থানার অধীনে জাজিলপাড়া থেকে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় গোপালদেবের তাম্রশাসন (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে) এবং ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে হবিবপুর থানার জগজ্জীবনপুর থেকে আবিষ্কৃত মহেন্দ্রপালদেবের তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। তাম্রলিপি তিনটি পালরাজাদের আমলের।

সেন আমলের তাম্রশাসন

লক্ষ্মণ সেনের তর্পণদিঘি তাম্রশাসন

আদি দিনাজপুর জেলার বৃহত্তম দিঘি তর্পণদিঘি। বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধীনে তপন থানার অন্তর্গত। এই তাম্রলিপিতে কোটিবর্ষের পরিবর্তে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তপাতি বরেন্দ্রীর উল্লেখ করা হয়েছে। এই সঙ্গে সরকারি ভাবে কোটিবর্ষ নামের অবসান ঘটে। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় দিনাজপুর সমেত বরেন্দ্র তার করতলগত হয়েছিল। এই তাম্রশাসনে আছে হুতাশনদেবের প্রপৌত্র, মার্কণ্ডেয় দেবশর্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেবশর্মার পুত্র, ভরদ্বাজগোত্রীয় ভরদ্বাজ অঙ্গিরা, বার্হস্পত্য-প্রবর সামবেদ কৌথুম শাখা চরণানুষ্ঠায়ী হেমাশ্বরথ মহাদানাচার্য্য ঈশ্বর দেবশর্মাকে এই শাসন প্রদত্ত হয়েছিল। পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অধীনে বিল্বহিষ্টি নামক গ্রামখানি হেমাশ্বরথ মহাদানের দক্ষিণা স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের আরও দুইখানি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি হল পাবনা জেলার অধীনে মাধাই নগর তাম্রশাসন এবং নদীয়া জেলার রাণাঘাটের নিকটে আনুলিয়া গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত আনুলিয়া তাম্রশাসন। এই দুই লিপিতে একদিকে যেমন ভূমিদানের কথা উল্লেখিত হয়েছে, অপরদিকে লক্ষ্মণ সেনের বরেন্দ্র বিজয়ের কথা ঘোষিত হয়েছে। সেন রাজাদের তাম্রলিপি দিনাজপুর জেলায় তর্পণদিঘি তাম্রলিপি ছাড়া অন্য কোনও তাম্রশাসন পাওয়া যায় নি। তবে সেন নৃপতিদের বিভিন্ন তাম্রলিপি ও অন্যান্য সূত্র থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অধীনে যে সব শাসনকেন্দ্র ছিল সেগুলি বেশিরভাগই হয় বিষয় না হয় মণ্ডল। বিষয় ও মণ্ডলের অস্তিত্ব একসঙ্গে প্রায় দেখাই যায় না। যেমন, পুণ্ড্রবর্ধনের অধীনে খাড়ি বিষয়, কোনও মণ্ডলের অস্তিত্ব সেখানে নেই। লক্ষ্মণ সেনের আনুলিয়া তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অধীনে ব্যাঘ্রতটীর অধীনে মাথবস্ত্য গ্রাম। অথচ, ধর্মপালের খালিমপুর লিপিমতে ব্যাঘ্রতটী ছিল একটি মণ্ডল। আবার, মাধাই নগর তাম্রশাসনে আছে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অধীনে বরেন্দ্রীর অন্তর্গত কাঁটাপুর ও নিকটবর্তী দাপুনিয়া পাটক গ্রাম। বিষয় বা মণ্ডলের কোনও উল্লেখ নেই।

৪. গৌড়াধিপ মহীপালদেবের তাম্রশাসন

এই তাম্রশাসনটি দিনাজপুরের বাণগড় ধ্বংসাবশেষ হতে আবিষ্কৃত হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য এক ফুট আদ ইঞ্চি, প্রস্থ এক ফুট। এর শিরোভাগে একটি ধর্মচক্র আছে। ধর্মচক্রখানি ছয় পংক্তি লিপির ঠিক মাঝখানে বদ্ধ করা আছে। তাম্রলিপিতে গ, জ, ন, ম, ক্ষ প্রভৃতি অক্ষরগুলি দেখলেই আধুনিক বঙ্গাক্ষর বলে মনে হয়।

তাম্রলিপির সামনের ভাগ

শ্রীমহীপাল দেবস্য

১ম ওঁ স্বস্তি। মৈত্রীং কারুণ্যরত্ন প্রমুদি

২য় তহৃদয় প্রেয়সীং সন্দ ধানঃসম্যক্সম্বোধিবি

৩য় দ্যাশ রিদমলজলক্ষা লিতাজ্ঞান পঙ্কঃ।

৪র্থ জিত্বা যঃ কামকারি প্রভবমভিভবং শাশ্বতী

৫ম স্প্রাপ শাস্তিং সশ্রীমা লোকনাথো জয়তি।।

৬ষ্ঠ শবলোহন্যশ্চ গোপালদেবঃ ।। ১ ।।

৭ম কেতনং সমকরো বোঢুং ক্ষম ক্ষ্মাভরং পক্ষচ্ছেদ
ভয়া দুপস্থিতর্য্যাবতামে কাশ্রয়ো ভূভৃতাম্। মর্য্যাদাপরিপা

৮ম লনৈকনিরতঃ শৌর্য্যালয়োহস্মাদ ভূদ্দুগ্ধাম্বোধি বিলাস হাসিমহিমা

৯ম শ্রী ধর্ম্মপালো নৃপঃ ।। ২ ।। রামস্যেব গৃহীত সত্য তপসস্তস্যানুরূপো
গুণৈঃ সৌমিত্রেরু দপাদি তুল্যমহিমা বাক্‌পালনামানুজঃ । যঃ

১০ম শ্রীমান্নয়বিক্রমৈক বসতির্ভ্রাতুঃস্থিত শাসনে শূন্যা শত্রুপতাকিণী-

১১শ ভিরকরোদেকাত পত্রা দিশঃ ।।৩।। তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জ্জগতীং পুনানঃ
পুত্রো বভুব বিজয়ী জয়পালনামা। ধর্ম্মদ্বিষাং সময়িতা যুধি দেবপাল যঃ।

১২শ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈষীৎ ।। ৪ ।। শ্রীম্মাবিগ্রহপালস্তৎ সূনুরজাত
শত্রুরিব জাতঃ।। শত্রুবণিতা প্রসাধ

১৩শ নবিলোপিবিমলাসি জলধারঃ ।। ৫ ।। দিক্‌পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং
দেহে বিভক্তান্ গুণান্ শ্রীমন্তঞ্জন

১৪শ য়াম্বভুব তনয়ং নারায়ণং সপ্রভম্।যঃ ক্ষৌণাপতিভিঃ শিরোমণি রুচা শ্লিষ্টা
ঙ্ঘ্রি পীঠো পলং ন্যায়ো।

১৫শ পাওমলঞ্চকার চরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাসনম্ ।।৬।। তোয়াশয়ৈর্জ্জ লধিমূল
গভীর গর্ভৈদ্দে বালয়ৈশ্চ।

১৬শ কুলভূধর তুল্য কক্ষৈঃ। বিখ্যাত কীর্ত্তির ভবত্তনয়শ্চ তস্য শ্রীরাজ্যপাল ইতি
মধ্যমলোকপালঃ ।। ৭ ।। তস্মা

১৭শ ৎ পূর্ব্বক্ষিতি ঘ্রান্নিধিরিব মহসাং রাষ্ট্র কূটান্বয়েন্দোস্তু ঙ্গস্যৌত্তুঙ্গ
মৌলেদ্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্য দেব্যাং

১৮শ প্রসুতঃ। শ্রীমান্ গোপাল দেবশ্চিতর তরমবনেরেক পত্না ইবৈকো
ভর্ত্তাভুন্নৈকরত্ন দ্যুতি খচিত চতুঃসিন্ধু

১৯শ চিত্রাংশুকায়া ।।৮।।যঃ স্বামিনং রাজগুণৈর নূন মাসেবতে চারুতরানুরক্তা।
উৎসাহ মন্ত্র

২০শ প্রভুশক্তিলক্ষ্মীঃ পৃথ্বীসপত্নীমিব শীলয়ন্তী ।। ৯।। তস্মাদ্বভূব সবিতুর্ব্ব
সুকোটিবর্ষীকালেন চন্দ্রইব বিগ্রহপালদেবঃ। নেত্রপ্রিয়েন।

২১শ বিমলেন কলাময়েণ যেনোদিতেন দলিতো ভুবনস্যতাপঃ ।। ১০।।

২২শ দেশে প্রাচি প্রচুর পয়সি স্বচ্ছমাপীয়তোয়া স্বৈরং ভ্রান্ত্বা তদনুমলয়ো পত্যকা

চন্দনেষু কৃত্বা সাদ্রৈস্তরুষু জড়তাং শীকরৈরভ্রতুল্যাঃ

২৩শ প্রালেয়াদ্রেঃ কটকমৃভজন্ যস্য সেনা গজেন্দ্রাঃ।। ১১।। হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পাদনিধিকৃত বিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যম।

২৪শ নিহতচরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধি তস্মাদভবদনিপালঃ শ্রীমহীপাল

২৫শ দেবঃ ।। ১২ ।। সখলু ভগীরথপথ প্রবর্ত্ত মাননানাবিধ নৌবাটক

২৬শ সম্পাদিত সেতু বন্ধ নিহিত সৈলসিখর শ্রেণী বিভ্রমাৎ। নিরতিশয় ঘনঘনা ঘনঘটা শ্যামায় মানবাসর লক্ষ্মী সমারব্ধ সন্তত জলদসময় সন্দে।

২৭শ হাৎ। উদীচীনানেকনরপতি প্রাভৃতী কৃতা প্রমেয় হয় বাহিনী খরখুরোৎ খাত ধুলী ধুসরিত দিগন্ত রালাৎ। পরমেশ্বর সেবা সমায়া।

২৮শ তাশেষজম্বুদ্বীপ ভূপালানন্ত পাদাতভরণ মদবনেঃ বিলাসপুরসমা

২৯শ বাসিতশ্রী মজ্জয় স্কন্ধাবারাৎ। পরমসৌগতো মহারাজধিরাজ।

৩০শ শ্রী বিগ্রহপাল দেব পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বর পরমভট্টারকো মহারাজধিরাজঃ শ্রীমান্মহীপালদেবঃ কুশলী। শ্রীপুন্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তৌ

৩১শ কোটিবর্ষবিষয়ে। গোকলিকামণ্ডলান্তঃ পাতিস্ব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন তলোপেত।

৩২শ চূটপল্লিকাবজ্জিত কুরটপল্লিকাগ্রামে। সমুপগতা শেষ রাজপুরুযান্। রাজ রাজন্যক। রাজপুত্র। রাজমাত্য। মহাসান্ধি বিগ্রহিক।

৩৩শ মহাক্ষপটলিক মহামন্ত্রি। মহাসেনাপতি। মহপ্রতীহার।

৩৪শ দৌঃসাধ সাধনিক। মহাদণ্ডনায়ক। মহকুমারামাত্য। রাজস্থানীয়োপরিক। দাশাপরাধিক। চৌরোদ্ধরণিক। দাণ্ডিকদাণ্ডপা।

পশ্চাদ্ভাগ

১ম সিক। সৌল্কিক গৌল্মিক। ক্ষেত্রপ। প্রা

২য় ন্তপাল। :: কোট্টপাল অঙ্গরক্ষ। তদায়ু

৩য় ক্তবিনিযুক্তক । হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবলব্যা

৪র্থ পৃথক। কিশোর বডবা গোমহিষা জাবি

৫ম কাধ্যক্ষ। দূতপ্রেষণিক। গমাগমিক।

৬ষ্ঠ অভিত্বরমাণ। বিষয়পতি। গ্রামপতি। তরিক। গৌড়।

৭ম মালব। খস। হূণ । কুলিক। কর্ণাট। চাট। ভট্ট। সেবকাদীন্। অন্যাংশ্চা-কীর্ত্তিতান্ রাজপাদোপজীবিনং প্রতিবাসিনো। ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ। মহত্ত।

৮ম মোত্তম কুটুম্বিপুরোগমেদান্ধ্র চণ্ডাল পর্য্যান্তান্। যথার্হং মানয়তি।

৯ম বোধয়তি। সমাদিশতি চ বিদিতমস্ত্ত ভবতাং। যথোপরিলিখিতোহয়ং গ্রামঃ স্বসীমাতৃণপ্লুতিগোচর পর্য্যন্ত সতলঃ। সোদ্দেশঃ।

১০ম সাম্রমধূকঃ। সজলস্থলঃ। সগর্ত্তোষরঃ। সদশাপরাধঃ সচৌরোদ্ধরণঃ। পরিহৃত সর্ব্বপীড়ঃ। অচাটভট প্রবেশঃ । অকি

১১শ ঞ্চিদ্ গ্রাহ্যঃ। সমস্তভাগভোগকরহিরণ্যাদি প্রত্যায়সমেতঃ। ভূমি

১২শ চ্ছিদ্রন্যায়েন। আচন্দ্রার্কক্ষিতি সমকালম্। মাতা পিত্রোরাত্ম

১৩শ নশ্চপুণ্যযসো ভিবৃদ্ধয়ে। ভগবন্তং বুদ্ধ ভট্টারকমুদ্দিস্য। পরাসর সগোত্রায়।

শক্তি। বলিষ্ঠ। পরাসর প্রবরায়।

১৪শ যযুর্ব্বেদ সব্রহ্মচারিণে। রাজস্বশাখাধ্যায়িণে। মীমাংসা ব্যাকরণ তর্ক বিদ্যাবিদে। হস্তিপদগ্রাম বিনিগর্গতায়। চারটি।

১৫শ গ্রামবাস্তব্যায়। ভট্টপুত্ররিষিকেশ পৌত্রায়। ভট্টপুত্র মধুশূদন

১৬শ পুত্রায়। ভট্টপুত্র কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মণে বিশুভ সংক্রান্তৌ বিধিবৎ। গঙ্গায়াং স্নাত্বা শাসনীকৃত্য প্রদত্তোহস্মাভিঃ। অতো ভবদ্ভিঃ।

১৭শ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যম্। ভামিভিরপি ভূপতিভিঃ। ভূমের্দ্দানফলগৌরবাৎ। অপহরণে চ মহানরকপাতভয়াৎ। দানমি

১৮শ দমনুমোদ্যানুপালনীয়ম্। প্রতিবাসিভিশ্চ ক্ষেত্রকরৈঃ।

১৯শ আজ্ঞাশ্রবণ বিধেয়ীভূয় যথাকালং সমুচিত ভাগভোগকর হিরণ্যাদি প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য ইতি ।। সম্বৎ ..... নদিনে। ভবন্তি চাত্র

২০শ ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকা।। বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিস্সগরা

২১শ দিভিঃ। যস্যযস্য যদাভূমিস্তস্যতস্য তদা ফলম্।। ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌপুণ্য কর্ম্মাণৌ নিয়তং

২২শ স্বগর্গগামিনৌ।। গামেকাং স্বর্ণমেকঞ্চ ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলম। হরন্নরকমাযাতি যাবদাহূত সংপ্লবম্।। ষষ্টিং বর্ষ সহস্রানি স্বর্গে।

২৩শ মোদতি ভূমিদঃ। আক্ষেপ্তা চামুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ।।

২৪শ স্বদত্তাম্পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্। স বিষ্ঠায়াং ক্রিমিভূর্ত্বা পিতৃভি মহ পচ্যতে। সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থি।

২৫শ বেন্দ্রান্ ভুয়োভূয়ঃ প্রার্থয়ত্যেষ রামঃ। সামান্যোহয়ং ধর্ম্মশেতুর্নৃপার্নাং কালে কালে পালনীয়ো ভবদ্ভিঃ। ইতি কমলদলাম্বু

২৬শ বিন্দু লোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ। সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ

২৭শ বুদ্ধা নহি পুরুষো পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ।। শ্রীমহীপাল দেবেন দ্বিজ শ্রেষ্ঠো পপাদিতে। ভট্ট শ্রী বাসনো মন্ত্রী শাসনে দূতকঃ

২৮শ কৃতঃ।। পোষালী গ্রাম নির্যাতবিজয়াদিত্য সূনুনা। ইদং শাসনমুৎকীর্ণং শ্রী মহীধর শিল্পিনা।।

লক্ষ্মণ সেন দেবের তাম্রশাসন

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার অধীনে তর্পণ দিঘির নিকটে পুষ্করিণী খননকালে এই তাম্রশাসনটি পাওয়া যায়।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

বিদ্যুৎদত্র মণিদ্যুতিঃ ফণিপর্তোবালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারিস্বর্গ তরঙ্গিণী সিতশিরোরোমালা বলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাস সমীরনোপ নিহিতঃ শ্রেয়োহস্কু রোদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্ বঃ স ভবার্ত্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃ কপর্দ্দাম্বুদঃ ।। ১ ।।
আনন্দোহম্বুনিধৌ চকোর নিকরে দুয়খচ্ছিাত্যন্তিকী
কহলারে হতমোহতা রতিপতাবেকোহহমেবেতিধীঃ।

যস্যামী অমৃতাত্মণঃ সমুদয়ন্ত্যাশু প্রকাশাজ্জগ
ত্যত্রেধ্যানি পরম্পরা পরিণতং জ্যোতিস্তদাস্তাং মুদে ।। ২ ।।
সেবাবনম্রনৃপ কোটিকিরীটরোচি
রম্বুল্লসৎ পদনখদ্যুতি বল্লরীভিঃ।
তেভ্যো বিষজ্বর মুষো দ্বিষতামভূষণ
ভূমীভূজঃ স্ফুটমথৌষধি নাথ বংশে ।। ৩ ।।
আকৌমার বিকস্বরৈ দির্শিদিশি প্রস্যন্দিভির্দোযর্শঃ
প্রালেয়ৈরবিরাজ বক্ত নলিনম্লাণীঃ সম্মুন্মীলয়ন্।
হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রৌঘ পুণ্যাবলী ʼ
শালিশ্লাঘা বিপাকপীবরগুণ স্তেষামভূদ্ বংশজ ।। ৪ ।।
যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিতভুজতেজঃ সহচরৈ
র্যশোভিঃ শোভন্তে পরিধি পরিণদ্ধাইব দিশ।
ততঃ কাঞ্চীলীলা চতুর চতুরম্ভোধিলহরী
পরিতোর্ব্বীভর্ত্তাহজনি বিজয়সেনঃ স বিজয়ী ।। ৫ ।।
প্রত্যহঃ কলি সম্পদামনলসো বেদায়নৈকাধ্বগঃ
সংগ্রামশ্রিত জঙ্গমাকৃতির ভূদ্ বল্লাল সেন স্ততঃ।
যশ্চেতোময়মেব শৌর্য্যবিজয়ী দত্তৌষধাং তৎক্ষণা
দক্ষীণার চয়াঞ্চকার বশগাঃ স্বস্মিন্ পরেষাংশ্রিয়ঃ ।। ৬ ।।
সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগণ গুণাভোগপ্রলোভাদ্দিশা
মীশৈরংশসমর্পণেণ ঘটিতস্ত ওৎ প্রভাবস্ফুটঃ।
দোরুষ্মক্ষপিতারিসঙ্গররসো রাজন্যধর্মশ্রয়ঃ
শ্রী মল্লক্ষ্মণ সেন ভূপতিরতঃ সোজন্য সীমাহজনি।। ৭ ।।
শশ্বদ্ বন্ধভয়াদ্ বিমুক্ত বিষয়াস্তন্মাত্রনিষ্ঠীকৃত
স্বান্তায়াস্ত কথং ননাম রিপবস্তস্য প্রয়োগাল্লয়ম্।
বৈরাত্মপ্রতিবিম্বতেহপি নিপতৎ পাত্রহপি চঞ্চৎতৃণে
হ্প্যদ্বৈতেন যতস্ততেহপি সপরো দৈবঃ পরং বীক্ষতে ।। ৮ ।।

স খলু শ্রী বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ-শ্রীবল্লাল সেন পদনুধ্যাত পরমেশ্বর-পরমবৈষ্ণব পরম ভট্টারক - মহারাজা ধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবঃ কুশলী। সমুপগতা শেষরাজ - রাজন্যক রাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র - রাজমাত্য - পুরোহিত - মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ - মহাসান্ধি বিগ্রহিক - মহা সেনাপতি - মহামুদ্রাধিকৃত - অন্তরঙ্গ - বৃহদুপরিক - মহাক্ষপটলিক - মহাপ্রতীহার - মহাভৌরিক - মহাপীলুপতি - মহাগণস্থ - দোঃসাধিক - চৌরোদ্ধরণিক - নৌবলস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিক দিব্যপৃতফ - গৌল্মিক দণ্ডপাশিক - দণ্ডনায়ক - বিষয় পত্যাদীননাংশ্চ সকলরাজ পাদোপজী বিনেহিধ্যক্ষ প্রচারোক্তন্ ইহা কীর্ত্তিতান্ চট্ট-ভট্ট জাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরাণ্ যর্থাহমানয়তি বোধয়তি সমাদিশতিচ মতমস্ত ভবতাং। যথা

শ্রপৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি পূর্ব্বে বুদ্ধবিহারী দেবতা নিকরদেয়ান্মণ ভূম্যাঢ়াবাপ পূর্ব্বালিঃ সীমা দক্ষিণে নিচডহার পুষ্করিণী সীমা পশ্চিমে নন্দিহরিপাকুণ্ডী সীমা উত্তরে মোল্লাণখাড়ী সীমা ইথুং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্তত্রত্য দেশব্যবহার মলিনদেব গোপমাদ্যসার ভুবহিঃ পাঞ্চোন্মানাধিক-বিংশ ত্যুত্তরাঢ়বাপশ তৈকাত্মকঃ সম্বৎসরেণ কপর্দ্দক পুরাণ-সার্দ্ধশতৈকোৎ পাওকো বিল্লহিষ্টী গ্রামীয় ভূভাগঃ সবাটবিটপঃ সজলস্থলঃ সগর্ত্তোযরঃ সগুবাকনা নারিকেলঃ সদশাপরাধঃ পরিহৃত সর্ব্বপীড়োহ চট্ট-ভট্ট প্রবেশাহকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্য স্তৃণযুতিগোচর পর্য্যন্তঃ হুতাশনদেবশর্ম্মণ প্রপৌত্রায মার্কন্ডেয়দেশর্ম্মণঃ পৌত্রায় লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় ভরদ্বাজ সগোত্রায় ভরদ্বাজ-অঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরায় সামবেদ কৌথুমশা খচরণানুষ্ঠায়িনে হেমাশ্বারথমহাদানাচার্য্য - শ্রীঈশ্বরদেবশর্ম্মণে পুণ্যেহহনি বিধিদুদক পূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীনারায়ণ ভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভি বৃদ্ধয়ে দত্তহেমাশ্বরথ মহাদানে দক্ষিণাত্বে নোৎ সৃজ্য আচন্দ্রার্কক্ষিতিসম কালং ভূমিচ্ছিদ্রণ্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোহস্মাভিঃ। তদ্ ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানু-মন্তব্যং। ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহরণে। নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্ম গৌরবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মনুশাসিনঃ শ্লোকাঃ।

বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সাগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং।।
ভূমিং যঃ প্রতি গৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভো তৌ পুণ্য কর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ।।
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমিভূর্ত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে।।
ইতিকমলদলাম্ব বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদা হৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ।।
শ্রী মল্লক্ষ্মণসেনো নারায়ণদত্ত সান্ধিবিগ্রহিকং।
ইহ ঈশ্বরশাসনে দূতং ব্যধতু নরনাথঃ । সং ৭ ভাদ্রদিনে ৩।। শ্রী

গুরব মিশ্রের বাদাল স্তম্ভ লেখ

আদি দিনাজপুর জেলার বাদাল নামক স্থানে স্তম্ভ লেখটি আবিষ্কৃত হয়। স্তম্ভলেখটিতে পালরাজা নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরব মিশ্রের বংশাবলী উল্লেখিত হয়েছে।

খ্যাতঃ শাণ্ডিল্য বংশৈকো ধীরদেবস্তদন্বয়ে
পাঞ্চালো নাম তদ্গোত্রে গর্গস্তস্মাদজায়ত।
পত্নীচ্ছানাম তস্যাসীদিচ্ছায়াত্ত বিবর্ত্তিণী।
নিসর্গ নির্মলস্নিগ্ধা পতিতত্ত্বপরায়ণা।।
সুতস্তয়োঃ কমলযোনিরিব দ্বিজেশঃ।
শ্রী দর্ভপাণিরিতি নামনি সুপ্রসিদ্ধঃ।।
আবেরাজনকাস্মতঙ্গজমদপ্তিম্যচ্ছিলা। ভূৎপতে

রা গৌরী পিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎ সিতিম্নোগিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণ জলাদাবারিরা শিত্বয়া
ন্নীত্যা রাজ্যভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ।।
মাদ্যং নানাগজেন্দ্রস্রযদনবরতোচ্ছ্বাসভূত প্রবাহো
মৃদবক্ষো দীপ্তিভঙ্গী প্রবলঘনরজঃ সম্বৃ তাশাধিকাশং।
দৃকচক্রাপাতভূভূশ্মনিক রবিহরৎ বাহিনী দুর্বিলোকাং
প্রাপ্য শ্রীদেবপালো নৃপতি বরসভাপেক্ষয়া দ্বারি যস্য।।
দত্ত্বাপ্যনল্পমুদ্র পচ্ছবিপীঠমগ্রে
যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজকল্পঃ।
নানা নরেন্দ্র মুকুটাঙ্কিত পাদ পাংশুঃ
সিংহাসনং সচ্চকিত স্বয়মাসসাদ।।
তস্য শ্রী শর্করাদেব্যামত্রেঃ সোম ইব দ্বিজঃ।
অভূৎ সোমেশ্বরঃ শ্রীমান্ পরমেশ্বর বল্লভঃ।।
শিব ইব শিবায়া হরিরিব লক্ষ্ম্যাগৃহাশ্রমপ্রেপ্সুঃ।
অনুরূপায়া বিধিকৃতং রণাদেব্যাঃ পাণি জগ্রাহ।।
আসন্নাজিহ্বরাজাদ্ বরুণলিপি শিখারামদিক্ চক্রবালা।
দুর্ব্বোধাভ্যস্ত শক্তিস্বনয়পরিণীতাশেষবিদ্যা প্রতিষ্ঠঃ।
তাভ্যাং জন্ম প্রপেদে ত্রিদশজনমনোনন্দনঃ সুক্রিয়াভিঃ
শ্রীমান্ কেদারমিশ্রগ্রহপতিরিব সদ্‌গীতরূপ প্রবন্ধ।।
ভাস্বদর্শন সম্পাত চতুর্বিদ্যা পয়োনিধীন।
স্তাত্বা সোহগস্ত্য সম্পত্তি মুদ্ গিরন্নস্থিরো নৃপং।।
উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃতহূণ গর্ব্বং
খর্ব্বীকৃত দ্রাবিড় গুর্জ্জর নাথ দর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরসনা ভরণম্বুভোজ
গৌড়েশ্বরশ্চিরমুপাস্য ধিবং যদীয়াং।।
স্বয়মপি হৃত বিত্ত নার্থিনো যোহবমেনে
দ্বিষতি সুহৃদিদিবা সীন্নির্বিবেকো যদাত্মা।
ভবজল নিধিপাতে যস্যভীধু তপাপা
পরিমৃদিদিত কশং যথেই পরে যঃ পরে ধাম্নি রেমে।।
যস্যে গ্রাসু বৃহস্পতি প্রতিকৃতেঃ শ্রীসুরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব প্রজাপ্রিথবলো গত্বৈব ভূয়ঃ স্বয়ং।
নানাম্ভোসিনধিমেখলস্য জগতঃ কল্যাণসঙ্গী চিরং
গঙ্গাম্ভঃ পূতমানসো নতশিরা জগ্রাহ পূতমুয়ঃ।।
দেবগ্রামভবাধন্ন্যা দেবীসুতুল্যবলয়ালোক সন্দীপিতরূপা।
দেবকীব তস্মাদ্ গোপালপ্রিয়কার কমসূত পুরুত্তমং।।
জমদগ্নি কুলোৎপন্ন সম্পন্নক্ষত্রচিন্তকঃ।
যঃ শ্রীগুরুবমিশ্রাখ্য রাজাসম ইবা পরঃ।।

৫. দিনাজপুরে পাল-সেন যুগের সংস্কৃতি

ধর্মমত

প্রাক্-গুপ্তযুগ থেকেই দিনাজপুরে আর্য-অনার্যের সম্মিলনে ধর্মমতে যে একটা সমন্বয় ধারা গড়ে উঠেছিল, জৈন-বৌদ্ধ এবং বৈদিক ধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল, সে কথা প্রসঙ্গক্রমে আগেই উল্লেখিত হয়েছে। পালযুগ বাঙালির ধর্ম ও সংস্কৃতির গৌরবময় যুগ। এই যুগে যদিও বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ লাভ ঘটেছিল প্রবলভাবেই, তাসত্ত্বেও, পালরাজারা ধর্মমতে বৌদ্ধ হলেও হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁদের উদারতা ছিল যথেষ্ট। আদি দিনাজপুরে আবিষ্কৃত পাল রাজগণের তাম্রশাসনেও বেদ, বেদাঙ্গ, মীমাংসা প্রভৃতি ব্যুৎপন্ন এবং বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বংশের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। কুলশাস্ত্র মতে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বৈদিক অনুষ্ঠানের জন্য এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দিনাজপুরে যে বৈষ্ণব ও শৈবধর্মের বিশেষ প্রসার ছিল তাও বিভিন্ন সময়ে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন, পাহাড়পুর মন্দির গাত্র ইত্যাদি থেকে জানা যায়। পৌরাণিক দেবদেবী ও তাদের বহু আখ্যান, বিষ্ণু, হরি, সদাশিব, অর্ধনারীশ্বর, মহেশ্বর, কৃষ্ণ, সর্বাণী, লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি দেবতার পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল এবং উপাসকরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের মত শৈবধর্মও দিনাজপুরের মাটিতে প্রচলিত ছিল। নারায়ণপালের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে তিনি নিজে এই ভূমিতে একটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার পাশুপতাচার্য-মণ্ডলীদের ব্যবহারের জন্য গ্রাম দান করেছিলেন। সদাশিব সেনরাজাদেরও ইষ্টদেবতা ছিলেন। এই যুগেই এখানে তন্ত্রসাধনার প্রসার ঘটে। এই সময়েই বহু তন্ত্র সাধকের আবির্ভাব ঘটেছিল দিনাজপুর জেলায়। তার নিদর্শন স্বরূপ পঞ্চমুণ্ডির আসন ও তন্ত্রসাধনার পীঠ[৩২] এখনও বহুস্থানে বর্তমান। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে এখানে জৈনধর্ম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রমাণ তো রয়েই গেছে। জৈনগ্রন্থ *কল্পসূত্র*-মতে ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাস কোটিবর্ষীয় এবং পুণ্ড্রবর্ধনীয় জৈনধর্মীয় শাখা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বাংলার এই দুটি সুপরিচিত নগরীর নামে।

বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে যে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করেছিল তা যেমন তাম্রলিপিগুলি থেকে জানা যায়, তেমনই চীনদেশীয় পরিব্রাজকের উক্তি হতেও জানা যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, দশম-একাদশ শতাব্দীতে সারা বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল সুজলা-সুফলা এই দিনাজপুরের মাটি থেকেই। এখানে মহাযান সম্প্রদায়ের প্রধানত তিনটি উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। এই উপসম্প্রদায়গুলি একান্তই বাংলার, ভারতের অন্যত্র তা দেখা যায় না। প্রধান তিনটি ধর্মীয় উপসম্প্রদায় হল সহজযান, বজ্রযান ও কালচক্রযান। এঁরাই হলেন বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায়। দিনাজপুরই ছিল এঁদের মূলকেন্দ্র ও সাধনস্থল। দিনাজপুর অঞ্চলের সীতাকোট মহাবিহার, দেবকোট মহাবিহার, জগদ্দল মহাবিহার, প্রভৃতি মহাবিহারের সুনাম দেশ-বিদেশে প্রচলিত ছিল এবং এইসব মহাবিহারে যে সব বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন তাঁদের অনেকে তিব্বতীয় সাহিত্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই অঞ্চলে বর্তমানে

বৌদ্ধধর্মের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়েছে। এর মূল কারণ এখানে সেনরাজাদের অভ্যুদয়ের ফলে বাংলায় শৈব এবং বৈষ্ণবধর্ম এবং প্রাচীন বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মানুষ্ঠান ও আচার-বিচারের প্রবল প্রসার হয়। এটি হল দিনাজপুর অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম পতনের একটি কারণ। আরও একটি অন্যতম কারণ হল, সহজযানীদের মতে সহজযান ধর্ম ছিল দেহবাদী। এই দেহবাদীতত্ত্বে বৌদ্ধধর্মের 'শূন্যতা'-র অর্থ ছিল প্রকৃতি এবং 'করুণ' হল পুরুষ। এই শূন্যতা ও করুণার মিলনেই আসবে পরমবোধি ও মহাসুখ। এই অবস্থায় সাধকের রিপু বিলুপ্ত হয় এবং জাগতিক জ্ঞানও লোপ পায়। তাঁর তখন সকল সংস্কার ধ্বংস হয়ে যায় এবং তিনি এই অবস্থায় ভেদাভেদ জ্ঞানশূন্য হন। এরই নাম সহজ অবস্থা এবং এই সাধনপদ্ধতির নাম সহজধর্ম এবং সাধক হলেন সহজধর্মী বা সহজিয়া। কিন্তু সময়ের ফেরে পরবর্তীতে তা নর-নারীর দেহমিলনের সাধনায় পর্যবসিত হয়। এই মিলন সঞ্জাত যে সুখ উৎপন্ন হয় তাইই দীর্ঘস্থায়ী করতে পারলে মহাসুখ লাভ হয়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অন্তরের অধ্যাত্ম সাধনের নামে নর-নারীর দৈহিক মিলন দীর্ঘস্থায়ী করার সাধনা আরম্ভ হয়। এর ফলেই বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি ঘটে ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন হয়।

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত এই অঞ্চলেরও সহজপন্থীরা ছিলেন উদার, সংস্কারমুক্ত ও বর্ণাশ্রম বিরোধী। তাছাড়া, এই ধর্মমত ছিল চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্মমত যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁরা ছিলেন কিছু কিছু বৌদ্ধ আচার্য। 'সিদ্ধাচার্য' নামে যারা পরিচিত। এই সিদ্ধাচার্যরা তাঁদের গুহ্য সাধনকথা লিখে গেছেন সান্ধ্যভাষায়। এইগুলির নাম চর্যাপদ। এই চর্যাপদই হল বাংলাভাষা, বাংলাকাব্য ও বাংলাগানের প্রথম নিদর্শন। এঁদের আবির্ভাবকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে। এঁদের মধ্যে লুইপাদ, কাহ্নপাদ, সরহপাদ, ভূসুক ও কুক্কুরীপাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চর্যাপদ রচয়িতা কাহ্নপাদ ছিলেন দিনাজপুরের ভূমিজ সন্তান। তাঁর বাড়ি ছিল আত্রাই নদীর তীরে সমজিয়া[৩৩] অঞ্চলে। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলায় কীর্তনের প্রচলন করেন। তাঁর রচিত পদগুলি সঙ্গীসহ তিনি গান করে বেড়াতেন, সে কারণে লোকনাট্যের তিনিই উদ্ভাবক বলে অনেকে মনে করেন। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ সহজিয়া পন্থীরা অনেকটাই পরিবর্তিত আকারে বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। বৌদ্ধ উপাসক কালচক্রযানীদের প্রভাব ও প্রসারও এখানে বিকশিত হয়েছিল। কালচক্রযানে তিথি, নক্ষত্র, বার ও রাশির উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে দিনাজপুর জেলায় গণিত ও জ্যোতিষের চর্চা প্রবলভাবে প্রসারলাভ করেছিল।

এই মাটিতে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্য ও শাক্তধর্মের মিলনে সৃষ্টি হয়েছিল হিন্দুধর্মের আরও তিনটি উপসম্প্রদায়ের। এই তিনটি উপসম্প্রদায় হল নাথপন্থী, কৌলমার্গী ও অবধূতী। দিনাজপুরে পাল রাজত্বকালে নাথ সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটেছিল। এই সম্প্রদায়ের গুরুদের মধ্যে দিলেন গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, জালন্ধরীনাথ প্রভৃতি নাথযোগীরা। মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের গ্রন্থাবলীই নাথ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য ছিলেন যোগীশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথ। বরেন্দ্রভূমির বৌদ্ধ ঐতিহ্য

ও অসংখ্য স্মারক স্মৃতির সঙ্গে গোরক্ষনাথের নাম জড়িত। লোককাহিনি অনুসারে দিনাজপুর জেলার সর্বত্র গোরক্ষনাথ এবং কিংবদন্তির রাজা গোপীচন্দ্রের নাম প্রচলিত। এখানে অনেক নাম স্মৃতি ও স্থানস্মৃতি আছে যার সঙ্গে গোরক্ষনাথের প্রত্যক্ষ জীবন বিজড়িত। গোরক্ষনাথের পুঁথিতে আছে যে তিনি এক নারী-প্রধান রাজ্যে গমন করেছিলেন। সেই নারী-প্রধান রাজ্য যে দিনাজপুর অঞ্চল তার তুলনা অনেকটাই খুঁজে পাওয়া যায়। সুদূর অতীতকালে বরেন্দ্রের এক অংশ প্রধানত দিনাজপুর অঞ্চল নারী-প্রধান এলাকা ছিল বলে আরণ্যক পণ্ডিতরা ব্যঙ্গ ভাষায় এর নাম দিয়েছিলেন স্ত্রী রাজ্য। দিনাজপুর জেলার গোরকুই গ্রামে[৩৪] গোরক্ষমন্দির রয়েছে। এই মন্দির যে গোরক্ষনাথের নামানুসারে হয়েছে প্রত্ন নিদর্শন থেকে তার অনেকটা হদিশ পাওয়া যায়। এই মন্দিরটি খুব বড় নয়, ইটের তৈরি এবং মন্দিরের গায়ে বিভিন্ন কারুকাজ খচিত।[৩৫] মন্দিরের দ্বারদেশের শিলালেখ থেকে জানা যায় মন্দিরটি ৯২০ শকাব্দে নির্মিত। শিলাফলকটি বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধীনে দিনাজপুর জাদুঘরে রয়েছে। এখানে একটি প্রাচীন কূপ রয়েছে, কূপটি অলৌকিক মণ্ডিত। কূপ থেকে যতই জল তোলা হোক না কেন কূপের জল কোনক্রমেই নিঃশেষ হয় না। কূপটি ভক্তদের কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত। এই কূপের নাম গোরক্ষকুণ্ড। এখানে কালীমন্দির এবং তান্ত্রিক কয়েকটি স্মারক মন্দিরের অস্তিত্ব দেখে প্রমাণ করে যে এই গোরক্ষ মন্দিরকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে নাথমতের প্রচলন ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। নাথগুরু গোরক্ষনাথ যে একদা দিনাজপুর জেলার মাটিতেই ধ্যানরত থেকে সাধন ভজনে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তা নাথ মতবাদ প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র 'যোগীরভবন' দেখে অনেকে মনে করেন। যোগীর ভবন এখনও অক্ষত দেখতে পাওয়া যায়।[৩৬] লোক বিশ্বাস যে, গোরক্ষনাথ গুম্ফার মধ্যে যে আসনটিতে ধ্যানরত থাকতেন সেই আসন স্থানটি এখনও অক্ষত রয়েছে।

কি খণ্ডিত কি অখণ্ডিতই হোক না কেন, দিনাজপুর জেলার আধুনিক অধিবাসীদের মনে প্রাচীন বৌদ্ধসত্ত্বার উত্তরাধিকারীত্বের প্রভাব যে সুস্পষ্টভাবে দানা বেঁধে আছে তার বিকাশ এখানকার সংস্কৃতিকে ঘিরে এখনও প্রবহমান। এখনকার পূজা-পার্বণ, লোকসংগীত, লোকনাট্য, লোকগাথা, আতিথেয়তা, সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারীত্বের ছাপ রয়ে গেছে। একদা এখানে বৌদ্ধ ধর্মমতকে কেন্দ্র করে তার যে সংস্কৃতি তা মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে আধিপত্য লাভ করেছিল। ক্রমে সেই সংস্কৃতির ধারা নানান প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়ে বিভিন্ন রূপে পরিগ্রহণ করতে করতে অবশেষে বাংলার মুসলিম শাসনের প্রাথমিক অবস্থায় নাথসাহিত্য ও সংস্কৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে এগুলি বৌদ্ধগান ও দোহা নামক বাংলা সাহিত্যের আদিরূপে পরিণত হয়েছিল, যা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎস বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ আচার্য, নাথ সিদ্ধাচার্য, বাউল, ফকির, সুফি দরবেশদের সম্মিলিত প্রয়াসে ও পারস্পরিক ভাব-ভাবনার আদান প্রদানে এই মাটিতে ধর্মীয় ও সামাজিক গঠনতন্ত্রের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। আরও একটি বিষয়, একদা নিষ্ঠাবান বৌদ্ধভিক্ষুরা, আচারশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্র অনুযায়ী আদর্শ জীবন যাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের

চরিত্র ও ধর্মমত গঠনে যে সহায়তা করে বাঙালির ধর্মজীবনের এক আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলেছিলেন, পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ এই উভয় সম্প্রদায়েরই যে রকম নৈতিক অধোগতি, অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল তার ফলেই বাঙালির ধর্মজীবন নানাভাবে কলুষিত হয়ে সেই পুরনো আদর্শ, পদ্ধতির যে মহান ও উচ্চ আলো সেই আলোর প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। তবে সর্বসাধারণের মধ্যে যে ধর্মভাব বিশেষ ব্যাপক ও প্রভাবশালী ছিল, আমাদের সাহিত্যে ও শিল্পকলায় তার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়।

৬. ভাষা ও সাহিত্য

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত দিনাজপুর অঞ্চলেও আর্যদের সংস্পর্শে এসে ও তাঁদের প্রভাবে এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা নিজেদের ভাষা ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে আর্যভাষা গ্রহণ করেছিলেন। আর্যরা যখন এদেশে আসেন এবং বসবাস আরম্ভ করেন তখন প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা হতে প্রথমে পালি ও প্রাকৃত ভাষার প্রচলন হয় এবং পরে অপভ্রংশ হয়ে তিনটি ভাষার সৃষ্টি হয়। এই অপভ্রংশ ভাষা থেকেই বাংলা প্রভৃতি দেশীয় ভাষার উৎপত্তি হয়। বাংলার সর্বত্র যেমন এই সব ভাষার প্রচলন ছিল দিনাজপুরেও তেমনি এইসব ভাষারই চলন ছিল। সেকালে এখান থেকে বাঙালির যে সব সাহিত্য রচিত হয়েছিল তা প্রধানত সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। আদি দিনাজপুর জেলা থেকে গুপ্ত, পাল ও সেনযুগে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলি সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। এ জেলায় একদা যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ছিল এবং এখানে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার প্রসারে যে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন অধিকতর ছিল তা চীনদেশীয় পরিব্রাজকদের বিবরণে বিশেষভাবে জানা যায়।

পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে দিনাজপুর অঞ্চলে সংস্কৃত সাহিত্য একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করেছিল এবং বাঙালির প্রতিভা সংস্কৃত সাহিত্যে যে একটি অভিনব রচনারীতির প্রবর্তন করেছিল তার প্রমাণ এই অঞ্চলের ভূমিজ সন্তান চন্দ্রগোমিন্। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম *চান্দ্রব্যকরণ*। *পাণিনি*-র সূত্রগুলিকে নতুন প্রণালীতে বিভক্ত করে তিনি যে ব্যাকরণ পুস্তকে বৃত্তি রচনা করেছিলেন, তা ভারতবর্ষে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। তিনি সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পকলায় কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। সম্রাট অশোকের কাছে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। নালন্দার প্রধান আচার্য চন্দ্রকীর্তি তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। তিনি তাঁর সম্মানে নালন্দায় একটি শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করেন। এর সামনের দিকে তিনখানি রথ ছিল, তার একটিতে চন্দ্রগোমিন্ আর একটিতে মঞ্জুশ্রীর মূর্তি এবং তৃতীয়টিতে স্বয়ং চন্দ্রকীর্তি ছিলেন। চন্দ্রগোমিন্ যোগাচার-মতবাদ সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন।[৩১] তিব্বতীয় কিংবদন্তি অনুসারে চন্দ্রগোমিন্ *ন্যায়সিদ্ধালোক* নামে একটি দার্শনিক গ্রন্থ, *তারা ও মঞ্জুশ্রীর স্তোত্র*, *লোকানন্দ* নাটক, *শিষ্য-লেখ-ধর্ম* নামে কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও ৩৬টি তন্ত্রশাস্ত্রের রচনা করেছিলেন।

দিনাজপুরে সংস্কৃত চর্চা ও কাব্যরচনা অবিরাম গতিতে প্রসার লাভ করেছিল

পালযুগে। এই ভূমিরই কৃতি সন্তান দেবপালের ব্রাহ্মণমন্ত্রী দর্ভপানি চতুর্বেদে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। দর্ভপাণির পৌত্র কেদারমিশ্র এই মাটিতে শাস্ত্রশিক্ষা লাভ করে বেদ, আগম, নীতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের পারদর্শিতা এবং বেদের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন।[৩৮] তিব্বতীয় লামা তারানাথ জেতারি নামক একজন বাঙালি আচার্যের কথা লিখে রেখে গেছেন। বরেন্দ্র ভূমির এই বৌদ্ধ জ্ঞান-তাপস বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষত অভিধর্মপিটকে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। রাজা মহীপাল তাঁকে বিক্রমশীল বিহারের পণ্ডিত, এই গৌরবময় পদসূচক একখানি মানপত্র দান করেন। লামা তারানাথের মতে, তিনি একশোটি পুস্তক রচনা করেন। এর অনেকগুলিই তিব্বতীয় ভাষায় রচিত হয়েছিল। মহাপণ্ডিত জেতারির জন্ম কোথায় হয়েছিল এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা যায়, আদি দিনাজপুর জেলার সুরোহর গ্রামে [৩৯] জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখানেই দুই ছাত্র রত্নাকর শান্তি ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তাঁর কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন।

বাঙালি বৌদ্ধ আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন আমাদের দিনাজপুর জেলারই ভূমিজ সন্তান। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও সম্প্রতি গবেষণায় জানা যায় যে, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আদি দিনাজপুর জেলার সুরোহর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই গ্রামেই আচার্য জেতারির কাছে তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে দেবকোট মহাবিহারে উচ্চতর শিক্ষালাভ করেন।[৪০] তিব্বতীয় গ্রন্থে তাঁর জীবনী সম্বন্ধে নানা তথ্য পাওয়া যায়। তিনি বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, সাংখ্য ইত্যাদি বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সংঘবাসীরা তাঁর নাম উচ্চারণ না করে তাঁকে 'ধর্মনিধি' বলে অভিহিত করতেন। তিব্বতে এখনও তাঁর স্মৃতি পূজিত হয়। তিনি ১৬৮ খানি পুস্তক রচনা করেছিলেন। এই সব গ্রন্থের বেশিরভাগই বজ্রযান সাধন গ্রন্থ। দশম হতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় বহু বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। এই সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। বাংলার রাজা গোপীচাঁদের সন্ন্যাস অবলম্বনে রচিত বহু গীতিকা সমস্ত বঙ্গদেশেই খ্যাতিলাভ করেছিল। গোরক্ষনাথ, নাথ সম্প্রদায় নামে পরিচিত। তিনি সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলায় বহু পুস্তক ও পদ রচনা করে অমর হয়ে আছেন। দিনাজপুর জেলার ধামইর হাট থানার অধীনে 'যোগীরভবন' তাঁর সাধন ক্ষেত্র ছিল। এই জেলার গোরকুই গ্রামে গোরক্ষমন্দিরও গোরক্ষনাথের স্মৃতি এখনও বহন করে চলেছে। এর থেকে মনে হয় তিনি দিনাজপুর জেলারই সন্তান। অন্যান্য সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে চর্যাপদ রচয়িতা কৃষ্ণপাদ অথবা কানুপা দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করে এই জেলাকে পুণ্যভূমিতে পরিণত করে গেছেন।

সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে অমরকীর্ত্তি লাভ করেছেন এ জেলার সুসন্তান কবি সন্ধ্যাকর নন্দী। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম *রামচরিতম্*। গ্রন্থের মধ্যেই সন্ধ্যাকর তাঁর আত্মপরিচয় প্রদান করে গেছেন।

বসুধা শিরো-বরেন্দী মণ্ডল - চূড়ামণিঃ কুলস্থানম্।
শ্রী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর - প্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ।।
তত্র বিদিতে বিদ্যোতিনি নন্দিরত্ন সন্তানে।

সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীর নিধির্গ নৌঘস্য।।
তস্য তনয়ো মতনয়ঃ করণ্যানামগ্রণী রণর্ঘগুণঃ।
সান্ধি - শ্রীপদা সম্ভাবিতাভিধানতঃ প্রজাপতিজ্বার্ত।।
নন্দিকূল - কুমুদকানন- পূর্ণেন্দুর্নন্দনোহভবত্তস্য।
শ্রী সন্ধ্যাকর নন্দী পিশূনাস্কন্দী-সদানান্দী।।

সন্ধ্যাকর নন্দী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকটে বৃহদ্বটু নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই বৃহদ্বটু স্থানটি আদি দিনাজপুর জেলার বটুন গ্রাম[৪১] ছিল বলে অনেকে মনে করেন। নেপাল রাজ দরবারে যে সব হাতে লেখা পুরাতন গ্রন্থ ছিল তার পরিদর্শন সূত্রপাত করে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' নেপালে পণ্ডিত পাঠিয়েছিলেন। সেইসূত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর হরপ্রসাদশাস্ত্রী এই কাব্যখানি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এনে কাব্যগ্রন্থটি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত করে প্রকাশ করেছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী এই গ্রন্থে পালরাজা রামপালদেবের 'বরেন্দ্রী উদ্ধার কাহিনী' বিবৃত করেছেন। কাব্যটি তিনি রচনা করেছিলেন গৌড়েশ্বর মদনপাল দেবের শাসন সময়ে। আটশো বছর আগে যেরকম বঙ্গ-লিপি প্রচলিত ছিল, গ্রন্থটি সেই পুরনো অক্ষরে লিখিত।[৪২] সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিতম্* কাব্যগ্রন্থের কিছু নমুনা ঃ

কলিযুগ-রামায়ণমিহ্ কবিরপি কলিকাল বাল্মীকিঃ।
কাব্য কলাকূলনিলয়ো গুণমণি মেরুর্মণীষিনামীশঃ।
সীমা সাহিত্য বিদ্যাম শেষভাষা বিশবিদঃ স কবিঃ।।
শ্রীঃ শ্রয়তি যস্য কণ্ঠং কৃষ্ণং তং বিভ্রতং ভূজেনাগম্।
দধতং কং দামজটা লম্বং শশিখণ্ড মণ্ডলং বন্দে।
করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্মসু।
কায়স্থে ব্রতবন্ধে চ নাট্যগীত প্রভেদয়োঃ।
পুমাএঃ শূদ্রাবিশোঃ পুত্রে বাণরাদৌ চ কীর্তাতে।।
স্তোকৈ স্তোষিত লোকৈঃ শ্লোকৈকেরক্লেশনশ্লেষৈঃ।
ঘটনা-পরিস্ফুটরসৈঃ গম্ভীরোদার-ভারতী-সাবৈঃ।।

সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্য ইতিহাস হলেও তা ঘটনা পরিস্ফুট রসে পরিপূর্ণ। তাঁকে বাংলার কবি কল্‌হন বলে অনেকেই সমাদর করেছেন। আমাদের গর্ব যে তিনি দিনাজপুর জেলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন।

বরেন্দ্রভূমির শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন অনিরুদ্ধ ভট্ট। তিনি ছিলেন বঙ্গের অধিপতি বল্লাল সেনের গুরু। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর মত পারদর্শী সেকালে খুব কমই ছিল। তাঁর রচিত দুখানি গ্রন্থের নাম *পিতৃদয়িতা* ও *হারলতা*। সেইসময় বরেন্দ্রের আরও একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ছিল হলায়ুধ মিশ্র। তিনি অল্প বয়সেই রাজপণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনি শ্রুতি-স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের সার সংগ্রহ করে *মৎস্যসূক্ত* রচনা করেছিলেন। হলায়ুং মিশ্রের অপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ *সেক-শুভোদয়া*। উল্লেখ্য যে, সেনরাজাদের প্রায় সকলেই কবিতা রচনা করতেন এবং এই যুগকে বাংলায় সংস্কৃত কাব্যের সুবর্ণযুগ বলা হয়। এই সময় লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস বরেন্দ্র অঞ্চলের

৪৮৫ জন কবির রচিত ২৩৭০টি কবিতা সংগ্রহ করে *সদুক্তিকর্ণামৃত* নামে সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই কাব্য সংগ্রহে রাজা বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন এবং কেশব সেনের রচিত কবিতাও আছে। তাছাড়া, সেনযুগে বিশেষত লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় ধোয়ী, উমাপতিধর, গোবর্ধন, শরণ ও জয়দেব এই পাঁচজন প্রসিদ্ধ কবি তাঁর রাজসভাকে সর্বদাই অলংকৃত করে রাখতেন। কবি ধোয়ী তো একটি শ্লোকে রাজা লক্ষ্মণ সেনকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। একবার পিতার উপর অভিমান করে লক্ষ্মণ সেন বাড়ি ছেড়ে বিক্রমপুরে চলে গিয়েছিলেন। স্বামীর দীর্ঘ প্রবাসের ফলে তাঁর স্ত্রী দুঃখে প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প নেন। সে সময় রাজ অন্তপুরে অনেক স্ত্রীলোকই সংস্কৃত জানতেন। লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী তাই তাঁর দুঃখ-বেদনার কথা প্রকাশ করে একটি শ্লোক রচনা করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। বল্লাল সেন দৈবাৎ সেই শ্লোকটি দেখতে পেয়ে উদ্বিগ্ন হন। শ্লোকটি ঃ

"পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনোমুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখশান্তিং করোতু মে।।"[৪৩]

সংস্কৃত ভাষাতে সে যুগের নারীরাও যে কাব্য চর্চা করতেন শ্লোকটি তারই নিদর্শন। হলায়ুধ মিশ্রের সংস্কৃত ভাষা চর্চার নিদর্শন ঃ

"বাল্যোখ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাশুশুবিম্বোজ্জ্বল
চ্ছত্রোৎসিক্ত-মহামহত্তনুপদং দত্ত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবন শেষযোগ্যমখিল ক্ষ্মাপাল নারায়ণঃ
শ্রী মল্লক্ষ্মণ সেনদেব নৃপতি ধর্ম্মধিকারং দদৌ।।"

শ্রীধর দাসের *সূক্তিকর্ণামৃত* থেকে উদাহরণ ঃ

"শাকে সপ্তবিংশত্যধিক শতোপেত দশশতে শরদাম্
শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনদেব ক্ষিতিপস্য রসৈকত্রিংশে।
সবিতুর্গত্যা ফাল্গুণ বিংশেষু পরার্থহেতোবকুতুকাৎ।
শ্রধরদাসেনেদং 'সুক্তি কর্ণামৃতং' চক্রে।।"

উমাপতি ধরের রচিত কবিতার অংশ ঃ

"তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনো ব্রহ্মবাদী।
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানাম জনি কুলশিরোদাম সামন্ত সেনঃ ।।"

দিনাজপুর জেলার সু-সন্তান চর্যাগীতির রচয়িতা এবং প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যের পুরোধা কাহ্নপাদের একটি দোহাকোষের উদাহরণ দিয়ে এই অধ্যায়ের শেষ করছি।

"পণ্ডিত লোঅ খমহু মহু এত্থু ন কি অই বিঅপ্পু
জো গুরুবঅণে মই সুঅউ তহি কিং কহমি সুগোপ্পু
কমল কুলিস রেবি মজ্ ঝঠিউ জো সো সুরঅ বিলাস
কো তহি রমই ন তিহুঅণে কস্স ন পূরই আস।।"

বাংলা অনুবাদ ঃ পণ্ডিত লোক, আমাকে ক্ষমা কর; এখানে কিছু বিকল্প করা হচ্ছে না,

যা আমি শুনেছি সুগোপন গুরুবাক্যে তা আমি কি করে বলি। কমল এবং কুলিশ এই দুইয়ের মধ্যস্থিত যে সুরত বিলাস তাতে ত্রিভুবনে কে না সুখী হয় এবং কার না আশা পূর্ণ হয়।[২৪]

৭. দেব-দেবীর মূর্তি পরিচয়

বিষ্ণুমূর্তি

অখণ্ড দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে বিষ্ণু ও তার অবতারদের মূর্তি। বিষ্ণুমূর্তির চারহাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম থাকে। কোন কোন মূর্তিতে আবার চক্র ও গদার পরিবর্তে একটি পুরুষ ও নারীমূর্তি দেখা যায়। এদের নাম যথাক্রমে চক্রপুরুষ ও গঙ্গাদেবী। দিনাজপুর অঞ্চলে যে সব বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলি বিষ্ণুর বিশ্বরূপ অবতাররূপী মূর্তি, সাধারণত চারহাত বিশিষ্ট এবং এগুলি ত্রিবিক্রমের মূর্তি নামে পরিচিত। বিষ্ণুর চারহাতে যে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের কথা বলা হয়েছে, ভূষণ পরিবর্তন ধরে সেইসব বিভিন্ন হাতে অবস্থানের কারণে এদেশে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্তিগুলির মধ্যে ২৪টি বিভিন্ন রূপ পরিকল্পিত হয়েছে বলে জানা যায়। এখানকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত ত্রিবিক্রম রূপের বিষ্ণুর বৈশিষ্ট্য হল, এর নিম্ন ও ঊর্ধ্ববাম এবং ঊর্ধ্ব ও নিম্ন-দক্ষিণ হাতে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা, ও পদ্ম এবং দুইপাশে শ্রী ও পুষ্টি অর্থাৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তি। লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর স্ত্রীরূপে পরিচিত।

তবে পৌরাণিক যুগের প্রচলিত মতে মহাদেবের দুই কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই বিষ্ণুর স্ত্রী। ঋষি কশ্যপ ও তাঁর স্ত্রী বিনতার পুত্র গরুড় পক্ষী হল বিষ্ণুর বাহন। বিষ্ণুর চার হাতের মধ্যে এক হাতে ধরা আছে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, তা সীমাহীন শূন্যতার প্রতীক-রূপে পরিচিত। একটি হাতে সুদর্শন চক্র, যা অনন্তকালের প্রতীক। একটি হাতে রয়েছে কৌমোদিকী গদা, অনন্ত ও শৃঙ্খলার প্রতীক। অপর আরও একটি হাতে আছে পদ্ম, যা অনন্ত সৃষ্টি, সৌন্দর্য ও সজীবতার প্রতীক। বিষ্ণুর ধনুকের নাম শার্ঙ্গ ও তরবারির নাম নন্দক। তাঁর বুকে কৌস্তুভমণির অলংকরণ, তাতে শ্রীবৎস নামক এক অদ্ভুত চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে, মণিবন্ধে আছে সামন্তক মণি।

দিনাজপুর জেলা থেকে পাওয়া বিষ্ণুমূর্তিগুলি উৎকৃষ্ট কালো পাথরে তৈরি ও সমপদস্থানক ভঙ্গিতে দণ্ডায়মাণ। মূর্তির মাথায় মুকুট, কানে কুণ্ডল, সামনের ডান হাতে পদ্ম, বামহাতে শঙ্খ, পেছনের ডানহাতে কারুকার্য খচিত কৌমোদকী গদা এবং বাম হাতে চক্র। বুকের উপর গলার হার থেকে ঝুলন্ত কৌস্তুভমণি, স্কন্ধদেশ থেকে বাহুর পেছন দিয়ে সামনের দিকে জানুদেশ পর্যন্ত প্রলম্বিত ও নিরাবরণ বক্ষদেশে যজ্ঞোপবীত। সামনের উভয় হাতের কনুইয়ের উপরে অঙ্গদ এবং চারহাতের কব্জিতেই একাধিক বলয়ের অলংকার। মূর্তির উপরের অংশে সামান্য অংশ ক্ষুদ্র উত্তরীয় দিয়ে ঢাকা এবং তা ভেজাকাপড়ের মত দেহের সঙ্গে অঙ্গীভূত। কটিদেশ থেকে হাঁটু পর্যন্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রের আচ্ছাদন (ধুতি) এবং সূক্ষ্মতার জন্য ভেজাকাপড়ের মত তা দেহের সঙ্গে অঙ্গীভূত।

খোলা নাভিমূলের নিচ থেকে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার জন্য দণ্ডাকারে নির্মিত পরিধেয় বস্ত্রের মোটা কোঁচা হাঁটু দেশের কিঞ্চিৎ উপর পর্যন্ত প্রলম্বিত। মূর্তির ডানপাশে চামরহাতে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাড়ানো আছে লক্ষ্মী এবং বামপাশে একই ভঙ্গিতে দাঁড়ানো সরস্বতী, বিষ্ণুর দুই স্ত্রী। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পাশে দাঁড়ানো আছে একটি করে অপেক্ষাকৃত ছোট নারীমূর্তি। বিস্বপদ্মের উপর দাড়ানো প্রধান মূর্তির পাদমূলে যে অস্পষ্ট একটি ক্ষুদ্র মূর্তি দেখা যায় তাকে বিষ্ণুর বাহন গরুড় বলে চিহ্নিত করা হয়। এর দুপাশে আছে করজোড়ে অবস্থানরত একটি করে অতি ক্ষুদ্র মূর্তি সম্ভবত এঁরা উভয়েই মূর্তি প্রতিষ্ঠাকারী।

আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, পৃষ্ঠপটের উপরের দিক কিছুটা অর্ধবৃত্তাকার হলেও সর্ব-উর্ধ্বাংশ সুচাল। এই সূচাল অংশের নীচেই রয়েছে মৃদু হাস্যরত সিংহমুখ (কীর্তিমুখ), এর নীচে আছে কিছু অলংকরণ। তাঁর নীচে প্রধান প্রতিমার মাথার পেছনে শিরশত্র। কীর্তিমুখের উভয়পাশে একটি করে উড়ন্ত বিদ্যাধর। ডান পাশের বিদ্যাধরের নীচে বীণাবাদনরত ক্ষুদ্র নারীমূর্তি। উভয় নারীমূর্ত্তির নীচে হাতির পিঠে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো সিংহ বা ঘোড়ার মূর্তি। দু'পাশের এই দুটি প্রাণী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রায় মাথা ঘেঁষে রয়েছে।

বেশির ভাগ মূর্তিরই গড়নের রীতি দেহে রসমাধুর্যের স্পর্শ ও কোমল পেলব, দৃঢ় শক্তিময় ও যৌবনদীপ্ত দেখতে। দেহের নীচের দিকে বিশেষ করে দু'পায়ের নির্মাণে ঋজু অস্তিত্ববাণ, জানুর গড়ন ও মণ্ডনেমার্জিত নৈপুণ্য। দেহের উপরের দিকে মনোরম মাধুর্যময় গড়ন এবং প্রশস্ত ও স্মিত মুখমণ্ডল। কোনও কোনও মূর্তির মুখমণ্ডলে মোঙ্গালীয় প্রভাব রয়েছে।

দিনাজপুর জেলায় আরও এক ধরনের বিষ্ণুমূর্তি দেখা যায় যেমন, ইষৎ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে শায়িত মূর্তির মাথার উপরে ফণা বিস্তার করে আছে, সপ্তবাসুকি। মূর্তির ডান হাতে শঙ্খ ও বামহাতে গদা, পিছনের ডানহাতে পদ্ম ও বাম হাতে গদা। পাদদেশে চামর হাতে শ্রী ও বামদিকে পদসেবারত একটি নারীমূর্তি, নাম পুষ্টি। শায়িত মূর্তির উপরে পৃষ্ঠপটে বিভিন্ন আসনে বসে আছে ৯টি ক্ষুদ্র মূর্তি, এঁরা সবাই চার হাত বিশিষ্ট। শায়িত মূর্তির মাথার উপরে যে সপ্তবাসুকির মূর্তি আছে, তার চক্রের উপরে ললিতাসনে বসে আছে একটি ক্ষুদ্রমূর্তি, নারীমূর্তি বলেই মনে হয়। এই মূর্তির নীচে হাঁটু গেড়ে করজোড়ে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্রমূর্তি, পুরুষ মূর্তি বলেই মনে হয়। এর নীচে ওই রকম ভঙ্গিতে বসে আছে আরও একটি ক্ষুদ্র নারী মূর্তি। এই দুটি মূর্তি মনে হয় মূর্তি প্রতিষ্ঠাকারীদের।

এই ধরনের বিষ্ণুমূর্তির শৈলী দেখলে মনে হয় যেন ছাঁচে ঢালাই করে নির্মিত। আয়ত চোখ, সরু অধর, ওষ্ঠ এবং সজীব চিবুকের রেখা বিশিষ্ট মুখের ভঙ্গি যেন সংবেদনশীল। মূর্তির গড় ও ডৌল কোমল সৌকুমার্য লক্ষ্যণীয়। দশম-একাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের মধ্যে যে সংবেদনশীল মাধুর্য ও দীর্ঘায়ত ক্ষীণদেহে যে সৌষ্ঠব ও কারুকাজ দেখা যায় তা মূর্তিটির মধ্যে প্রতিভাত। প্রধান প্রতিমা ও সপ্তবাসুকির গড়ন ও মণ্ডলে কোমল পেলবতা চোখে পড়ার মত। উল্লেখ্য যে, অনন্ত শয়ানে বিষ্ণুমূর্তির

নিদর্শন বাংলায় খুব কমই দেখা যায়। সপ্তবাসুকি পরিবৃত একটি বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগার মিউজিয়ামে। কৃষ্ণপাথরের অপূর্ব কারুকাজ খচিত এই মূর্তিটি সেন আমলে নির্মিত বলে মনে হয়। মূর্তিটিকে বাসুকি বিষ্ণুর মূর্তি বলা হয়। অনন্ত শয়ানে কালো পাথরের তৈরি একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে দিনাজপুর জেলার কাহারোল থানার অধীনে গড়ন্দরপুর গ্রামে। মূর্তিটি সম্ভবতঃ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর। মূর্তিটি বর্তমানে রয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দিনাজপুর মিউজিয়ামে।[৪৫]

আদি দিনাজপুর জেলার সুরোহর গ্রামে[৪৬] প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তিটি সাতটি নাগফণার নীচে দণ্ডায়মান। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে, শ্রী ও পুষ্টির পরিবর্তে মূর্তিটির দুইপাশে সম্ভবত শঙ্খপুরুষ ও চক্রপুরুষ রয়েছে। মধ্যস্থিত নাগফণার উপরের ভাগে ক্ষুদ্র দ্বিভুজ ধ্যানীমূর্তি এবং পাদপীঠের মধ্যভাগে ষড়ভুজ নৃত্যপরায়ণ শিব। এই মূর্তিটিকে অনেকে মহাযান মতের প্রভাবের ফল বলে মনে করেন। মূর্তিটি বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজসাহীর বরেন্দ্র রিচার্স সেন্টারে রয়েছে। বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে পাওয়া গেছে ত্রিবিক্রম রূপের বিষ্ণুমূর্তি। এই সব মূর্তি মূলত সেন আমলের। মূর্তিগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, বালুরঘাট জেলা গ্রন্থগার মিউজিয়াম, বালুরঘাট মহাবিদ্যালয় মিউজিয়াম, বংশীহারী ব্লক, বালুরঘাট কালেক্টরিয়েট, হরিরামপুর থানা[৪৭] এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার রাতুন গ্রামের রাজভিটা, রায়গঞ্জের অধীনে টেনোহরি, কামারপুকুর, উত্তর দিনাজপুর জেলা জাদুঘর[৪৮] ইত্যাদি জায়গায়।

সূর্যমূর্তি

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে দিনাজপুর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সূর্যপূজার প্রচলন হয়েছিল। এখানকার বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া সূর্যমূর্তিগুলি দেখলেই তা বোঝা যায়। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন উভয়েই নিজেদের 'পরম সৌর' বলে অভিহিত করে গেছেন বিভিন্ন তাম্রশাসনে। গুপ্তযুগের বিশেষত খ্রিস্টীয় ৭ম শতকের দুটি সূর্যমূর্তি পাওয়া গেছে অখণ্ড পশ্চিম দিনাজপুর জেলার তপন ও হরিরামপুর থানায়। মূর্তি দুটি বর্তমানে রয়েছে একটি বংশীহারী ব্লক অফিসে অপরটি তপন থানায়। পাল-সেনযুগের পাওয়া সূর্যমূর্তিগুলির অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল অলংকরণ প্রাচুর্য। গুপ্তযুগের সূর্যমূর্তিগুলিতে যেমন সূর্যের সঙ্গী দেখা যায় পাল-সেন যুগের সূর্যমূর্তিগুলিতে তা দেখা যায় না। গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর সূর্যমূর্তির পায়ে সাধারণত উঁচু বুট জুতোর মত পাদুকা দেখা যায়। মূর্তিগুলি খুবই সাদাসিধা, কারুকার্য নেই বললেই চলে। কিন্তু পাল-সেন যুগের নির্মিত যেসব সূর্যমূর্তি এ জেলায় পাওয়া গেছে সেগুলি সাধারণত সমপদস্থানক ভঙ্গিতে দাঁড়ানো, সূর্যের মস্তকে কারুকার্যময় কিরীট, ত্রিবলী বিশিষ্ট কণ্ঠের নীচে রত্নখচিত মণিহার, বুকে বর্মের আচ্ছাদন, স্কন্ধের উপরে ওঠানো দু'হাতের মৃণালের উপর প্রস্ফুটিত পদ্ম, কটি দেশ থেকে জানু পর্যন্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রের (ধুতি) আবরণ এবং সেই বস্ত্রের প্রলম্বিত ও মোটা কোঁচা লজ্জাস্থানকে

আবৃত করে হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত। কটি দেশ-এ রয়েছে কারুকার্য খচিত কোমরবন্ধ এবং তার দু'পাশ থেকে প্রলম্বিত দুটি কারুকার্যময় ছোরা এবং পদযুগল উঁচু ও অলংকৃত পাদুকা দিয়ে আবৃত।

সূর্যমূর্তিগুলির বিশেষত্ব যে প্রধান প্রতিমার বামপাশে সূর্যের স্ত্রী সুরেণু বা সংজ্ঞার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মূর্তি, তাঁর বামপাশে দণ্ড, দণ্ডী বা দেবসেনাপতি স্কন্দের (কার্তিকেয়) অপেক্ষাকৃত বড় মূর্তি। শেষের মূর্তির ডান হাতে ওঠানো তরবারি, বাম হাতে লাঠি বা ক্বচিৎ পদ্ম। প্রধান প্রতিমার ডান পাশে থাকে সংজ্ঞার মতই একটি ক্ষুদ্র নারীমূর্তি এবং তাঁকে সংজ্ঞার পার্থিব রূপ নিক্ষুভা বা ছায়া বলে ধরা হয়। তাঁর ডানপাশে থাকে দণ্ডীর সমান একটি পুরুষমূর্তি। স্ফীতোদর ও শ্মশ্রুমণ্ডিত এ মূর্তির হাতে থাকে লেখনী ও মস্যাধার। তাঁকে পিঙ্গলা, অগ্নি বা বিধাতা বলে পরিচিত করা হয়। এই চারটি মূর্তির প্রত্যেকের পদযুগলই সূর্যের মত উঁচু ও অলঙ্কৃত পাদুকা দ্বারা আবৃত। দণ্ডীর বামপাশে ও বিধাতার ডানপাশে থাকে যথাক্রমে ঊষা ও প্রত্যূষা নামে অভিহিত ও শরনিক্ষেপরত দুটি ক্ষুদ্র নারীমূর্তি। তাঁদের পদযুগলে সূর্যের মত পাদুকা থাকে না। শর নিক্ষেপ করে তারা অন্ধকারকে দূর করেন। তাছাড়া প্রধান প্রতিমার পদযুগলের সামনে একটি ক্ষুদ্র নারীমূর্তি দেখা যায়, তিনি সূর্যের তৃতীয় স্ত্রী ঊষা। এঁর সামনেই থাকে সূর্যের রথ চালক অরুণের ক্ষুদ্র মূর্তি। তাঁর হাতে যে লাগাম থাকে তা হচ্ছে নাগ। অরুণের নিচেই এক চক্র বিশিষ্ট ও সপ্তাশ্ব পরিচালিত রথ। সূর্যমূর্তির পৃষ্ঠপটের সর্বোচ্চ অংশে থাকে কীর্তিমুখ। এর নীচে দুপাশে বিদ্যাধরের প্রতিকৃতিসহ বিভিন্ন অলংকরণ। আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া মোট ১১টি সূর্যমূর্তি বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধীনে দিনাজপুর জেলা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।[৪৯] উল্লেখ্য যে, উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার অধীনে বিন্দোলের ভৈরবী মন্দিরের ভেতরে ভগ্নদশায় যে কালোপাথরের খোদিত মূর্তিটি রয়েছে, এই মূর্তিটি আসলে সূর্যমূর্তি বলে মনে হয়। মূর্তিটি সম্ভবত দশম-একাদশ শতাব্দীর নির্মিত।

শৈবমূর্তি

দিনাজপুর জেলায় শিব সাধারণত লিঙ্গরূপেই পূজিত হতেন। মূলত দুই শ্রেণির লিঙ্গ এখানে সুপরিচিত। চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির মত, আরেক প্রকার লিঙ্গ হল, লিঙ্গের উপর শিবের মুখ খোদিত মুখলিঙ্গ। মুখলিঙ্গ আবার দুইরকমের, একমুখ এবং চতুর্মুখ। দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে একমুখ লিঙ্গই বেশি পাওয়া যায়। বাংলায় শিবের মূর্তি নানানরূপে কল্পিত হয়েছে। যেমন চন্দ্রশেখর, নটরাজ, সদাশিব, উমা-মহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর ও কল্যাণ সুন্দর। শিবের উমা-মহেশ্বর আলিঙ্গন মূর্তির সংখ্যাই এখানে বেশি দেখা যায়। শিব-পার্বতীর দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত এ ধরনের প্রত্যেকটি মূর্তিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অন্তরঙ্গ ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সৃষ্টিই এ সব প্রতিমার বিশেষত্ব। এই ধরনের মূর্তিতে শিবকে ললিতাসনে বসানো দেখা যায়, তাঁর প্রসারিত ডান পায়ের নীচে থাকে পদ্ম বা নন্দী। শিবের বাম উরুতে ললিতাসনে বসানো উমার প্রসারিত

বাম পায়ের নিচে থাকে পদ্ম বা দেবীর বাহন সিংহ। *মৎস্যপুরাণ* মতে, উমা-মহেশ্বর আলিঙ্গন মূর্তিতে শিবের চার হাত অথবা দুই হাত এবং উমা দুই হাত বিশিষ্ট থাকেন। চার হাত বিশিষ্ট শিব মূর্তির পেছনের ডান হাতে থাকে শূল, সামনের ডান হাতে পদ্ম, সামনের বাম হাতে উমার বাম বা উভয় স্তন ধরা থাকে এবং উমার ডান হাতে শিবের কাঁধে ও বাম হাতে পদ্ম বা দর্পণ থাকে। দিনাজপুরে পাওয়া বেশির ভাগ উমা-মহেশ্বর মূর্তিতে শিবের পিছনের ডান হাতে নাগপাশ, ত্রিশূল, কুঠার, পদ্ম, অক্ষমালা বা পুষ্পগুচ্ছ, সামনের ডান হাতে পদ্ম, তরবারি বা শর থাকে, কোথাও সেই হাত দিয়ে দেবীর চিবুক ধরা থাকে এবং পিছনের বাম হাতে ত্রিশূল, নরমুণ্ড, হরিণ, শূল বা অগ্নি থাকে। কিন্তু সামনের বাম হাত দিয়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেবীর বাম বা উভয় স্তন ধরা থাকে। দেবী মূর্তির ডান হাতে থাকে সাধারণত শিবের ডান কাঁধ, বাম কাঁধ বা বাম উরু ধরা থাকে এবং বাম হাতে পদ্ম বা দর্পণ থাকে । এই মূর্তির কোনও কোনটিতে তাঁদের দুই দাসী জয়া ও বিজয়া এবং তাঁদের দুই পুত্র কার্তিক ও গণেশের মূর্তি এবং অন্যান্য অলংকরণ দেখা যায়। এইরকম অতিসুন্দর কারুকাজমণ্ডিত উমা-মহেশ্বরের একটি মূর্তি বালুরঘাট ট্রেজারিতে রয়েছে।[৫৩] মূর্তিটি সেন যুগে নির্মিত। অপর একটি মূর্তি রয়েছে রায়গঞ্জ থানার অধীনে সোনাপুর গ্রামে। শিবের পুত্র গণেশের বহু সংখ্যক মূর্তি দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এইসব মূর্তির মধ্যে বসানো গণেশ, দাঁড়ানো গণেশ এবং নৃত্যরত গণেশের এই তিন প্রকার মূর্তিই পরিকল্পিত হয়েছে। শিবের বাহনরূপে বিভিন্ন আকারের কালোপাথরে নির্মিত নন্দী বা বৃষমূর্তি দেখা যায়। বৃষমূর্তিগুলির বিশেষত্ব হল, তিনি পায়ের উপর ভররত ও সামনের ডানপা কিঞ্চিৎ উঠানো অবস্থায় রয়েছে। বৃষমূর্তির গলদেশে শিকল, ঘুঙুর ও ছোট ঘণ্টার মালার অলংকরণ, গলদেশের নিচে সেই মালা থেকে প্রলম্বিত প্রকাণ্ড আকারের ঘণ্টা ভূমি স্পর্শ করে আছে। মূর্তির মুখমণ্ডলে সুন্দর অলংকরণ আছে। পিঠের উপর থেকে পেট পর্যন্ত কারুকার্যময় বস্ত্রের অলংকরণ রয়েছে। এই রকম একটি মূর্তি রয়েছে বর্তমান বাণগড়ে ইতালিয় মিশনের চত্বরে। তাছাড়া এখান থেকেই পাওয়া যায় তৃতীয় গোপালের লিপিযুক্ত সদাশিব মূর্তি।

শক্তিমূর্তি

দিনাজপুরে বিভিন্ন শ্রেণির দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে চতুর্ভুজা দেবীমূর্তিই সচরাচর দেখা যায়। কেউ কেউ এই মূর্তিগুলিকে চণ্ডী অথবা গৌরী-পার্ব্বতী নামে অভিহিত করে থাকেন। আবার দেবী অষ্টভুজা ও সিংহবাহিনী এবং তাঁর হাতে শঙ্খ, তীর, অসি, চক্র, ঢাল, ত্রিশূল, ঘণ্টা ও ধনু রয়েছে, এরকমও মূর্তি দেখা যায়। দিনাজপুর জেলার বেংনা গ্রামে ৩২টি হাত বিশিষ্টা অসুরের সঙ্গে যুদ্ধরতা দেবীমূর্তিও পাওয়া গেছে। কুশমণ্ডি থানার অদূরে জোড়দিঘি গ্রামে মহিষ-মর্দিনীর মূর্তি পাওয়া গেছে। মাতৃকা মূর্তি মূলত দেবতাদের শক্তিরূপে কল্পিত। দিনাজপুর জেলায় উৎকীর্ণ এইসব মাতৃকা মূর্তির মধ্যে পাওয়া গেছে যথাক্রমে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী,

বৈষ্ণবী, বারাহী ও চামুণ্ডা। বারাহীর একটি দুর্লভ মূর্তি বালুরঘাট জেলা গ্রন্থগারে রয়েছে। মূর্তিটি সেনযুগে নির্মিত। এইরকম আরও একটি মূর্তি রয়েছে হরিরামপুর থানায়। সপ্তমাতৃকা মূর্তির মধ্যে চামুণ্ডা মূর্তি অন্যতম। এর বৈশিষ্ট্য হল চক্ষু কুটরাগত, মাংসহীন মুখ, ত্রিনয়ন, মাংসহীন দেহ অস্থিসার, উর্ধ্বকেশ, ক্ষীণউদর, ব্যাঘ্র চর্ম পরিহিতা, বাম হাতে রয়েছে নরকপাল ও পট্টীশ, দক্ষিণ হাতে রয়েছে কর্তারি (কাটারি, খাড়া) ও শূল, শবারূঢ়া এবং অস্থি নির্মিত অলঙ্কার পরিহিতা।[৫১] দিনাজপুর (বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্র) থেকে পাওয়া এইরকম একটি চামুণ্ডা মূর্তি রয়েছে মালদহ মিউজিয়ামে। মূর্তিটি একাদশ শতকের।[৫২] তাছাড়া, দিনাজপুর মিউজিয়ামে কালপাথরে তৈরি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর ৬টি চামুণ্ডা মূর্ত্তি রয়েছে।

পাল-সেন যুগে এখানে মনসা পূজা নতুন করে উদ্দীপনা লাভ করে। দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দশম-একাদশ শতাব্দীর যে মনসা মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে সেগুলির লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল দেবী ললিতাসনে বিশ্বপদ্মের উপর উপবিষ্টা দু'হাত বিশিষ্টা। মূর্তির মাথার উপরে রয়েছে সপ্তবাসুকি, তাঁরা পূর্ণ ফণা বিস্তার করে আছে এবং অষ্টম বাসুকি দেবীর বাম হাতে ধরা আছে এবং সেই হাত দেবীর বাম পা স্পর্শ করে আছে। ডান হাতটি বরদ মুদ্রায় নিচের দিকে প্রসারিত হয়ে ডান পায়ের জানুদেশে ন্যস্ত। মূর্তির মাথায় জটা মুকুট, কানের কুণ্ডল দুটি কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত। মূর্তির উপরের দিকে প্রায় অর্ধবৃত্তাকার, পৃষ্ঠপটের উপরিভাগ কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মাগ্র। প্রধান প্রতিমার দু'পাশে আছে দুটি ক্ষুদ্র মূর্তি। মূর্তির ডান দিকে রয়েছে জরতকারু মুনির কঙ্কালসার মূর্তি ও বাম দিকে রয়েছে অস্তিক মুনি। বেলে পাথর অথবা কালো পাথরের তৈরি এই মূর্তিগুলি সূক্ষ্ম কারুকার্যময় এবং উন্নত মানের শিল্পশৈলী। সুগঠিত বক্ষদেশের উপর পুরুষ্টু স্তন যুগল, ক্ষীণ কটিদেশ, প্রশস্ত মেখলা। কলাকৃতির গড়ন ও মণ্ডন দেখে মনে হয় এইসব মূর্তি প্রথম পালযুগের অথবা নবম শতাব্দীর। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বৈরাট্টা থেকে পাওয়া এই রকম দুটি মনসা মূর্তি বর্তমানে উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মিউজিয়ামে রয়েছে।[৫৩] এ জেলার অন্যান্য দুর্লভ ও মূল্যবান মূর্তিগুলির মধ্যে যমুনা, অর্ধনারীশ্বর, তারা, ব্রহ্মা, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জৈন ও বৌদ্ধমূর্তি

দিনাজপুর অঞ্চলে জৈনমূর্তি খুব কম পাওয়া গিয়েছে। বাংলায় যদিও খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত জৈনধর্মের যথেষ্ট প্রভাব দেখা গেলেও এখানে সপ্তম শতাব্দীর আগে কোনও জৈনমূর্তি পাওয়া গেছে বলে আমার জানা নেই। দিনাজপুর জেলায় তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ ও পার্শ্বনাথের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এই মূর্তিগুলি কালোপাথরের তৈরি দশম-একাদশ শতাব্দীর বলে মনে হয়। মূর্তিগুলির লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল, বিশ্বপদ্মের উপর কায়োৎসর্গ অর্থাৎ দু'পায়ের উপর সমান ভর দিয়ে দাঁড়ানো। মূর্তির হাত দুটি সামান্য বাঁকানো ভাবে জানুদেশ পর্যন্ত প্রায় স্পর্শরত। প্রতিমার মাথায় জটামুকুট ও কর্ণদ্বয় নিচের দিকে প্রলম্বিত। মস্তক দেশের

উপরে শিরশ্চক্রের পরিবর্তে আছে পূর্ণফলাবিশিষ্ট সপ্তবাসুকি। সপ্তবাসুকির উভয়পাশে একটি করে উড়ন্ত বিদ্যাধর মূর্তি ও আনুষঙ্গিক মেঘের প্রতিকৃতি। সপ্তবাসুকির উপরে আছে ক্রমহ্রস্বায়মান বলয়রেখার মাধ্যমে রচিত ভদ্রমন্দিরের চন্দ্রতাপের মত অলংকরণের প্রান্তদেশ থেকে উৎসারিত পদ্মফুলের অলংকরণ। প্রতিমার ডানপাশের বিদ্যাধরের নীচে বাহনসহ ৮টি ক্ষুদ্র মূর্তি এবং বামদিকের বিদ্যাধরের নীচে বামনসহ ৭টি ক্ষুদ্র মূর্তি। দু'পাশের এই মূর্তিগুলি প্রায় সব কটিই যুদ্ধরত ভঙ্গিতে রচিত। এগুলির নীচে ও মূল প্রতিমার জানুদেশ বরাবর ডানপাশে চামর হাতে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়ানো অপেক্ষাকৃত বড় পুরুষমূর্তি এবং এর বাম পাশে করজোড়ে দাঁড়ানো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুরুষমূর্তি এবং এর ডানপাশে একই ভঙ্গিতে ও বীণাহাতে দাঁড়ানো অপেক্ষাকত ক্ষুদ্র ও কিছুটা অস্পষ্ট নারীমূর্তি। বামপাশে চামর হাতে ও ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়ানো পুরুষমূর্তি এবং এর বেশ কিছু উপরে চামরধারী পুরুষমূর্তির কাঁধ ও মাথা বরাবর দাঁড়ানো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুরুষমূর্তি। চামরধারী উভয়মূর্তির মাথায় করণ্ড মুকুট। বিশেষ করে মূর্তির সপ্তরথ পাদমূলের মধ্যভাগে উৎকীর্ণ ললিতাসনে উপবিষ্টা অষ্টভূজা ক্ষুদ্র নারীমূর্তি এবং এর দু'পাশে প্রায় নৃত্যের ভঙ্গিতে রচিত ১টি করে ক্ষুদ্র নারীমূর্তি। এদের পাশে আছে উভয়দিকে আরও ১টি করে ক্ষুদ্র মূর্তি। পাদমূলের সর্ব নিম্নাংশে একটু বাঁকান ভাবে একসারিতে দাঁড়ানো ১০টি অতি ক্ষুদ্র নারীমূর্তি।

মূর্তিগুলির শিল্পশৈলী খুবই উন্নত মানের। মূল প্রতিমার প্রশস্ত বুক ও স্কন্ধদেশ, ক্ষীণ কটিদেশ ও বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুদৃঢ় গঠন শক্তিগর্ভ দেহে প্রাণপ্রাচুর্যের পরিচায়ক। পদযুগলের গঠনে কিছুটা ঋজুতা লক্ষণীয়। মূর্তিটির জানুদুটির উপরাংশে তুলনায় হাঁটু ও হাঁটুর নীচের গড়ন সরু নয়, কিছুটা স্তম্ভের মত দেখতে। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত সুরোহর গ্রামে তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের একটি অপূর্ব মূর্তি পাওয়া গেছে। আরও একটি মূর্তি পাওয়া গেছে দিনাজপুর জেলার অধীনে কাহারোল থানার অন্তর্গত ভেলোয়া গ্রাম থেকে। তীথঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তিটি পাওয়া যায় দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার একটি গ্রাম থেকে। মূর্তিগুলি রয়েছে বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজসাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সেন্টারে (ঋষভনাথ) ও দিনাজপুর জেলা মিউজিয়ামে।[৫৪] দিনাজপুর জেলায় অসংখ্য ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হলেও এখানে আবিষ্কৃত বৌদ্ধমূর্তির সংখ্যা খুবই কম। পালরাজাদের চারশো বছরেরও অধিককাল ধরে রাজত্বকালে এখানে কত বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ ও মন্দিরাদি যে নির্মিত হয়েছিল তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন, অথচ, সেই তুলনায় বৌদ্ধমূর্তির আবিষ্কারের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। মহাযান ও বজ্রযান সম্প্রদায় যে পালযুগে বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল এবং এই দুই মতের অনুযায়ী বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিই তার সাক্ষ্য রেখে গেছে। এঁদের মধ্যে ধ্যানীবুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর, প্রজ্ঞা পারমিতা, মঞ্জুশ্রী নামে দুই বোধিসত্ত্ব জম্ভল, হেরুক, তারা মূর্তি, এগুলি উল্লেখযোগ্য। অবলোকিতেশ্বরের একটি মূর্তি মালদা থেকে এবং প্রজ্ঞাপারমিতার একটি মূর্তি গাজোল থেকে পাওয়া গেছে। মূর্তিগুলি মালদহ মিউজিয়ামে রয়েছে। সম্প্রতি কুশমণ্ডি থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে শ্যামতারা মূর্তি। মূর্তিটি কুশমণ্ডি থানায় সংরক্ষিত রয়েছে।[৫৫]

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. আত্রাই নদী, *দধীচি*, উত্তরাধিকার বালুরঘাট সংখ্যা, পৃ. ৫-৭।
২. জল ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, লোক সংস্কৃতি গবেষণা, পৃ. ১৯১।
৩. উত্তরীয় দেশ ঃ পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রগুলিতে উত্তরবঙ্গকে উত্তরীয় দেশ নামেই অভিহিত করা হত।
৪. N.L. Dey, *The Geographical Dictionary of Ancient Medieval India*, New Delhi, p.26.
৫. ফুলবাড়ি ঃ বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দিনাজপুর জেলার অধীন ফুলবাড়ি অবস্থিত।
৬. প্রভাসচন্দ্র সেন, *বগুড়ার ইতিহাস*, পৃ. ১৯০।
৭. খারট পাড়া ঃ অনেকের মতে, বর্তমান বৃহত্তর রাজশাহী ও পাবনা জেলা নিয়ে গঠিত।
৮. হীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, *দিনাজপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৩৭।
৯. *মধুপর্ণী*, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, পৃ. ২৩-৩১।
১০. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রাচীনযুগ), পৃ. ২৩।
১১. কর্ণসুবর্ণ ঃ বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রাঙ্গামাটি নামক স্থানে।
১২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।
১৩. খালিমপুর ঃ মালদা জেলার অধীনে খালিমপুর গ্রাম।
১৪. সোমপুর মহাবিহার ঃ বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধীনে জয়পুর হাট জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক স্থানে।
১৫. বিক্রমশীল মহাবিহার ঃ বিহার রাজ্যের অধীনে ভাগলপুরের নিকট।
১৬. কুর্দ্দালখাতক ঃ কেউ কেউ মালদা জেলার উত্তর অঞ্চলের বরিন্দ্ এলাকা বলেছেন; দ্রষ্টব্যঃ কমল বসাক, *ভ্রমণে ও দর্শনে মালদহ*, পৃ. ১১০।
১৭. এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যের হদিশ পাওয়া যায় কমল বসাক রচিত, প্রাগুক্ত গ্রন্থে, পৃ. ১০৯-১১২।
১৮. মহেন্দ্রপালদেবের তাম্রশাসনটি বর্তমানে মালদহ মিউজিয়ামে রয়েছে।
১৯. রমাপ্রসাদ চন্দ, *গৌড় রাজমালা*, পৃ. ৪৪।
২০. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
২১. বেলওয়া ঃ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধীনে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত হিলি রেল স্টেশন এবং ঘোড়াঘাটের মধ্যস্থলে অবস্থিত।
২২. *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. 42, W.W. Hunter, p. 77-88.
২৩. ধামইরথানা ঃ বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধীনে।
২৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
২৫. দিবর ঃ স্থানটি বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধীনে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত। বর্তমানে দিবর দিঘি জঙ্গলে ভর্তি এবং তার চারদিকে ধানক্ষেত।
২৬. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *গৌড় লেখমালা*, পৃ. ১২৭-৪৬।
২৭. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদি পর্ব), পৃ. ৩০২।
২৮. মদনাবতী ঃ স্থানটি বর্তমানে মালদহ জেলার বামনগোলা থানার অধীনে।

২৯. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 'Muhammad Bakhtyar's Expedition to Tibet', *Indian History Quarterly*, Vol. IX, 1993, p. 49.
৩০. প্রণব সরকার সম্পাদিত, *লোক*, নভেম্বর ২০০২। সোনারপুর, কলকাতা-৫০।
৩১. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩।
৩২. সমজিয়া : বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানার অধীনে।
৩৩. গোরকুই : বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত গোরকুই গ্রাম।
৩৪. ১৯৯৭ সালে দেখা। রচনাকার।
৩৫. যোগীর ভবন : বর্তমানে নঁওগা জেলার অধীনে ধামইর থানার অন্তর্গত বাদাল স্তম্ভ লেখের ৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যমুনা নদীর তীরে।
৩৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।
৩৭. দীনেশচন্দ্র সরকার, *পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত*, পৃ. ৬৮।
৩৮. সুরোহর গ্রাম : বর্তমানে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার অধীনে।
৩৯. *দৈনিক বসুমতী পত্রিকা*, শিলিগুড়ি সংস্করণ, ৯ জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৩।
৪০. রজনীকান্ত চক্রবর্তী, *গৌড়ের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩।
৪১. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১০।
৪২. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *দিনাজপুর মিউজিয়াম* (১৯৮৯), এই গ্রন্থে মূর্তিটির বিশদ বিবরণ রয়েছে। উৎসাহীরা দেখে নিতে পারেন, পৃ. ৫৯-৬০।
৪৩. সুরোহর গ্রাম : বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার অধীনে ইটাহার থানার অন্তর্গত।
৪৪. *Archaeological Assets of Dakshin Dinajpur* , Office of the District Magistrate, Balurghat, Compiled by D.C. Sarker IAS, p. 9, 10, 11.
৪৫. ৮ম উত্তর দিনাজপুর জেলা বই মেলা, ২৮ ডিসেম্বর ২০০২।
৪৬. ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে দেখা। রচনাকার।
৪৭. *Archaeological Assets of Dakshin Dinajpur,* Office of the District Magistrate, Balurghat (July 1994).
৪৮. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী,* তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৮
৪৯. *Art in Stone : A catalogue of sculptures in Malda Museum*, p. 30.
৫০. Akshaya Kumer Maitreya Museum (*Catalogue,* part - 1), University of North-Bengal (1981), p. 8.
৫১. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১১৭।
৫২. *Archaeological Assets of Dakshin Dinajpur,* Office of the District Magistrate, Balurghat (July 1994).
৫৩. Akshaya Kumer Maitreya Museum (*Catalogue*, Part-I). University of North Bengal (1981), p. 8.
৫৪. *Archaeological Assets of Dakshin Dinajpur,* Office of the District Magistrate, Balurghat (July 1994).
৫৫. *Archaeological Assets of Dakshin Dinajpur,* Office of the District Magistrate, Balurghat (July 1994).

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্পকর্ম

১. গৃহ নির্মাণ শিল্প

প্রাচীন বাংলার আদি দিনাজপুর অঞ্চলে স্থাপত্য শিল্প যে কত উন্নত ছিল তা বাণগড় স্তুপের বিভিন্ন স্তরে, শুঙ্গ, কুষাণ, বর্ধণ, গুপ্ত, পালযুগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দালানকোঠার নিদর্শন থেকে জানা যায়। বাণগড় খননের দ্বিতীয় স্তরে প্রস্তর কর্মের প্রমাণ পাওয়া গেছে; প্রস্তর শিল্পে বিলাসী কারুকাজ শোভিত শিল্প প্রক্রিয়ার সন্ধান সেকালে প্রস্তর স্তম্ভ ও থামের ভিত্তির উপর বড় আকারের হল ঘর নির্মাণের প্রযুক্তি থেকে পাওয়া যায়। বাণগড় স্থাপত্য পদ্ধতির সে এক অতুলনীয় কীর্তি। সে যুগে দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচিত্র কারুকলা খচিত প্রাসাদ, মন্দির, স্তুপ ও বিহার যে নির্মিত হয়েছিল তার ধ্বংসাবশেষগুলি দেখলেই বোঝা যায়। প্রাচীন প্রশস্তিকারেরা বাণগড়ে নির্মিত একটি বিশাল গগনস্পর্শী মন্দিরকে 'ভূ-ভূষণ', 'কুল-পর্বত-সদৃশ' বলে উল্লেখ করে গেছেন। আজ সবই ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে, কিন্তু এখনও কালের তাণ্ডব সহ্য করে শুধুমাত্র তার শেষ চিহ্নটিকে ধরে রেখেছে চারটি নকশাদার গ্রেনাইট প্রস্তর নির্মিত ৬ ফুট উচ্চ গোলাকার ও ৪ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট স্তম্ভ। দিনাজপুরের লোককবি সন্ধ্যাকর নন্দী দ্বাদশ শতাব্দীতে বরেন্দ্রভূমিতে যে 'প্রাংশু প্রাসাদ', কাঞ্চন খচিত মন্দির, মহাবিহার দেখেছিলেন তা সবই কালগর্ভে বিলীন হয়েছে। গৃহনির্মাণ শিল্পের সেই কীর্তি আছে, তার নিদর্শন আজ আর নেই। দীর্ঘকাল ধরে উষ্ণ ও জলীয় বায়ু, বন্যা, নদী প্লাবণ, রাক্ষুসী পরিপূর্ণ জঙ্গল সেই শিল্প সমৃদ্ধিকে বিশাল বিশাল ধ্বংসস্তুপের অন্ধকারে নিভৃতে আজ ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।

বাণগড় উৎখননের ফলে স্থাপত্য কাজে ব্যবহৃত প্রচুর শিলাখণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেছে। বাণগড় ধ্বংসাবশেষের বিস্তৃত এলাকায় আজও দেখা যায় অগণিত ছোট বড় মাপের কঠিন শিলা সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, মাটির নিচেও প্রথিত অবস্থায় রয়েছে। এত শিলাখণ্ড যে তার সীমাসংখ্যা নেই। এমনকি রানিশংকৈল থানার অধীনে গোরকই গ্রামে পাথর নির্মিত স্তুপেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।[১] স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে বাণগড় গৃহনির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত এত অসংখ্য প্রস্তরের জোগান হয়েছিল কোথা থেকে? দিনাজপুর জেলায় অসংখ্য সৌধ, প্রাসাদ, মন্দির, সড়ক, সেতু ও মূর্তি শিল্পে বিভিন্ন ধরনের ছোট, বড়, মাঝারি এবং বৃহৎ পাথর, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

কেউ কেউ বলেন, তার বেশির ভাগই নাকি বাণগড় স্তূপ থেকে সংগ্রহ করা। স্থাপত্য আদর্শে নির্মিত অসংখ্য অট্টালিকারাশির ছোট বড় সাইজ করা এত অসংখ্য কঠিন শিলাখণ্ড এল কোথা থেকে? রাজমহল, বিন্ধ্যা অঞ্চল? তা কি আমদানি করা? বাংলায় কোনও প্রস্তর উৎপন্ন হয় না বলে তার সব পাথরই কি আমদানি করা হয়েছিল রাজমহল পাহাড়, বিন্ধ্যাচল পর্বত অথবা রাজস্থান থেকে? এত বিশাল বিশাল পাথর, উঁচু উঁচু স্তম্ভ প্রস্তর আমদানি করে এদেশে আনা সেইসময় অসম্ভব ছিল বলে মনে হয়। আদি দিনাজপুর জেলাতেই উন্নত প্রযুক্তির কৌশলে কঠিন শিলাখনি সেকালে নির্মিত হয়েছিল। আদি দিনাজপুরের পার্ব্বতীপুর ও জয়পুর হাটে সেই কঠিন শিলাখনির অস্তিত্ব ছিল, সম্প্রতি আধুনিক প্রযুক্তির দৌলতে আবিষ্কৃত হয়েছে সাবেক সেই শিলাখণ্ড খনির অস্তিত্ব। ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে, পার্ব্বতীপুরের মধ্যপাড়ার পুরামাটির গভীরতম গহ্বরে সঞ্চিত কঠিন শিলাখণ্ডের জন্মপ্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল প্রায় পাঁচ-ছয় লক্ষ বছর আগে। এর থেকে বলা যায় সেই যুগে বাংলায় প্রস্তর উৎপন্ন হত। বাংলায় প্রস্তর উৎপন্ন হয় না এই রকম ধারণা পুরোপুরি সত্যি নয় বলেই মনে করি। এই প্রস্তরভাণ্ডার হিমালয়ের মৌলিক অস্তিত্বের সঙ্গে সংযুক্ত। দিনাজপুর জেলার মাটিতে প্রস্তর গড়নের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াও জড়িত ছিল হিমালয় পর্বতের সঙ্গে। সাম্প্রতিক গবেষণায় এই বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা জানা যায়। এ নিয়ে গবেষণার নতুন দিগন্তও উন্মোচন করা যায়।

২. স্তূপ

বৌদ্ধস্তূপই ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন। ভগবান বুদ্ধের অস্থি বা ব্যবহৃত বস্তু রক্ষার জন্যই প্রথমে স্তূপের পরিকল্পনা হয়েছিল। পরে বিশেষ ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করার জন্য যে যে স্থানে তা ঘটেছিল সেখানে স্তূপ নির্মাণ করত। বৌদ্ধদের মধ্যেই স্তূপ বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করেছিল। বৌদ্ধরা স্তূপকে পবিত্র মন্দিরের মত জ্ঞান করত, স্তূপকে পূজা-অর্চনা করত, স্তূপ নির্মাণ করে তা উৎসর্গ করা অতি পুণ্যবান কাজ বলে মনে করতেন। বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দিনাজপুর জেলাতেও ছোট বড় অসংখ্য স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। স্তূপের তিনটি অংশ, এই তিন অংশের নাম মেধি, অন্ড ও ছত্রাবলী। প্রাচীন স্তূপ নির্মাণ কৌশলে দেখতে পাওয়া যায় অনুচ্চ গোলাকৃতি, অধোভাগের উপর গম্বুজাকৃতি, মধ্যম অথবা প্রধান অংশ এমনভাবে তৈরি হত যে যাতে অধোভাগের কতকটা স্থান মুক্ত থাকে এবং এর উপর দিয়ে গম্বুজের চারদিকে ঘুরে আসা যায়। এই উন্মুক্ত অংশ সেবকদের প্রদক্ষিণ পথস্বরূপ ব্যবহৃত হত। গম্বুজের উপরে রয়েছে প্রথমত চতুষ্কোণ হর্মিকা ও তার উপর একটি গোলাকৃতি চাকা থাকত। পরবর্তী সময়ে এই আকৃতি ক্রমশই দীর্ঘাকার হতে থাকে। এর অধোভাগ অনেকটা পিপার আকার ধারণ করে এবং মধ্যভাগের অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজও ক্রমশ দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়। উপরের গোল চাকার সংখ্যাও বেড়ে যায় এবং পর পর ছোট হতে হতে শেষ চাকাটি প্রায় বিন্দুতে পরিণত হয়। হিউয়েন সাং লিখেছেন পুণ্ড্রবর্ধনের যে স্থানে গৌতমবুদ্ধ ধর্মোপদেশ দান করেছিলেন, সেই স্থানে মৌর্য সম্রাট অশোক নির্মিত

স্তূপগুলি তিনি দেখেছিলেন। হিউয়েন সাং-এর সময়কার কোন স্তূপের ধ্বংসাবশেষও এখনও পর্যন্ত বাংলায় আবিষ্কৃত হয়নি। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, বাংলায় যে সব স্তূপ দেখা যায় তা সাধারণত ক্ষুদ্র আকৃতি। পুণ্য অর্জনের জন্য দরিদ্র ভক্তরা এগুলি তৈরি করত। আদি দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেন যে, উত্তরপূর্ব ভারতে সবচেয়ে বেশি স্তূপের সংখ্যা দিনাজপুর-মালদা জেলাতেই রয়েছে। অখণ্ড পশ্চিম দিনাজপুর জেলার যে সব স্থানে স্তূপের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে সেগুলি হল, কুশমন্ডি থানার অধীনে দেহাবন্দ স্তূপ, ইটাহার থানার অন্তর্গত জগদলা স্তূপ, ভদ্রশীলা স্তূপ, কালিয়াগঞ্জ থানার অধীনে উদ্গ্রাম স্তূপ, বংশীহারী থানার অন্তর্গত কুমারদিঘি স্তূপ, গঙ্গারামপুর থানার অধীনে উষাগড় স্তূপ, ধলদিঘি স্তূপ, তপন থানার অন্তর্গত দ্বীপখণ্ড স্তূপ, কুমারগঞ্জ থানার অধীনে দেবগ্রাম স্তূপ এবং বালুরঘাট থানার অন্তর্গত নাজিরপুর স্তূপের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। স্তূপগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়ে গেছে, স্তূপের চারপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে অজস্র পুরাতন ইটের টুকরো, মৃৎপাত্রের টুকরো ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড। বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দিনাজপুর অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গাতেও স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে তেঁতুলিয়া শালবাহন স্তূপ, নেকমর্দান স্তূপ, বোচাগঞ্জ সতিমণ ডাঙ্গি স্তূপ, বীরগঞ্জ ঝলঝালির স্তূপ, খানসামা গোয়ালডিহি স্তূপ, পার্ব্বতীপুর হীরা বেশ্যার স্তূপ, বদরগঞ্জ পাঁচপুকুরিয়া স্তূপ, বিরাম পুর বিবিরধাপ স্তূপ, সীতাকোট স্তূপ, নওয়াবগঞ্জ তর্পণঘাট স্তূপ, চক দরিয়া স্তূপ এবং ঘোড়াঘাট থানার অধীনে পাল্লরাজ ও টঙ্গীশহর স্তূপের ধ্বংসাবশেষ উল্লেখযোগ্য।[২]

৩. বৌদ্ধ বিহার

বঙ্গদেশে বৌদ্ধভিক্ষুদের বসবাসের জন্য অনেক বিহার ছিল। সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই দিনাজপুর অঞ্চলে যে বৌদ্ধভিক্ষুদের বাসের জন্য বিহার নির্মিত হয়েছিল তা এই জেলায় বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় এই শ্রেণির স্থাপত্যের সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা সম্ভবপর হয়েছে। আদি দিনাজপুর জেলার মাটিতেই রয়ে গেছে ইতিহাসের জগদ্দল মহাবিহার, চীনামঠ মহাবিহার, দেবকোট মহাবিহার ও সীতাকোট মহাবিহার। পরবর্তী সময়ে আরও কিছু বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে যদিও তার উল্লেখ ইতিহাসে নেই, কিন্তু আকারে-আয়তনে ও প্রত্ন নিদর্শনে এগুলি যে প্রাচীন বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধজ্ঞান কেন্দ্র ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধীনে পতিরাজ-দেহাবন্দ মহাবিহার। এই স্থানটিতে খনন কাজ হলে মন্দির, কূপ, স্নানাগার, রন্ধনশালা, ভোজনালয়, স্তম্ভযুক্ত প্রশস্ত দালান, ভিক্ষুদের বাসের জন্য ছোট ছোট ঘর সমস্তই পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস। ইতিমধ্যে এক শ্রেণির অসাধুমানুষ পতিরাজ-দেহাবন্দ স্তূপের প্রচুর ইট খননের মাধ্যমে বের করে লোপাট করছে। তাতে সেখানে প্রাচীন বিহারের স্তম্ভযুক্ত প্রশস্ত দালান, মন্দির, স্নানাগার, রন্ধনশালা, ভোজনালয় এই সবের কাঠামো দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন শিলাস্তম্ভ, মূর্তি, মুদ্রা,

পোড়া মাটির বুদ্ধমূর্তি, ইত্যাদি এখান থেকে আবিষ্কৃত হচ্ছে। পতিরাজ-দেহাবন্দ বিহারের বিশালত্ব ও সৌন্দর্য মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। এর খননকাজ বিশেষ প্রয়োজন। বিশ্বাস যে, খননের ফলে এর সমস্ত ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাচীন বাংলার বিহার সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তথ্য আমরা জানতে পারব।

দিনাজপুর জেলায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের উল্লেখযোগ্য মহাবিহারটির নাম ছিল সীতাকোট মহাবিহার। আগের একটি পর্বে এই বিহারটি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। চতুষ্কোণিক এই বিহারটির চারদিক ঘিরে ছিল ভেতরমুখী দুয়ার বিশিষ্ট কক্ষগুলি। ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের বসবাসের জন্য তৈরি এসব বাসগৃহের টানাটানা বারান্দা ছিল। পাল রাজত্বের শেষ অংকে বরেন্দ্রীতে বৌদ্ধধর্মের গৌরব ও প্রাধান্য যে অক্ষুণ্ণ ছিল সীতাকোট মহাবিহার তা প্রমাণ করে। ১৯৬৮ ও ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে স্তূপটি উৎখননের ফলে ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত সামগ্রী পাওয়া গিয়েছিল সেগুলি হল, ব্রোঞ্জ নির্মিত ছোট আকারের বুদ্ধমূর্তি, একটি বোধিস্বত্ব পদ্মপাণি, অপরটি মঞ্জুশ্রী বুদ্ধমূর্তি। দুটি মূর্তিরই পৃষ্ঠদেশে দেবনাগরী অক্ষরে লিপি উৎকীর্ণ, আবিষ্কৃত হয় ৩৪২ দফার বিভিন্ন নামের ও বিভিন্ন মূল্যের মূল্যবান প্রত্নবস্তু। এইসব প্রতিটি পুরাবস্তুই বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসংস্কৃতির মূল্যবোধক।[৩]

৪. মন্দির

দিনাজপুর জেলায় প্রাচীনকালের সমস্ত মন্দিরই প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। এইসব মন্দিরের গঠন প্রণালী সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তক থেকে যতখানি জানা যায়, তাতে মন্দিরের ছাদের আকৃতি চার রকম শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। প্রথমত, এক শ্রেণির মন্দিরে ছাদ ছিল কতগুলি সমান্তরাল চতুষ্কোণ স্তরের সমষ্টি। প্রতি দুই স্তরের মধ্যবর্তী ভাগ অন্তর্নিবিষ্ট থাকায় এই স্তরগুলি পৃথক পৃথক দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, এই শ্রেণির মন্দিরের ছাদ উড়িষ্যার মন্দিরের মত শিখরে ঢাকা। চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের প্রাচীর গাত্র থেকে উচ্চ শিখরের চারটি ধার সামান্য বাঁকা হতে হতে প্রায় সংলগ্ন হয়ে যায়। সংযোগস্থলে একটি গোলাকার প্রস্তরখণ্ডে আবদ্ধ করা হয় এবং শিখরের গায়ে কারুকাজ খচিত অনেক লম্বালম্বি পংক্তি থাকে। এই শ্রেণির মন্দিরকে বলা হয় রেখ-দেউল। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির মন্দিরগুলি মূলত ভদ্র-দেউলের সবচেয়ে উচু স্তরের উপর একটি স্তূপ বা শিখর স্থাপন করে এই দুই শ্রেণির মন্দিরের সৃষ্টি হয়েছে।[৪] এই শ্রেণির মন্দির পরবর্তীকালে নির্মিত দিনাজপুরের অধীনে কান্তনগরের মন্দির। দিনাজপুর অঞ্চলে প্রাচীন বিলুপ্ত মন্দিরের অংশ বিশেষ স্তম্ভ, চৌকাঠ ইত্যাদি পাওয়া গেছে। দিনাজপুর রাজবাড়িতে কারুকাজ খচিত প্রস্তর স্তম্ভটির উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে, স্তম্ভটি গৌড়াধিপ প্রতিষ্ঠিত একটি শিব মন্দিরের অংশ। এই মন্দিরটি নবম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে দিনাজপুর জেলার অধীনে গরুড়স্তম্ভ ও কৈবর্ত স্তম্ভটিকে স্মরণ করা যেতে পারে।

দিনাজপুর জেলায় প্রাচীন মন্দির গুলির মধ্যে বর্তমানে যে দুটি মন্দির সংস্কারের

পরম্পরায় টিকে আছে সেই দুটির মধ্যে একটি বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত শিববাটী গ্রামে রাজা বাণ কর্তৃক নির্মিত (কথিত) শিবমন্দির, অপরটি ওই থানারই অধীনে হাই স্কুল পাড়ায় অবস্থিত রাজা বাণের টাঁকশালের ম্যানেজার (কথিত) কর্তৃক নির্মিত শিবমন্দির। তাছাড়া, পরবর্তী সময়ে নির্মিত বেশ কয়েকটি মন্দির দিনাজপুর জেলায় ভগ্নদশায় এখনও টিকে আছে। এগুলির মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধীনে ভিখাহারে অবস্থিত মন্দিরবাসিনী দেবীর মন্দির, করদহের শিবমন্দির, পতিরামের অদূরে খাঁপুর গ্রামে সিংহবাহিনীর মন্দির, গোপীনাথদেবের মন্দির, কুমারগঞ্জ থানার অধীনে দেবগ্রামে শিবমন্দির, দেবী অন্নপূর্ণার মন্দির, গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত মাসুর কিস্‌মত গ্রামে পঞ্চরথের মন্দির (তুলসী মন্দির), কুশমণ্ডি থানার করণজী গ্রামে শচীদেবীর মন্দির, উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার অন্তর্গত ভদ্রশীলা গ্রামে ভদ্রমন্দির, পাষাণী মন্দির, কালিয়াগঞ্জ থানার অধীনে সোনাপুর গ্রামে নবদুর্গার মন্দির, রায়গঞ্জ থানার বিন্দোলে মার্তণ্ড ভৈরবের মন্দির ইত্যাদি। বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দিনাজপুর জেলার অধীনে এখনও অতি পুরাতন কয়েকটি মন্দির ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও কিছুটা অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। এগুলি হল, বীরগঞ্জ থানার অধীনে ভেলুয়ার মন্দির, কাঠগড়-ঢাকেশ্বরী মন্দির, রানিশংকৈল থানার অন্তর্গত গোরকুই গ্রামে গোরক্ষ মন্দির ইত্যাদি। পরবর্তীকালে দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের আমলে নির্মিত কান্তনগরে কান্তজীর মন্দির, বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দিনাজপুরে মন্দিরগুলির মধ্যে এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

৫. ভাস্কর্য ও পোড়ামাটির শিল্প

প্রস্তর ভাস্কর্য শিল্পে বাণগড় সভ্যতার নিদর্শন উজ্জ্বলতর পরিচয় রেখে গেছে আমাদের কাছে। এখানে দেবমন্দির নির্মাণে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের বহুল বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শৈল্পিক আবেগ বা নন্দন বোধকেও বিকশিত করেছে। কালের স্থূল হস্তাবলেপে আদি দিনাজপুর জেলায় গড়ে ওঠা বহু মন্দির লুপ্ত হয়ে গেছে সেই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেছে ভাস্কর্য শিল্পের নানান নিদর্শন। দিনাজপুর জেলায় বাংলার অন্যান্য স্থানের মত অনেক স্থলে মন্দির বিনষ্ট হলেও তার মধ্যে দেবমূর্তি রক্ষিত হয়েছে। বাংলায় যে বহুসংখ্যক দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে তার থেকেই বাংলার প্রাচীন চারুশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। বাণগড় থেকে আবিষ্কৃত কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির স্তম্ভ, প্রস্তর নির্মিত সর্পে ভাস্কর্য খচিত চৌকাঠ, গ্রেনাইট প্রস্তর নির্মিত অলংকৃত স্তম্ভ, প্রস্তর নির্মিত কারুকার্য খচিত হংসযুগল, সে কালের উন্নত ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন।

সংখ্যায় খুব কম হলেও আদি দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে কিছু কিছু পোড়ামাটির নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি মৌর্য, শুঙ্গ ও কুষাণ যুগের বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। ভাস্কর্য শিল্প বিকাশের শুরুতে মাটিই ছিল এর প্রধান উপকরণ। মানুষের নন্দনবোধকে তৃপ্ত করার জন্যই বোধহয় খেয়ালখুশি মত গড়া ও ভাঙা, ভাঙা ও গড়ার কাজের মধ্য দিয়ে এই শিল্পকলার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। এ দেশের খালবিল ইত্যাদিতে

সহজলভ্য আঠালমাটিই ছিল এ শিল্পকর্মের প্রধান উপকরণ। বাণগড় উৎখননে যে সব মৃৎশিল্পের পুরাবস্তু পাওয়া গেছে তারমধ্যে, চকচকে কালো রঙের পাত্র, যার দেহে ধূসর রঙের মধ্যে কৃষ্ণাভ রঙ মেশানো থাকত, তাছাড়া, থালা, ঘটি, বাটি, মালসা, গ্লাস, লাল ও ধূসর রঙের মৃৎপাত্রের গায়ে সাধারণত শঙ্খ ও পদ্ম চিহ্নযুক্ত ছাপ দেওয়া থাকত, এই ধরনের মৃৎপাত্র যেমন বিভিন্ন আকারের ঘট, মাটির তৈরি ভাঁড়, ঢাকনি, মালসা, কড়াই, জালা, জলপাত্র প্রভৃতি রন্ধনশালার বিভিন্ন বাসনপত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই সময় কালো চক্‌চকে মসৃণ মৃৎ পাত্রের ব্যবহার করা হত। এ জাতীয় মসৃণ মৃৎপাত্র মৌর্যযুগের ভারতীয় মৃৎশিল্পের অনন্য নিদর্শন। শুঙ্গযুগেও কোটিবর্ষ বা বাণগড়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির শিল্পকলাগুলির নিদর্শন ইতিহাসের আর এক আলোকিত দিক। মৃৎশিল্পে বিশেষ করে পোড়ামাটির মৃৎশিল্পে এখানকার লোকশিল্পীরা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কটিদেশে কারুকাজ খচিত মেখলা পরা অপূর্ব লাবণ্যময়ী মন ভুলানো ভঙ্গিতে দাঁড়ানো বাণগড়ের মৃন্ময়ী দেবীমূর্তি শুধু বঙ্গদেশেরই নয় ভারতীয় মৃৎশিল্পের গৌরবের বস্তু। মূর্তিটি কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে রয়েছে। এর দক্ষিণ হাতে রয়েছে একটি শারিকাপাখী, দক্ষিণ পদপ্রান্তে একটি হাঁস এবং বামপায়ের পাশে রয়েছে একটি হরিণ। লোকশিল্পের উন্নততর নিদর্শন এই কলাকৃতির সঙ্গে যুক্ত লোকশিল্পীরা এখানে তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে আপন প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শুঙ্গযুগে বিশেষত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে বাংলায় যে শিল্পকলার এক ব্যাপক জোয়ার এসেছিল তা বাণগড়ের মৃৎশিল্প ও অন্যান্য চারুকলার নিদর্শন থেকেই প্রমাণিত হয়। এই যুগে নগর রক্ষার জন্য একপ্রকার পোড়ামাটির তৈরি ক্ষেপণী ১৬০টির মত আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি দেখতে অনেকটা টর্পেডোর মত। শত্রুর প্রতি ছুড়ে মারার জন্যই এগুলি পুড়িয়ে খুব শক্ত করা হয়েছিল। হাতের আঙুল দিয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধরার জন্য কোনো কোনোটিতে খাঁজকাটাও ছিল। দেখতে অনেকটা ডিমের মত এবং উভয়দিক সূঁচালো, কোনোটি হরতনের মত, কোনটি আবার বলের মত গোল। তাছাড়া, পোড়ামাটির মানুষ, জন্তুর আকৃতি খেলনা, তামা ও হাড়ের শলাকা, লোহার হাতিয়ার, পাথরের মালা, দেখতে কোনোটা গোল, চ্যাপ্টা ঢোলের মত অথবা হরতকীর মত। রূপা ও তামার কার্ষাপণ যে প্রচলিত ছিল তাও বাণগড় খননে পাওয়া গেছে।[৫]

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতে বাংলার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে সেই সময় সেখানে যে ভাস্কর্য শিল্পের অবসান ঘটেছিল বিশেষজ্ঞদের অভিমত থেকে তা জানা যায়। কিন্তু বাংলার পূর্ব অঞ্চলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ও রাজত্ব টিকে থাকে। সে সময়ে দ্বাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্য শিল্পকলার অনুকরণে এই অঞ্চলে অনেক ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে আদি দিনাজপুর জেলায় যে মন্দিরাদির অলংকরণের জন্য পোড়ামাটির মূর্তি নির্মিত হয়েছিল, বিভিন্ন মন্দিরের চিত্রফলকগুলিতে সেই চিত্র পাওয়া যায়। মোগল আমলের শেষ দিকে দিনাজপুর জেলায় নির্মিত মন্দির গাত্রে যে

সব পোড়ামাটির চিত্রফলকের নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলি ছিল খুবই উন্নতমানের। বিখ্যাত কান্তনগর মন্দিরসহ অন্যান্য মন্দিরগুলিতে সেই উন্নতমানের শিল্পকর্মের নিদর্শন পাওয়া যায়। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর মন্দিরগুলিতে এই শিল্পকলার আরও উৎকর্ষ ঘটেছিল।

৬. টেরাকোটা শিল্প

বাংলায় মানুষের সভ্যতার সূচনা থেকে টেরাকোটা শিল্পের সূত্রপাত হয়েছিল। বাণগড় সভ্যতার সময় সেই শিল্পকলা বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করেছিল। বাংলায় পাথর খুব সহজে পাওয়া যেত না। পাথর খুব সুলভ না হওয়ার দরুন লোকশিল্পীরা তাঁদের শিল্প বিকাশের পথ বেছে নিয়েছিলেন মৃৎশিল্পের মাধ্যমে অর্থাৎ টেরাকোটা শিল্পকলায়। পালযুগে এবং তার আগেও টেরাকোটা শিল্প এখানে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পাথরের পরিবর্তে শিল্পীরা মাটির কাদায় তাঁদের শৈল্পিক আবেগ প্রকাশ করত। শিল্পী তাঁর মনের লাবণ্য মিশিয়ে কলাকৃতির মাধ্যমে সূক্ষ্ম কারুকাজ ও অলংকরণের সাহায্যে নিখুঁত নিপুণভাবে নির্মাণ করতেন টেরাকোটা ফলক, যেগুলি সেইযুগে সৌধ অলংকরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপকরণ ছিল। বাণগড় স্তূপ খননের ফলে দেবদেবী, রাজা-জমিদার, যোদ্ধা, কুস্তীগীর, গায়ক, বাদক, নৃত্যরতনারী, স্নানরতা নারী, বিভিন্ন পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, ফলফুল কোরক্, বাঘ শিকাবি, কিন্নর, উড়ন্ত বিদ্যাধর, কারুকার্য খচিত ইট ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সবই প্রমাণ করে টেরাকোটা শিল্পকলা দিনাজপুর অঞ্চলে কত উন্নত ছিল। বাণগড় স্তূপ খননে টেরাকোটা শিল্পের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তার বেশির ভাগই কুষাণ যুগের মৃৎশিল্পের বৈশিষ্ট্যতার পরিচায়ক। পালযুগীয় ও বৌদ্ধধর্মীয় এবং জৈনধর্মীয় টেরাকোটা শিল্পের সংখ্যা খুব কম আবিষ্কৃত হয়েছে। বাণগড় থেকে আবিষ্কৃত টেরাকোটা শিল্পকলার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল বৈদিক ধর্মীয় বিশ্বাসনিষ্ঠ ও আচার অনুষ্ঠান চিত্রিত টেরাকোটা শিল্পকলা। বাণগড় ছাড়া দিনাজপুর জেলার সীতাকোট, পতিরাজ-দেহাবন্দ মহাবিহার থেকে টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন রূপে কারুকাজ খোচিত ইট, বাঘের পা চিহ্ন ইট, মাছের নকশা বিশিষ্ট ইট,[৬] পোড়ামাটির বুদ্ধমূর্তির ফলক, মানুষের পা চিহ্ন ইট[৭] ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই আমলের আবিষ্কৃত টেরাকোটা শিল্পের এই সব নিদর্শন ছিল লোকজ শিল্পজ্ঞানের ও লোক শিল্পকৌশলের আলোকিত দৃষ্টান্ত।

৭. শিল্পকার

আদি দিনাজপুর জেলার সে যুগের শিল্পকারদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। লামা তারানাথের বিবরণ থেকে পাওয়া যায় যে, ধীমান ও তাঁর পুত্র বীৎপালো প্রস্তর ও ধাতুর মূর্তি গঠন ও চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। তাঁদের অনেক শিষ্য ও প্রশিষ্য ছিল। এঁরা সম্মিলিত হয়ে সে কালে একটি শিল্পী সংঘ গঠন করেছিলেন। বাংলায় যে শিল্পী সংঘ ছিল তা বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই

শিল্পীগোষ্ঠীর নাম ছিল 'বারেন্দ্র শিল্পীগোষ্ঠী চূড়ামণি'। এর নেতৃত্বে ছিলেন সে যুগের খ্যাতনামা শিল্পী রাণক শূলপাণি। সিলিমপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, প্রস্তরে অক্ষর উৎকীর্ণ করাই ছিল প্রকৃত শিল্পীদের কাজ। বরেন্দ্রের এইসব শিল্পীরা বেশির ভাগই বাস করতেন দিনাজপুরের অধীনে দেবীকোট নগরীতে। তখন বাংলার একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল পুনর্ভবা নদীতীরস্থ দেবকোট নগর। ধর্ম শিল্প সাহিত্য ও দর্শনে এই নগরের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বভাবতই 'বারেন্দ্র শিল্পীগোষ্ঠী চূড়ামণি'দের প্রধান কর্মস্থল যে দেবীকোট নগরীই ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। আদি দিনাজপুর জেলাগুলি থেকে প্রাপ্ত তাম্রশাসনগুলিতে যে সব শিল্পীদের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে শিল্পী মহীধর, শিল্পী শশিধর, সূত্রধর বিষ্ণুভদ্র, শিল্পী সোমেশ্বর, শিল্পী ধীমান, শিল্পী বীটপাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব শিল্পীরা যে কেবলমাত্র প্রস্তর ও তাম্রপটে অক্ষর উৎকীর্ণ করতেন, তাই নয়। তাঁরা উচ্চ শ্রেণির শিল্পী ছিলেন এবং ধাতু ও প্রস্তরের মূর্তি প্রভৃতিও তৈরি করতেন।[৮]

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. রানিশংকৈল ঃ বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধীনে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত।
২. D. K. Chakrabarti, *Ancient Bangladesh,* Oxford University Press, Dhaka.
৩. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *দিনাজপুর মিউজিয়াম,* পৃ. ২৯-৩১।
৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রাচীনযুগ), পৃ. ২০৮।
৫. গোবিন্দ গোস্বামী, *প্রত্নতীর্থ পরিক্রমা,* পৃ. ১১২, ১১৩, ১১৪।
৬. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।
৭. কালিয়াগঞ্জ বার্তার সংগ্রহশালা, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।
৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থকরী

১. চাষবাস

সুজলা সুফলা এই ভূমির চাষবাসই সমস্ত অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক। কৃষি কাজই দিনাজপুর জেলার লোকবৃত্ত সমাজের জীবিকা নির্বাহের মূল মেরুদণ্ড। এখানকার জনসংখ্যার বেশিরভাগই গ্রামে বাস করত। গ্রামের চারপাশে জমি চাষ করে বিভিন্ন ধরনের শস্য ও ফল উৎপাদন করত। খুব প্রাচীন কাল হতেই এখানকার অর্থকরী ফসলরূপে ধান, পাট, লঙ্কা, কলাই ও ইক্ষু ছিল অন্যতম। এখানকার গুড় সে যুগে বিদেশে চালান যেত। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, প্রচুর গুড় উৎপাদন হত বলে এদেশের নাম গৌড় হয়েছিল। তাছাড়া তুলা ও সর্ষপের চাষও এখানে বহুল পরিমাণে হত এবং পানের বরজও ছিল অনেক। বহু ফলবান বৃক্ষের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, ডুমুর ইত্যাদির চাষও ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তখন রাজাই ছিলেন সমস্ত জমির মালিক। যারা জমি চাষ করত বা অন্যভাবে জমি ভোগ করত, তাদের কতগুলি নির্দিষ্ট কর দিতে হত। রাজা অথবা সামন্ত প্রভুদের কি হারে খাজনা বা কর দিতে হত তার সঠিক বিবরণ জানা যায় না। রাজা মন্দির বা দেবালয় প্রভৃতি ধর্ম-প্রতিষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণদের প্রতিপালনের জন্য জমি দান করতেন। এই জমির জন্য কোনও কর ছিল না। এবং গ্রহীতা বংশানুক্রমে তা চিরকাল ভোগ করতে পারতেন। অনেক সময় এমনও দেখা দিত ধনীরা রাজার কাছ থেকে পতিত জমি কিনে ব্রাহ্মণদের দান করতেন এবং তা নিষ্কর ও চিরস্থায়ী বলে গণ্য হত। আদি দিনাজপুরের বিভিন্ন স্থানে তখনকার দিনে জমির মাপ হত নল দিয়ে। বিভিন্ন জায়গায় এই নলের মাপ ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। বরেন্দ্রে জমি মাপের জন্য 'বৃষভশঙ্কর' নলের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা, বৃষভশঙ্কর নলের উদ্ভব হয়েছে সেন রাজা বিজয় সেনের উপাধি থেকে। গুপ্তযুগে এখানে জমির পরিমাণ সূচক দুটি সংজ্ঞা ব্যবহার হত, একটি কুল্যবাপ অপরটি দ্রোণবাপ। কুল্যবাপ শব্দটি কুলা হতে সৃষ্টি হয়েছিল, এক কুল্য বীজের মাধ্যমে যতটুকু জমি বপন করা যায়, তাকেই মনে হয় কুল্যবাপ বলা হত। ক্রমে এর একটি পরিমাপ নির্দিষ্ট হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন এক কুল্যবাপ জমির পরিমাণ ছিল প্রায় তিন বিঘার সমান। আবার, কুল্যবাপের আটভাগের এক ভাগকে দ্রোণবাপ বলা হয়। পরবর্তী সময়ে কুল্যবাপের পরিবর্তে পাটক, ভূপাটক ইত্যাদি শব্দের

ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। পাটক ছিল ৪০ দ্রোণের সমান। তাছাড়া, আঢ়, আঢ়বাপ, উন্মান, উদান, কাক, কাকিনিক প্রভৃতি জমির পরিমাণ সূচিত করার জন্য ব্যবহার করা হত। এর কোন্‌টির কি পরিমাণ ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না।[১]

২. শিল্পজাত জিনিস

সেকালে দিনাজপুর জেলা কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এখানে বিভিন্ন রকমের শিল্পজাত সামগ্রী প্রস্তুত করা হত। এখানে পাটের লাছি দিয়ে এক ধরনের সুতো তৈরি করে মোটা কাপড় প্রস্তুত হত। এই জাতীয় কাপড়ের নাম ছিল দুকুল। কৌটিল্য লিখেছেন, পুণ্ড্রদেশীয় দুকুল শ্যাম ও মণির মত স্নিগ্ধ। রেশমের জন্যও এই অঞ্চল খ্যাত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে একে পত্রোর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পত্রোর্ণ রেশমের মত একজাতীয় কীটের লালায় তৈরি হত এবং দিনাজপুরে এই জাতীয় বস্ত্র প্রস্তুত হত। কার্পাসিক অথবা কার্পাস তুলার চাষও এখানে প্রচুর পরিমাণে হত। প্রস্তর ও ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প এখানে কি পরিমাণে উন্নতি লাভ করেছিল তা পূর্বেই বলা হয়েছে। এখানকার কর্মকার ও সূত্রধর সম্প্রদায় গৃহ, নৌকা, শকট ও অলংকার শিল্প নির্মাণ করত এবং নিত্যদিনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এঁরাই নানান উপকরণ জোগাত। এখানকার কাঠের কাজ ছিল বিখ্যাত। কাঠের মোখা শিল্প সেইসময় এই জেলা থেকে তিব্বতে যেতো। পাটের লাছির সাহায্যে একরকমের ফাটি তৈরি করে, এই রকম তিনটি ফাটি একত্রে জোড়া দিয়ে এখানে ধোকড়া তৈরি হত। এখানকার ধোকড়া শিল্প সেকালে শীতের দেশগুলিতে অধিক পরিমাণে রপ্তানি হত।

বাংলার শিল্পীদের সংঘবদ্ধ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন তাম্র শাসনে। নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক প্রভৃতি এই রকম সংঘের প্রধান ছিলেন। সেইসময় 'বারেন্দ্র শিল্পীগোষ্ঠী চূড়ামণি'র খ্যাতি তো সমস্ত বাংলা জুড়েই ছিল। এই রকম সংঘবদ্ধ শিল্পী জীবনের ফলেই বাংলায় নানা শিল্পী ক্রমশ বিভিন্ন বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছে। যেমন, তন্তুবায়, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, কংসকার, শঙ্খকার, মালাকার প্রভৃতি। বিভিন্ন শিল্পীসংঘ ক্রমে ক্রমে সমাজে যে একটি বিশিষ্ট স্থান করে এক একটি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে এবিষয়ে ঐতিহাসিকরা একমত বলে জানা যায়।

৩. ব্যবসা-বাণিজ্য

শিল্পজাত দ্রব্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দিনাজপুর জেলায় ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটেছিল। আদি দিনাজপুর জেলায় পুনর্ভবা, আত্রাই, টাঙ্গন, যমুনা, করতোয়া, কুলিক, নাগর প্রভৃতি নদী থাকায় শিল্পজাত সামগ্রী এখান থেকে দেশের নানাস্থানে প্রেরণের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। এই কারণে তখন এখানকার নানা জায়গায় হাট ও গঞ্জ এবং নতুন নতুন জনপদ গড়ে উঠেছিল। দেবীকোট নগরই তখন বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। শিল্প ও বাণিজ্য থেকে তখন যে রাজ্যের বিপুল আয় হত তার পরিচয় হট্টপতি, শৌল্কিক তরিক প্রভৃতি কর্মচারীদের নাম থেকে বোঝা যায়।

এখানকার বাণিজ্য কেবল দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। স্থল ও জলপথে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গেও যুক্ত ছিল এবং বিভিন্ন সামগ্রী বিনিময় হত। ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, প্রাচীনকাল হতেই সমুদ্রপথে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। এখানকার বিভিন্ন সামগ্রী তখন দক্ষিণ ভারত, লঙ্কাদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে যেত। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে অথবা তার আগেও স্থলপথে আসাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়ে বাংলার সঙ্গে চীন, আসাম প্রভৃতি দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। দুর্গম হিমালয়ের পথ দিয়েও নেপাল, ভুটান ও তিব্বতের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য চলত।[২]

৪. বিনিময় প্রথা

ঐতিহাসিকদের ধারণা অনুযায়ী খ্রিস্ট জন্মের চার-পাঁচশো বছর আগেই বাংলায় মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন ছাপকাটা মুদ্রা বাংলায় অনেক পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। পুরাতন মৌর্য যুগের লিপিতে মুদ্রার উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং প্রাচীনকালে যে দিনাজপুর জেলাতেও মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময় প্রথা চলত ইতিহাসের সূত্র থেকেই তা বলা যায়। বাংলায় কুষাণ যুগের মুদ্রা খুব কম পাওয়া গেলেও গুপ্তযুগের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা বহুসংখ্যায় পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। প্রাচীন লিপিতে মূলত দিনার ও রূপক, এই দুই ধরনের মুদ্রার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বর্ণমুদ্রার নাম ছিল দিনার ও রৌপ্যমুদ্রার নাম ছিল রূপক। ১৬ রূপক এক দিনারের সমান ছিল। সাধারণতঃ গুপ্তযুগের পতনের পরে বাংলার স্বাধীন রাজারা গুপ্তমুদ্রার অনুরূপে সোনার মুদ্রা প্রচলন করেন। গুপ্ত শাসকদের আমলের রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায় নি। তবে, বাংলার স্বাধীন রাজাদের আমলে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার গঠন খুব উন্নতমানের ছিল না এবং এই মুদ্রায় খাদের পরিমাণও বেশি ছিল বলে জানা যায়।

পালরাজারা প্রায় চারশো বছর রাজত্ব করলেও এদেশে তাঁদের নির্মিত মুদ্রা খুব বেশি পাওয়া যায় নি। বাণগড় খননে বাংলার প্রাচীনতম ধাতুর তৈরি তাম্রমুদ্রা পাওয়া গেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, এখানেও পাল আমলের প্রথম দিকে মুদ্রার প্রচলন ছিল। তাছাড়া, পাহাড়পুর খনন করে তিনটি তাম্রমুদ্রা পাওয়া যায়, এর একদিকে বৃষ ও অপরদিকে তিনটি মাছ উৎকীর্ণ ছিল। পালরাজা বিগ্রহপালের শাসন আমলের 'শ্রীবিগ্র' এই নামযুক্ত কতগুলি তামা ও রূপার মুদ্রা পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা, এই মুদ্রাগুলি পালরাজা তৃতীয় বিগ্রহপালের। পাল আমলের শাসকদের নির্মিত বিশেষ কোনও মুদ্রা আবিষ্কৃত না হওয়ার দরুন এই যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিষ্কার চিত্র অনেকটাই জটিল হয়ে উঠেছিল। সেন আমলে এখানে পুরাণ ও কপর্দক পুরাণ নামে একরকমের মুদ্রার পরিচয় পাওয়া যায়, আবিষ্কৃত সেন লিপিগুলি থেকে। কিন্তু সেন রাজাদের কোনও মুদ্রা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। রাজা লক্ষ্মণ সেনের শাসন আমলের কিছুটা পরিচয় আমাদের জন্য রেখে গেছে ঐতিহাসিক মীনহাজুদ্দিন। লক্ষ্মণ সেনের দানশীলতার উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, কাউকে তিনি লক্ষ কড়ির কম দান

করতেন না।· সেন আমলে আদি দিনাজপুর জেলায় যে কড়ির মাধ্যমে জিনিসপত্র বিনিময় চলত তা মীনহাজুদ্দিনের লেখা থেকেই প্রমাণিত হয়। এই জন্যই কেউ কেউ পুরাণ ও কপর্দক-পুরাণ নামে মুদ্রাকে আসলে একটি কাল্পনিক সংজ্ঞামাত্র বলেছেন। কপর্দক-পুরাণ বলতে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কড়িকে বোঝানো হত। হয়ত কড়ির ছাপ দিয়ে রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ হত। সেন আমলে যে কড়ির সাহায্যে বিনিময় প্রথা চালু ছিল, ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মত থেকে সে তথ্য পাওয়া যায়। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নত বাংলায় যে কড়ির ব্যবহার ছিল এতে অবাক হবার কোনো কারণ নেই। ফা-হিয়ান কিন্তু ভারতবর্ষে কড়ি প্রচলনের কথা বলে গেছেন। ১৭৫০ অব্দেও কলকাতা শহরে ও বাজারে কড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল।[৩]

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ), পৃ. ১৯৭।
২. ঐ, পৃ. ১৯৯।
৩. ঐ, পৃ. ২০০।

পঞ্চম অধ্যায়

মানব সমাজ

১. জনগোষ্ঠী

যে যুগে আমাদের *মনুস্মৃতি*, *মহাভারত* প্রভৃতি রচিত হয়েছিল, সেই যুগেই যে বাংলায় আর্য ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার বর্ণন আগেই কিছু দেওয়া হয়েছে। এর পূর্বে বাঙালির ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। জাতিভেদ আর্য সমাজেরই একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। আর্যরা এদেশে বসবাসের ফলেই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। এই জন্যই বঙ্গ, সুক্ষ্ম, পুলিন্দ, কিরাত, পুণ্ড্র প্রভৃতি বাংলার আদি বাসিন্দারা ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হয়েছিল। যারা ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত ছিল সেইসব বাঙালি ব্রাহ্মণদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। *মনুসংহিতা*-তে উক্ত হয়েছে যে, পুণ্ড্রক ও কিরাত এই দুই ক্ষত্রিয় জাতি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সংশ্রব ও শাস্ত্রীয় কাজকর্মের অনুষ্ঠান না করায় তারা শূদ্রত্ব লাভ করেছিল। কৈবর্ত জাতি *মনুসংহিতা*-য় সঙ্কর জাতি বলে বর্ণিত হয়েছে। এই ভাবে বাংলায় আরও অনেকেরই জাতি বিপর্যয় ঘটেছিল।

আদি দিনাজপুর জেলায় উত্তম ও মধ্যম সঙ্করভুক্ত বেশির ভাগই ছিল সুপরিচিত জাতি। এদের মধ্যে করণ ও অম্বষ্ঠ সঙ্কর বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। অম্বষ্ঠরা চিকিৎসা ব্যবসা করত বলে বৈদ্য নামে অভিহিত হয়েছিল। করণেরা লিপিকর ও রাজকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই করণেরাই পরবর্তীতে কায়স্থ জাতিতে পরিণত হয়েছে। এছাড়া, শংকস্কার, দাস, তন্তুবায়, মোদক, কর্মকার ও সুবর্ণবণিক এঁরাও ছিল এ জেলার অধিবাসীরূপে সুপরিচিত। *ব্রহ্মবৈবর্ত* পুরাণে যে মিশ্র তালিকা রয়েছে তাতে গোপ, নাপিত, মোদক, কুবর, তাম্বলি, স্বর্ণকার ও বণিক সৎশূদ্র নামে পরিচিত হয়েছে। পতিত সঙ্কর জাতির মধ্যে রয়েছে কোটক, তীবর, তৈলকার, লেট, মল্ল, চর্মকার, শুন্ডী, পৌণ্ড্রক, কৈবর্ত, রজক, কৌয়ালী, যুগী ইত্যাদি আরও নানান শ্রেণি। তাছাড়াও আছে ব্যাধ, ভড়, কোল, কোঞ্চ, ডোম, জোলা, চণ্ডাল প্রভৃতি আরও বিভিন্ন শ্রেণি। আছে ম্লেচ্ছ জাতিও।

সমাজে প্রত্যেক জাতিরই নির্দিষ্ট বৃত্তি ছিল। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন এটাই ছিল ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট কাজ। তাছাড়া ব্রাহ্মণেরা রাজ্য শাসন ও যুদ্ধবিভাগেও কাজ করতেন। কৈবর্তরা উচ্চ রাজকাজে নিযুক্ত ছিলেন, করণেরা যুদ্ধ ও চিকিৎসা করতেন, বৈদ্যরা মন্ত্রীর কাজ এবং দাস জাতীয় ব্যক্তিরা রাজকর্মচারী ও সভাকবি ছিলেন।

প্রাচীনকালে বিভিন্ন জাতির মধ্যে অন্নগ্রহণ ও বিয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে কঠোরতা ছিল না। শাস্ত্র অনুযায়ী উচ্চ শ্রেণির বরের সঙ্গে নিম্ন শ্রেণির কনের বিয়ে হত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে পান ও ভোজনের নিষেধের কঠোরতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের অন্ন ও জল গ্রহণ করতেন না। অন্ত্যজ জাতির পাত্রে রেখে দেওয়া জল পান করলে ব্রাহ্মণদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। আবার, ক্ষত্রিয়রা শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করলে প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা কমে যেত।

প্রাচীনকাল থেকেই যে দিনাজপুর জেলায় ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ছিল তা দামোদরপুর ও বৈগ্রাম তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। দামোদরপুর লিপিতে জনৈক কর্পটিক নামীয় ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ কাজ সম্পাদনের জন্য ভূমি কেনার প্রার্থনা করছেন। পঞ্চ মহাযজ্ঞের জন্য রাজা আর একজন ব্রাহ্মণকে ভূমি দিয়েছেন একথাও লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া, রিভুপাল হিমালয়ের পাদদেশে ডোঙ্গাগ্রামে কোকামুখ স্বামী, শ্বেতবরাহ স্বামী এবং নাম লিঙ্গের পূজা ও সেবার জন্য ভূমি কিনেছেন বলেও জানা যায়। বৈগ্রাম তাম্রলিপিতে ভোয়িল এবং ভাস্কর নামে দুই ভাই গোবিন্দ স্বামীর নিত্য পূজার জন্য ভূমি কিনেছেন বলে উল্লেখিত হয়েছে।[১] এসব থেকে বোঝা যায় যে, অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের বসতি ছিল অধিকতর। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণেরাই ভূমিদান লাভ করেছেন তাই নয়, জৈন ও বৌদ্ধ আচার্যরাও এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলিও ওই রকম ভূমিদান লাভ করেছিলেন।

করণ বা কায়স্থরা উচ্চরাজকাজে নিযুক্ত থাকতেন। দিনাজপুর জেলার কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা সান্ধিবিগ্রহিক ও করণদের শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখিত হয়েছে। করণেরা হিন্দুযুগের পরে ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়, আবার কায়স্থরা হিন্দুযুগের আগে সমাজে তেমন পরিচিতি ছিল না, এখানে তাঁরা পরে প্রাধান্য লাভ করেছে। কুলজী গ্রন্থের মতে, রাজা আদিশূর এই বরেন্দ্রভূমিতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পঞ্চ ভৃত্য এনেছিলেন তাঁরাই ছিলেন ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত প্রভৃতি কুলীন কায়স্থের আদিপুরুষ।[২] অম্বষ্ঠ- বৈদ্যরাও রাজ্যে ও সমাজে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, এদের কেউ কেউ ব্রাহ্মণ বলেও বিবেচিত হতেন। এখানকার অন্যান্য জাতির মধ্যে যুগী, সুবর্ণবণিক, কৈবর্ত, সদগোপ, রজক, নট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ডোম, চণ্ডাল ও শবরদের বসবাসের কথাও জানা যায় এ জেলায়। ডোমেরা সাধারণত শহরের বাইরে বাস করত এবং অস্পৃশ্য বলে গণ্য হত। তারা বাঁশের ঝুড়ি তৈরি করত ও তাঁত বুনত। চণ্ডালেরা মাঝে মাঝে গৃহস্থের বউ চুরি করে নিয়ে যেত। শবরেরা পাহাড়ে বাস করত। তাদের মেয়েরা কানে দুল, ময়ুরপুচ্ছ ও গুঞ্জাফুলের মালা পরত।[৩]

২. উৎসব অনুষ্ঠান

সাবেক কালে দিনাজপুরের লোকবৃত্ত সমাজে দেবদেবীর পূজা ছাড়াও হরেক রকমের লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকত। ধর্মশাস্ত্রে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, জন্মের আগে থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত মানুষের এই স্তরগুলিতে যে বিধি পালনের নিয়ম ছিল সে সবই বিভিন্ন অবস্থায় পালনীয় হত।

যেমন, শিশুর জন্মের আগে তার মঙ্গলের জন্য গর্ভধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ণ, শোষ্যন্তী হোম অনুষ্ঠান, জন্মের পর জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ইত্যাদি। তাছাড়া, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে শলাকর্ম, অশৌচ পালন ইত্যাদি শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারেই আচরিত হত। লোকজীবনে নিত্য দিন ধর্মশাস্ত্রের প্রবল প্রভাব ছিল। কোন্ কোন্ তিথিতে কি কি খেতে হবে, কি কি খেতে হবে না, কোন্ তিথিতে উপবাস করতে হবে, অধ্যয়ন, বিদেশযাত্রা, তীর্থগমন প্রভৃতির জন্য কোন্ কোন্ কাল শুভ অথবা অশুভ তা শাস্ত্রের অনুশাসনের দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হত। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* কাব্য থেকে জানা যায়, প্রাচীন যুগেও দুর্গা পূজাই বাংলার প্রধান পর্ব ছিল। সেইসময় উমা অর্থাৎ দুর্গার অর্চনা উপলক্ষে বরেন্দ্রে সাড়ম্বরে উৎসব পালিত হত। প্রাচীন গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, দুর্গা পূজায় বিজয়া দশমীর দিন 'শবরোৎসব' নামে এক প্রকারের নাচ ও গানের অনুষ্ঠান হত। শবর জনজাতির লোকদের মত এইদিন কেবলমাত্র গাছের পাতা পড়ে এবং সারা গায়ে কাদা মেখে ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা অশ্লীল গান গাইত এবং কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করত। চৈত্রমাসে কাম মহোৎসব নামে লোকবাজনা সহকারে একধরনের অশ্লীল গান গাওয়া হত। লোকের বিশ্বাস ছিল যে, কামদেব এতে তুষ্ট হন ও পুত্র দান করেন। হোলাকা (হোলি) ছিল সমাজে একটি প্রধান উৎসব। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এই অনুষ্ঠানে যোগ দিত। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে অক্ষক্রীড়া অনুষ্ঠিত হত এবং আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব একত্রিত হয়ে ভোজন করতেন। এই দিন বাড়িতে চিঁড়া ও নারিকেলের তৈরি নানাধরনের খাদ্য খাওয়ার নিয়ম ছিল। কার্তিক মাসে পালিত হত সুখরাত্রি ব্রত। সন্ধ্যাকালে এই উপলক্ষে গরিব দুঃখীকে খাওয়ান হত এবং পরদিন সকালে যার সঙ্গে দেখা হত, বন্ধু বা আত্মীয় না হলেও তাকে কুশল বচন, পুষ্প, গন্ধ, দই প্রভৃতি দিয়ে অর্চনা করা হত। ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে ইন্দ্র উৎসবে কাঠের তৈরি বিশাল ধ্বজ-দণ্ড উড়ানো হত। এই উপলক্ষে সুবেশধারী নাগরিকরা সমবেত হতেন এবং রাজা স্বয়ং দৈবজ্ঞ, সচিব, কঞ্চুকী ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে একত্রিতে উপস্থিত হয়ে উৎসবে যোগদান করতেন। এই সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানই এখানকার লোকমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য ছিল।

এইসব অনুষ্ঠান ছাড়াও পল্লীতে কৃষি জীবনের সঙ্গে যুক্ত অধিবাসীরা মাঠে হল চালনার প্রথম দিন, বীজ ছড়ানো, ফসল কাটা, গোলায় ফসল তোলা নানা প্রকারের আচার অনুষ্ঠানও প্রচলিত ছিল। এইসব অনুষ্ঠানে সাধারণত কোনও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হত না। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এইসব পূজা অনুষ্ঠানের অধিকারী ছিলেন। সেকালে শিল্পীজীবনকে ঘিরেও বিশেষ বিশেষ দিনে কামারের হাঁপর, কুমোরের চাক, তাঁতীর তাঁত, চাষীর লাঙ্গল, ছুতোর-রাজমিস্ত্রীর কারুযন্ত্র প্রভৃতিকে আশ্রয় করে এক ধরনের ধর্মানুষ্ঠান চালু ছিল। আজও এইসব উৎসব অনুষ্ঠান এখানকার লোকবৃত্তে সচল রয়েছে। উৎপাদন যন্ত্রের এই পূজাচারের সঙ্গে এখানকার সাবেক কালের আদিবাসীদের প্রজনন শক্তির পূজাচারের সম্বন্ধও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। পূজাচারের এই সব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই গ্রাম্য কৃষি ও কারুজীবনের ধর্মকর্মময় বাঙালির সৃষ্টির আনন্দ,

উদ্যোগ, শিল্পময় জীবনের মাধুর্য ও সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে। আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এইসব উৎসব অনুষ্ঠান আজও অনুস্যুত হয়ে আছে।

৩. স্বভাব ও জীবনধারা

প্রাচীন যুগে বাঙালির স্বভাব ও জীবনযাত্রার স্পষ্ট বা বিস্তৃত বিবরণ জানার কোন তথ্য পাওয়া যায় না। প্রাচীন বাংলার চর্যাপদগুলিতে এবিষয়ে কিছু কিছু উল্লেখ থাকলেও তা যথেষ্ট নয়। সপ্তম শতকে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাং পুণ্ড্রবর্ধনের সর্বসাধারণের মধ্যে লেখাপড়া শিখবার অদম্য আগ্রহ ও প্রাণপণ চেষ্টার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই সময় বরেন্দ্রের বিস্তীর্ণ ভূমিতে সাধারণত বেদ, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, অর্থশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, কাব্য, তর্ক, ব্যাকরণ, অলংকার, ছন্দ, আয়ুর্বেদ, অস্ত্রবেদ, আগম, তন্ত্র প্রভৃতির পঠন পাঠন প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের পুস্তকও পঠন-পাঠনের জন্য ব্যবস্থা ছিল। সেকালে এই দেশ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য বাঙালি দূরদেশে যেত। কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁর *দশোপদেশ* নামক হাস্য রসাত্মক কাব্যে লিখেছেন, গৌড়ের ছাত্ররা যখন প্রথম কাশ্মীরে আসে, তখন তাদের ক্ষীণ দেহ দেখে মনে হয় যেন ছুঁলেই ভেঙে পড়বে, কিন্তু এখানকার জল-হাওয়ার গুণে তারা শীঘ্রই এমন উদ্ধত হয়ে ওঠে যে, দোকানদার দাম চাইলে দাম দেয় না, সামান্য উত্তেজনার বশেই মারার জন্য ছুরি উঠায়।[৪] এখানকার মেয়েদের সুখ্যাতি ছিল। বাৎস্যায়ন তাদের মৃদু-ভাষিণী, কোমলাঙ্গী ও অনুরাগবতী বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন, রাজ অন্তপুরে মেয়েরা পর্দার আড়াল হতে অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে আলাপ করত।

সন্ধ্যাকর নন্দী *রামচরিত* কাব্যে এই মাটিকে সুজলা-সুফলা, শস্য শ্যামলা এবং মনোরম বলে উল্লেখ করেছেন। রামাবতী নগরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন, প্রশস্ত রাজপথের ধারে 'কনক পরিপূর্ণ ধবল প্রাসাদ-শ্রেণী মেরু শিখরের ন্যায় প্রতিয়মান হইত' এবং এর উপর স্বর্ণকলস শোভা পেত। নানাস্থানে মন্দির, স্তূপ, বিহার, উদ্যান, পুষ্করিণী, ক্রীড়াশৈল, ক্রীড়া ব্যাপী ও নানা রকম পুষ্প, লতা, তরু, গুল্ম নগরের শোভা বৃদ্ধি করত। হীরক, বৈদূর্যমণি, মুক্তা, মরকত, মাণিক্য ও নীলমণিখচিত আভরণ এবং নানারকম স্বর্ণখচিত তৈজসপত্র ও অন্যান্য গৃহ উপকরণ, মহামূল্য বিচিত্র সূক্ষ্ম বসন, কস্তুরী, কালাগুরু, চন্দন, কুঙ্কুম ও কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য এবং নানা যন্ত্রের মন্দ্র মধুর ধ্বনির সঙ্গে তান লয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীত সেকালের অধিবাসীদের ঐশ্বর্য, সম্পদ ও বিলাসিতার পরিচয় প্রদান করত।[৫] সন্ধ্যাকর নন্দী স্পষ্টই লিখেছেন, সেকালে সমাজে ব্যাভিচারী ও সাত্ত্বিক উভয় শ্রেণিরই লোক ছিল। নগরে বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা অবশ্য গ্রামের তুলনায় বেশি মাত্রায় ছিল। আদি দিনাজপুর জেলার মানুষের মধ্যে সেকালে নৈতিক জীবনের খুব উচ্চ আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিবাসীরা সাধারণত সৎ ও শান্ত প্রকৃতির ছিল। তারা ছিল সরল ও বিনয়ী। ধনী লোকেরা ধনসম্বলের জন্য গর্ব করতেন না। দিনাজপুরের মানুষেরা কলহপ্রিয় নয়। সেকালে মারপিট, দাঙ্গা-হাঙ্গামার সেরকম

কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই।[৬] হিউয়েন সাং তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছেন, এই অঞ্চলের লোকেরা স্পষ্টচারী, গুণবান এবং শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান।

সেকালে আদি দিনাজপুর জেলার নর-নারীর যৌন-সম্বন্ধের ধারণা ও আদর্শ বর্তমানে সময়ের মাপকাঠিতে বিচার করলে খুব যে উচ্চ ও মহৎ ছিল এরকম ভাবনা সঠিক নয়। এ বিষয়ে বাঙালির যে খুব সুনাম ছিল না তার প্রমাণ আমাদের জন্য রেখে গেছেন বাৎস্যায়ন। বাৎস্যায়ন তাঁর লেখনীতে গৌড় রাজ অন্তঃপুরবাসিনীদের ব্যাভিচারের কথা উল্লেখ করেছেন। সাধারণত ভাত, মাছ, মাংস, শাকসব্জী, ফলমূল, দুধ এবং দুধের নানারকমের জিনিস যেমন, ক্ষীর, দই, ঘি ইত্যাদি প্রধান খাদ্য ছিল। ব্রাহ্মণেরা সাধারণত মাছ-মাংস খেতেন না, তাঁরা নিরামিষ ভোজন করতেন। সেকালে ইলিশমাছ ও শুটকী মাছের বেশ আদর ছিল। বিভিন্ন রকমের মাদক পানীয় ব্যবহার হত। তখন বাঙালিরা ধুতি ও শাড়ি পরত। পল্লী অঞ্চলের পুরুষেরা সাধারণত নেংটি ও নারীরা বুকানি ব্যবহার করত। উৎসব উপলক্ষে বিশেষ পোষাক ব্যবহারের ব্যবস্থা ছিল। পুরুষ ও মেয়েরা উভয়েই আংটি, কানে কুন্ডল, গলায় হার, হাতে কেয়ুর ও বলয়, কটি দেশে মেখলা ও পায়ে মল পরত। পুরুষ বা স্ত্রী কেউই শিরোভূষণ ব্যবহার করত না। পুরুষদের চুল বাবরির মত কাঁধের উপর ঝুলে পড়ত, মেয়েরা নানারকম খোঁপা বাঁধত। সেকালের মানুষেরা পায়ে চামড়ার জুতা, কাঠের খড়ম ও ছাতার ব্যবহার করত। মেয়েদের বিয়ে হলে কপালে সিঁদুর পরত। সেকালে খুব পাশা ও দাবা খেলা এবং নাচ, গান ও অভিনয়ের প্রচলন ছিল। পুরুষেরা শিকার, মল্লযুদ্ধ, ব্যায়াম ও নানা রকমের বাজীকরের খেলা করত। সেকালে নানাবাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, করতাল, ঢাক, ঢোল ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। ধনী লোকেরা হাতি, ঘোড়া বাড়িতে রাখতেন। গরুর গাড়িই ছিল সড়কপথের যানবাহন, জলপথে নৌকা ছিল প্রধান যানবাহন।[৭]

৪. শেষ কথা

আদি দিনাজপুর জেলার ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝি, সেরকম প্রাচীন লিখিত কোনও ঐতিহাসিক গ্রন্থ নেই। সুতরাং এই জেলা সম্পর্কে যা কিছু ইতিহাস রচনার প্রধান উপকরণ তা হল বিদেশীয় লেখকের বিবরণ, প্রাচীন লিপি, মুদ্রা ও অতীতের স্মৃতি চিহ্ন। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* কাব্যগ্রন্থের মত বহু সংখ্যায় ওই ধরনের বই আবিষ্কৃত হলে হয়ত আদি দিনাজপুর জেলার কঙ্কালসার ইতিহাসে রক্তমাংস যোগ করে একে সুগঠিত আকারে রূপ দেওয়া সম্ভবপর হত। বরেন্দ্রের অতীত ইতিহাসের পাতা থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাসের যতটুকু উপকরণ পাওয়া গেছে তা ধুলো নয়, অল্প হলেও সোনা। এর সাহায্যেই আমরা এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্ম জীবনের প্রকৃতি, গতি ও ক্রম বিবর্তনের একটা অতি ক্ষীণ আভাস বা ধারণা খুঁজে পাই, তার মূল্য অপরিসীম। সে কালে যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে এখানকার বাঙালি বলিয়ান ছিল তার প্রমাণ এখানকার ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হতে বিতারিত বৌদ্ধধর্ম শেষ পর্যন্ত বাঙালির এই রাজ্যেই শেষ আশ্রয় লাভ করে

চারশো বছর টিকে ছিল। দিনাজপুরের দেবকোট মহাবিহার থেকে জ্ঞানলাভ করেই এই অঞ্চলের ভূমিজ সন্তান শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর উত্তরে দুর্গম হিমগিরি পার হয়ে তিব্বতকে সেই জ্ঞান ও ধর্মের নতুন আলোকে বিকশিত করেছিল। জগদ্বিখ্যাত সীতাকোট, জগদ্দল ও দেবকোট মহাবিহার এই জেলার অধীনে ছিল। বাঙালির রাজশক্তি, মনীষা ও ধর্মভাবের দ্বারাই তা পরিপুষ্ট হয়েছিল। বাণিজ্য সম্পদে এই অঞ্চল ঐশ্বর্যশালী ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যেও এখানকার দান অসামান্য। যতদিন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা থাকবে ততদিন এই মাটির লালিত সন্তান হলায়ুধ, চন্দ্রগোমিন্, চক্রপাণিদত্ত, জীমূতবাহন, অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দী, প্রমুখ সমগ্র ভারতে আদৃত হয়ে থাকবেন। বাঙালির প্রতিভার নতুন দিগন্ত এঁরা উদ্ভাসিত করেছিলেন।

এখানকার বাঙালি সন্তানেরাই কলাকৃতিকে উন্নতির উচ্চ সোপানে নিয়ে গিয়েছিল। রাণক শূলপাণিই তার বড় দৃষ্টান্ত। এখানকার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ সবই ছিল প্রাচীন যুগে দিনাজপুর জেলার ভূমিজ সন্তানদের বিশেষ দান। পাল রাজত্ব কালের সর্বশেষ রাজা মদনপালের সঙ্গে বিজয় সেনের সংঘর্ষ, লক্ষ্মণ সেনের সময় তুর্কি সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলজীর সংঘর্ষ, এইসব লড়াইয়ের মাধ্যমে সেন শাসনের অবসানের পর দিনাজপুর থেকে হিন্দু শাসনের অবসান ঘটে আর হিন্দুযুগের পরিসমাপ্তি ঘটলে সেখানে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যে কোনও সমাজই অগ্রসর হয় বিরোধের মধ্য দিয়ে, এটাই সমাজদর্শনের রীতি। লক্ষ্মণ সেনের সময় মুসলমানদের বঙ্গ আক্রমণের মধ্য দিয়ে তাই সমাজ দর্শন অনুযায়ী পুনরায় বঙ্গ সমাজেরই অগ্রগতি দেখা যায়।

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদিখণ্ড), পৃ. ২২০।
২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রাচীনযুগ), পৃ. ১৮৫।
৩. ঐ, পৃ. ১৮৭।
৪. ঐ, পৃ. ১৯১।
৫. ঐ, পৃ. ১৯৩।
৬. যোগেশচন্দ্র সরকার, *সচিত্র দিনাজপুরের ভূগোল ও বিজ্ঞানের কথা*, পৃ ২৩।
৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪, ১৯৫।

দ্বিতীয় পর্ব

মধ্যযুগ

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম রাজশক্তির অভ্যুদয়

১. দেবকোটে বখ্‌তিয়ার

আদি দিনাজপুর জেলা থেকেই বাংলায় মুসলিম আধিপত্যের সূচনা হয়েছিল। মুসলিম রাজশক্তির এই অভ্যুদয়ের প্রথম সূচক ছিলেন বঙ্গবিজয়ী তুর্কি বীর ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজী। যদিও 'নোদীয়হ্‌' অর্থাৎ নদীয়ায় লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এদেশে তাঁর বিজয় অভিযানের শুরু। বখ্‌তিয়ারের নবদ্বীপ বিজয় তথা মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা বাংলায় কোন্ বছর হয়েছিল সে সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। তবে অনেকের ধারণা, ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ জয় করেছিলেন। মীনহাজ-ই-সিরাজের মতে 'নোদীয়হ্‌' ও 'লখনৌতি' জয়ের পর বখ্‌তিয়ার লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন[১]। নদীয়া ও লখনৌতি অধিকার করার পর বখ্‌তিয়ার কার্যত স্বাধীন রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি বাংলার অধিকাংশই জয় করতে পারেন নি। বখ্‌তিয়ার নদীয়া ও লখনৌতি বিজয় করলেও পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের অধিকার অক্ষুণ্ণই ছিল। লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা এবং দেববংশের রাজারা তখন পূর্ববঙ্গ শাসন করেছিলেন। ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দেও মধু সেন নামে একজন রাজার রাজত্ব করার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের মতে, ত্রয়োদশ শতকের শেষ দশকের আগে মুসলিম রাজশক্তি পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গের কোনও অঞ্চলই জয় করতে পারেনি। সে কারণেই ত্রয়োদশ শতকের মুসলিম ঐতিহাসিকরা বখ্‌তিয়ারকে বঙ্গবিজেতা বলে উল্লেখ করেন নি। বখ্‌তিয়ার পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ জয় করে বাংলায় যে মুসলিম শাসনের প্রথম সূচনা করেছিলেন এটাই ছিল তাঁর কীর্তি। বখ্‌তিয়ার ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের অধিকারভুক্ত অঞ্চলকে মুসলিম ঐতিহাসিকরা 'লখনৌতি' রাজ্য বলেছেন, 'বাংলা রাজ্য' বলে উল্লেখ করেন নি।[২] আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 'নদীয়া'তে লক্ষণ সেনের আধিপত্য বখ্‌তিয়ার কর্তৃক লখনৌতিতে রাজ্য স্থাপনের পরও বজায় ছিল, ঐতিহাসিকদের দেওয়া তথ্য সূত্র ভাওয়াল তাম্রশাসনের তারিখ এবং বখ্‌তিয়ারের গৌড় বিজয় স্মারক মুদ্রা অনুসারে জানা যায়।

লক্ষ্মণ সেনের শাসনের অন্তিম বৎসরে উৎকীর্ণ ভাওয়াল লেখতে শত্রুর বিরুদ্ধে রাজপুত্রদের বিশেষ বীরত্ব বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন কুলজী গ্রন্থের বর্ণনায় ভিন্নতা

থাকলেও ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, লক্ষণ সেনের পুত্র কেশব সেন যবনের ভয়ে গৌড় ত্যাগ করে বঙ্গে গমন করেন। এতে বহু বিভিন্নতা থাকলেও কখনই লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের কথা বলা হয়নি। বখ্‌তিয়ার নদীয়া আক্রমণ করলেও লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে লক্ষ্মণ সেনের ক্ষয়ক্ষতি হলেও চূড়ান্ত পরাজয় হয়নি। লখনৌতি অঞ্চলে বখ্‌তিয়ার রাজ্য স্থাপনের পরেও নদীয়াতে লক্ষণ সেনের আধিপত্য বজায় ছিল।[২]

বখ্‌তিয়ার খিলজীর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় কুড়ি বছর পর্যন্ত দিনাজপুর জেলার অধীনে 'দেবকোট'ই ছিল বাংলার মুসলিম রাজশক্তির প্রধান কর্মকেন্দ্র। বখ্‌তিয়ার লখনৌতিতে তাঁর রাজধানী রাখলেও পরে লক্ষণাবতী থেকে দেবকোটে কেন রাজধানী সরিয়েছিলেন তার সদুত্তর পাওয়া কঠিন। তিব্বতে অভিযান চালানোর জন্য তিনি দেবকোটে এসেছিলেন তাও বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে অনেকে মনে করেন।[৩] আবার অনেকের ধারণা, যে কারণে লক্ষ্মণ সেন লক্ষণাবতী পরিত্যাগ করেছিলেন ওই একই কারণে বখ্‌তিয়ার ওই শহর ত্যাগ করেন। লক্ষ্মণ সেন ও বখ্‌তিয়ার খিলজী কি কারণে লক্ষণাবতী পরিত্যাগ করেন ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় কারণটির উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, ওই সময় গঙ্গা প্রথমে কালিন্দির খাত দিয়ে ও পরে মহানন্দার খাত দিয়ে প্রবাহিত হত। কিন্তু ক্রমশ নদী পশ্চিম দিকে সরতে থাকার ফলে শহরের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। এর ফলে লক্ষণ সেন ও বখ্‌তিয়ার লক্ষণাবতী শহর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। লক্ষণ সেন আরও দক্ষিণে নদীয়াতে চলে যান ও বখ্‌তিয়ার আরও উত্তরে যান।[৪] এখানে প্রশ্ন জাগে যে বখ্‌তিয়ার নদীয়া জয়ের পর লখনৌতি নগরে রাজধানী স্থাপন করে তাঁর আবাস স্থল ও শাসনকেন্দ্র রূপে দেওকোট নগরকে বেছে নিলেন কেন?

নদীমার্তৃক বাংলায় পুনর্ভবা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সমৃদ্ধ এই দেবকোট নগরী শুধু গুপ্তযুগ থেকে শাসনকেন্দ্র রূপেই নয়, ধর্ম-শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে এবং আন্তর্জাতিক স্থলপথ ও বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্ররূপে এই নগরের পরিচিতি ও মর্যাদা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই নগরে ছিল পাল-সেন রাজন্য বর্গের নির্মিত পরিখাবেষ্টিত দুর্গ, ছিল রাজকীয় প্রাসাদ ও হিন্দু-বৌদ্ধদের মন্দির-বিহার, অনেক বড় বড় দিঘি, ছিল রাষ্ট্রের অধিকরণ গৃহ, কোষ্ঠাগার, সার্থবাহ-বণিক-নাগরিকদের বাসগৃহ ও সৈন্য সামন্তের আবাসস্থল। পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির অধীনে কোটিবর্ষ বিষয়ের সমৃদ্ধ এই জনপদ মৌর্যযুগ থেকে আরম্ভ করে বঙ্গদেশে যে কয়েকটি জায়গায় নগরায়ণের কাজ শুরু হয়েছিল তার মধ্যে প্রাচীনতম মহাস্থানগড়ের পরেই ছিল দেবকোট। সুতরাং বখ্‌তিয়ারের কাছে এই নগরের আকর্ষণ যে পুরোমাত্রায় ছিল তা বলাই বাহুল্য। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, তুর্কি বিজয়ের অনেক আগে থেকেই এখানে বাঙালি জাতির আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে নেমে এসেছিল চরম বিপর্যয়। এই বিপর্যয় আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল বাংলার শেষ স্বাধীন নরপতি লক্ষ্মণ সেন। তিনি তাঁর পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে প্রথম থেকেই বৌদ্ধদের

দূরে সরিয়ে রেখে ইসলামপন্থী সুফি-সাধকদের সঙ্গে আপস-রফার মনোভাব নিয়ে শাসনকাজ চালাতে থাকেন। এর পরিণতিতে উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে দিনাজপুর ও মালদা অঞ্চলের অনেকেই ইসলামপন্থী সুফি সাধকদের অলৌকিক ক্রিয়া ও কর্মক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের ব্যভিচারের স্পর্শ থেকে বাঁচার আশায় ধর্মান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ সমাজে এই সময় মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল মূলত দুটি কারণে। একটি সামাজিক বৈষম্য ও বর্ণগত বাধা অপরটি, হিন্দু ও বৌদ্ধদের কলহ। তাছাড়া সুফি দরবেশরা তাঁদের সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের বাণীর মাধ্যমেও এখানকার গ্রাম্য লোক জীবনের বৃহত্তর অংশকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন. এটাও ছিল আরও একটি কারণ। তাঁদের মৃত্যুর শত শত বছর পরেও আজও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন দরগাগুলি হিন্দু ও মুসলমানের মিলনতীর্থে পরিণত হয়ে আছে।

২. বখ্‌তিয়ারের দেবকোট শাসন

১২০৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে তারিখে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজী ইসলামের বিজয়পতাকা দিনাজপুরের মাটিতে প্রোথিত করেন। দেবীকোট তুর্কিদের মুখের উচ্চারণে বাংলার মানচিত্রে সেদিন থেকে পরিবর্তিত রূপ নিয়ে দেওকোট, দেবকোট, দীওকোট রূপে পরিচিত হয়। দেবীকোটে বখ্‌তিয়ারকে স্বাগত জানানোর লোকের অভাব ছিল না। কারণ, যবন আসছে বলে দেবকোটের কট্টরপন্থী হিন্দুত্ববাদীরা এবং বৌদ্ধ দার্শনিক-পণ্ডিতেরা আগেই এখানকার আস্তানা গুটিয়ে নিয়ে পূর্ববঙ্গে গিয়ে নিরাপদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর একটা বড় অংশ যাঁরা পূর্ববঙ্গে আস্তানা গুটিয়ে পালিয়ে যেতে পারলেন না তাঁরা এখানে ওখানে লুকিয়ে থাকলেন। আর একটা অংশ যারা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন তাঁরা দেবকোটেই থেকে গেলেন। এই ধর্মান্তরিত অংশের মানুষের সহায়তায় দেবকোট দখল করতে বখ্‌তিয়ারকে কিছুটা কম বেগ পেতে হয়েছিল। ওদন্তপুরী বিহার আক্রমণের সময় বখ্‌তিয়ারের বাহিনীকে বাধা দেবার ফলে মুণ্ডিত শির বৌদ্ধ-শ্রমণদের রক্তে যেমন বিহারের মাটি রঞ্জিত হয়েছিল, তেমনি বখ্‌তিয়ারের আগমনে দেবকোটের মাটিও কিছুটা রক্তসিক্ত হয়েছিল। বিনারক্তপাতে বখ্‌তিয়ার দেবকোট দখল করতে পারেননি। প্রথমেই তিনি দেবকোটের বৌদ্ধ চৈত্যকে, বহু হিন্দুমন্দির ও দেবতার মূর্তিগুলিকে ভেঙে ফেললেন এবং বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। মুসলিম সমাজের বিকাশের প্রয়োজনে হিন্দুদের মন্দির, প্রাসাদ, রাষ্ট্রের অধিকরণ গৃহ, নাগরিকদের বাস গৃহ ও সৈন্য সামন্তের আবাসস্থলগুলিকে তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্, মুসাফিরখানা, মহাফেজখানা ইত্যাদিতে পরিণত করলেন। এই অবস্থার ফলে দেবকোটের সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, এককথায় আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। একটি সম্পূর্ণ নতুন সমাজ ও ধর্মাশ্রয়ী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের এটিই ছিল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

দেবকোট পরিপূর্ণভাবে জয় করে বখ্‌তিয়ার অধিকৃত অঞ্চলের শাসনে মনোনিবেশ করেন। ঐতিহাসিক আবদুল করিম বাংলার সুলতানি আমলের ইতিহাসে লিখেছেন, বখ্‌তিয়ারের রাজ্যসীমা পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে

দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর শহর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৫] এই সমগ্র অঞ্চলগুলিকে বখ্‌তিয়ার কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করলেন এবং তাঁর সহযোগী বিভিন্ন সেনানায়ককে তিনি বিভিন্ন বিভাগের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। এইসব শাসনকর্তারা প্রায় সকলেই ছিলেন হয় তুর্কি না হয় খিলজী জাতীয়। রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে বখ্‌তিয়ার, আলীমর্দান, মুহম্মদ শিরান, হুসামুদ্দীন ইউয়জ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। বাংলার একটি অংশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বখ্‌তিয়ার খিলজী মুসলিম শাসনের যে সূচনা করলেন তা একটি নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্বে বখ্‌তিয়ার ও তাঁর শাসকেরা বিভিন্ন স্থানে প্রশাসনিক কেন্দ্র ও সামরিক ঘাঁটি তৈরি করতে লাগলেন। শাসনক্ষমতাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং মুসলিম সমাজ গড়ার লক্ষ্যে বখ্‌তিয়ার দিনাজপুর জেলার চিরামতি ও বালিয়া নামক নদী হতে খাল কেটে পরিখা নির্মাণ করে একডালা নামক স্থানে[৬] একটি দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করলেন। জেলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে করতোয়া নদীর পশ্চিমতীর ঘেঁষে অবস্থিত ছিল ঘোড়াঘাট অঞ্চল। এখানে তিনি প্রশাসনিক ও সামরিক কেন্দ্র তৈরি করলেন, সেইসঙ্গে ঘোড়াঘাট বড় জনপদ হিসেবে সমৃদ্ধি অর্জন করল। দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চলে ছিল মাহীসন্তোষ নামক একটি প্রাচীন শহর। এখানেও বখ্‌তিয়ার প্রশাসনিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন। এই মাহীসন্তোষ জনপদটির নাম পরবর্তীকালে বারবকাবাদ হয়েছিল। এছাড়া, এই জেলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জ, দেওতলা ও হেমতাবাদ, এই জায়গা তিনটিতেও তিনি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। এইসব অঞ্চলে বখ্‌তিয়ার ও তাঁর শাসকরা বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, ও খানকাহ্‌ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৩. তিব্বত অভিযান

দেবকোট বিজয়ের কিছুদিনের মধ্যেই বখ্‌তিয়ার তিব্বত জয়ের সংকল্প নেন। লখনৌতি ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তখন কোচ, মেচ ও থারু নামে জনজাতি সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল অধিকতর। এই সময় একদিন মেচ জনজাতির প্রধান সর্দার বখ্‌তিয়ারের হাতে ধরা পড়লে তার কাছে তিব্বত অভিযানের পথ-ঘাট, প্রধান প্রধান শহর বন্দর, ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করলেন। দেবকোটেই তিনি ধর্মান্তরিত করলেন মেচ উপজাতিদের প্রধানকে। ধর্মান্তরিত মেচ প্রধানের নাম হল আলীমেচ। এই আলীমেচ বখ্‌তিয়ারের তিব্বত অভিযানের পথ প্রদর্শক হলেন।

বখ্‌তিয়ার দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং তিব্বত-ভুটান সীমান্তে পৌঁছোলেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন না থাকায় তিনি পিছু হঠতে বাধ্য হন। পথে কামরূপ রাজের অসহযোগিতা এবং গেরিলা আক্রমণের ফলে অসহায় সমরনায়ক দশ হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র ১০০ (একশো) জন সৈন্য নিয়ে অতিকষ্টে দেবকোটে ফিরে আসেন। ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে, বখ্‌তিয়ারের এই অসফল অভিযান বা বিপর্যয়ের তারিখটি হল ৭ মার্চ, ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ।[৭] শত্রুপক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বখ্‌তিয়ারের বাকি সেনারা মারা গিয়েছিল।

দেবকোটে পৌঁছে অত্যাধিক মানসিক যন্ত্রণায় বখ্‌তিয়ার রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। যে সমস্ত খিলজী ও সেনা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের সাক্ষাতের সময় বিশেষ লজ্জায় তিনি ঘোড়ায় চলাফেরা থেকে বিরত থাকেন। কারণ, যখনই তিনি ঘোড়ায় চড়ে নগরে বের হতেন বিভিন্ন বাড়ির ছাদ ও রাস্তা থেকে বেশির ভাগ নারী ও শিশু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করত ও তাঁকে অভিশাপ দিত, গালিগালাজ করত। দিনের পর দিন এই মানসিক যন্ত্রণায় বখ্‌তিয়ার অসুস্থ হয়ে পড়েন।

৪. বখ্‌তিয়ারের অন্তিম শয়ান

আলীমর্দান নামে বখ্‌তিয়ারের এক দুঃসাহসী ও দুর্ধর্ষ আমির ছিল। দেবকোটের সীমান্ত অঞ্চলের (নারকোটি) জায়গির তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। বখ্‌তিয়ারের অসুস্থতার দুঃসংবাদ পেয়ে তিনি দেবকোটে আসেন। শরীর আরও খারাপ হলে বখ্‌তিয়ার বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। এইভাবে তিন দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কেউ তাঁর দর্শনলাভে আসে না। ঘরের দরজা বন্ধ করে তিনি বিছানায় পড়ে রইলেন। আলীমর্দান কোনও উপায়ে তাঁর কাছে গিয়ে বখ্‌তিয়ারের মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে ফেললেন। তখনও তাঁর প্রাণ ছিল। বাংলার মুসলিম রাজশক্তির অভ্যুদয়ের প্রথম সূচক তুর্কিবীর বখ্‌তিয়ারকে তিনি ছুরিকাঘাতে হত্যা করলেন।[৮] তিব্বত অভিযানের মত অসম্ভব কাজে মন না দিলে হয়ত এত তাড়াতাড়ি বখ্‌তিয়ারের দেহ দেবকোটের ভেজা মাটিতে শায়িত হত না। বর্তমান গঙ্গারামপুর থানার অধীনে নারায়ণপুরের পীরপাল গ্রামে যে প্রাচীন সমাধিস্থলটি দেখা যায় সেখানেই তিনি অন্তিম শয়ানে সমাধিস্থ হয়ে আছেন, এটাই জনশ্রুতি। তবে এর পেছনে কোনও ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। *তবাকাত-ই-নাসিরী*-র সূত্র মতে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ বখ্‌তিয়ার দেবকোটে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকেও বখ্‌তিয়ার খিলজী দেবকোটের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই তিনজন সহযোগী মুহম্মদ শিরান খিলজী, আলীমর্দান খিলজী ও হুসামুদ্দীন ইউয়জ খিলজী শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁরা দেবকোটে শাসনকাজ পরিচালনা করেছিলেন। শাসনকর্তা মুহম্মদ শিরান খিলজী ও আলীমর্দান খিলজীর শাসন আমলেও মুসলিম রাজ্যের রাজধানী ছিল দেবকোট। তাঁদের পরবর্তী শাসনকর্তা সুলতান গিয়াস-উদ্দীন ইউয়জ খিলজীর শাসন কালের প্রায় মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেবকোটই ছিল তাঁর রাজধানী। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে দেবকোট রাজধানীর মর্যাদা হারায় এবং ওই বছরেই দেবকোট থেকে রাজধানী লখনৌতিতে স্থানান্তর করা হয়।

খিলজী শাসকদের পরে দিনাজপুর অঞ্চল ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লি সুলতানদের অধীনে ছিল। তারপর এই অঞ্চলে ১৩২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানদের স্বাধীন শাসন চলছিল। ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে আবার দিনাজপুর অঞ্চল দিল্লি সুলতানদের অধীনে চলে যায়। ১৩৩৯ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় এই অঞ্চলে স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুরে এই স্বাধীন শাসন টিকে ছিল। তারপর থেকে দিনাজপুর জেলা ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আফগান ও মোগল শাসনের অধীন ছিল।[৯]

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব*, পৃ. ৪, ৫, ৬, ১২।

২. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ* (১ম খণ্ড),পৃ.৫৪৮-৪৯; রমেশচন্দ্র মজুমদার , *বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র*, পৃ. ১৪।

৩. অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর*, পৃ. ১৬৪।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

৫. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (সুলতানী আমল), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর, পৃ. ৬৯, ৭০।

৬. একডালা ঃ বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার অধীনে। কুশমণ্ডি থানার দক্ষিণ অংশ এবং বংশীহারী থানার উত্তর অংশে বালিয়া ও চিরামতি নদী দুটির মধ্যবর্তী প্রায় ২৫ বর্গ মাইল ব্যাপী।

৭. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 'Muhammad Bakhtyar's Expedition to Tibet', *Indian Historical Quarterly*, Vol.IX, 1993, পৃ. ৪৯।

৮. মিনহাজ উদ্দীন, *তবকাত-ই-নাসির*, আবুল কালাম মোহম্মদ যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত, পৃ. ৪২, ৪৩।

৯. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, ১৯৭৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলমান সমাজ বিস্তার

১. দেবকোটে ইসলামপন্থী সুফি সাধক

তুর্কি বিজয়ের পর দেবকোটে বিভিন্ন ধারায় যে নতুন নতুন চিন্তাভাবনার বিকাশ হয়েছিল সুফি ভাবধারা ছিল তার মধ্যে অন্যতম। সুফি সাধকরা ইসলামের বিজয়ী শাসকদের প্রাধান্য থেকে স্থানীয় মানুষদের চিন্তামুক্ত করতে এ দেশে ইসলামের এক সর্বজনপ্রিয় জনগ্রাহ্যরূপ দেন। বঙ্গদেশে সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে, সমাজ জীবনের বন্ধ্যাত্ব মোচনে সমান অধিকারের আদর্শ স্থাপন করাই ছিল সুফিবাদের শ্রেষ্ঠ অবদান। সুলতানি যুগে উত্তরা জনপথের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র দিনাজপুরের সামাজিক ইতিহাসে সে ক্ষেত্রে ইসলামপন্থী সুফি সাধকদের প্রবেশের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহাসিকদের ধারণা অনুযায়ী এ দেশের অভ্যন্তরে মুসলিম সমাজ গঠনের একটি প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া এগারো শতক থেকেই সূচিত হয়েছিল, কিন্তু এ বিষয়ে কোনও লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। ইতিহাসের সূত্র থেকে যেটুকু জানা যায়, তা হল এগারো ও বারো শতকে সেন রাজাদের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সমাজ জীবনে একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময় বর্ণবিভক্ত সমাজে একটি মিশ্র সমাজের সৃষ্টি হয়, যা সেই সময়কার সামাজিক ঐক্যকে বলিষ্ঠভাবে ধরে রাখতে পারেনি। এই বর্ণবিভক্ত ধর্মের অধিবাসীদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি ধর্মীয় বৈষম্য থাকায় বাংলার সমাজ কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। সেনযুগে বিশেষ করে লক্ষণ সেনের আমলে কঠোর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশেই মুসলমান সুফি সাধক শ্রেণির আগমন ঘটতে থাকে। বাইশ হাজার পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয় এই রকম গ্রামসমূহ সুফি সাধক শেখ মকদুম শাহজালাল তাব্রিজীকে তিনি দান করেছিলেন। লক্ষণ সেনের এই রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি সেকালের সমাজজীবনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া যে সৃষ্টি করেছিল তা বলাই বাহুল্য। জানা যায়, বখ্‌তিয়ার খিলজী মুসলিম সমাজ বিকাশের প্রয়োজনে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকাহ্ স্থাপন করেছিলেন যা এই অঞ্চলের মুসলিম সমাজ বিকাশকেই নিশ্চিত করেছে। দেবকোটে এই সময় থেকেই মুসলিম সমাজ বিকাশের পথ সৃষ্টি হতে শুরু করে। তের শতকের পর থেকে দিনাজপুর অঞ্চলে সুফি সাধকেরা যে আসতে শুরু করেন এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের চারপাশে যে মুসলিম সমাজের বিস্তার ঘটতে শুরু করে তা বিভিন্ন শিলালিপি থেকে ধারণা করা যায়। এই সময় তিন জন সুফির নাম পাওয়া যায়। এঁদের একজন শাহ্ নাসির উদ্দীন নেকমর্দান,

যাঁর সমাধি রয়েছে নেকমর্দান নামক গ্রামে।[১] অপর দু'জন হলেন, পীর বদরুদ্দীন, বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ থানায় যার সমাধি রয়েছে এবং বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের নিকটে মৌলানা আতা শাহ, যাঁর দরগা রয়েছে গঙ্গারামপুর ধলদিঘিতে। এদের মধ্যে শুধুমাত্র মৌলানা আতা শাহ-র নাম শিলালিপি প্রমাণে জানা যায়।[২] চারটি শিলালিপির সঙ্গে মৌলানা আতা-র নাম জড়িত। এই লিপিগুলি সুলতান-সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-১৩৮৯), জালাল উদ্দিন ফতেহ্ শাহ (১৪৮১-১৪৯৬), সামসুদ্দিন মুজাফ্ফর শাহ (১৪৯০-১৪৯৩) এবং আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) সময় উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

সুলতান রুকন উদ্দিন-কায়কাইয়ুসের সময় (১২৯১-১৩৩০) দেবকোটের বৌদ্ধ চৈত্যটি কিছুটা ভেঙে তার উপর একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। কালের আঘাতে মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ওইখানেই সাধক মৌলানা আতা শাহ-র দরগায় মসজিদের গায়ে সংলগ্ন ত্রিস্তর যে ফলকটি ছিল সুরক্ষার জন্য খুলে এনে দরগার দেওয়ালে লাগানো হয়েছিল। এই শিলালিপিতে জাফর খানের নাম পাওয়া যায়। সুলতান রুক্ন উদ্দিন-কায়কাইয়ুসের আমলে জাফর খান ছিলেন উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক শাসনকর্তা। তিনি উত্তরবঙ্গের শাসনকর্তা রূপে অধিষ্ঠিত থাকার সময় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারকল্পে বখ্তিয়ার সুরক্ষিত দেবকোটের বৌদ্ধ চৈত্য ভেঙে যে মসজিদ, মাদ্রাসা, ও উপাসনালয় স্থাপন করেছিলেন তিনিও বর্তমান মৌলানা আতা শাহ-র দরগার প্রশস্ত চত্বরে মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উপসনালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দের (৬৯৭ হিজরীবর্ষে মহরম মাস) ১৬ অক্টোবর মসজিদ, উপাসনালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রটি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার মাটিতে দিনাজপুরের দেবকোটেই প্রথম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই প্রথম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাংলারই প্রাদেশিক শাসনকর্তা জাফর খান। বর্তমানে সেই মসজিদ, উপাসনালয় ও মাদ্রাসার অস্তিত্ব না থাকলেও মৌলানা আতা শাহ্র দরগায় জাফর খানের সেই শিলালেখটি এখনও সংযুক্ত রয়েছে।[৩]

দিনাজপুর জেলায় চেহেল গাজীর সমাধির পাশে এবং মহিসন্তোষ নামক স্থানে মসজিদ নির্মাণের সাক্ষ্য বহনকারী আরও দুটি শিলালেখ পাওয়া গেছে। চেহেল গাজীর সমাধির পাশে[৪] মসজিদ নির্মাণের উৎকীর্ণ কাল ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ (৮৬৫ হিজরি)। শিলালিপি থেকে জানা যায় বারবক শাহের সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা উলুঘ নুসরত খান এই মসজিদটি তৈরি করেন এবং চেহেল গাজীর সমাধিও তিনি সংস্কার করেন। মহিসন্তোষে[৫] নির্মিত মসজিদটির শিলালিপি একটি সমাধির গায়ে পাওয়া যায়। শিলালিপিটির উৎকীর্ণ কাল ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ (৮৬৫ হিজরি)। মহিসন্তোষ থেকে আরও একটি মসজিদ নির্মাণের শিলালিপি পাওয়া যায় ১৪৭১ খ্রিস্টাব্দে (৮৭৬ হিজরি)। এই শিলালিপিতে উৎকীর্ণ হয়েছে বারবকাবাদ নামটি। বারবকাবাদ নামটি মহিসন্তোষের সঙ্গে অভিন্ন। অপর একটি শিলালিপির ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সময়েও এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল।[৬] এইসব থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে

দিনাজপুর জেলার চারদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একদিকে যেমন মুসলিম প্রশাসনিক ক্ষমতা বিস্তার লাভ করেছিল, অপরদিকে মসজিদ স্থাপন এবং সুফি সাধকদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে মুসলিম আধিপত্যের বিকাশকেও সুনিশ্চিত করে তুলেছিল।

২. সুফিদের অবদান ও কার্যকলাপ

ইসলামপন্থী সুফিদের আগমনে দিনাজপুর জেলায় শুধু মুসলিম সমাজ বিস্তারই নয়, একই সঙ্গে মুসলমান শাসক ও সুফি সাধকদের মাধ্যমে এখানে জ্ঞানের বিকাশ ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের চেষ্টা চলেছিল। দেবকোটে সুফি সাধকেরা এসেছিলেন মূলত পশ্চিম এবং মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর ভারত হয়ে। তাঁদের এই অঞ্চলে আসার সময়কাল মূলত দুটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। একটি ভারতে মুসলিম বিজয়ের আগে এবং দেবকোটে মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্বে। তুর্কি বিজয়ের আগে সাধক আদম শাহ, শাহ সুলতান মহী সওয়ার, মকদুম শাহ গজনভী, এই সব সুফি সাধকদের আগমনের কথা জানা যায়। কিন্তু এঁদের অবদান ও কার্যকলাপ অনেকটাই কিংবদন্তি নির্ভর। এঁরা সঠিক করে কোন্ সময়ে এদেশে এসেছিলেন ইতিহাসে তার সন্ধান পাওয়া যায় না। গৌড়বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্বে ও পরবর্তীতে বাহির দেশ থেকে বহু সুফিসন্ত এখানে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শেখ জালাল উদ্দীন তাব্রিজী, শেখ আখি সিরাজউদ্দিন, শাহ ইসমাইল গাজী, সেখ আলাউদ্দিন আলাউল হক, নূর কুতুব আলম প্রমুখ। সুফি মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর লেখা একটি পত্র থেকে দিনাজপুর জেলায় সুফিবাদের প্রভাব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। তার পত্র থেকে জানা যায় দেবগাও বা দেবকোটে, মহিসুনে (মহিগঞ্জ), দেওতলা (বর্তমান মালদহ জেলা) বিভিন্ন স্থানের সুফি সাধকেরা অতীন্দ্রিয় সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন এবং সেখানেই তাঁরা সমাধিস্থ হয়েছেন।[৭] সুফি সাধক আতা শাহ ও শেখ জালাল উদ্দিন তাব্রিজীর দিনাজপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এতটাই প্রভাব ছিল যে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অগণিত মানুষ তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা মূলত সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী, বিনয়ী, সংযমী, শিশুবৃদ্ধের প্রতি যত্নবান, মুসলিম-অমুসলিম সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং আড়ম্বরহীন জীবনযাপন করার কথা বলতেন। সুফি সাধকদের মূল কথাই ছিল মানুষের দয়া হবে সূর্যের মত, বিনয় হবে জলের মত এবং ধৈর্য হবে মাটির মত। তাঁদের মতে, ঈশ্বর সাধনা আর কিছুই নয়, বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করা ও ক্ষুধার্তকে আহার দেওয়া। আর্ত মানুষের সেবাই ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত। সুফি সাধকেরা আধ্যাত্মিক কাজের পাশাপাশি শিষ্য ও সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করার কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। প্রচুর মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

সুফি সাধকরা সাধারণত রাষ্ট্র ও শাসকদের প্রতি আচরণে শাসক শ্রেণি থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন। এর মূল কারণ ছিল তাঁরা যেন জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়েন। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে অনেক সময় দেখা যেত তাঁরা সুলতানের অন্যায়মূলক কাজে হস্তক্ষেপ করত। এর জন্য কঠোর সংঘাত ও শাস্তিও তাঁরা পেয়েছেন কিন্তু নিজেদের পথ ও মত থেকে সরে আসেন নি। এইসব কারণে মুসলিম শাসকদের

চেয়েও পীর, ফকির ও দরবেশদের প্রতি দিনাজপুর জেলার সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল অটুট এবং আজও তা রয়ে গেছে। মুকুন্দরাম ও বিজয়গুপ্তের লেখা থেকে জানা যায় যে, সুলতানি আমলে সুফিরা স্থানীয় মানুষের কাছে পীর অর্থাৎ আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে পরিচিত ছিলেন। হিন্দু অবতারবাদের সঙ্গে পীরবাদের বিস্তর মিল লক্ষ্য করা যায়। এর ফলেই দিনাজপুর জেলায় কেবলমাত্র ধর্মমত ছাড়া লোকাচার এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। এখানকার বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, বিবাহ প্রথা, আতিথেয়তা ও লোকাচারে একটা সমন্বয়ের ছাপ দেখা যায়। এই সমন্বয়, সম্প্রীতি ও সংহতির মিলন সেতু রচনার সূচকই ছিলেন ইসলামপন্থী সুফি সাধকরা।[৮]

৩. মুসলিম শাসনের দ্বিতীয় পর্ব ঃ ইলিয়াস শাহী বংশ

বাংলার একটি অংশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বখ্‌তিয়ার খিলজী মুসলিম শাসনের যে সূচনা করেছিলেন তার একটা নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ধারা ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সময়কাল ছিল মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্ব। পরবর্তী দুশো বছর ছিল বাংলার স্বাধীন সুলতানদের স্বাধীনতার যুগ। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে খিলজী-বলবনী-রাজবংশের সুলতান বহরম খান মারা যাবার পর ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ সোনার গাঁ ও লখনৌতি জয় করে বাংলার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করেন। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ ১৩৩৮ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর আমলে দেবকোট-লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন মুখলিশ নামে জনৈক ব্যক্তি। মুখলিশের সময় লখনৌতির শাসন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মুহম্মদ তুঘলকের অধীনস্থ বলবনী বংশের সুলতান কদর খানের সেনাবাহিনীর বেতন দাতা আলী মুবারক মুখলিশকে হত্যা করে লখনৌতি অধিকার করেন। লখনৌতিতে এই সময় কোন শাসনকর্তা না থাকায় আলী মুবারক বাধ্য হয়ে আলাউদ্দীন আলী শাহ নাম গ্রহণ করে নিজেকে লখনৌতির রাজা বলে ঘোষণা করেন। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ লখনৌতি বেশিদিন নিজের অধিকারে রাখতে পারেন নি ঠিকই, কিন্তু সোনার গাঁও সমেত পূর্ববঙ্গের বেশিরভাগ অংশই তাঁর দখলে ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ নামে এক ব্যক্তি (১৩৪৯-১৩৫২) পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। ওই সময় আলাউদ্দীন আলী শাহ-ই দিনাজপুর অঞ্চল শাসন করতেন। তিনি লখনৌতি থেকে পাণ্ডুয়ায় তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। এরপর প্রায় একশো বছর পাণ্ডুয়াই বাংলার রাজধানী ছিল।[৯] আলাউদ্দীন আলী শাহ (১৩৪১-৪২) মাত্র একবছর রাজত্ব করে পরলোক গমন করেন। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত শাহ জালালের দরগা আলাউদ্দীন আলী-শাহ-ই প্রথম নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এরপর লখনৌতি রাজ্যের অধীশ্বর হন আলী শাহর অধীনস্থ ইলিয়াস হাজী নামে এক ব্যক্তি। তিনি ষড়যন্ত্র করে আলাউদ্দীন আলী শাহকে বধ করেন এবং শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নাম গ্রহণ করে নিজে সুলতান হন।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৫৮ - ৫৯) লখনৌতি রাজ্যের অধীশ্বর হবার পর রাজ্যবিস্তার ও অর্থ সংগ্রহে মন দেন। তিনি সোনার গাঁ অঞ্চল অধিকার করে নেন।

উড়িষ্যা আক্রমণ করে চিল্কা হ্রদের সীমানা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে ৪৪টি হাতি সমেত প্রচুর ধনসম্পত্তি লুঠ করে আনেন। চম্পারণ, গোরক্ষপুর কাশী প্রভৃতি অঞ্চলও তিনি জয় করেন। এইভাবে, ইলিয়াস শাহ নানা রাজ্য জয় করায় এবং পুরাতন তুগলক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অনেক অঞ্চল অধিকার করায় দিল্লির সম্রাট ফিরোজ শাহ তুগলক ক্রুদ্ধ হন এবং ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ইলিয়াসের রাজধানী পাণ্ডুয়া জয় করে নেন। ইলিয়াস তার পূর্বেই পাণ্ডুয়া থেকে তাঁর লোকজন সরিয়ে নিয়ে একডালা নামক পাণ্ডুয়ার কিছু দূরে একটি দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই একডালা যেমনই বিরাট, তেমনি দুর্ভেদ্য দুর্গ। এর চারদিকে ছিল নদী দিয়ে ঘেরা। ফিরোজ শাহ কিছুকাল একডালা দুর্গ অবরোধ করে রইলেন। কিন্তু; ইলিয়াস আত্মসমর্পণের কোনও লক্ষণই দেখালেন না। অবশেষে একদিন ফিরোজের সেনারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ায় ইলিয়াস শাহ মনে করলেন ফিরোজ শাহ পেছনে হটে যাচ্ছেন। তখন তিনি একডালা দুর্গ হতে সসৈন্য বের হয়ে ফিরোজ শাহের বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। দুই পক্ষে যে যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধে ফিরোজ শাহ ইলিয়াসকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করতে পারলেন না। আক্রমণের সময় ইলিয়াশ শাহ প্রথমেই সম্মুখ যুদ্ধ না করে কৌশলে পশ্চাদপসরণ করেছিলেন। সেই সময় বর্ষা শুরু হয়েছে। চারদিকে জল প্লাবিত হওয়ার দরুন ফিরোজ শাহ ইলিয়াসের কয়েকটি হাতি জয় করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন এবং মানে মানে বাংলাদেশ হতে প্রস্থান করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই দুই সুলতানের মধ্যে সন্ধি হয়েছিল। একডালার যুদ্ধে ইলিয়াস শাহের সেনাদলে অধিকাংশই ছিল দিনাজপুর জেলার বাঙালি পাইক। এই পাইকদের বেশির ভাগই ছিল হিন্দু। পাইকদের দলপতি সহদেব এই যুদ্ধে প্রাণ দেন।

ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত একডালা দুর্গটি ছিল আদি দিনাজপুর জেলার অধীনে। বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কুশমণ্ডি থানার অধীনে একডালা নামক স্থানেই দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহের সঙ্গে বঙ্গেশ্বর ইলিয়াস শাহের যুদ্ধ হয়েছিল। চিরামতী এবং বালিয়া নদীর মধ্যবর্তী এই স্থানে একডালা দুর্গের ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু প্রত্নস্মৃতি এখনও দেখা যায়। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ সিংহাসনে বসেন। তাঁর অতুলনীয় কীর্তির নিদর্শন পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ। ভারতবর্ষে নির্মিত সমস্ত মসজিদের মধ্যে আদিনা মসজিদ আয়তনের দিক থেকে দ্বিতীয়। পিতার মত তিনিও মুসলিম সুফি সাধকদের সেবক ছিলেন। আদি দিনাজপুর জেলার অধীনে দেবকোটের বিখ্যাত সাধক মৌলানা আতা শাহর সমাধিতে তিনি একটি মসজিদ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ১৩৫৮ থেকে ১৩৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সিকন্দর শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে বসেন। লোকরঞ্জক ব্যক্তিত্বের জন্য অল্পদিনের মধ্যেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর আমলেই কয়েকবার চীন সম্রাটের দূতেরা বাংলার রাজদরবার পাণ্ডুয়ায় এসেছিলেন। তিনি কবি ও কাব্যামোদী ছিলেন। ইরানের কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। হিন্দু রাজা গণেশ ছিলেন ইলিয়াস শাহী বংশের একজন আমীর। রাজা গণেশ হিন্দু

হওয়ায় তাঁকে তিনি পদচ্যুত করেছিলেন। তার ফলে, রাজা গণেশ গিয়াসুদ্দীনের শত্রু হয়ে দাঁড়ান এবং শেষ পর্যন্ত তিনি চক্রান্ত করে গিয়াসুদ্দীনকে হত্যা করেন।[১০]

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ্ পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে বসেন। দুই বছর রাজত্ব করার পর (১৪১২-১৪) সৈফুদ্দীন মারা যান। সৈফুদ্দীনের পরে শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ্ শাহ্ পাণ্ডুয়ার সুলতান হন। শিহাবুদ্দীন রাজার পুত্র না হয়েও রাজ সিংহাসন লাভ করেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল অমিত শক্তিধর রাজা গণেশ তাঁর পিছনে ছিলেন বলেই। শিহাবুদ্দীনের রাজত্বকালে রাজা গণেশ বাংলার শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করেছিলেন এবং রাজকোষের দায়িত্ব তাঁরই হাতে ন্যস্ত ছিল। শিহাবুদ্দীন নামেমাত্র সুলতান ছিলেন। শিহাবুদ্দীন একবার চীন সম্রাটের কাছে দূত মারফৎ একটি পত্র সহ দিনাজপুর অঞ্চলের বিখ্যাত টঙ্গন ঘোড়া এবং এদেশে উৎপন্ন আরও নানান ধরনের জিনিস পাঠিয়েছিলেন। কারও কারও মতে গণেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ফলে গণেশ তাঁকে হত্যা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ্ সিংহাসনে বসেছিলেন। আলাউদ্দীন তখন শিশু ছিলেন এবং তাঁকে নামমাত্র রাজা করে গণেশই রাজ্য শাসন করেছিলেন। কয়েকমাস রাজত্ব করার পরেই আলাউদ্দীন সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন। গণেশই রাজা হবার ইচ্ছায় আলাউদ্দীনকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন। আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ্ সিংহাসনচ্যুত হওয়ার পরেই বাংলার স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস শাহী বংশের সমাপ্তি ঘটে। বাংলার সুলতানি যুগের ঘোর তমসাময় সেই দিনে নীরবে নিভৃতে বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে নিলেন এক হিন্দু রাজা। তিনি ছিলেন দিনাজপুর জেলারই ভূমিজ সন্তান।

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. নেকমর্দান : বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধীনে দিনাজপুর রানিশংকৈল উপজেলার অন্তর্গত।
২. Muhammad Enomul Haq, *A History of Sufism in Bengal.* Asiatic Society of Bengal (1975), p. 180.
৩. অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী, 'দেবকোটের এক দরগা : দুই দীঘি : তিন লিপি', *দধীচি*, শারদ সঙ্কলন, ১৪০৫, পৃ. ১৪০, ১৪১, ১৪২।
৪. চেহেলগাজী : বর্তমান দিনাজপুর জেলার কোতয়ালী উপজেলার অধীনে (বাংলাদেশ রাষ্ট্র)।
৫. মহিসন্তোষ : বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নওগাঁ জেলার অধীনে পত্নীতলা উপজেলার অন্তর্গত।
৬. Abdul Karim, *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal,* Asiatic Society of Bangladesh, 1992.
৭. আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, পৃ. ১৬, ১৭।
৮. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ. ১৪।
৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (মধ্যযুগ), পৃ. ৩২।
১০. ঐ, পৃ.৪৩।

তৃতীয় অধ্যায়

সুলতানি যুগে হিন্দু রাজা

১. রাজা গণেশ

বাংলার ইতিহাসে রাজা গণেশ ছিলেন একজন ব্যতিক্রম ধর্মী পুরুষ। তিনিই একমাত্র হিন্দু, যিনি বাংলার পাঁচশো বছরের উপরে মুসলিম শাসনের মধ্যে কয়েক বছরের জন্য হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানদের অন্যতম আমীর থাকাকালীন বাংলার রাজনীতিতে গণেশ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ রাজা আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং নিজের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সাহায্যে মুসলমান রাজত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে স্বয়ং বাংলার সিংহাসনে বসেছিলেন।

রাজা গণেশ ছিলেন আদি দিনাজপুর জেলার অধীনে ভাতুড়িয়া[১] অঞ্চলের একজন শক্তিশালী জমিদার। তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানদের আমীরও ছিলেন। বেশিদিন রাজত্ব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। গণেশের সিংহাসন অধিকার নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশ অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন। এর নেতৃত্বে ছিলেন বাংলার দরবেশরা। রাজা গণেশ কঠোরভাবে এই বিরোধিতা দমন করেন এবং কয়েকজন দরবেশকে তিনি মেরে ফেলেন। এর ফলে দরবেশরা তাঁর উপর আরও ক্ষোভে ফেটে পড়েন। দরবেশদের নেতা নূর কুৎব্ আলম উত্তর-পূর্ব ভারতের শক্তিশালী নৃপতি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কির কাছে উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় এক পত্রে লিখে জানালেন যে, গণেশ ঘোরতর অত্যাচারী এবং মুসলমানদের পরম শত্রু। ইব্রাহিমকে সসৈন্যে বাংলায় এসে রাজা গণেশকে সিংহাসনচ্যুত করতে অনুরোধ করলেন। ইব্রাহিম শর্কি এই পত্র পেয়ে এই ব্যাপারে জৌনপুরের দরবেশ আশরফ সিমনানীর উপদেশ চাইলেন এবং তাঁর মতামত নিয়ে বাংলার দিকে সেনাবাহিনীসহ রওনা হলেন। রাজা গণেশ ইব্রাহিম শর্কির বিপুল সামরিক শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। এই যুদ্ধে রাজা গণেশের পুত্র যদু (জিৎমল) পিতার পক্ষ ত্যাগ করে ইব্রাহিমের পক্ষে যোগ দিলেন, গণেশ তখন সিংহাসন ছেড়ে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। ইব্রাহিম যদুকে মুসলমান করে বাংলার সিংহাসনে বসালেন। যদু সুলতান হয়ে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ নাম গ্রহণ করলেন। জলালুদ্দীনের সিংহাসন আরোহণের ফলে বাংলায় আবার হিন্দু প্রাধান্যের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিবর্তন

যদিও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পুত্র জলালুদ্দীন নামে সুলতান রইলেন, কিন্তু তিনি পিতার কাছে পুতুলে পরিণত হলেন। বাংলাদেশে আবার হিন্দুধর্মের জয়পতাকা উড়তে লাগল। গণেশ আবার তার প্রতিপক্ষ দরবেশ ও অন্যান্য মুসলমানদের দমন করতে লাগলেন। এই সব ঘটনায় নূর কুৎব্ আলম অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি পরলোক গমন করলেন।

এই অবস্থার মধ্যে এদিকে রাজা গণেশ যখন নানা দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করলেন, তখন তিনি পুত্র জলালুদ্দীনকে অপসারিত করে স্বয়ং 'দনুজমর্দনদেব' নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে বসলেন। 'দনুজমর্দনদেব' এই নামে বাংলা হরফে ক্ষোদিত মুদ্রাও বের হল। এইভাবে 'দনুজমর্দনদেব' রূপে ১৪১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দ এবং ১৪১৮-১৯ খ্রিস্টাব্দের কিছু সময় পর্যন্ত রাজত্ব করার পর রাজা গণেশ মারা যান। ঐতিহাসিকদের ধারণা, রাজা গণেশ তাঁর পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত করেছিলেন এবং বন্দী করে রেখেছিলেন। জলালুদ্দীনের ষড়যন্ত্রেই গণেশের মৃত্যু হয় বলে কেউ কেউ মনে করেন।[২]

অল্প সময়ের জন্য রাজত্ব করলেও গণেশ বাংলার বেশির ভাগ অঞ্চলে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের প্রায় সমস্তটা এবং মধ্যবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু অংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি আদি দিনাজপুর জেলার এই দেশীয় লোকদের নিয়ে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। এই সেনাবাহিনীর সাহায্যেই গণেশ তাঁর পাণ্ডুয়ার রাজধানী সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন। রাজা গণেশ যে প্রতিপত্তিশালী, বিচক্ষণ কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞ রূপে সম্মানিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ ইতিহাসেই পাওয়া যায়। মুসলমানদের প্রতি গণেশের অত্যাচার সম্বন্ধে কোনও কোনও গ্রন্থে অতিরঞ্জিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আবার অনেকে বলেন, গণেশ অনেক মুসলমানের আন্তরিক ভালবাসাও লাভ করেছিলেন। তিনি বিখ্যাত আদিনা মসজিদের সংস্কার সাধন করে তাকে তার কাছারি বাড়িতে পরিণত করেছিলেন বলে কথিত। সমস্ত ফার্সি পুথিতে গণেশের নাম 'কান্‌স' লেখা হয়েছে, এই কারণে কারও কারও মতে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল 'কংস'।

২. রাজা গণেশ সম্পর্কে কিছু কথা

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে আদি দিনাজপুরের লোককবি কৃষ্ণদাস, তাঁর রচিত *শ্রীমদ অদ্বৈতবাল্য লীলা সূত্রং* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিখেছেন, সুলতানি আমলে দিনাজপুরের কর আদায় ও আভ্যন্তরীণ শাসনকাজের ভার ভৌমিকদের উপর দেওয়া হয়েছিল। এই ভৌমিকরাই ছিলেন দিনাজপুর অঞ্চলের জায়গির। এইসব ভৌমিকদের মধ্যে দিনাজপুরের ভৌমিক বংশীয় রাজা গণেশ[৩] একদা প্রবল পরাক্রান্তা হয়েছিলেন। তিনিই মুসলমান সুলতানকে অপসারণ করে স্বাধীন গৌড়েশ্বর হয়েছিলেন। লোককবি কৃষ্ণদাস লিখেছেন ঃ

যশঃ প্রসূণে স্ফুটিতে নৃসিংহ নাম্নঃ সদা মানুষ রাজকস্য।
তদ্ গন্ধ সন্দোহ বিমোহিতাত্মা রাজা গণেশো বহু শাস্ত্রদর্শী।।
কায়স্থ বংশাগ্র্য বরোগুণজ্ঞো লোকানুকম্পী বর ধর্ম্মযুক্ত।

দাতা সুধীরো জনরঞ্জকশ্চ শ্রী বিষ্ণু পাদাব্জযুগানুরক্ত।।
দুতৈঃ সমানীয় নিজস্য ধাম্নি দিনাজপুরে বহু সভ্যযুক্তে।
তস্মিন্ নৃসিংহং লাড়ুলীত্যুপাধৌ সংনস্য মন্ত্রিত্বমবাপ্য ভদ্রং।।
তদ্‌যুক্তি চাতুর্য্য বলেন রাজা শ্রীমদ্ গণেশো বরদস্যু রূপান্।
গৌড়স্য পালান্ যবনাত্মজান্‌হি জিত্বা চ গৌড়শ্বর তামবাপ।।
গ্রহপক্ষাঙ্কি শশধৃঙ মত্তে শাকেসবুদ্ধিমান্।
গণেশো যবনান্ জিত্বা গৌড়ে কচ্ছত্রধৃগভূৎ।।[৪]

ঈশান নাগর কৃত *অদ্বৈত প্রকাশ*-এ লিখিত আছে যে, অদ্বৈতাচার্যের পিতামহ নরসিংহ নাড়িয়ালের মন্ত্রণাবলে রাজা গণেশ গৌড়াধিপ হয়েছিলেন। *অদ্বৈত প্রকাশ* নামক বৈষ্ণবগ্রন্থের কিছু অংশ ঃ

যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার বংশজাত।।
যেই নরসিংহ যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ।।
যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রী গণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদসাহে মারি গৌড়ে হৈল রাজা।।

এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনে থেকে গৌড়বাসী এই গণেশ নৃপতির সময়ে কিছুদিনের জন্য স্বাধীনতার উজ্জ্বলমূর্তি দর্শন করেছিলেন। এই সুদিনে গৌড়ে ব্রাহ্মণ সমাজও সমাজ সংস্কারে মনোযোগী হয়েছিল।[৫]

বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত আটমাইল উত্তরে হেমতাবাদ থানার সীমান্ত লাগোয়া কমলাবাড়ি হাট। বিস্তৃত এলাকা কসবা মহশো নামেও পরিচিত। এই স্থানের চারপাশে প্রায় আধমাইল অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে নানা পুরাকীর্তির নিদর্শন। ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বসু আজ থেকে প্রায় ৮২ বছর আগে এই স্থান পরিদর্শন করেছিলেন। প্রত্নবিভাগও এই প্রত্ন সমৃদ্ধ অঞ্চলটি দীর্ঘকাল ধরে অবহেলায় অনুসন্ধানহীন অবস্থায় ফেলে রেখেছেন। এই অবহেলার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ আমরা জানি না। প্রায় দুশো বছরের কিছু আগে ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন সাহেব এই অঞ্চল ঘুরে গিয়ে লিখেছিলেন "It is said that formerly there governed at this place a Hindu Raja named Mahes, to whome much of the neighbouring country was subjet." রাজা মহশোর রাজত্বকালে বাজরুদ্দীন নামে এক সুফি সাধক এখানে বসতি গড়েন। তার অল্পকাল পরেই আসেন মুকদুম ঘুরিবল হোসেন দোকোর পোস নামে আরও একজন পীর। বুকানন সাহেবের রিপোর্টে আছে, "The Pir, I should suppose, was accompanied by and army .... on the contrary, it is said that the Raja fled Mercle because he was shoked at the destruction which the two barbarian saints and their attendants, committed on innocent cattle and poultry." মুকদুম গয়াদুল হোসেন নামক এক মৌলানা সাধক বাহাত্তর

জন সঙ্গী সহ এই অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং যুদ্ধে রাজা মহশোকে পরাজিত করে ধর্ম প্রচারে নামেন। এই রকম জনশ্রুতি থেকে এঘটনাই প্রমাণ করে যে এখানে সুলতানি যুগে পীর-ফকির-দরবেশদের অনমণীয় আধিপত্য ছিল। যার ফলে রাজা মহশো বিতাড়িত হয়েছিলেন। এই রাজা মহশো কে এবং কী তার পরিচয়, ইতিহাস তার সঠিক সন্ধান দিতে পারেনি।

কসবা মহশোয় রাজা গণেশের রাজধানী ছিল, এই অঞ্চলে এটাই জনশ্রুতি। গণেশ যখন পাণ্ডুয়ার সিংহাসন অধিকার করেন তখন তাঁর সিংহাসন অধিকার নিয়ে যাঁরা চরম বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন বাংলার পীর-ফকির-দরবেশরা। কসবা মহশো অঞ্চলে এই পীর ফকিরদের দৌরাত্ম্য গণেশ কঠোর হাতেই দমন করেছিলেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু গণেশের পুত্র যদু যখন নিজ ধর্ম বিসর্জন দিয়ে ইব্রাহিম শর্কির পক্ষে যোগ দিলেন তখন গণেশ কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছিলেন এবং পীর ফকির দরবেশদের দ্বারা তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন। রাজা গণেশের কমলাবাড়ি বা কসবা মহশোয় দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করাও অসম্ভব নয়। তিনি ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্পন্ন একজন শক্তিশালী জমিদার ছিলেন। হেমতাবাদের উত্তর-পূর্বে ভাতুড়িয়া বলে যে অঞ্চলে তিনি ছিলেন, লোক প্রচলিত অর্থে যে স্থানটি বর্তমানে ভাতুড়া (জে এল নং ৬৯) নামে পরিচিত, সেখান থেকে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কসবা মহশো ও ছোট পাড়ুয়া (পাণ্ডুয়া) অঞ্চল, লোকশ্রুতি এই ছোট পাড়ুয়া বা পাণ্ডুয়ায় গণেশের কাছারি ছিল। রাজা গণেশের রাজত্বকাল মাত্র চার বছর। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে বিরোধী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হলেও তাঁর বিচক্ষণতা ও কূটনৈতিক প্রয়াসের সূত্রে এখানে গণেশের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করা অসম্ভব কিছু নয়। কমলাবাড়ি ও ছোট পাড়ুয়া অঞ্চলের পুরাকীর্তি রাজা গণেশের দ্বিতীয় রাজধানীরই ধ্বংসাবশেষের স্মৃতিচিহ্ন বলে মনে হয়।

৩. রাজা গণেশের পুত্র মহেন্দ্রদেব

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠপুত্র মহেন্দ্রদেব পিতার সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি যদু বা জলালুদ্দীনের ছোট ছিলেন। ১৩৪০ শকাব্দে মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা পাওয়া যায়। মহেন্দ্রদেব সিংহাসনে বসার অল্প দিনের মধ্যে জলালুদ্দীন তাঁকে অপসারিত করে সিংহাসন পুনরধিকার করেন। ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল হতে ১৪১৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি, এই নয় মাসের মধ্যে দনুজমর্দনদেব, মহেন্দ্রদেব ও জলালুদ্দীন তিনজন রাজাই রাজত্ব করেছিলেন বলে বিভিন্ন মুদ্রার সাক্ষ্য হতে জানা যায়। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন, মহেন্দ্রদেব জলালুদ্দীনেরই হিন্দু নাম, পিতার মৃত্যুর পর জলালুদ্দীন কিছু সময়ের জন্য এই নামে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন। এই মত গ্রহণযোগ্য নয় বলে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন। মহেন্দ্রদেব তাঁর মুদ্রায় নিজেকে 'চণ্ডীচরণ পরায়ণ' বলেছেন, যা নিষ্ঠাবান মুসলমান জলালুদ্দীনের পক্ষে সম্ভব নয়।[৬] বর্তমান হরিরামপুর থানার অধীনে একডালাদুর্গের কাছেই একটি বড় গ্রাম মহেন্দ্র[১] রাজা

গণেশের কনিষ্ঠপুত্র মহেন্দ্রদেবের স্মৃতি চিহ্নিত, এটাই জনশ্রুতি। এখানে বড় বড় দিঘি, প্রচুর ভগ্ন শিলা ও পুরাতন ইট প্রমাণ করে যে, এই স্থান পূর্বে একটি পরিকল্পনা প্রসূত সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল, দূরে একটি বড় স্তূপ দেখিয়ে স্থানীয় মানুষেরা বলেন, 'মহেন্দ্র রাজার বাড়ি'।

৪. জলালুদ্দীন বা যদু

রাজা গণেশের জ্যেষ্ঠ পুত্র জলালুদ্দীন বা যদু বাংলায় দুই দফায় রাজত্ব করেছিলেন। প্রথমবার ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বার ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কেউ কেউ বলেন, যদু বা জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের আসল নাম ছিল জিতমল্ল। বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত রায়গঞ্জ থানার পূর্বে জিতমলপুর নামক একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল, যা রাজা গণেশের পুত্র যদুর স্মৃতিচিহ্নবিজড়িত বলে কথিত। প্রত্নরত্নময় এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলই ছিল রাজা গণেশের পুত্র জিতমল্লের। এই স্থানটির নাম দেখে ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেছেন জলালুদ্দিনের প্রকৃত নাম ছিল জিতমল্ল।[৮] ঐতিহাসিক স্টুয়ার্টের মতে, জিতমল্ল ছিলেন রাজা গণেশের এক মুসলমান পত্নী বা উপপত্নীর গর্ভজাত। সে কারণে মুসলমানেরা জিতমল্লের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। জিতমল্ল তাঁর পিতার আদেশেই ১২ বছর বয়সে নূর কুৎব্ আলমের কাছে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন বলে *রিয়াজ-উস্-সলাতিন্* গ্রন্থে গোলাম হোসেন সালিম লিখেছেন।

গণেশের পুত্র যদু মধ্যে মধ্যে পালিয়ে মুসলমান হতে যেত। তিনি পুত্রকে ধরে আনতেন। যদুর এই আচরণে রাজা গণেশ দু-একবার প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। একবার সোনার ধেনু প্রস্তুত করে যদুকে তার মধ্য দিয়ে টেনে বের করেন এবং সোনার ধেনু ব্রত উদ্‌যাপন করে সেই স্বর্ণ ধেনু রাজা গণেশ ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। তা সত্ত্বেও যদু মুসলমান হলেন এবং জলালুদ্দীন নাম ধারণ করে হিন্দুদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে সুবর্ণধেনু ব্রত অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই কাজের অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণদের প্রত্যেককে তিনি গরুর মাংস খাইয়ে দিয়ে জোর করে মুসলমান করেছিলেন।[৯] এই সময় হিন্দু রাজার অনুকরণে অনেক হিন্দু মুসলমান হয়েছিলেন। জলালুদ্দীন সিংহাসনে বসার সময় সুবিখ্যাত সাধু সেখ সাহেদকে সোনার গাঁ হতে এনে তাঁরই নির্দেশে রাজকাজ করতেন। তিনিই রাজধানী পাণ্ডুয়া হতে গৌড়ে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং বহু শিল্পকলা সমন্বিত বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করে প্রাচীন গৌড় নগর সু-সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁর আমলে নির্মিত ভগ্ন মসজিদ, অতিথিশালা, দিঘি প্রভৃতি বর্তমানে 'জালালী কীর্ত্তি' বলে পরিচিত। জলালুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণের পর পূর্ব বাংলায় মুসলমান ধর্ম বিস্তারের জন্য ঘোষণা করেছিলেন যে, হিন্দুদের হয় মুসলমান হতে হবে নয়ত খড়্গামুখে প্রাণ দিতে হবে। জলালুদ্দীনের এই ঘোষণা হওয়ার পর প্রাণভয়ে অনেকে কামরূপ রাজ্যে এবং আসাম ও কাছাড়ের জঙ্গলে পালিয়ে যান। এই সময় দিনাজপুর জেলাসহ পূর্ববঙ্গের যে সব অনার্যজাতি আর্যসমাজের নিম্নস্তরে

বাস করত তাদের অনেকে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। এই জন্যই পূর্ব বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা অধিক।[১০] এই সময়, গৌড়-পাণ্ডুয়াকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গে ইসলাম ধর্মের যে বিস্তৃতি ঘটেছিল তা হয়েছিল মূলত স্থানীয় নিম্নবর্গীয় হিন্দু সমাজের ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে।

জলালুদ্দীনের প্রথমবারের রাজত্বকালে তাঁর রাজসভায় চীন সম্রাটের দূতেরা এসেছিলেন। চীনাদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, জলালুদ্দীন প্রধান দরবার ঘরে বসে চীনা রাজদূতদের দর্শন দিয়েছিলেন এবং চীনের সম্রাট কর্তৃক প্রেতিত পত্র গ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি চীনা দূতদের এক ভোজ দিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন, এই ভোজে মুসলমানী রীতি অনুযায়ী গরুর মাংস দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সুরা দেওয়া হয় নি। জলালুদ্দীনের দ্বিতীয়বার রাজত্বকালের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তিনি ইসলামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং রাজা গণেশ যে সব মসজিদ ভেঙে ফেলেছিলেন সেগুলির সংস্কার সাধন করেন। বাংলায় সুলতানি শাসনের দুশো বছর ধরে সুলতানদের মুদ্রায় 'কলমা' উৎকীর্ণ হত না, জলালুদ্দীনই প্রথম তাঁর মুদ্রায় 'কলমা' খোদাই করান। রাজত্বের শেষ দিকে তিনি 'খলীফৎ আল্লাহ্' অর্থাৎ ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী উপাধি গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে, জলালুদ্দীনের সমসাময়িক *স্মৃতিরত্ন হার* নামক একটি গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, এই জলালুদ্দীনই রায়রাজ্যধর নামক একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুকে তাঁর সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেছিলেন। *স্মৃতিরত্ন হার* পুস্তকের লেখক বৃহস্পতি মিশ্রও জলালুদ্দীনের কাছে কিছু সমাদর পেয়েছিলেন। এতে বোঝা যায় যে, জলালুদ্দীন হিন্দুধর্মের অনুরাগী না হলেও যোগ্য হিন্দুদের মর্যাদা দান করতেন।[১১] মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে, জলালুদ্দীন সুশাসক ও ন্যায় বিচারক ছিলেন। তিনি জনকীর্ণ পাণ্ডুয়া নগরী ছেড়ে গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করে সমগ্র বাংলা ও আরাকান ছাড়াও ত্রিপুরা ও দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশে রাজত্ব করেছিলেন। ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। পাণ্ডুয়ায় একলাখী প্রাসাদে সুলতান জলালুদ্দীনের সমাধি রয়েছে।

যদু বা জলালুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন আহ্মদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৬ অথবা ১৮ বছরের মত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কারণ, শামসুদ্দীন আহ্মদশাহের রাজত্বের প্রথম বছর অর্থাৎ ১৪৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দ ছাড়া আর কোনও বছরের মুদ্রা পাওয়া যায় নি। বুকাননের বিবরণ অনুযায়ী শামসুদ্দীন তিন বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি মহান, উদার, ন্যায়পরায়ণ এবং দানশীল নৃপতি ছিলেন। আবার, *রিয়াজ-উস্-সলাতীন্* গ্রন্থে শামসুদ্দীন আহ্মদ-শাহকে বদমেজাজী, অত্যাচারী এবং রক্ত পিপাসু সুলতান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনিই এতই রক্তপিপাসু ছিলেন যে বিনাকারণে মানুষের রক্তপাত করতেন এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করতেন। ঐতিহাসিকদের মতে, শামসুদ্দীনের দুইজন ক্রীতদাস ছিল। এদের একজনের নাম সাদী খান অপরজন, নাসির খান। এরাই ষড়যন্ত্র করে শামসুদ্দীন আহ্মদশাহকে হত্যা করেন। ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, আহ্মদশাহ ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে রাজা হয়েছিলেন এবং ১৪৪২

খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। শামসুদ্দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় হিন্দুরাজা গণেশের বংশের রাজত্ব শেষ হয়।[১২]

উল্লেখ্য যে, ইলিয়াস শাহী বংশের ৯ জন এবং রাজা গণেশের বংশে ৪ জন, মোট ১৩ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ১১ জন রাজা আদি দিনাজপুর জেলার অধীনে পাণ্ডুয়ায় রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, মোট ৫২ বৎসরের আরও কিছু বেশিদিন পাণ্ডুয়ায় রাজধানী ছিল। গণেশের পুত্র জলালুদ্দীনের সময় থেকে কল্লোলমুখর পাণ্ডুয়া নগরী রাজধানীর মর্যাদা হারায় এবং গৌড় তখন থেকেই রাজধানীর মর্যাদা ফিরে পায়।[১৩]

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. ভাতুড়িয়া : রজনীকান্ত চক্রবর্তী, *গৌড়ের ইতিহাস* (মুসলিম যুগ) গ্রন্থে লিখেছেন 'ভাতুড়িয়া' রাজশাহী জেলার অধীনে (ভাতুড়িয়া পরগনা)। দুর্গাচরণ সান্ন্যাল *বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস* পুস্তকে লিখেছেন 'ভাতুড়িয়া' দিনাজপুর জেলার অধীনে। 'ভাতুড়িয়া' যে দিনাজপুর জেলার (বর্তমান উত্তর দিনাজপুর) হেমতাবাদ থানার অন্তর্গত ভাতুরা অঞ্চল (জে. এল. নং ৬৯) এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ভালভাবে গ্রামটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় উঁচু ভূখণ্ডের চারদিকে বৃত্তাকার পরিখাবেষ্টিত এবং মাটি খুঁড়লেই প্রাচীন ইট যেখানে সেখানে পাওয়া যায় এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। স্থানীয় মানুষেরা এই অঞ্চলটিকে আজও রাজা গণেশের গড় বলে থাকেন। কথিত যে, হেমতাবাদের পশ্চিমে ছোট পাড়ুয়াতে (পাণ্ডুয়া) রাজা গণেশের একটি কাছারি ঘর ছিল।

২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (মধ্যযুগ), পৃ. ৪৮।

৩. রাজা গণেশ : ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেন, রাজা গণেশ ব্রাহ্মণ কুলজাত ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণিভুক্ত ছিলেন, বিশেষত মুসলমান ঐতিহাসিকরা তাঁকে ভাতুড়িয়ার জমিদার রূপে উল্লেখ করেছেন। এই ভাতুড়িয়া হতে প্রসিদ্ধ ভাদুড়ী বংশের উদ্ভব হয়েছে (দ্রষ্টব্য : *বৃহৎবঙ্গ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৪)। আবার কেউ কেউ বলেন, রাজা গণেশ ছিলেন উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ (দ্রষ্টব্য : নগেন্দ্রনাথ বসুর *বঙ্গীয় রাজন্য কাণ্ড* এবং দুর্গাচরণ সান্যালের *বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, পৃ. ১৮৮-১৮৯)।

৪. প্রভাস চন্দ্র সেন, বি. এল, *বগুড়ার ইতিহাস*, পৃ. ২৪২-২৪৩।

৫. নগেন্দ্রনাথ বসু, *বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস* (বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ), পৃ.৬২।

৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

৭. মহেন্দ্র : বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধীনে হরিরামপুর থানার অন্তর্গত।

৮. রজনীকান্ত চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃ. ৪৫।

৯. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ* (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ. ৬২৭।

১০. রজনীকান্ত চক্রবর্তী, *গৌড়ের ইতিহাস* (২য় খণ্ড, মুসলমান রাজত্ব), পৃ. ৪৬।

১১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

১২. দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৭।

১৩. রজনীকান্ত চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

চতুর্থ অধ্যায়

পরবর্তী মুসলিম রাজবংশ

১. দিনাজপুরে মাহমুদ শাহী বংশ ও হাবশী রাজত্ব

রাজা গণেশের রাজবংশের পতনের পর বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে নেন মাহমুদ শাহী বংশ। শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহেব পরবর্তী সুলতান রূপে সিংহাসনে বসেন নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ্‌। তাঁর সিংহাসনে আরোহণ নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক রয়েছে। *রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন্‌*-এর মতে তিনি ছিলেন ইলিয়াস শাহের বংশধর। আবার বুকাননের বিবরণীতে নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহকে ইলিয়াস শাহের বংশধর বলা হয়নি। তিনি ২৪/২৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন। গৌড় নগরীতে তিনি অনেক দুর্গ ও প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি সুযোগ্য নৃপতি ছিলেন এবং ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার সঙ্গে সমস্ত কাজ করতেন। দেশের মানুষ তাঁর শাসনে সন্তুষ্ট ছিল। ইনি ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকাজ পরিচালনা করেন। দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রুকনুদ্দীন বারবক শাহ্‌ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বারবক শাহ্‌ মোট একুশ বছর ১৪৫৫ হতে ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। প্রথমে তিনি পিতার সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেছিলেন, অবশিষ্ট সময়ে এককভাবে। উল্লেখ্য এই যে, বাংলার সুলতানদের মধ্যে অনেকেই নিজের রাজত্বের শেষের দিকে পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন। সুলতানদের মৃত্যুর পর যাতে তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে সংঘর্ষ না বাধে, সেজন্যই এই অভিনব প্রথার প্রচলন হয়েছিল। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক মিস্টার ওয়েস্ট মেকট সাহেব চেহেলগাজীর মসজিদ থেকে একটি শিলালিপি উদ্ধার করেন। ওই শিলালেখটি ছিল রুকনুদ্দীন বারবক শাহ সুলতানের রাজত্ব কালের। ঐতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তী দিনাজপুরে আবিষ্কৃত ওই প্রস্তরলিপি অনুসরণ করে বলেন যে, ৮৬৫ হিজরী সনের অর্থাৎ ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বরের কিছু আগে তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন।[১]

বারবক শাহ্‌ অনেক নতুন রাজ্য জয় করে নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইসমাইল গাজী নামে একজন ধার্মিক ব্যক্তি বারবক শাহের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ইসমাইল গাজী কামরূপের রাজা কামেশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন, কিন্তু রাজা তাঁর অলৌকিক মহিমা দেখে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[২]

তখন দিনাজপুরের অধীনে ঘোড়াঘাট দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন ভান্দসী রায়। ইসমাইল গাজীর বিরুদ্ধে তিনি সুলতানের কাছে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ করেন। এই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার দরুন সুলতান বারবক শাহ ইসমাইলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাঁর আমলে দিনাজপুর জেলা সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে উন্নত হয়েছিল। দিনাজপুরের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত মহিসন্তোষ নামক স্থানে বারবক শাহ একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং একটি টাঁকশাল স্থাপন করেছিলেন। সমৃদ্ধ এই জনপদটি পরবর্তীতে তাঁরই স্মরণে বারবকাবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর রাজধানী গৌড় নগরী এতই উন্নত হয়েছিল যে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফেরিয়া-ই-সুজা নামক একজন পর্তুগিজ ঐতিহাসিক স্বচক্ষে ওই গৌড় নগর পরিদর্শন করে লিখেছিলেন যে, 'গৌড়ের লোকসংখ্যা ১২ লক্ষ। নগরে এত লোক সমাগম হয় যে, অনেকে পায়ের তলায় চাপা পড়ে মারা যায়। পথগুলি ছিল প্রশস্ত ও সরল। পথের উভয় ধারে বড় বড় গাছ পথিকদের উত্তাপ হতে রক্ষা করে।'[৩]

বারবক শাহ শুধু পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের অনেক কবি ও পণ্ডিত তাঁর কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বৃহস্পতি মিশ্র। *গীতগোবিন্দ টীকা, কুমারসম্ভব টীকা, রঘুবংশ টীকা, শিশুপালবধ টীকা, অমরকোষ টীকা, স্মৃতিরত্নহার* প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁরই রচিত। দিনাজপুরের সুজলা সুফলা মাটি তাঁর সাহিত্য চর্চার মননকে উর্বর করেছিল। রাজা গণেশের পুত্র জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের সেনাপতি রায় রাজ্যধর ছিলেন বৃহস্পতি মিশ্রের শিষ্য ও পৃষ্ঠপোষক। বারবক শাহ বৃহস্পতি মিশ্রকে 'পণ্ডিত সার্বভৌম' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। রাজা তাঁকে দিয়েছিলেন উজ্জ্বল মণিময় হার, দ্যুতিমান দুটি কুন্তল, রত্নখচিত দশ আঙুলের অঙ্গুরীয়, এসব দিয়ে হাতির পিঠে চড়িয়ে সোনার কলসের জলে অভিষেক করে ছত্র ও অশ্বের সঙ্গে 'রায়মুকুট' উপাধিও দান করেছিলেন। *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* নামক বিখ্যাত বাংলা কাব্যের রচয়িতা মালাধর বসুকে তিনি 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন। বাংলা রামায়ণ-এর রচয়িতা কবি কৃত্তিবাসকেও তিনি বিপুল সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে কৃত্তিবাসকে যিনি গৌড়েশ্বর সংবর্ধনা দিয়েছিলেন তার নাম রুকনুদ্দীন বারবক শাহ।[৪] কবি গৌড়েশ্বরের রাজসভায় 'চন্দনের ছড়া' মাধ্যমে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। নয় দেউড়ী পার হয়ে সুবর্ণ যষ্টিধারী রাজদূত তাঁকে রাজসভায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে দ্বাররক্ষক উচ্চৈস্বরে তাঁর আগমন জ্ঞাপন করেছিলেন। কৃত্তিবাস যেদিন রাজার দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন সেদিন নগরীতে ধন্য ধন্য শব্দে চারদিক মুখর হয়ে উঠেছিল। বঙ্গসাহিত্যে সে এক শুভ মুহূর্ত।[৫] বারবক শাহ যে উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় হিন্দু কবি পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা হতে। বারবক শাহ হিন্দুদের উচ্চ রাজপদেও নিয়োগ করেছিলেন। দিনাজপুর অঞ্চলের বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ্ নারায়ণ দাস ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক। ভান্দসী রায় ছিলেন তাঁর রাজ্যের সীমান্তে ঘোড়াঘাট অঞ্চলে একটি দুর্গের অধ্যক্ষ। বারবক শাহের শিলালিপি থেকে নসরৎ খান সহ আরও অনেক

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আঞ্চলিক শাসনকর্তা। এই নসরৎ খান ছিলেন দিনাজপুর শহরের উপকণ্ঠে প্রাচীন গোপালগঞ্জ (চেহেলগাজী) অঞ্চলের সুলতানি প্রশাসনিক কেন্দ্রের আঞ্চলিক শাসনকর্তা। বারবক শাহ ছিলেন একজন সত্যিকার সৌন্দর্য রসিক। তাঁর প্রাসাদের একটি সমসাময়িক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, প্রাসাদটির মধ্যে উদ্যানের মত একটি শান্ত ও আনন্দদায়ক পরিবেশ বিরাজ করত। এর নীচ দিয়ে একটি পরম রমণীয় জলধারা প্রবাহিত হত এবং প্রাসাদটিতে মধ্য তোরণ নামে একটি অপূর্ব সুন্দর বিশেষ প্রবেশপথ হিসাবে নির্মিত তোরণ ছিল। বারবক শাহ গৌড়ের 'দাখিল দরওয়াজা' নামে পরিচিত বিরাট ও সুন্দর তোরণটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

রুকনুদ্দীন বারবক শাহের পুত্র শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ পিতার সঙ্গে যুক্তভাবে কিছুদিন রাজত্ব করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি একক ভাবে শাসন করেন। তিনি শিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ ও দক্ষ নরপতি রূপে অভিহিত হয়েছিলেন। তাঁর আমলে দিনাজপুর তথা বাংলায় আইন শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটেছিল। ইউসুফ শাহও প্রথম তাঁর রাজ্যে প্রকাশ্যে মদ্যপান একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনিই বিচার ব্যবস্থার যাতে কোনও তারতম্য না ঘটে, পক্ষপাত - দোষ-দুষ্ট না হয় তার জন্য কাজীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন। আলিমরা ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে কারও পক্ষ অবলম্বন না করেন এবং বিচারে কাজীরা ব্যর্থ হলে সেগুলির বেশির ভাগই তিনি নিজেই নিষ্পত্তি করে দিতেন। তিনি দেবকোট, দেওতলা, পাণ্ডুয়া, মহিসন্তোষ, গোপালগঞ্জ, ঘোড়াঘাট প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি মসজিদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

পরবর্তী সুলতানের নাম জলালুদ্দীন ফতেহ শাহ। ১৪৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৪৮৭-৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। *রিয়াজ-উস্-সলাতীন্*-এর মতে ফতেহ শাহ ছিলেন বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও উদার নৃপতি। কবি বিজয়গুপ্তের *মনসা মঙ্গল*-এ লেখা আছে যে, জলালুদ্দীন ফতেহ শাহ বাহুবলে বলী ছিলেন এবং তাঁর প্রজাপালনের গুণে প্রজারা সুখে ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল নবদ্বীপে শ্রী চৈতন্যদেবের জন্ম। চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে।[৬] ফতেহ শাহের রাজত্বকালে রাজ্যে নিগ্রো ও খোজা সম্প্রদায়ের মানুষেরা রাজদরবারে বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়েছিল।

এরপর সুলতান শাহজাদা, জলালুদ্দীন ফতেহ শাহকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। এই সময় বাংলায় অনেকেই প্রভুকে হত্যা করে রাজা হয়েছিলেন। বাবর তাঁর আত্মকাহিনীতে বাংলাদেশের এই বিচিত্র ব্যাপারের উল্লেখ করেছেন এবং যেভাবে এদেশে রাজার হত্যাকারী সকলের কাছে রাজা বলে স্বীকৃতি লাভ করত, তাতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। সুলতান শাহজাদার রাজত্বকালে খোজা ও নিম্নশ্রেণির কর্মচারীরা উচ্চপদ লাভ করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন সম্ভ্রান্ত লোকেরা সুবিধা পেলেই তাঁর প্রতিকূলতা করবেন। তিনি মাত্র ৮ মাস রাজত্ব করেছিলেন।

পরবর্তী রাজার নাম সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ। তাঁর বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব, মহত্ত্ব ও দয়ালুতার জন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। তিনি গৌড় নগরীতে একটি মিনার, একটি মসজিদ এবং একটি জলাধার নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর নির্মিত মিনারটি এখনও বর্তমান আছে, যা ফিরোজ মিনার নামে পরিচিত। তিনি ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন অধিকার করেন এবং ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ-ই ছিলেন বাংলার প্রথম হাবশী সুলতান। এর পরবর্তীতে দিনাজপুরসহ বাংলার সিংহাসন লাভ করেন নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ। ইনি একবছর মাত্র রাজত্ব করেন। এর পিতৃপরিচয় রহস্যে ঢাকা। ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ একে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের পুত্র বলে মনে করেন।[৭] দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে হাবৃশ খান নামে একজন হাবশী তাঁর সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করে সুলতানকে হাতের পুতুলে পরিণত করেছিলেন। কিছুদিন রাজ্য এইভাবে চলার পর সিদিবদর নামে আরও একজন হাবশী বেপরোয়া হয়ে উঠেন এবং হাবৃশ খানকে হত্যা করে নিজেই শাসন ব্যবস্থার কর্তা হয়ে বসেন। কিছুদিন পরে এক রাত্রে সিদিবদর পাইকদের সর্দারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহকে হত্যা করেন এবং পরের দিন সকালে সিদিবদর শামসুদ্দীন মুজাফ্ফর শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। দিনাজপুর সহ বাংলায় নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্ব কাল ১৪৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

বাংলার শেষ হাবশী রাজা ছিলেন শামসুদ্দীন মুজাফ্ফর শাহ। ইতিহাসে মুজাফ্ফর শাহ সম্পর্কে কোনও প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় নি। কারও কারও মতে তিনি অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। রাজা হয়ে তিনি বহু দরবেশ, আলিম ও সম্ভ্রান্ত লোকদের হত্যা করেছিলেন। তাঁর অত্যাচার যখন চরমে পৌঁছেছিল তখন তাঁর মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন রাজার বিরুদ্ধবাদীদের একত্রিত করে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন এবং মুজাফ্ফর শাহকে বধ করে নিজে রাজা হলেন। ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই মত নিয়ে বিতর্ক আছে। মুজাফ্ফর শাহের রাজত্বকালে পাণ্ডুয়ার নূর কুৎব্ আলমের সমাধি ভবনটি পুনর্নির্মাণ হয়েছিল। তিনি দেবকোটে মৌলানা আতার দরগায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। মুজাফ্ফর শাহ ১৪৯১ থেকে ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় হাবশী রাজত্বের অবসান হয়।

২. আলাউদ্দীন হোসেন শাহ

দিনাজপুরের মধ্যযুগের ইতিহাসে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের নামই কীর্তিমান সুলতান রূপে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। হুসেন শাহের শাসনপর্ব শুরু হওয়ায় প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে বাংলার শাসন ক্ষমতা হাবশীদের অধিকারে চলে গিয়েছিল। দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ এই কালপর্বে সুলতানি বাংলার সার্বিক বিকাশ ব্যহত হওয়া ছিল স্বাভাবিক। বাংলার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক জীবনকে স্থিতিশীল ও মহিমান্বিত করার অভাব পূরণ করেছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ। কথিত যে, এই সময় কেন্দ্রে সুলতান এবং রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুলতানের অমাত্যরা বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মসজিদ, মাদ্রাসা,

সমাধিগৃহ, ইমারত এই যুগেই নির্মিত হয়েছিল। স্থাপত্যসমূহের ধ্বংসাবশেষ এবং সমসাময়িক শিলালিপি-ভাষ্যে এর সাক্ষ্য রয়েছে। হুসেন শাহের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যদেবের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল নব্য বৈষ্ণব আন্দোলন যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বাংলার ইতিহাসে চৈতন্যদেবের নানা প্রসঙ্গের সঙ্গে হোসেন শাহের নাম যুক্ত হয়ে এখানকার লোকবৃত্তে এই উভয় ব্যক্তিত্বের স্মৃতিকে আজও আলোকিত করে রেখেছে।

হোসেন শাহের জন্মবৃত্তান্ত অনেকখানি রহস্যে ঢাকা। এ নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন তিনি আরব বা তুর্কিস্থান হতে এসেছিলেন, আবার কারও মতে, হোসেন শাহ বিদেশ থেকে আসেন নি তিনি বাংলাদেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ফ্রান্সিস্ বুকাননের বিবরণে জানা যায়, হোসেন শাহ রংপুরের বোদা বিভাগের দেবনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হোসেন শাহের মা যে হিন্দু ছিলেন এরকম কিংবদন্তিও প্রচলিত আছে। আবার কেউ কেউ বলেন, হোসেন শাহ দিনাজপুরের একডালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহকে 'নসরৎ শাহ বাঙ্গালী' বলে উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্য চরিতামৃত* এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর *মহাভারত* পুস্তকে লিখেছেন যে, হোসেন শাহের দেহ কৃষ্ণবর্ণ ছিল। এই সমস্ত ধারণা থেকে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, হোসেন শাহ বিদেশি ছিলেন না, তিনি বাঙালিই ছিলেন। যে সমস্ত সৈয়দ বংশ বাংলা দেশে বহুকাল ধরে বসবাস করে আসছিল সেই রকম একটি বংশেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[৮]

১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে এক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হোসেন শাহ বাংলার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। তিনি সিংহাসনে বসার আগে পরপর কয়েকজন সুলতান অল্পদিন রাজত্ব করে আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। এই অবস্থার মধ্যে রাজা হয়ে হোসেন শাহ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাঁর রাজ্যের আয়তন বিশাল ছিল। তিনি বাংলার প্রায় সমস্তটা এবং বিহারের কিছু অংশ, কামরূপ ও কামতা রাজ্য এবং উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশ নিজের রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর এই বিরাট ভূখণ্ডে হোসেন শাহ অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। *রিয়াজ-উস্-সলাতীনে*-র মতে, হোসেন শাহ ছিলেন একজন দক্ষ সুশাসক এবং জ্ঞানী ও গুণীবর্গের পৃষ্ঠপোষক।

হোসেন শাহ গৌড় হতে কাছে একডালায় তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। এই একডালা যে দিনাজপুরের অধীনেই ছিল সে প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। একডালায় তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন সম্ভবত ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য। ক্রমাগত লুণ্ঠনের ফলে গৌড়নগরী শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল। একডালায় রাজধানী স্থানান্তরিত করার অন্তরালে সম্ভবত এটিই ছিল অন্যতম কারণ। তিনি প্রতিবছর একডালা থেকে পায়ে হেঁটে পাণ্ডুয়ার নূর কুৎব্-উল-আলমের সমাধি পরিদর্শনে যেতেন। বুকানন হ্যামিলটন লিখেছেন, দিনাজপুরের অন্তর্গত বর্তমান রায়গঞ্জ থানার অধীনে উত্তরে চারমাইল দূরত্বে ছোট পাঁড়ুয়া নামক স্থানে হোসেন শাহের আরও একটি বাসস্থান

ছিল। ছোট পাঁড়ুয়া যে তাঁর আমলে একটি শক্তিশালী মুসলিম শাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল তা বুকানন সাহেবের বিবরণ থেকেই জানা যায়। দিনাজপুরের হিন্দু সামন্তরা হোসেন শাহের বিরুদ্ধে সম্ভবত অনেকটাই তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দু সামন্তদের শায়েস্তা করবার জন্য দিনাজপুর জেলার উত্তর অংশে দমদমা ও ঘোড়াঘাট দুর্গ দুটিকে হোসেন শাহ আরও শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। দমদমা ছিল দেবকোটের অপর নাম। মুসলিম শাসনকালে এখানে একটি দুর্গ বা সেনা নিবাস ছিল। সুলতানি আমলেই ঘোড়াঘাট পাঠানদের শক্তিকেন্দ্র রূপে পরিচিত ছিল। হোসেন শাহ এখানেই দুর্গটিকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। এর মূল কারণ ছিল করতোয়ার পূর্বপাড়ে বিদ্যমান বৈরী রাজ্য কামতাপুরের বিপক্ষে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলা। দিনাজপুরের অন্তর্গত ঘোড়াঘাট দুর্গটিকে কেন্দ্র করে বহু পাঠান সর্দারের বসতি গড়ে উঠেছিল। এইসব পাঠানদের মধ্যে মজনু খাঁ, বাবা খাঁ, দস্তম খাঁ, মাসুম খাঁ, জাবেরী খাঁ প্রমুখ সর্দার এক একজন পাঠান গোত্রপতি ছিলেন। তাঁদের প্রচুর ধন সম্পদ ছিল এবং অধীনে ছিল বিরাট জনশক্তি। এই জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে হোসেন শাহের কামতাপুর অভিযান সফল হয়ে উঠেছিল।

দিনাজপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে হিন্দু রাজারা হোসেন শাহের বিরুদ্ধে যখন কিছুটা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন, সেই সূত্রে হেমতাবাদের পশ্চিমে বর্তমান কমলাবাড়ি হাটের কাছে মহশো নামে এক হিন্দু রাজা এবং আরও কিছুটা পশ্চিম ও উত্তরে বালিয়া নামে এক ক্ষত্রিয় রাজার বিরুদ্ধে হোসেন শাহ পীর-দরবেশদের লেলিয়ে দিয়ে হীন চাতুরির আশ্রয় নিয়েছিলেন, এই অঞ্চলে এটাই জনশ্রুতি। বুকানন হ্যামিলটন লিখেছেন যে, বাজেরুদ্দীন ও ঢোকরপোষ নামে দু'জন পীর এসে রাজা মহশোকে ওই স্থান থেকে উচ্ছেদ করেন এবং তারপরেই সুলতান হোসেন শাহ ওই স্থানে আসেন ও ঢোকরপোষের ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেন।[৯]

বর্তমান কমলাবাড়ি হাটের কাছে কসবা মহশো নামক স্থানে যেখানে রাজা মহশোর বাড়ি ছিল, সেখানে হোসেন শাহ একটি মসজিদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন বলে কথিত। কিন্তু, কমলাবাড়ির এই মসজিদ সম্পর্কে বুকানন সাহেব লিখেছেন, "This Mosque, force as incription over the gate, would appear to have been built in the year of the Hegira 996, by Sultan Hoseyn"। বুকাননের বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে, কুতুব শাহ এই মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং এই মসজিদ অলংকৃত হয়েছে অবিশ্বাসী, নাস্তিকের লুণ্ঠন করা পাথর ও পিলার দিয়ে। মসজিদের নির্মাণ ৯৯৬ হিজরী হলে, ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি নির্মিত হয়। কিন্তু তার বহুকাল আগেই হোসেন শাহ পরলোক গমন করেছিলেন। স্বভাবতই, প্রশ্ন জাগে কে ছিলেন এই সুলতান হোসেন ও কুতুব শাহ?

রাজা মহশোর প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এবং মন্দির ছাড়াও আরও একটি ভগ্নাবশেষের বর্ণনা পাওয়া যায় বুকাননের বিবরণ থেকে। "About a mile half beyond this ruin is another, which has been surrounded by a brick wall, and is usually

called the Tukht or throne of Hoseyn (Badshah) the king". এই তখত্ (Tukht) ছিল কুড়ি ফুট উঁচু, মাথার উপরে ছাঁটা পিরামিডের আকৃতি। এই তখত্ও (Tukht) অলংকৃত হয় রাজা মহশোর ভগ্নাবশেষ থেকে সংগৃহীত উপকরণে। এই তখ্ত-এর ভগ্নাবশেষ যে বাংলার সুলতান হোসেন শাহের এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকে না। এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসনের জন্য হোসেন শাহ দ্বিতীয় শাসন কেন্দ্র রূপে এখানে একটি শক্তিশালী সেনাঘাঁটি তৈরি করেছিলেন। তিনি ক্রমে উত্তরবঙ্গের রাজা মহশো, রাজা বালিয়া এবং আরও জমিদারের জমিদারী নিজের শাসনাধীনে এনেছিলেন বলে মনে হয়। শাসনের সুবিধার জন্য কসবা মহশোয় তিনি স্থাপন করেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় শক্তিশালী শাসনকেন্দ্র।

জনশ্রুতি, হোসেন শাহ এই অঞ্চলে আরও একজন প্রতাপশালী ক্ষত্রিয় রাজা বালিয়াকে উচ্ছেদ করেছিলেন হাসান বুরহানা নামে এক দরবেশের মাধ্যমে। বালিয়া রাজার নাম অনুসারেই তাঁর দিঘি ও গ্রামের নাম ছিল বালিয়াদিঘি। বিরাট বালিয়াদিঘির পাড়ে ছিল বালিয়া রাজার প্রাসাদ। রানি ও রাজকন্যারা ব্যবহার করত ওই দিঘির জল। হাসান বুরহানা নামে এক দরবেশ দলবল নিয়ে বালিয়া রাজার আশ্রয় প্রার্থী হন। রাজা তাঁকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন। তখন ফকির পুকুরের পাড়ে চামড়ার আসন পেতে ধর্মচর্চা শুরু করেন। তার ফলে চামড়ার আসনটি ক্রমে বাড়তে বাড়তে রাজবাড়ি স্পর্শ করে। এই ঘটনায় হতবুদ্ধি রাজা দিঘিতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই অঞ্চলে বুরহানা ফকিরের কেল্লা বলে একটি লোকপ্রবাদ রয়েছে। এই কেল্লাটি আসলে ছিল বালিয়া রাজার। এর মধ্যে অল্পসংখ্যক সেনা থাকবার ব্যবস্থা ছিল। কেল্লাটি গম্বুজাকৃতি। কেল্লার উপরে ওঠার জন্য ছিল ঘোরানো সিঁড়ি, দেয়ালের মাঝে ঘুলঘুলি, সম্ভবত বহিঃশত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য। এই কেল্লাটি বুরহানা ফকির দখল করে নিয়েছিলেন। এর অন্তরালে প্রকৃত ঘটনাটি ছিল রাজা বালিয়ার সঙ্গে ফকিরের লড়াই এবং রাজার পরাজয়। সম্ভবত এই বুরহানা ফকিরের অনুচরেরাই পরবর্তীতে বিন্দোলের ভৈরবী মন্দিরও ধ্বংস করেন।[১০] বর্তমানে বালিয়া রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখলে বোঝা যায় হিন্দুর বাড়ির অংশবিশেষ মুসলমানি রীতিতে পরিবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু, রাজা মহশো এবং বালিয়া রাজার রাজত্বকাল কবে তার সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় নি।

হোসেন শাহের শাসনকালে কোচবিহারের কামতা রাজ্যের অধিপতি ছিলেন রাজা লিলাম্বর। লিলাম্বরের অধীনে রাজ্য দক্ষিণে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হোসেন শাহ লিলাম্বরকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য অধিকার করে নেন। হোসেন শাহের রাজত্ব কালে চৈতন্যদেবের আগমন ঘটেছিল এই দিনাজপুর অঞ্চলের মাটিতে।[১১] তাঁর রাজত্বকালের একটি শিলালিপি পাওয়া যায় দিনাজপুর জেলার অধীনে রানিশংকৈল থানার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামে।[১২] লিপির তারিখ (জমাদিয়স্ - সানি, ৯০৫ হিজরী সন) জানুয়ারি ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ।

এখানে বাংলার সুলতান হোসেন শাহের আমলের তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি

মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। মসজিদের কাছেই পূর্বদিকে রয়েছে একটি ছোট প্রাচীন পুকুর, সেখানেই একটি পাকা কবর থেকে শিলালিপিটি পাওয়া যায়। শিলালেখটিতে উৎকীর্ণ লিপির অনুবাদ ঃ

"নবী, তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! বলেছেন এ জগতে যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তাঁর জন্য বেহেশ্‌তে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। স্থল ও সমুদ্রের অধিকারী এবং বহু বিজয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত সুলতান আলা-উদ্‌-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল মোজাফ্‌ফর হোসেন শাহর রাজত্বকালে, আল্লাহ্ তাঁর রাজ্য ও রাজত্বকে চিরস্থায়ী করুন! রহিম উদ্‌-দীনের পুত্র মিঞা মালিক কর্তৃক ৯০৫ হিজরী সনের জমাদিয়স-সানি মাসে এ মসজিদ নির্মিত হয়।"

হোসেন শাহের আমলে সম্ভবত এখানে একটি উন্নত জনপদ গড়ে উঠেছিল। এই স্থানের চার মাইল উত্তরে অবস্থিত নেকমর্দানে মুসলিম প্রাধান্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে খুব সম্ভব এই স্থানের প্রাধান্য হ্রাস পেতে থাকে।[১৩]

অনেকে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি পর্বকে 'হোসেন শাহী' আমল নামে চিহ্নিত করে থাকেন। কিন্তু, তাঁরই সভায় যশোরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্জন প্রভৃতি বাঙালি কবিরা কর্মচারী ছিলেন, তাঁদের কাব্যসৃষ্টির মূলে যে হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষণ বা অনুপ্রেরণা ছিল এমন খবর পাওয়া যায় নি। সে যুগের কিছু কিছু কবি যেমন, বিপ্রদাস পিপিলাই, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রমুখ, তাঁদের কাব্যে হোসেন শাহের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু হোসেন শাহের সঙ্গে তাঁদের কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। এই সব কবিরা হোসেন শাহের কাছ থেকে কোনও রকমের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়নি। আরও একটি বিষয়, সুলতানি যুগে প্রকৃতই বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল রুক্‌নুদ্দীন বারবক শাহের আমলে। হোসেন শাহ কোনও কবি বা পণ্ডিতকে কিন্তু কোন উপাধি দেন নি। বৃন্দাবন দাস *চৈতন্যভাগবত*-এ একজন লোক দিয়ে বলিয়েছেন, "না করে পাণ্ডিত্য চর্চা রাজা সে যবন।" আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, অনেকে ভুল করে বলে থাকেন যে হোসেন শাহের আমলে বাংলার পদাবলী সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা ভুল। হোসেন শাহের রাজত্বের অবসানের কয়েক দশক বাদে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, প্রভৃতি কবিদের আবির্ভাবের পর বাংলার পদাবলী সাহিত্যের উন্নতি ঘটেছিল। এই সব কারণে, বাংলা সাহিত্যের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে হোসেন শাহের নাম যুক্ত করার কোন সার্থকতা নেই বলে মনে হয়।[১৪] বাংলার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সুলতানদের সম্বন্ধে যতখানি তথ্য পাওয়া যায় তার তুলনায় হোসেন শাহের সম্বন্ধে এত বেশি তথ্য পাওয়া যায় নি। ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেন, হোসেন শাহই বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান এবং তাঁর রাজত্বকালে বাংলা এবং বাঙালি জাতি চরম সমৃদ্ধিলাভ করেছিল। ঐতিহাসিকদের এই মতটিও বিতর্কিত। কারণ, ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম তিনজন সুলতান এবং রুক্‌নুদ্দীন বারবক শাহ কোনও কোনও দিক দিয়ে হোসেন শাহের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারেন। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শাহ পরলোক গমন করেন।

৩. চৈতন্যদেব

১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন গমন বাসনায় গৌড়ের নিকটে রামকেলিতে এসে উপস্থিত হলেন। জয়ানন্দের *চৈতন্য মঙ্গল*-এ রামকেলি গ্রামের নাম কৃষ্ণকেলী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের ক'দিন তিনি রামকেলিতে সনাতনের বাড়ির কাছেই এক তমাল বৃক্ষের নিচে অবস্থান করেছিলেন। চৈতন্যদেবের আগমনে গৌড়ে যেন এক ধর্মীয় ভাব-বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁকে দেখার জন্য বিস্তর লোকের সমাগম হচ্ছে। একদিন হোসেন শাহ অট্টালিকার উপর দাঁড়িয়ে গঙ্গার শোভা দেখছিলেন। দেখতে পেলেন পিপীলিকার মত সারি বেঁধে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ সন্ন্যাসীর পেছনে পেছনে, গঙ্গাতীরের রাজপথ দিয়ে যাচ্ছে। হোসেন শাহ বিস্মিত হলেন। চৈতন্যদেব, সনাতনের বাসভবনের কাছেই অবস্থান করছেন। বিস্তর মানুষের দলবল দেখে সুলতানের রাজকর্মচারীরা সুলতানকে নানা কথা শুনিয়ে তাঁর কান ভাঙাতে শুরু করলেন। গুজব ছড়িয়েছে, গৌড়ে একজন মহাপুরুষের আগমন ঘটেছে হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য। তিনিই হবেন 'গৌড়ের রাজা'। নগর কোতোয়াল এসে রাজাকে জানায়, 'এক সন্ন্যাসী ভূতের নাম নিয়ে — কেবল হাসে, কাঁদে, তাঁর সঙ্গে বিস্তর লোক।'

সুলতানের সামনে ওই সময় রূপ, সনাতন, কেশব ছত্রী, প্রমুখ উচ্চপদস্থ হিন্দু রাজকর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। হোসেন শাহ তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সন্ন্যাসীর বিষয় কিছু জান? উল্লেখ্য এই যে, হোসেন শাহ সেই সময় হিন্দুদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, কিন্তু তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ কালে, সেখানকার হিন্দু দেবদেবী ও হিন্দুদের প্রতি যে অত্যাচার করেছিলেন তা সকলের মনে ছিল। তার জন্য উল্লেখিত রাজকর্মচারীরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন না। সনাতন উত্তর দিলেন, 'সামান্য সন্ন্যাসী, আপনি কোতোয়ালের কথা বিশ্বাস করবেন না।' হোসেন শাহ বললেন, 'সন্ন্যাসী যদি সামান্য হয়, তবে এত লোকে নিজের খেয়ে তাঁর পিছে পিছে ঘুরে বেড়ায় কেন? বেতন দিতে দেরী হলে তোমরা সকলেই তো আমাকে ছেড়ে যাও।'[১৫] হোসেন শাহ কোতোয়ালকে বললেন, সন্ন্যাসীর প্রতি যেন অত্যাচার না হয়। তিনি যথেচ্ছ বিচরণ করুন। কোতোয়াল বলল, হুজুর! আরও একটি কথা আছে। বলো। সন্ন্যাসী যখন গান করেন বৃক্ষরা তখন মাথা নুইয়ে প্রণাম করে। একথা শুনে হোসেন শাহ অবাক হলেন। তিনি কেশব খাঁকে বললেন, কেমন সন্ন্যাসী, নিয়ে এসো আমার কাছে, আমি দেখব।

সুলতানের একথা শোনার পর রূপ ও সনাতন এবং অন্যান্য কয়েকজন রাজকর্মচারী রাত্রিতে গোপনে চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁরা অনেক কথার পর বললেন, আপনার এখানে থাকা ঠিক নয়। কু-পরামর্শে রাজার মন বিচলিত হওয়া বিচিত্র নয়। চৈতন্যদেব উত্তরে বললেন, আমি শুধু তোমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য এখানে এসেছি, নতুবা এখানে আমার আসার প্রয়োজন ছিল না। পরদিনই চৈতন্যদেব গৌড় ত্যাগ করেন।

চৈতন্যদেব যখন গৌড়ে এসেছিলেন বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা

ছিল অত্যন্ত সংকটজনক। রাজ্য শাসকরা নিজেদের মধ্যে হানাহানির ফলে সামাজিক জীবনের স্থিতিশীলতা ছিল নিতান্তই ভঙ্গুর; আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার অভাব ছিল। রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাণিজ্য-ঘাটতি, খাদ্যশস্যের অভাব, রাজস্ব বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রতিকূল পরিণামে সমাজ জীবন অনিশ্চিত আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছিল। পীর-গাজী এবং মুসলিম আমলারা ওই সময় হিন্দুদের ওপর খুবই অত্যাচার করতেন। ফলে ধর্মচর্চায় হিন্দুরা মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের অসংখ্য লাঞ্ছনা ও অকথ্য অপমান বাঙালি তখন নীরবে সহ্য করেছিল। এই অনিশ্চিত আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির মধ্যেই চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় ঘটেছিল গৌড়ের রামকেলিতে।[১৬]

গৌড়ে চৈতন্যদেবের সফরের তাৎপর্য অপরিসীম। এখানেই তাঁর ধর্ম বিপ্লব এক গভীর সমাজ বিপ্লবে রূপ নিয়েছিল। এখানে তিনি হোসেন শাহের রাজত্বকালের অপশাসন এবং সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর ভক্তদের সমান মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার দিয়েছিলেন। এর জন্য তাঁকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং তিনি যেভাবে সেই বাধা ও প্রতিরোধ ভেঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিলেন সেটাই তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। চৈতন্যদেব সুলতান ও প্রশাসকদের প্রতিরোধ ও বাধা কি ভাবে ভেঙ্গেছিলেন সেই ঐতিহাসিক ঘটনার একটি উল্লেখ করছি। গৌড়ে হোসেন শাহ তার প্রধানমন্ত্রী সনাতনকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। কারারক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে সনাতন নিজেকে মুক্ত করে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। সরাসরি রাষ্ট্রশক্তিকে এভাবে অস্বীকার করেছিলেন সনাতন। এই ঘটনা চৈতন্যদেবের অনুপ্রেরণা ও আকর্ষণ ক্ষমতারই পরিচয়বহ। হোসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী নিজেকে কারামুক্ত করেছেন, এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সৃষ্টি হয় বিপুল উন্মাদনা। চৈতন্যদেবের নামে জয়জয়কার পড়ে যায়।

চৈতন্যদেবের আগমন ও অবস্থানকে কেন্দ্র করে রামকেলির প্রসিদ্ধি ঘটলেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পীঠস্থান রূপে এই অঞ্চলের পরিচিতি ছিল বহু আগে থেকেই। এখানে সার্বভৌম ভট্টাচার্য, বিদ্যাভূষণ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য, রামভদ্র, বাণী বিলাস ও সনাতন গোস্বামীর শিক্ষক বাচস্পতির মত পণ্ডিতদের মাটিতে পায়ের স্পর্শ পড়েছে। এখানেই কবি চতুর্ভুজ *হরিচরিত* কাব্য প্রণয়ন করেন। রূপ গোস্বামী রচনা করেন *কৃষ্ণলীলা* বিষয়ে সংস্কৃত কাব্য ও গীতিকা। বিদ্যাবাচস্পতি রামকেলিতে *ভ্রমর দূত* কাব্য লিখেছিলেন। রামকেলিতে জগন্নাথ সেন, জগদানন্দ রায়, সঞ্জয় কবিশেখর প্রমুখ মহাপ্রভুর দিব্য লীলাকে কেন্দ্র করে কাব্য রচনা করেছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা অনুপম গোস্বামী রামকেলিতেই বসতি গড়েছিলেন এবং এখানেই দেহত্যাগ করেন।

হোসেন শাহের বহু মন্ত্রী, আমাত্য ও কর্মচারীর নাম এ পর্যন্ত জানতে পারা গিয়েছে। এঁদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়েরই কর্মচারী ছিল বেশি। এঁদের মধ্যে দু'জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল ঃ

সনাতন (১৪৮৮ - ১৫৫৮) ঃ সনাতন হোসেন শাহের মন্ত্রী ও সভাসদ ছিলেন এবং তাঁর বিশিষ্ট উপাধি ছিল 'সাকর মল্লিক'। সনাতন হোসেন শাহের অন্যতম 'দবীর-

খাস' বা প্রধান সেক্রেটারিও ছিলেন। সনাতন ও রূপের পূর্বপুরুষ ছিলেন রূপেশ্বর। তিনি কর্ণাট দেশের ভূখণ্ড বিশেষের রাজা ছিলেন। তাঁর বংশের পদ্মনাভ রাজা দনুজমর্দন কর্তৃক সম্মানিত হয়ে নবহট্ট বা নৈহাটীতে বসবাস করেন। পদ্মনাভ বংশের উত্তরসূরি হলেন মুকুন্দদেব। মুকুন্দদেবের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ ছিলেন সনাতন, মেজো রূপ এবং ছোটো বল্লভ। যশোর জেলার ফতোয়াবাদ ও গৌড়ের নিকটে রামকেলিতে ওঁদের বাসাবাড়ি ছিল। সনাতন, রূপ ও বল্লভ, মুকুন্দদেব তাঁর তিন পুত্রকেই সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষা শেখান। পরে নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির কাছে সংস্কৃত এবং সপ্তগ্রামের সৈয়দ ফখ্রুদ্দিনের কাছে ফার্সি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।

হোসেন শাহ সনাতনকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও তাঁর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতেন। এই সময় সনাতন বিস্তর সজ্জন ব্রাহ্মণদের ডেকে এনে রামকেলির 'ভট্টবাটী' নামক এলাকাটিতে তাঁদের বসতি গড়ে দেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা হবার পর সনাতন রাজকাজে অবহেলা করেন এবং উড়িষ্যা অভিযানে সুলতানের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেন। তাঁর এই অপরাধের জন্য হোসেন শাহ তাঁকে বন্দী করে রেখে উড়িষ্যায় চলে যান। শেষে সুলতানের কারাধ্যক্ষ শেখহবুকে উৎকোচদানে বশীভূত করে সনাতন মুক্তি লাভ করেন ও বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তিনি চৈতন্যদেবের একজন প্রিয় ভক্ত ছিলেন। বৃন্দাবনে সনাতনের বিষয় বুদ্ধি, বিদ্যা ও ভগবৎ প্রেম দর্শন করে লোকেরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। স্বয়ং আকবর বাদশাহ একবার সনাতনের সঙ্গে দেখা করে সন্তোষলাভ করেছিলেন। তিনি দিগ প্রদর্শনী নামে হরিভক্তি বিলাসের টীকা, শ্রীমদ্ভাগবত-এর দশম স্কন্দের *বৈষ্ণব তোষিণী* নামে টীকা, *লীলাস্তব* ও টীকাসহ দুইখণ্ড *ভাগবতামৃত* প্রণয়ন করেন। গৌড়ে থাকাকালীন 'সনাতন সাগর' নামে একটি দিঘি খনন করিয়েছিলেন। তাছাড়াও শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড নামে কয়েকটি জলাশয়ও খনন করিয়েছিলেন। সনাতন গোস্বামী রামকেলিতে প্রতিষ্ঠা করেন মদনমোহন মন্দির। ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

রূপগোস্বামী (১৪৮৯-১৫৬৩) ঃ সনাতন গোস্বামীর অনুজ। হোসেন শাহের মন্ত্রী এবং 'দবীরখাস' ছিলেন। সুলতান তাঁকে 'সাকির মালিক' উপাধি দিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল হোসেন শাহের রাজদরবারে চাকুরি করার পর রূপের সংসারে বিরাগ জন্মে এবং চৈতন্যের উপদেশে সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে যান। *হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ, কৃষ্ণ জন্মতিথি, গনোদ্দেশ দীপিকা, স্তবমালা, বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব, দানকেলি কৌমুদী, আনন্দমহোদধি, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, প্রযুক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা, মথুরা মহিমা, পদাবলী, নাটক চন্দ্রিকা, লঘুভাগবতামৃত* এবং *গোবিন্দ বিবুদাবলী* তাঁর রচিত গ্রন্থ। গৌড়ে থাকাকালীন তিনি 'রূপসাগর' নামে একটি দিঘি খনন করিয়ে দিয়েছিলেন। ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে রূপগোস্বামী বৃন্দাবনে প্রয়াত হন।

বল্লভ গোস্বামী ঃ হোসেন শাহের দরবারের ইনি ছিলেন টাঁকশালের অধ্যক্ষ। সনাতন ও রূপ গোস্বামীর ছোট ভাই। বল্লভ গোস্বামীর পুত্রের নাম জীব গোস্বামী, মোট ২৫ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন। এগুলির মধ্যে *হরিণামামৃত ব্যাকরণ, সূত্র মালিকা, মাধবমহোৎসব* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১৭]

৪. হোসেন শাহের অন্যান্য বংশধর

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি শাসনভার লাভ করেন এবং ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। নসরৎ শাহ্ ধর্মপ্রাণ শাসক ছিলেন। তাঁর আমলে গৌড়ে অনেকগুলি মসজিদ তিনি নির্মাণ করেছিলেন। তার মধ্যে বিখ্যাত বারদুয়ারী বা সোনা মসজিদ অন্যতম। নসরৎ শাহ্ গৌড়ে কদমরসুল নামক মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। কদমরসুল মসজিদের অভ্যন্তরে হজরত মহম্মদের পদ চিহ্ন অঙ্কিত একখানি প্রস্তর ছিল। শাহ জালাল নামক এক সুফি সাধক পদচিহ্নিত প্রস্তরখানি আরবদেশ থেকে বাংলায় এনেছিলেন। এই পাথরখানি পূর্বে পাণ্ডুয়া নগরে শাহ জালালউদ্দিন তাব্রেজির ঘরে ছিল। সুলতান হোসেন শাহ্ এটি গৌড়ে এনেছিলেন। হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন কেউ হরণ করে নিয়ে গিয়েছে। একটি বাক্স শুধু কদমরসুল মসজিদে রয়েছে। গৌড়েশ্বর নসরৎ শাহ্ *মহাভারত*-এর একখানি অনুবাদ সংকলন করিয়েছিলেন। তাঁর আদেশে সংকলিত হয়েছিল *ভারত পাঞ্চালী*, সঞ্জয়ের *মহাভারত*, কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত *মহাভারত* ও বিজয়পণ্ডিতের *মহাভারত*। কবি বিদ্যাপতিও নসরৎ শাহের প্রশংসা করেছেন। নাসির যে প্রেম বিষয়ক সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন বিদ্যাপতির পদে তার আভাস পাওয়া যায়। সমগ্র বাংলা, ত্রিহুত ও বিহারের বেশির ভাগ অংশ এবং উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ নসরৎ শাহের অধিকারে ছিল। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে নসরৎ শাহের মৃত্যু হয়। বুকানন সাহেব লিখেছেন, নিদ্রিত অবস্থায় প্রাসাদের প্রধান খোজার হাতে নসরৎ শাহ নিহত হয়েছিলেন। এই ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয়, কারণ এই বৎসরেই চৈতন্যদেবের লীলাবসান হয়েছিল।

নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁরই আদেশে শ্রীধর কবিরাজ নামে জনৈক কবি একখানি *কালিকা মঙ্গল* বা *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য রচনা করেন। এটিই প্রথম বাংলা *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য। দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজশাহ মাত্র এক বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। কারও মতে, আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার তিনমাসের মধ্যে তাঁর খুল্লতাত গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ তাঁকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন।[১৮] তাঁর রাজত্বকালে (১৫৩২-১৫৩৮) পর্তুগিজরা বাংলায় প্রথম বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্ব সময়ে হুমায়ুন বিনা বাঁধায় গৌড় অধিকার করেন (জুলাই, ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ)। এই সময় মাহমুদ শাহ পরলোক গমন করেন। এর ঠিক পরেই শের শাহ আবার গৌড় আক্রমণ ও অধিকার করেন। মাহমুদ শাহের রাজকর্মচারীদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। বিখ্যাত পদকর্তা কবি শেখর বিদ্যাপতি তাঁর রাজসভার কর্মচারী ছিলেন বলে জানা যায়।

৫. মৌলানা আতা শাহর শিলালিপি

সুলতানি যুগে দিনাজপুর জেলা থেকে বিভিন্ন শাসকদের রাজত্বকালের কয়েকটি শিলালেখ পাওয়া গেছে, যেগুলি অধিকাংশই আরবি ভাষায় উৎকীর্ণ হয়েছে। কোনও

কোনও জায়গায় কিছু কিছু ফারসি ভাষারও ব্যাবহার করা হয়েছে। এইসব শিলালিপি থেকে মুসলিম সমাজ বিস্তারের চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায়। এইসব শিলালিপিগুলি পাওয়া গেছে মূলত মসজিদের গায়ে। শিলালিপিগুলিতে মসজিদ নির্মাণের তারিখ, সমকালীন শাসনকর্তা, নির্মাতার নাম ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি খোদিত হতে দেখা যায়। দিনাজপুর জেলায় সুলতানি যুগে প্রথম যে শিলালেখটি পাওয়া যায় সেটি দিল্লির নিয়োজিত বাংলার শাসনকর্তা জালালুদ্দিন মাসুদ জানীর (১২৪৭-১২৫১) সময়কালের বলে জানা যায়। এটি পাওয়া গিয়েছিল দিনাজপুরের অধীনে গঙ্গারামপুরের অদূরে পিছলি ঘাটালি নামক স্থানে। যদিও এই পিছলি ঘাটালি ঠিক কোথায়, তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে, স্টেপলটন সাহেব বলেছেন, শিলালেখটি যেখানে পাওয়া গেছে তার উত্তর পুর্বে এক মাইল দূরে গঙ্গারামপুরের অবস্থান। ধ্বংসপ্রায় ইমারতের গায়ে এটি ছিল এবং লিপিভাষ্যে একে পবিত্র ইমারত বলা হয়েছে। এই মসজিদটি সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ প্রথম নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন, পরে তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহর (১২৪৬ - ১২৬৬) সময় বাংলার শাসনকর্তা জালাল-উদ্দিন মাসুদ জানী ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ইমারতটি নির্মাণ করেছিলেন। দিনাজপুর জেলার দেবকোটে যে প্রথম মুসলমান সংস্কৃতির আলো প্রবেশ করেছিল শিলালিপিটি সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

ধলদিঘিতে মৌলনা আতা শাহর সমাধি ঃ গঙ্গারামপুরের নিকটে ধলদিঘিতে (দহলদিঘি) রয়েছে মৌলানা আতা শাহর দরগা। এই দরগায় চারটি শিলালিপি রয়েছে। এগুলি যথাক্রমে সুলতান সিকান্দর শাহ (১৩৫৭-১৩৮৯), জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহ (১৪৮১-১৪৯৬), শামসুদ্দিন মুজাফ্ফর শাহ (১৪৯০-১৪৯৩) এবং আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময়ে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এই চারটি শিলালিপির মধ্যে শুধুমাত্র আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময় উৎকীর্ণ করা শিলালিপিতে সুফি সাধক মৌলানা আতা শাহর নাম জড়িত রয়েছে। এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেছেন ব্লকম্যান সাহেব। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় মৌলানা আতার দরগায় মূল প্রবেশপথের উপরিভাগের ঠিক মাঝখানে সংগ্রথিত একটি শিলালেখর তিনি পাঠোদ্ধার করেছেন।

শিলালেখটি দৈর্ঘ্যে ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১ ফুট ২ ইঞ্চি। কিছু ফারসি শব্দ-যুক্ত আরবি ভাষায় রচিত এই লিপির চারটি ছত্রে ৯১৮ হিজরী বর্ষে আলাউদ্দিন হোসেন শাহর রাজত্ব কালে রুক্‌ন খান কর্তৃক আতা শাহ'র দরগার সামনে মিনার শোভিত একটি মসজিদ নির্মাণের কথা উল্লেখিত হয়েছে। শিলালেখটি সমাধি কক্ষের বাইরের দেয়ালে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেজন্য অনেকেই মনে করেন যে রুক্‌ন খান কর্তৃক হোসেন শাহর আমলে নির্মিত মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রস্তর ফলকটি সংগ্রহ করে এনে ওই সমাধিগৃহের প্রবেশপথের উপরের অংশে পরবর্তীকালে লাগানো হয়। এই ধারণা সঠিক নয়। এই অভিলেখটি থেকে বাংলায় সুলতানি আমলের বিশেষত আলাউদ্দিন হোসেন শাহর রাজত্বকালের শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো এবং

সুলতানের বিভিন্ন ধরনের কাজে নিযুক্ত মন্ত্রী, নগরপাল ও সচিবদের কাজের পরিধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে জানার বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যের হদিশ পাওয়া যায়। এই অভিলেখে উল্লিখিত রুক্ন খানের আভিজাত্য ও পদমর্যাদাসূচক খেতাব সমূহ বিশ্লেষণ করলেই সুলতানি আমলে প্রশাসনিক কাজ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হত সে সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা জন্মায়। রুক্ন খানের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে এখানে বলা হয়েছে তিনি ছিলেন 'শরাবদার-ই-গইর-ই-মুহল্লী', সুপরিচিত মুজফরাবাদ শহরের উজীর; 'সী-ই-লস্‌কর' ও ফিরুজাবাদ নামে সুপ্রসিদ্ধ শহরের 'মনসবদার-ইন-কোতোয়ালী'। 'উজীর' অর্থ মন্ত্রী, রাজ্যের বিশেষ একটি বা একাধিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। আবার, দেখা যাচ্ছে, উজীরের চেয়েও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর 'শরাবদার-ই-গইর-ই-মুহল্লী', এই পরিচয়টি। পানীয়ের মধ্যে বিষ মিশিয়ে পরিবেশন করার সম্ভাবনা থাকত বলে অতীতে এই পানীয় সরবরাহের দায়িত্বে নিযুক্ত হতেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি রাজার পূর্ণ বিশ্বাসভাজন। অতএব রুক্ন খানের উপর সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহর পূর্ণ আস্থা ছিল বলেই তাঁর উপর এই বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। এই অভিলেখে যে সব সুলতানি আমলের খেতাবের উল্লেখ করা হয়েছে সেইসব খেতাবের অর্থ অনুযায়ী যদি সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীর কার্যধারা ও ক্ষমতা সূচিত হয়ে থাকে তাহলে বোঝা যায় যে উজীরেরা একই সঙ্গে সামরিক ও বে-সামরিক কাজ নির্বাহ করতেন। এই শিলালেখে উল্লিখিত ফিরুজাবাদ শহরটি হল পাণ্ডুয়া (বর্তমান মালদহ জেলা) কিন্তু মুজফরাবাদ শহরটির সঠিক অবস্থান আজও নির্ণীত হয়নি। ঐতিহাসিক অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামীর মতে, দেওকোট শহরের নাম মুজফরাবাদ কোনও একসময় হয়েছিল বলে মনে হয়।[১৯]

আতা শাহর দরগার দেওয়ালে অভিনিবদ্ধ অন্যান্য শিলালেখগুলিতে মৌলানা আতার নাম উচ্চারিত হয়েছে। যেমন, সুলতান সিকান্দর শাহর (৭৬৫ হিজরী বর্ষ) অভিলেখে তাঁকে বলা হয়েছে 'কুতব্‌-অল্‌-অউলিয়া ওয়াহিদ অল-মুহ্‌অক্কে কিন সিরাজ-অল-হক ওয়াল-শরা-ওয়াল দিন মৌলানা আতা'। জালালউদ্দিন ফতেহ্ শাহ'র শিলালেখে (৮৮৭ হিজরী বর্ষে) 'মুখ্‌দুম অল্‌-মশ্‌হুর মৌলানা আতা ওয়াহিদ-অল-দিন'। শামসুদ্দীন মুজফ্‌ফর শাহর লিপিতে (৮৯৬ হিজরী বর্ষে) 'অল্‌ মুখ্‌দুম্‌ অল্‌-মশ্‌হুর্‌ কুতব্‌ অউলিয়া মুখ্‌দুম মৌলানা আতা'। আলাউদ্দিন হুসেন শাহর শিলালিপিতে (৯১৮ হিজরী বর্ষ) মৌলানা আতার নাম জড়িয়ে বলা হয়েছে 'শেখ অল মশাইখ্‌ আতা'।

মৌলানা আতা শাহর দরগাটি বর্গাকার চতুষ্কোণ বিশিষ্ট। (৩৬ ফুট - ১ ইঞ্চি x ৩৬ ফুট - ১ ইঞ্চি)। বেলেপাথর ও ইটের সমন্বয়ে নির্মিত। দরগার তিনদিকে তিনটি দরজা ছিল। উত্তর ও পূর্বদিকের দরজা দুটো আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পূর্বদিকের দেয়ালের নিচের অংশের ৩/৪ ভাগ ধুসর বর্ণের বেলেপাথরে তৈরি এবং উপরের অংশে ইটের গাঁথনি। প্রতিটি দেয়াল ১১ ইঞ্চি (৪ ফুট ৩ ইঞ্চি) চওড়া। বিভিন্ন আকারে ইট আলাদাভাবে তৈরি করে দেয়ালে লাগানো হয়েছিল। একটি ইটও ভেঙে লাগানো হয়নি। এই একই পদ্ধতিতে এবং একই মাপে (৫১ ইঞ্চি) বাণগড়ের উপরে যে পালযুগের অনুপম স্থাপত্য নিদর্শন আছে, সেখানেও দেখা যায়।

দরগার পশ্চিমদিকে রয়েছে অলংকৃত মিরহাব এবং ছাদবিহীন চতুর্দিক ঘেরা প্রাঙ্গণের পূর্বদিকের এক প্রান্তে বন্ধ করে দেওয়া দরজা ঘেঁষে আছে মৌলানা আতার সমাধি, যার উপরিভাগ সাদা কাপড়ে আচ্ছাদিত। মৌলানা আতা সিকান্দারের রাজত্বকালে বা তার কিছু আগে সম্ভবত দেহ রক্ষা করেছিলেন। তিনি যে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ইসলামপন্থী সাধক ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, তাঁর পাণ্ডিত্য ও কর্মনিষ্ঠায় মুগ্ধ সুলতান সিকান্দর শাহ্ পরম শ্রদ্ধাবান প্রয়াত মৌলানা কর্তৃক আরব্ধ গম্বুজশোভিত সমাধিকক্ষটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সুফি সাধকের পাণ্ডিত্যের জন্যই পরবর্তীকালে মুজফ্ফর শাহ্, ফতেহ্ শাহ্ এমন কি হোসেন শাহ্ও এই দরগাটির সংস্কার সাধন এবং মসজিদ নির্মাণ কাজে এগিয়ে এসেছেন। মৌলানা আতা শাহ্ কোন্ তরিকার সাধক ছিলেন সোহ্রাওয়ার্দীয়া বা নক্শবন্দিয়া, তা জানার কোনও সূত্র নেই। অনেকে বলেন, আনুমানিক ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৬৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ছিল ধলদিঘির পারে তাঁর অবস্থান এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুফি সাধক শেখ জালালউদ্দীন তাব্রিজীর মত তিনিও ছিলেন সোহ্রাওয়ার্দীয়া তরিকার সাধক। এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতকে জৌনপুরী সাধক মীর সৈয়দ আসরফ্ জাহাঙ্গীর সিমনানীর একটি পত্র থেকে। তিনি লিখেছিলেন, 'সুরাওয়ার্দীয়া তরিকার সত্তরজন বিশিষ্ঠ সাধকের সমাধি দেওকোটে আছে।'[২৫]

৬. মুসলিম রাজত্বের প্রথম যুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা

আদি দিনাজপুর জেলায় যে সুলতানি আমলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রথম থেকেই চালু ছিল, তাতে কোনও সন্দেহই নেই। এর কারণ, মুসলিম অধিকারের প্রথম থেকেই আদি দিনাজপুর জেলাতেই ছিল তাদের প্রশাসন কেন্দ্র। তুর্কি মুসলমানের প্রথম রাজধানী লখনৌতি ছিল আদি দিনাজপুর জেলার মধ্যেই। এরপর বখ্তিয়ারের দ্বিতীয় রাজধানী দেবকোট ছিল এই জেলারই অংশবিশেষ। পরবর্তীতে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল, রাজধানী পাণ্ডুয়াও ছিল দিনাজপুর জেলারই অধীনে। সেই সময়কার শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইতিহাসে যেটুকু পাওয়া যায় তাতে মুসলিম রাজ্যের দর-উল-মুল্ক অর্থাৎ রাজধানী ছিল লখনৌতি, কখনও দেবকোট, কখনও পাণ্ডুয়া। এই রাজ্য কতগুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এই অঞ্চলগুলিকে ইকতা বলা হত এবং এক একজন আমীরকে এক একটি ইকতার মোকতা অর্থাৎ শাসনকর্তা বলা হত। আমীররা প্রশাসনিক দায়িত্ব পাবার পর তাঁরা মোকতা অর্থাৎ ইকতার অধিপতি নামে পরিচিত হতেন। এক একটি ইকতার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সেনাবাহিনী থাকত এবং নিজস্ব ইকতার আয় দিয়ে ইকতার অধিপতি সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের ব্যয় নির্বাহ করতেন। প্রয়োজন হলে ইকতার অধিপতি তাঁর দলবল নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাহায্যে এগিয়ে যেতে বাধ্য থাকতেন। উল্লেখ্য যে, বখ্তিয়ার খিলজী প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা পরবর্তী শাসনকর্তা যেমন, শিরান খিলজী, আলীমর্দান খিলজী এবং সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইয়জ খিলজীর আমলেও ১২২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। ওই বছর লখনৌতি রাজ্য দিল্লির সম্রাট শাম্স-উদ-দীন ইলতুত্মীশের

প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে চলে যায় এবং সম্রাট তার জ্যেষ্ঠপুত্র নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহকে লখনৌতি রাজ্যের মুকতা বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১২২৭ থেকে ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লখনৌতি রাজ্য মোটামুটিভাবে দিল্লির সুলতানের অধীনে ছিল, যদিও মাঝে মাঝে কোনও কোনও শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও একের পর একজন শাসনকর্তা দিল্লির সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে লখনৌতি রাজ্যের শাসন কাজ পরিচালনা করতেন। তখন সমগ্র লখনৌতি রাজ্যই ছিল দিল্লির অধীনে একটি ইকতা এবং এর শাসনকর্তা ছিলেন মুকতা অর্থাৎ ইকতার অধিপতি বা মালিক। ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে বলবন তুঘ্রিল খাঁর মৃত্যুর পর বুঘরা খান স্বাধীন হন। লখনৌতি রাজ্যের এই স্বাধীনতা ১৩২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। এই সময়ে লখনৌতি রাজ্যকে 'ইকলিম-ই লখনৌতি' বলা হত এবং লখনৌতি তখন অনেকগুলি ইকতায় বিভক্ত ছিল। সমসাময়িক সাহিত্য, শিলালিপি ও মুদ্রা থেকে জানা যায় যে, ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের পর বাংলার মুসলিম রাজ্য 'লখনৌতি'র পরিবর্তে 'বঙ্গালহ' নামে অভিহিত হতে শুরু করে।

সুলতানি যুগে দিনাজপুর (কোতোয়ালী), ঠাকুর গাঁও, বালুরঘাট এই তিনটি জায়গায় কোন প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল না। তবে সুলতানি আমলের প্রায় পুরো সময় ধরে দেবকোট একটি বিশেষ প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল তা প্রত্ননিদর্শন ও শিলালিপির বিবরণ থেকে জানা যায়। পরবর্তী সময়ে দিনাজপুর জেলার মহিসন্তোষ নামক স্থানে শক্তিশালী একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বারবকাবাদ নামে পরিচিত এই অঞ্চল যে সুলতান রুক্নউদ্দীন বারবক শাহের আমলে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল তা শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে জানা যায়। সুলতানি আমলে এখানে একটি টাঁকশালও ছিল। মোগলযুগেও যে এই স্থানের সমৃদ্ধি ছিল তার প্রমাণ এখানে মোগল আমলে বারবকাবাদ নামক সরকার প্রতিষ্ঠা করার দৃষ্টান্ত থেকে জানা যায়। এই জেলার ঘোড়াঘাট ছিল আরও একটি শক্তিশালী সুলতানি প্রশাসনিক কেন্দ্র। বখ্‌তিয়ার খিলজী এখানে বিদ্রোহী মুকতা আলীমর্দান খিলজীকে এই ইকতার দায়িত্ব প্রদান করেন। এই স্থানটি সম্ভবত নারানকোট নামে পরিচিত ছিল। এরপরেও ঘোড়াঘাটের প্রাধান্য ছিল। দিনাজপুর জেলার রানিশংকৈল থানার মহেশপুর নামক স্থানটিতেও সুলতানি আমলে একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল বলে জানা যায়। এই স্থানটি আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। দিনাজপুর শহরের উপকণ্ঠে চেহেল গাজী নামক সাবেক অঞ্চলটিও সুলতান রুক্নউদ্দীন বারবকশাহর আমলে প্রাধান্য লাভ করেছিল। এ জেলার অধীনে মহল নামে একটি প্রশাসনিক বিভাগের সন্ধান পাওয়া যায় জিয়াউদ্দীন বারণী রচিত *তারিখ -ই-ফিরোজশাহী* পুস্তকে। 'ইকলিম-ই-লখনৌতি' নামে একটি প্রশাসনিক বিভাগের উল্লেখ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। তার থেকে মনে হয় ইকলিম শব্দের মাধ্যমে খুব সম্ভব লখনৌতি রাজ্যকে বোঝান হয়েছে।

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে যেমন ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বীথি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশাসনিক বিভাগগুলি বিভক্ত ছিল, সুলতানি যুগেও অনুরূপ আরসাহ, ইকলিম, মুলক, দিয়ার, মহাল, থানা প্রভৃতি বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে পার্থক্য ছিল এই যে মুসলিম আমলের

প্রথম দিকে ইকতার সৃষ্টি হয়েছিল কোনও ব্যক্তি বা স্থানকে কেন্দ্র করে। এই যুগে সুলতানরা বাস করতেন বিরাট রাজপ্রাসাদে। সেখানেই প্রশস্ত দরবার কক্ষে তাঁর সভা বসত। সভায় সুলতানের পাত্রমিত্র সভাসদরা উপস্থিত থাকতেন। সুলতানের প্রাসাদে থাকতেন সুলতানের হাজিব, সিহাহ্দার, শরাবদার, জমাদার, দরবান প্রভৃতি কর্মচারী। হাজিবরা সুলতানের সভার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, সিহাহ্দাররা সুলতানের বর্ম বহন করতেন, শরাবদাররা সুলতানের সুরাপানের ব্যবস্থা করতেন, জমাদাররা ছিলেন তাঁর পোশাকের তত্ত্বাবধায়ক এবং দরবানরা সুলতানের প্রাসাদের ফটকে পাহারা দিতেন। সুলতানের অমাত্য, সভাসদ ও অন্যান্য অভিজাত রাজপুরুষেরা আমীর মালিক প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত হতেন।[২১] রাজ্যের বিশিষ্ট পদাধিকারীরা 'উজীর' আখ্যা লাভ করতেন। উজীর বলতে সাধারণত মন্ত্রী বোঝালেও সেইসময়ে অনেক সেনানায়ক ও আঞ্চলিক শাসনকর্তাও উজীর আখ্যা লাভ করেছিলেন। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সুলতানরা সীমান্ত অঞ্চলে সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। তাঁদের উপাধি ছিল লস্কর উজীর। সুলতানের প্রধান মন্ত্রীরা 'খান-ই-জহান' উপাধি লাভ করতেন। প্রধান আমীরকে বলা হত 'আমীর-উল-উমারা'। সুলতানের মন্ত্রী, আমাত্য ও পদস্থ কর্মচারীরা 'খান মজলিস', 'মজলিস-অল-আলা', 'মজলিস-আদম', 'মজলিস-অল-মুআজ্জম', 'মজলিস বারবক' ইত্যাদি উপাধি লাভ করতেন। সুলতানের সচিবদের 'দবীর' এবং প্রধান সচিবদের 'দবীর-ই-খাস' বা 'দবীর খাস' বলা হত। এই সময় দুর্গহীন শহরকে 'কসবাহ' এবং দুর্গযুক্ত শহরকে 'খিট্‌টাহ্' বলা হত। রাজ্যের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুলতান স্বয়ং। বিভিন্ন অভিযানের সময়ে যেসব বাহিনী প্রেরিত হত তাদের অধিনায়কদের বলা হত 'সর-ই-লস্কর'।

সুলতানের সেনাবাহিনী চারভাগে বিভক্ত ছিল। অশ্বারোহীবাহিনী, গজারোহী-বাহিনী, পদাতিকবাহিনী এবং নৌবহর। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত এখানকার সেনারা প্রধানত তীর-ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করত। তাছাড়া, বর্শা, বল্লম ও শূল অস্ত্রও ব্যবহার করত। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে বাংলার সেনারা কামান চালাতে শিখেছিল। বাংলার নৌবহরের অধিনায়ককে বলা হত 'মীর বহ্‌র'। বাংলার সেনাদের শক্তি জোগাত রণহস্তীর দল। সেনারা তখন নিয়মিত বেতন পেত। সেনাবাহিনীর বেতনদাতার উপাধি ছিল 'আরিজ-ই-লস্কর'। সুলতানি আমলের বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। কাজীরা বিভিন্ন স্থানে বিচারের জন্য নিযুক্ত হতেন এবং তাঁরা ইসলামের বিধান অনুসারে বিচার করতেন।[২২] আরও একটি বিষয়, আদি দিনাজপুর জেলার অধীনে মুসলিম প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলিতে সুলতানি যুগে শুধু মুসলমানরাই নয়, হিন্দুরাও শাসনকাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তাঁরা বহু মুসলমান কর্মচারীর উপরে 'ওয়ালি'ও নিযুক্ত হতেন। সুলতানের মন্ত্রী, সচিব এমনকি সেনাপতির পদেও বহু হিন্দু নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য এই যে, বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম সমাজ গঠনকারীদের সকলেই কিন্তু অভিবাসী ছিলেন না। আরবিয়, তুর্কি,

পারসিক জাতিভুক্ত অভিবাসীদের একটা বড় অংশের মধ্যে ধর্মপ্রচারক, শাসনকর্তা, কর্মকর্তা, কিছু সৈনিক এবং কিছু ব্যবসায়ী ও ভাগ্যান্বেষী এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। ইসলামের পতাকা এবং সেইসঙ্গে নিজস্ব সংস্কৃতি তারা সঙ্গে নিয়ে এলেও মুসলিম অভিবাসীরা এদেশের মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের মধ্যে যে ভাবের আদান-প্রদান গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তিমূল হিন্দু অনুকরণেই গড়ে উঠেছিল। হিন্দু সংস্কৃতির ভিত্তিতেই এই অঞ্চলের মুসলিম সমাজ গড়ে উঠেছিল।

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. রজনীকান্ত চক্রবর্তী, *গৌড়ের ইতিহাস* (মুসলমান যুগ), পৃ.৫৫। আবুল কালাম মোহম্মদ যাকারিয়া, *দিনাজপুর মিউজিয়াম,* পৃ. ১৫২।
২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (মধ্যযুগ), পৃ. ৫৬।
৩. রজনীকান্ত চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।
৫. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,* পৃ. ৮৫।
৬. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত, *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান,* পৃ. ১৫৬।
৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।
৮. ঐ, পৃ. ৭৩।
৯. A. Mitra, *Census - 1951*, West Dinajpur, p. 136 - 137.
১০. বিন্দোলের ভৈরবী মন্দির : বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার অধীনে রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত। বিন্দোল থেকে ২ কি. মি. দূরে বালিয়াদিঘি নামক গ্রামটি অবস্থিত।
১১. মালদহ : ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে মালদহ জেলা গঠিত হয়। তার পূর্বে মালদহ দিনাজপুর জেলার অধীনে ছিল।
১২. বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঠাকুর গাঁ জেলার অধীনে রাণিশংকৈল উপজেলার অন্তর্গত গ্রাম মহেশপুর, বর্তমানে যা মহলবাড়ি নামে পরিচিত।
১৩. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪, ১৫৫।
১৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬।
১৫. ধনঞ্জয় রায়, 'গৌড়বঙ্গের রূপ সনাতন', শারদীয়া *উত্তরস্বর,* ১৪০২, পৃ. ২৭
১৬. ধনঞ্জয় রায়, 'উত্তরবঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির পরিচয়', শারদীয় *উত্তরস্বর,* ১৯৯৯; পৃ. ১৯।
১৭. দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।
১৮. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ,* পৃ. ৬৩৪।
১৯. অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী, *ইতিকাহিনী,* পৃ. ১৫৬। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর বালুরঘাটে অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা হয় আতা শাহর দরগার শিলালিপিগুলি নিয়ে। রচনাকার।
২০. এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন অধ্যাপক অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী, রচিত প্রবন্ধ *'দেওকোটের এক দরগা : দুই দিঘি : তিনলিপি',* শারদীয়া *দধীচি,* ১৪০৫, পৃ. ১৩৩-১৬১।
২১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।
২২. ঐ, পৃ.১০৮।

পঞ্চম অধ্যায়

দিনাজপুরে আফগান প্রশাসক

১. হুমায়ুন ও শের শাহের আমল

গৌড় অধিকারের পর হুমায়ুন যুদ্ধে বিধ্বস্ত নগরীর সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হন। গৌড় নগরের রাস্তাঘাট, প্রাসাদ ও ভেঙে যাওয়া দেয়ালগুলি মেরামত করে তিনি এখানেই কয়েকমাস অবস্থান করেন। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জলহাওয়ার উৎকর্ষ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন হুমায়ুন। তিনি গৌড় নামের অর্থ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে কোন কিছুই জানতেন না, ভাবলেন এই শহরের নাম 'গোর', গোর অর্থ কবর। এই জন্য তিনি 'গৌড়' নগরীর নাম পরিবর্তন করে 'জন্নতাবাদ' রাখলেন। 'জন্নতাবাদ' অর্থ স্বর্গীয় নগর। হুমায়ুনের রাজত্বকালে বাংলার সব জায়গার মত দিনাজপুর অঞ্চলেও তাঁর কর্মচারীদের জায়গির দান করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে তিনি বিলাসব্যসনে মগ্ন হলেন। শেষপর্যন্ত হুমায়ুন এই অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন জাহাঙ্গীর কুলী বেগ নামে এক রাজকর্মচারীকে। তিনি গৌড়ের শাসনভার তাঁর হাতে দিয়ে গৌড় ত্যাগ করলেন। পথে চৌসা নামে একটি জায়গায় হুমায়ুনের সঙ্গে আফগান বীর শের খান সূরের যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হয়ে কোনরকমে জীবন নিয়ে পালিয়ে গেলেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত এই যুদ্ধে সাফল্য লাভ করে শেরখান সূর গৌড় পুনরধিকার করলেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে শেরখান, ফরিদুদ্দীন আবুল মুজাফ্ফর শের শাহ নাম গ্রহণ করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এক বৎসর কাল গৌড়ে ছিলেন এবং পরবর্তীতে হুমায়ুনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। হুমায়ুনকে কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত করে শের শাহ ভারতের সম্রাট হলেন। দিল্লিতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন। শের শাহ এই সময় তাঁরই দ্বারা নিযুক্ত শাসনকর্তা খিজর্‌খানকে পদচ্যুত করে কাজী ফজীলৎ নামে এক আফগান বীরকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

শের শাহের রাজত্বকালে বাংলা অনেকগুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত হয়েছিল এবং প্রতি বিভাগে একজন করে তিনি আমীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। শের শাহ ভারতবর্ষের শাসন পদ্ধতির সংস্কার সাধন করেছিলেন এবং রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। সমগ্র রাজ্যকে তিনি এগার হাজার ছয়শোটি পরগণায় বিভক্ত করে প্রতিটি পরগণায় পাঁচজন করে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। শের শাহ সিন্ধু নদের তীর হতে পূর্ববঙ্গে সোনার গাঁও পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। ওই রাজপথ

গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত। দিনাজপুর জেলার শের শাহী পরগণা শের শাহর আমলেই সৃষ্টি হয়েছিল।

শের শাহ ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যাওয়ার পর তাঁর পুত্র জলালখান সূর ইসলাম শাহ নাম গ্রহণ করে দিনাজপুর সহ সমগ্র গৌড়রাজ্যের অধিপতি হন। এই সময় কালিদাস গজদানী নামে একজন বার্হস বংশীয় রাজপুত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুলেমান খান নাম গ্রহণ করেন এবং বাংলায় আসেন। তিনি পূর্ববঙ্গের অংশ বিশেষ অধিকার করে সেখানে স্বাধীন রাজা হয়ে বসেন। ইসলাম শাহ তাঁকে দমন করার জন্য তাজ খান এবং দরিয়া খান নামে দুজন সেনানায়ককে পাঠান। এই যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে সুলেমান খানকে তাঁরা হত্যা করেন। ইসলাম শাহের রাজত্বকালে সিকন্দর সূরের ভাই কালাপাহাড় কামরূপ আক্রমণ করে কামাখ্যার মন্দিরগুলি বিধস্ত করেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ১২ বছরের পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে বসেন। কিছুদিন রাজত্ব করার পর শের শাহের ভাইয়ের ছেলে মুবারিজ খান তাঁকে নিহত করেন। মুবারিজ খানের এই নিষ্ঠুর আচরণের ফলে আফগান নায়কদের অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তার ফলে আফগানদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কলহ চরমে ওঠে। এই সময় দিনাজপুর অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন মুহম্মদ খান। এখানে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন এবং শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজী নাম গ্রহণ করে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। এর পরবর্তীতে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং নানান রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গৌড়ের অধীনে দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন যথাক্রমে আদিল শাহবাজখান (১৫৫৫ খ্রিঃ), গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ (১৫৫৬), জলালুদ্দীন দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন (১৫৬০)। ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে জলালুদ্দীন দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তৃতীয় গিয়াসুদ্দীন নাম নিয়ে গৌড়ের শাসন ক্ষমতায় বসেন। কয়েকমাস রাজত্ব করার পরে এক ব্যক্তি তাঁকে হত্যা করেন এবং তৃতীয় গিয়াসুদ্দীন ওই একই নাম নিয়ে সুলতান হন। এর একবৎসর পর কররানী বংশীয় তাজখান তৃতীয় গিয়াসুদ্দীনকে নিহত করে গৌড়ের অধিপতি হন।

২. কররাণী শাসনকর্তা

দিনাজপুরে কররাণী নামে আফগান ও পাঠান জাতির একটি প্রধান শাখা দীর্ঘদিন শাসন করেছিলেন। গৌড়ের শাসক শের খানের রাজসভায় প্রধান প্রধান আমাত্য ও কর্মচারীদের মধ্যে কররাণী বংশের অনেকে ছিলেন। এঁদের মধ্যে তাজ খান ছিলেন অন্যতম। মুহম্মদ শাহ আদিল যখন গৌড়ের শাসক সেই সময় তাজ খান গৌড় ছেড়ে পালিয়ে যান টান্ডা বা টাঁড়ায়। তাজ খানের ভাইয়েরা এই অঞ্চলের জায়গীরদার ছিলেন। টাণ্ডায় থাকার সময় তাজ খানের ভাইয়েরা একত্রিত হয়ে রাজস্ব আদায় করতে থাকেন এবং বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে লুটপাটও করতে থাকেন। এই সময় বহু আফগান বিদ্রোহী এদের দলে যোগ দেন এবং মুহম্মদ শাহ আদিলের একশো হাতী এরা চুরি করে নিয়ে যায়। এইভাবে চুনার নামক একটি জায়গায় মুহম্মদ আদিল খানের সেনাপতির সঙ্গে এদের যুদ্ধ হয়। ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে আদিল খানের সেনাপতি হিমুকে পরাজিত করে

তাজ খান ও সুলেমান খান বাংলায় পালিয়ে আসেন। তাজ খান ও সুলেমান খান এই সময় দিনাজপুর অঞ্চলের অনেক জায়গা জোর-জবরদস্তি ও জাল-জুয়াচুরি করে অধিকার করেন। এইভাবে দক্ষিণ পূর্ব বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গা তাঁরা অধিকার করেন। এরপর তাজ খান তৃতীয় গিয়াসুদ্দীনকে নিহত করে গৌড় অধিকার করেন (১৫৬৪ খ্রি.)। একবৎসর শাসন ক্ষমতায় থাকার পর তাজখান মারা যান এবং তাঁর ভাই সুলেমান কররানী গৌড়ের শাসনকর্তা হন।

সুলেমান কররাণী অত্যন্ত দক্ষ ও শক্তিশালী শাসনকর্তা ছিলেন। সেইসময় সুর বংশের বিভিন্ন শাখা বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে আফগানদের মধ্যে সুলেমানের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিলেন না। দিল্লি, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল মোগলদের হাতে পড়ার ফলে হতাশাগ্রস্ত আফগান নায়েকরা অনেকেই সুলেমান কররাণীর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এদের পেয়ে সুলেমান বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। গৌড় অধিপতি হয়ে সুলেমান তাঁর অধিকারভুক্ত এলাকায় শান্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি মুসলমান আলিম ও দরবেশদের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। তাঁর আমলে দিনাজপুরের অধীনে ঘোড়াঘাট ও দমদমায় প্রচুর মুসলিম আলিম ও দরবেশের আগমন ঘটেছিল। সুলেমানের অধিকারভুক্ত সীমারেখায় মোগল শাসকেরও বিস্তীর্ণ এলাকা অধিকারভুক্ত থাকায় সুলেমান, মোগল সম্রাট আকবর এবং তাঁর অধীনস্থ শাসনকর্তা আলী কুলী খান এবং মুনিম খানকে নানা উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতেন। ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে আলী কুলী খানের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধ লাগলে আকবর কর্তৃক পরিচালিত বাহিনীর কাছে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। তখন আলী কুলী খান প্রতিষ্ঠিত জমানীয়া নামক নগরটি আকবর সুলেমানকে সমর্পণ করেন। সুলেমান কররাণীর আমলে গৌড়নগরী অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ায় সুলেমান নিজেই গৌড় থেকে তাঁর রাজধানী টান্ডাতে স্থানান্তরিত করেন। সেই থেকে টান্ডা বা টাঁড়া বাংলার রাজধানীতে পরিণত হয়। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে টাঁড়া সম্পর্কে বুকানন হ্যামিলটন লিখেছেন, "কালিয়া চকের মধ্যে অবস্থিত টাঁড়া একটি ধ্বংসাবশেষ মাত্র; কিন্তু প্রাচীনত্বের কোনও নিদর্শন নেই। শের শাহ যখন হুমায়ুন কর্তৃক ভারত বাদশার ক্ষমতা থেকে চ্যুত হন তখন বাংলার এক নতুন রাজবংশ দিল্লির অধীনতা পাশ ছিন্ন করে ফেলে এবং গৌড় ত্যাগ করে পুরনো গঙ্গা পার হয়ে টাঁড়াতে চলে যায়। গৌড় থেকে টাঁড়ার দূরত্ব এতই কম যে তাঁরা রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলেন এ কথা বলা যায় না। শুধু একটি রাজপ্রাসাদ বা প্রাদেশিক আবাস তৈরি করেন মাত্র ....। গৌড়ের সব অধিবাসী টাঁড়াতে চলে যায় নি। ..... টাঁড়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এমন কিছু নিদর্শন অবশিষ্ট নেই যা দেখে বলা যায় যে রাজপুত্রেরা খুব জাঁকজমক সহকারে এখানে বাস করতেন বা বৃহৎ কোন স্থাপত্য নির্মাণ করেছিলেন।"

সুলেমান কররাণীর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন কালাপাহাড়। ইতিহাসে কালাপাহাড় সম্পর্কে বিস্তর কাহিনী-কিংবদন্তি রয়েছে। দুর্গাচরণ সান্ন্যাল *বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস* পুস্তকে রাজসাহী জেলার কিংবদন্তি অবলম্বনে কালাপাহাড়ের জীবনচরিতে লিখেছেন,

কালাপাহাড়ের নাম কালাচাঁদ রায়। বাল্যকালে সকলে তাঁকে রাজু বলে ডাকত। রাজসাহীর অন্তর্গত বীর জাওন গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল। তিনি প্রসিদ্ধ একটাকিয়া জমিদার বংশে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কালাপাহাড় বলিষ্ঠ, সুদর্শন ও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন। গৌড়ের বাদশাহ বারবক শাহের সপ্তদশ বর্ষীয়া পরমা সুন্দরী দুলারীবিবির রূপে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেন। বাদশাহ ও বেগম উভয়েই রাজকুমারীর মনোভাব জানলেন। বাদশাহ কালাপাহাড়কে ডেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে কুমারীকে বিয়ে করবার জেদ ধরলেন। কালাপাহাড় তেজের সঙ্গে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। রাগে ও ক্ষোভে বাদশাহ কালাপাহাড়কে শূলে দেবার আদেশ করলেন। যখন সমস্ত আয়োজন হয়েছে তখন হঠাৎ করে দুলারিবিবি রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে ঘাতককে আদেশ করলেন, "আগে আমায় হত্যা কর, তারপর এর অঙ্গ স্পর্শ কর।" রাজকুমারীর অসামান্য রূপ ও অপূর্ব অনুরাগ দেখে কালাপাহাড়ের গোঁড়ামি ভেঙে গেল এবং বিয়েতে মত দিলেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম ত্যাগ করলেন না। এর ফলে, কালাপাহাড় সামাজিক অত্যাচার ও নিগ্রহ হতে মুক্তি পেলেন না। জগন্নাথে গিয়ে এ অবস্থায় কি কর্তব্য, জানার জন্য সাতদিন অনাহারে ধর্ণা দিয়ে রইলেন। কিন্তু কোনও আদেশ পেলেন না, উপরন্তু পাণ্ডারা অত্যন্ত অপমান করে তাঁকে শ্রীমন্দির হতে তাড়িয়ে দিলেন। এরপর প্রতিশোধের পালা। সে প্রতিশোধ যে কি ভয়ানক তা সমগ্র পূর্বভারত হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার পর তাঁর নাম হল 'মহম্মদ ফর্ম্মলি', কিন্তু দেশে তাঁর নাম কালাপাহাড় নামেই চিহ্নিত হয়ে রইল। তিনি দিনাজপুর অঞ্চলে যারপরনাই অত্যাচার করেছিলেন। তাঁর নিষ্ঠুরতা দেখে অনেক মুসলমানও ব্যথিত হয়ে পালিয়ে যাওয়া হিন্দুদেরকে রক্ষা করার গোপন ব্যবস্থা করেছিলেন।

কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীবাসিনী ছিলেন। কালাপাহাড়ের দুরাচার জন সেনা তাঁকে ধর্ষণ করল। কালাপাহাড়ের কাছে এসে তিনি কেঁদে সমস্ত কথা বলে তার সামনেই বিষ পান করে মারা গেলেন। এই ঘটনায় কালাপাহাড় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং সেই দিন সমস্ত অত্যাচার বন্ধ করে দিলেন, ফলে কেদারেশ্বর লিঙ্গ রক্ষা পেয়েছিল। সেই দিন রাত্রিতে কালাপাহাড় সুরক্ষিত ঘরে শুয়ে ছিলেন, কিন্তু পরদিন তাঁকে আর দেখা গেল না। কেউ কেউ বলেন, তিনি মনের অনুতাপে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, কেউ বলেন, তিনি গঙ্গায় ডুবে মরেছিলেন।[১]

সুলেমান কররাণীর সেনাপতি কালাপাহাড় হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান এবং হিন্দুদের মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করার জন্য ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, কালাপাহাড় প্রথম জীবনে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরবর্তীকালে মুসলমান হয়েছিলেন বলে যে কিংবদন্তি আছে তার কোন ভিত্তি নেই। আবুল ফজলের *আকবর নামা*, নিয়ামতুল্লাহর *মখজান-ই-আফগানী* ইত্যাদি পুস্তক হতে প্রামাণিক ভাবে জানা যায় যে, কালাপাহাড়ের জন্ম মুসলমান ও আফগান পরিবারে। তিনি সিকান্দার শূরের ভাই ছিলেন। দুর্গাচরণ সান্ন্যাল তাঁর *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস* গ্রন্থে কালাপাহাড় সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে অনেকে মনে করেন।[২]

সুলেমান কররাণীর অন্যতম সেনাপতি কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী আফগান সেনা পুরীর দিকে রওনা হলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তারা একরকম বিনা বাধায় পুরী অধিকার করল। জগন্নাথ মন্দিরের ভেতরে সঞ্চিত বিপুল ধনরত্ন অধিকার করল এবং মন্দিরটি আংশিকভাবে বিধ্বস্ত করল। সুলেমানের রাজত্বকালের প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে কোচবিহারে এক নতুন রাজবংশের অভ্যুদয় হয়েছিল। এই নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশ্বসিংহ। তিনি 'কামতেশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বসিংহের তৃতীয় পুত্র শুক্লধ্বজের সঙ্গে সুলেমানের যুদ্ধ হয়। সুলেমানের সেনাবাহিনীর হাতে শুক্লধ্বজ বন্দী হলেন। কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে সুলেমানের সেনাবাহিনী কোচবিহারের রাজধানী অবরোধ করে প্রায় জয় করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সুলেমান উড়িষ্যায় এক অভ্যুত্থানের সংবাদ পেয়ে তিনি কোচবিহার অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে আসতে বাধ্য হন। এই সময় মোগলরা বাংলা আক্রমণের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল। কোচবিহারকে খুশি রাখতে পারলে হয়ত এই আক্রমণে কোচবিহার রাজের সমর্থন পাওয়া যাবে, এইরকম চিন্তায় তিনি শুক্লধ্বজকে মুক্তি দিয়েছিলেন। সুলেমান কররাণীর রাজত্বকালে মোগলেরা বাংলা আক্রমণ করে নাই, কিন্তু ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে সুলেমানের মৃত্যুর পর মোগল বাহিনী বাংলা আক্রমণে তৎপর হয়ে উঠল এবং তাঁর শেষ পরিণতি দাঁড়ালো দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে মোগল-আফগান যুদ্ধে।

৩. ঘোড়াঘাটে মোগল-আফগান যুদ্ধ

বস্তুতপক্ষে বাংলায় আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ও তাঁর বংশধরদের শাসনের অবসানের পরেই এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ জয় করার লক্ষ্যে মোগল শাসকদের অভিযান শুরু হয়। বাংলার সিংহাসনের দাবিদার হিসেবে মোগল-পাঠান যুদ্ধের এক পর্যায়ে এদেশে শূর বংশীয় আধিপত্য স্থাপিত হয়। দিনাজপুর সদরের বড়বন্দর মহল্লায় একটি শের শাহী যুগের মসজিদ, একাধিক সড়ক, বেশ কয়েকটি পুরাতন সেতু, চিরত্ন সামগ্রীর এইসব নিদর্শন থেকে দিনাজপুর ভূখণ্ডে শূর বংশীয়দের প্রাধান্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। শূর বংশের পরিপূর্ণ পতনের পর গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন কররাণী বংশের শাসকরা। এই বংশের সুলেমান কররাণীর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ কররাণী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর রাজত্বকালের আশ্চর্য ঘটনা এই যে, বায়াজিদ কররাণী স্বল্পকালীন রাজত্বের মধ্যেই আকবরের অধীনতা অস্বীকার করে নিজের নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। তিনি খুব নিশ্চিন্তে শাসন কাজ পরিচালনা করতে পারেন নি। তাঁর উদ্ধত আচরণ ও কর্কশ ব্যবহারের জন্য অল্পসময়ের মধ্যে অমাত্যদের একাংশ চক্রান্ত করে এবং এই চক্রান্তকারীদের মধ্যে সুলেমানের ভাগিনেয় ও জামাতা এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বায়াজিদ কররাণীকে হত্যা করেন। এই অবস্থায় কিছুদিন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির পর অমাত্যেরা সুলেমানের দ্বিতীয় পুত্র দাউদকে সিংহাসনে বসালেন।

দাউদ বাংলার সিংহাসনে বসবার পর বিহার দখলে মন দিলেন। বিহার নিজের দখলে আনবার জন্য তিনি লোদী খানের অধীনে এক বিশাল সেনা বাহিনী বিহারে

পাঠালেন। ইতিমধ্যে আকবরও বিহার অধিকার করার জন্য মুনিম খানকে বিহারে পাঠালেন। কিন্তু লোদী খান বিশ্বাসঘাতকতা করার ফলে দাউদ লোদী খানের উপর ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং তাঁকে দমন করার জন্য এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে বিহারে গেলেন। দাউদ লোদী খানকে সেখানে হত্যা করলেন। তার ফলে আফগানদের মধ্যে বিরাট ভাঙন ধরে। এই সুযোগে মোগলবাহিনী সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হয়ে পাটনার কাছে উপস্থিত হলেন এবং হাজীপুর দুর্গ দখলের চেষ্টা করলেন। আকবর মুনিম খানের সঙ্গে যোগ দিয়ে হাজীপুর দুর্গ অধিকার করলেন। তার ফলে দাউদ অত্যন্ত ভয় পেয়ে সদলবলে জলপথে বাংলায় ফিরে এলেন। মুনিম খান তখন রাজা তোডরমল্ল ও মুহম্মদ কুলী খান বরলাস নামে দুই দক্ষ এবং বিশ্বস্ত কর্মীকে দাউদকে ধরার জন্য নিযুক্ত করলেন। সেই সময় আফগান নায়কেরা কেউ কেউ উত্তর পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে গিয়ে সমবেত হলেন। আর একদল, কালাপাহাড়, সুলেমান খান মনক্লী, বাবুই মনক্লী, এইসব পাঠান নায়েকরা দিনাজপুরের অধীনে ঘোড়াঘাটে গেলেন। মুনিম খান তখন আফগান বীর কালাপাহাড়, সুলেমান খান মনক্লী, বাবুই মনক্লী ও অন্যান্য আফগানদের দমন করার জন্য মজনূন খান কাকশাল নামে এক যোদ্ধাকে ঘোড়াঘাটে পাঠালেন।

গৌড়ের পতনের পর বাংলায় সাম্রাজ্য বিস্তার করতে অগ্রসর হতে গিয়ে মোগল সেনাবাহিনী ঘোড়াঘাটের বিদ্রোহী আফগান নায়কদের কাছে প্রচণ্ডভাবে সামরিক বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। মোগলরা সমগ্র বাংলায় প্রথম সামরিক বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন এই ঘোড়াঘাটে। এর মূলকারণ গৌড় থেকে উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে ভাটি অঞ্চলের অভিযানে অগ্রসর হতে গেলে গৌড়ের পরেই ঘোড়াঘাটের উপর দিয়ে যেতে হত। ভাটি অঞ্চলের দিকে অভিযানে যেতে হলে ঘোড়াঘাট ছাড়া তখন অন্য আর কোন রাস্তা ছিল না। মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ঘোড়াঘাট ছিল আফগানদের শক্তিশালী কেন্দ্র। উত্তরবঙ্গের প্রধান শক্তিকেন্দ্র ঘোড়াঘাটে ছিল বহু আফগান সর্দারের বসবাস। এঁদের প্রত্যেকের ছিল প্রচুর ধনসম্পদ এবং অধীনে ছিল বিরাট জনশক্তি। ঘোড়াঘাটের স্বাধীনচেতা জঙ্গীবাজ আফগান সর্দারদের সঙ্গে নিয়ে কালাপাহাড় ও সুলেমান খান মনক্লী, বাবুই মনক্লী প্রমুখ আফগান বীরেরা সম্মিলিত ভাবে মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। বহু খণ্ডযুদ্ধ সংগঠিত হল। মোগলবীর মজনূন খান, সুলেমান খান মনক্লীকে নিহত করলেন। কালাপাহাড় ও বাবুই মনক্লী ঘোড়াঘাট থেকে পালিয়ে কোচবিহারে আশ্রয় নিলেন। তা সত্ত্বেও মোগলরা ঘোড়াঘাট দখল করতে পারলেন না। ঘোড়াঘাটের স্বাধীনতার অস্তিত্ব রক্ষায় আফগান সর্দাররা বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে শক্তি, বিক্রম ও সামরিক কৌশলে মোগলদের বিপর্যস্ত করে তুললেন। আফগানদের রণনীতির ধাঁধায় পড়ে মোগলযুদ্ধের তৎপরতা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল। বিশেষ করে বাংলার খালবিল ঝিলে পরিপূর্ণ জলাভূমি সমাকীর্ণ স্থানে রণকৌশলে অনভ্যস্ত মোগল সেনাবাহিনী ভয়াবহ বিপদে পড়ে গেলেন। তাছাড়া, ঘোড়াঘাটে মোগলদের কোনও স্থায়ী সেনাছাউনি ছিল না, বাংলায় তাদের শাসনকেন্দ্র ছিল মূলত ভ্রাম্যমাণ। ঘোড়াঘাট অতিক্রম না করা পর্যন্ত মোগল বাহিনীর ক্ষেত্রে ভাটি

অঞ্চল অর্থাৎ যমুনা নদীর পূর্ববর্তী অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার করা ছিল অসম্ভব। সেকারণে ঘোড়াঘাটের অধিকার রপ্ত করতে তাদের চরমভাবে বিপাকে ফেলে দিয়েছিল। বিভিন্ন পর্যায়ে নানা কৌশলে মোগলরা ঘোড়াঘাটের যুদ্ধে কিছুতেই আফগানদের তখনকার মত পরাস্ত করতে না পেরে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন। গৌড়ের পতনের পর বাংলায় মোগল আগ্রাসনের ভবিষ্যৎ কি গতি নেবে ঘোড়াঘাটের আফগান যুদ্ধক্ষেত্রেই সূচনা হয়েছিল তার প্রথম শক্তি পরীক্ষা।

দিল্লিশ্বর আকবরকে পর্যন্ত বিচলিত করে তুলেছিল ঘোড়াঘাটের রণাঙ্গনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কারণ, মুনিম খানের কাছে দাউদ বশ্যতা স্বীকার করেছিল এবং মুনিম খানের চেষ্টায় দাউদকে উড়িষ্যায় জায়গীর প্রদান করে রাজধানী টাণ্ডায় ফিরিয়ে এনেছিলেন। দাউদ খান নতি স্বীকার করলেও ইতিমধ্যে ঘোড়াঘাটে মোগল বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটেছিল। মুনিম খানের রাজধানী হতে অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কালাপাহাড় ও বাবুই মনক্লী সহ আফগান নায়কেরা পুনরায় কুচবিহার হতে ঘোড়াঘাটে ফিরে এসে মোগলদের পরাজিত ও বিতাড়িত করেছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে মোগল নায়ক মুনিম খান সেনাবাহিনী নিয়ে ঘোড়াঘাটের দিকে রওনাও হয়েছিলেন। কিন্তু ঘোড়াঘাটে পৌঁছাবার পূর্বে তিনি গৌড় জয় করে বসলেন। বর্ষার সময় টাণ্ডা বা টাঁড়ায় জলা জমিতে থাকার অসুবিধা হত বলে মুনিম খান ভেবেছিলেন গৌড় জয় করে সেখানেই রাজধানী স্থাপন করবেন। কিন্তু গৌড় নগরী দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল বলে সেখানকার ঘরবাড়িগুলি বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। সেখানে কয়েকদিন থাকার ফলে মুনিম খানের লোকেরা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং অনেক লোক মারাও গিয়েছিল। ফলে, মুনিম খানের আর ঘোড়াঘাটে যাওয়া হল না। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তিনি টাঁণ্ডায় ফিরে গেলেন এবং দশদিনের মাথায় তিনি মারা গেলেন। তাঁর ফলে, মোগলদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তাদের ঐক্যও নষ্ট হয়ে গেল। তখন শত্রুরা চারদিক হতে আক্রমণ করতে লাগল। বেগতিক দেখে মোগল বাহিনী গৌড়ে সমবেত হল এবং সেখান হতে বাংলাদেশ ছেড়ে সকলেই ভাগলপুর চলে গেলেন এবং ভাগলপুর থেকে তাঁরা দিল্লি ফেরবার চেষ্টা করতে লাগলেন।[৩]

এইসব কারণেই মোগল সম্রাট আকবরকে ঘোড়াঘাটের রণাঙ্গনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বিচলিত করে তুলেছিল। এবার ঘোড়াঘাট দখলের জন্য তিনি যুদ্ধনীতিকে কুটনীতিতে পরিণত করলেন। ঘোড়াঘাটের রণাঙ্গনের সেই সংকটকালে আকবরের নির্দেশে ঘোড়াঘাটের আফগান সর্দারদের জায়গিরদারী সনদ বাতিল করে দিলেন। এই ঘটনা ঘোড়াঘাটের আফগান সর্দারদের আর্থিক মেরুদণ্ডে চরম আঘাত হানল। আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আফগানরা মানসিক ক্ষেত্রেও দুর্বল হয়ে পড়ে। আফগান শিবিরে চরম খাদ্যাভাব দেখা দেয়। নেতৃত্বের বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। বিদ্রোহী আফগানদের বাড়ি বাড়ি গড়ে ওঠে মোগল বিরোধী দুর্গ, ঘোড়াঘাটের পথে প্রান্তরে সংগঠিত হয় অসংখ্য খণ্ডযুদ্ধ। আফগানদের রক্তে সিক্ত হয়ে ওঠে ঘোড়াঘাটের মাটি। যুদ্ধবিধ্বস্ত নগরীর বুকে নেমে আসে শ্মশানের অন্ধকার। অবশেষে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে

দাউদ খানের মৃত্যু এবং ঘোড়াঘাটে মোগল - আফগান যুদ্ধে মোগলদের হাতে আফগান নায়কদের শোচনীয় পরাজয়ের পর বাংলা থেকে স্বাধীন সুলতানি শাসনের প্রায় চারশো বছরের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৪১-৪২।

২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, (মধ্যযুগ), পৃ.১১৭-১৮।

৩. ঐ, পৃ. ১২৩।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দিনাজপুরে মোগল রাজত্ব

১. ঘোড়াঘাটে মোগল আধিপত্য

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে দাউদ খানের পরাজয় ও নিধনের ফলে বাংলায় মোগল সম্রাটের অধিকার প্রবর্তিত হয়েছিল। অপরদিকে ঘোড়াঘাটে শেষ মোগল-আফগান যুদ্ধে মোগল কূটনৈতিক ছলনায় প্রতাড়িত হয়ে বিদ্রোহী আফগানরা পরাজিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁদের সম্পূর্ণভাবে দমন বা বশীভূত করতে মোগল শক্তির অনেক সময় লেগেছিল। মোগল শাসন বাংলায় সুদৃঢ় হতে সময় লেগেছিল প্রায় কুড়ি বছর। বাংলায় তখন একজন মোগল সুবাদার ছিলেন এবং অল্প কয়েকটি স্থানে তখন সেনাননিবাস স্থাপিত হয়েছিল। বাংলায় শক্তিশালী দুটি সেনানিবাস মোগল শাসকরা সেই সময় প্রতিষ্ঠিত করেছিল দিনাজপুর জেলার অধীনে গঙ্গারামপুরের কাছে দমদমা এবং ঘোড়াঘাটে। মোগল বিজয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ঘোড়াঘাট ও দমদমার দায়িত্বে প্রথম মোগল ফৌজদার নিযুক্ত হন মুহম্মদ সৈয়দ খান। সেই সময় মোগল শাসনের চিত্রটা ছিল এই রকম, কেবল রাজধানী ও সেনানিবাসগুলির কাছাকাছি জনপদগুলিই মোগল শাসন মেনে চলত, অন্যত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছেছিল। এইসময় স্বাধীনচেতা জঙ্গিবাজ আফগানরা দলে দলে লুঠতরাজ করে ফিরত, মোগল সেনারাও এইভাবে অর্থ উপার্জন করত। বাংলার সবখানে জমিদাররা অবাধ ক্ষমতা পাওয়ায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করতে সচেষ্ট ছিলেন। 'জোর যার মল্লুক তার' এই নীতি চলার ফলে সর্বত্র সেই মাৎস্যন্যায়ের মত অন্ধকার সময়ের আবির্ভাব হয়েছিল। এই সময় বাংলার মোগল শাসনকর্তা ছিলেন খান-ই-জহান। তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী সুবাদার হন মুজাফ্‌ফর খান। মুজাফ্‌ফর খান সম্পূর্ণভাবে অযোগ্য ছিলেন এই পদের। তাঁর সময়ে ঘোড়াঘাট ও দমদমায় অসন্তোষ চরমে ওঠে। বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়।

সম্রাট আকবর ছিলেন অসাধারণ কূটনৈতিক প্রজ্ঞাবান শাসক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বহু যুদ্ধ বিগ্রহে অশান্ত বাংলাকে শাসন করতে গেলে সামরিক বল প্রয়োগের পরিবর্তে কল্যাণকর সংগঠন ও শান্তিপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা দরকার। মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র তিনি এক নতুন শাসননীতি প্রচলন করলেন। সমস্ত দেশ কতগুলি সুবায় বিভক্ত হয়েছিল। এবং প্রতি সুবায় সিপাহ্‌সালার বা সুবাদার ছাড়াও

বিভিন্ন বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষবৃন্দ দিল্লি থেকে নির্বাচিত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়লেন। রাজস্ব আদায়েও নতুন ব্যবস্থা হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত প্রাদেশিক মোগল কর্মচারীরা যে রকম বে-আইনি ক্ষমতা যথেচ্ছ পরিচালনা ও অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করতেন তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এই সময় আকবর বাংলাকে ২৪টি সরকারে (আধুনিক জেলায়) বিভক্ত করেছিলেন। রাজা তোডরমল্লকে দিয়ে বাংলার রাজস্বনীতিতে আমূল পরিবর্তন করে তুলেছিলেন। আকবর বাংলাকে যে ২৪টি সরকারে ভাগ করেছিলেন এই ব্যবস্থায় দিনাজপুর অঞ্চলে ৪টি সরকার (আধুনিক জেলা) গঠিত হয়েছিল। এগুলি হল, সরকার ঘোড়াঘাট, সরকার তাজপুর, সরকার বারবকাবাদ এবং সরকার পিঞ্জরা। এসব করার ফলে সুবে বাংলার মোগল কর্মচারীরা আকবরের এই নতুন শাসননীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। বাংলার শাসনকর্তা মুজাফ্ফর খান আকবরের এই নতুন শাসন নীতিকে কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করলে ঘোড়াঘাটের আফগান জায়গিরদার বাবা খাঁ কাকশাল বিদ্রোহী হয়ে উঠেন এবং তাঁরই ষড়যন্ত্রে মুজাফ্ফর খান মারা যান (১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল)।[১] এই রকম রাজনৈতিক 'পট পরিবর্তনে' ঘোড়াঘাটের বাবা খাঁ কাকশাল 'মাশুম খাঁ খান্ দৌরান' উপাধি গ্রহণ করেন। বাবা খাঁ কাকশাল এই উপাধি গ্রহণ করে সুবে বাংলার শাসনকর্তা মনোনীত হন। এরপর তিনি 'জব্বারী খান্ জাহান' উপাধি লাভ করে দশ হাজার (১০,০০০) সৈন্যের অধিনায়ক হন। এই অবস্থায় আকবর রাজা তোডরমল্লকে (১৫৮০-৮২ খ্রিস্টাব্দ) ঘোড়াঘাটে পাঠালেন। ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে বাবা খাঁ কাকশালের মৃত্যুর পর জব্বারী খাঁ কাকশাল ঘোড়াঘাটের বিদ্রোহীদের নেতা হন। আকবর তখন তোডরমল্লকে দিল্লিতে ডেকে পাঠালেন এবং তার স্থলে মীর্জা কোকাকে (হাকিম) সুবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার করে পাঠালেন। মীর্জা কোকার রাজত্বে অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আকবর খান-ই-আজমকে সুবাদার নিযুক্ত করে বাংলায় পাঠালেন। আফগান বিদ্রোহীরা তাঁর হাতে পরাজিত হলেও বিদ্রোহ একেবারে দমিত হল না। এই সময় মোগল জায়গিরদাররা বশ্যতা স্বীকার করলেও ভাটি প্রদেশের জায়গিররা (ভৌমিক মণ্ডলী) সহজে মোগল বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করলেন না। তাঁরা আফগান বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশেষ করে ঘোড়াঘাটের মাশুম খাঁ কাবুলী, দস্তম খাঁ কাকশাল প্রভৃতি কিছু কিছু বিদ্রোহী জায়গিরদারদের সঙ্গে খিজিরপুরের ভৌমিক ঈশা খাঁ ও বিক্রমপুরের ভৌমিক কেদার রায়ের নেতৃত্বে দলবদ্ধ হলেন। সম্মিলিতভাবে তাঁরা মোগল শক্তিকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করলেন। এই অবস্থায় আকবর আবার নতুন ব্যবস্থা করলেন। তিনি শাহবাজ খানকে বাংলায় বিদ্রোহ দমন করার জন্য পাঠালেন।

শাহবাজখান কৌশলে অবশেষে যুদ্ধের পরিবর্তে তোষণনীতি অবলম্বন ও উৎকোচ প্রদান করে বহু পাঠান বিদ্রোহী নায়ককে বশীভূত করলেন। ঈশা খাঁ, মাশুম খাঁ কাবুলী উভয়েই মোগলের বশ্যতা স্বীকার করলেন (১৫৮৬ খ্রিঃ)। এই সময় ঘোড়াঘাট সহ সমগ্র সুবে বাংলায় মোগল আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হল। ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে আকবর

শাসনসংক্রান্ত কাজ কতগুলি বিভাগে বিভক্ত করলেন এবং প্রত্যেক বিভাগ নির্দিষ্ট একজন কর্মচারীর অধীনস্থ হল। শাসন সংক্রান্ত বিভাগগুলি এইরকম, সিপাহ্‌শালার (পরে সুবাদার নামে অভিহিত) এবং তাঁর অধীনে দিওয়ান (রাজস্ব বিভাগ), বখশী (সেনা বিভাগ), সদর ও কাজী (দিওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার), কোতোয়াল (নগররক্ষা) প্রভৃতি অধ্যক্ষরা নিযুক্ত হলেন।[২] নতুন ব্যবস্থা অনুসারে ওয়াজিব খান সিপাহশালায় নিযুক্ত হলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হলে (আগস্ট, ১৫৮৭ খ্রিঃ) সৈয়দ খান ওই পদে নিযুক্ত হলেন। তাঁর অযোগ্য শাসনকালে ঘোড়াঘাট সহ সমগ্র বাংলায় আবার পাঠানরা ও জমিদাররা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

২. দিনাজপুরে বাংলার শাসনকারী রাজা মান সিং

১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে মোগল বাদশাহ আকবর রাজা মান সিংকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। রাজধানী টাণ্ডায় পৌঁছে তিনি বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য পাঁচ হাজার মোগল সেনাকে চারদিকে পাঠালেন। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে মান সিং টাণ্ডা বা টাঁড়া থেকে রাজধানী সরিয়ে রাজমহলে নতুন এক রাজধানীর পত্তন করে তার নাম দিলেন আকবর নগর। দিনাজপুর এই সময় আকবর নগর নামেই পরিচিত ছিল। মোগল বশ্যতা স্বীকার করেও ঈশা খাঁ বিদ্রোহী হয়ে উঠায় রাজা মান সিং ঈশা খাঁয়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। পাঠানরা তখন ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। এই সুযোগে ঈশা খাঁয়ের জমিদারির বেশিরভাগই মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। অন্যান্য স্থানেও বিদ্রোহীরা পরাজিত হন। ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকালে মান সিংহ ঘোড়াঘাটের শিবিরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই সংবাদ পেয়ে মাসুম খাঁ ও অন্যান্য বিদ্রোহীরা বিশাল রণতরী নিয়ে ঘোড়াঘাটে অগ্রসর হন। মোগলদের রণতরী না থাকায় বিদ্রোহীরা বিনা বাধায় ঘোড়াঘাটের ২৪ মাইল দূরে এসে পৌঁছালেন। ইতিমধ্যে জল কমে যাওয়ার দরুন তাঁরা ঘোড়াঘাটের ২৪ মাইল দূরে এসেও ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। রাজা মান সিংহ ঘোড়াঘাটের শিবিরে ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সেনা পাঠালেন। তাঁরা বিতাড়িত হয়ে ময়মনসিংহের জঙ্গলে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। এইভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ দীর্ঘদিন ধরে চলার পর রাজা মান সিংহের মত খ্যাতনামা সুবেদারের চেষ্টায় এবং ইতিমধ্যে ঈশা খাঁ ও কেদার রায়ের মৃত্যু হওয়ায় ওই বিদ্রোহ অনেকটাই সাম্যভাব ধারণ করেছিল। মোগল সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সেলিম 'জাহাঙ্গীর' নাম ধারণ করে দিল্লির মসনদে বসলেন (১৬০৫ - ১৬২৭)। তাঁর সময়ে বাংলায় সুবেদার হয়ে এসেছিলেন আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁ (১৬০৮ - ১৬১৩)। তাঁর আমলেই সম্পূর্ণ সুবে বাংলা প্রকৃতপক্ষে মোগল বাদশাহের বশীভূত হয়েছিল। ভাটি অঞ্চলের মুশা খাঁ ও বারো ভুঁইয়ারা বাধ্য হয়ে ইসলাম খাঁর নিকট বশ্যতা স্বীকার করলেন। উড়িষ্যায় পরলোকগত পাঠান নায়ক কুৎলু খানের ভ্রাতুষ্পুত্র উসমান পরাজিত হয়ে শ্রীহট্টের জঙ্গলে পালিয়ে গেলেন। ভূষণার রাজা মুকুন্দ রায়ের পুত্র শত্রুজিৎ মোগলবীর এনাৎ খাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে যশোহরে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য রওনা হলেন। মুশা খাঁ ও অন্যান্য মোগলপক্ষে বাধ্য-জমিদাররা নিজ নিজ নৌকা ও

সেনাসহ বাদশাহী অভিযানে যোগ দিলেন। মোগল যোদ্ধা সৈয়দ হকীম বগলার জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অগ্রসর হলেন। ইসলাম খাঁ স্বয়ং ঘোড়াঘাট সেনা-নিবাস থেকে ঢাকায় গেলেন। এইভাবে ইসলাম খাঁর চেষ্টায় সুবে বাংলার প্রসিদ্ধ ভৌমিক প্রতাপাদিত্যের ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে পতন ঘটলে সুবে বাংলা প্রকৃতই মোগলদের অধীনস্থ হল। মোগল ফৌজদারের অধীনে বিভিন্ন জায়গায় তখন যে অল্প কটি সুরক্ষিত সেনাঘাঁটি বা থানা ছিল তার মধ্যে করতোয়া নদীর তীরবর্তী দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩. দিনাজপুরে মোগল প্রশাসন

ইংরেজ অধিকারের পূর্ব দিগন্ত পর্যন্ত দিনাজপুর জেলায় প্রায় দেড়শ বছর মোগল শাসন স্থায়ী হয়েছিল। রাজনৈতিক ও সামরিক কারণে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট ছিল সমকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠতম ও বৃহত্তম মোগল শাসন কেন্দ্র। বর্তমান দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলার বেশ কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল প্রাচীন ঘোড়াঘাট সরকার। এই সরকারের সংলগ্ন উত্তরে ছিল কোচবিহার রাজ্য। করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে চকহান্দি নামক স্থানটি ছিল এই সরকারের প্রধান নগর যা ঘোড়াঘাট নগর নামে পরিচিত। কোচ ও হাজংদের আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক পাঠানকে জায়গির দিয়েছিল। মোগলরা যখন এই সরকার অধিকার করেন তখন পাঠান জায়গিরদারদের জায়গিরদারী মোগলরা অধিকার করেন। এই সময় ঘোড়াঘাট শহরে কাকশাল বংশীয় মোগল সেনানায়কদের বসতি ছিল অধিকতর। যেহেতু রাজনৈতিক ও সামরিক কারণে ঘোড়াঘাট ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকার, সেই কারণে এখানকার ফৌজদার, নায়েব ফৌজদার, কাজী এবং নায়েব কাজীর পদটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দেশের শ্রেষ্ঠতম ফৌজদার ও শ্রেষ্ঠতম কাজী বলে পরিচিত ব্যক্তিদেরকেই এই সরকারে নিযুক্ত করার নিয়ম ছিল। মুহম্মদ সৈয়দ খাঁ, মীর ইসফিনিয়ার খাঁ, মীর এবাদত খাঁ, মীর নসরুল্লাহ খাঁ. শেখ জবরদস্ত খাঁ, ইব্রাহিম খাঁ, খাদত আলী খাঁ, শামসুদ্দৌলা খাঁ, আলী ইজ্জত নিয়ামত-উল্লা খাঁ, সৈয়দ আহমদ খাঁ মির্জা, কাশেম আলী খাঁ, ঘোড়াঘাটের ফৌজদার হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। ঘোড়াঘাটের শেষ মোগল ফৌজদার ছিলেন করম আলী খাঁ। মাত্র ১২ বৎসর বয়সের এই কিশোর ফৌজদারের পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। *মুজাফ্ফর নামা* একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ঘোড়াঘাট সরকারে মহালের সংখ্যা ছিল ৮৪টি। বাৎসরিক রাজস্ব ছিল ৮৩, ৮৩, ০৭২ $\frac{১}{২}$ দাম। এখান থেকে ৯০০ অশ্বারোহী, ৫০টি হস্তী এবং ৩২, ৬০০ সৈন্য বাংলার সর্বত্র সরবরাহ করতে হত।[৩] এই সরকার বর্দ্ধনকুঠির রাজার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পরবর্তীকালে ইদ্রাকপুর জমিদারী নামে যা পরিচিত হয়েছিল। বর্দ্ধনকুঠির[৪] রাজার নাম ছিল ভগবান। তিনি ১৫৩৩ শকাব্দের পূর্বে রাজপদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজা ভগবানের দেওয়ানের নামও ভগবান ছিল। রাজার নিবুর্দ্ধিতার সুযোগে তিনি সেইকালের ঢাকার সুবেদারকে প্রচুর উৎকোচ দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি লিখে নিয়েছিলেন। পরে নানারকম

গোলযোগ দেখা দেওয়ায় স্থির হয় যে, রাজা নয় আনা এবং দেওয়ান সাত আনা অংশ পাবেন। এই সাত আনা অংশ দিনাজপুর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভের পর ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ইদ্রাকপুর জমিদারির প্রথম রাজা হয়েছিলেন রাজা রাজেন্দ্র।[৫]

দিনাজপুরের মোগল শাসন আমলে বাংলার সুবাদার ইসলাম খানের মৃত্যুর পর কাশিম খান সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন (১৬১৪ - ১৭ খ্রিঃ)। পরবর্তীতে সুবাদার হন ইব্রাহিম খান। ইব্রাহিম খানের আমলে মোগল শক্তি ও প্রতিপত্তি প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শাহজাহান আরাকান রাজ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের সহায়তায় ইব্রাহিম খানকে পরাস্ত করে বাংলার রাজধানী রাজমহল দখল করে নেন। জাহাঙ্গীর নগর অধিকার করে তিনি স্বাধীন রাজার মত রাজত্ব করতে লাগলেন। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সম্রাট শাহজাহান দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসন আরোহণ (১৬২৮ খ্রিঃ) হতে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৭ খ্রিঃ) পর্যন্ত বাংলাদেশে মোগল শাসন শান্তিতেই পরিচালিত হয়েছিল। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তিনজন সুবাদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন, শাহজাহানের পুত্র শুজা (১৬৩৯ - ১৬৫৯ খ্রিঃ), শায়েস্তা খান (১৬৬৪ - ১৬৮৮ খ্রিঃ) এবং আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুস্‌সান (১৬৮৮ - ১৭০৭ খ্রিঃ)।

মোগল শাসন আমলে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটই ছিল রাজস্ব বিভাগীয় প্রধান দফতর, শুধু তাই নয়, ঘোড়াঘাট একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী সামরিক ঘাঁটি এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মোগল সুবাদারদের প্রত্যক্ষ শাসনের অধীনেও ছিল দিনাজপুর। এই যুগে বহুবিধ শাসন পদ্ধতি ছিল রাজস্ব ব্যবস্থাপনার একটি বৈশিষ্ট্য। সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা ও কর আদায় করতেন। সেই সময় দিনাজপুর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় গ্রামের স্তরে পাটওয়ারী পর্যন্ত রাজস্ব কর্মচারীদের এক ক্রমোচ্চ শ্রেণি রাজস্ব আদায় ও বিলি ব্যবস্থার দায়িত্ব পেতেন ঘোড়াঘাটের খোদ প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে। পুরো রাজস্ব আদায় ও নিয়মিত ভাবে তা প্রেরণ নিশ্চিত করা ছিল ফৌজদারের কর্তব্য। ঘোড়াঘাট প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে কানুনগো দফতর গ্রাম অঞ্চলের খবর, জমি, রাজস্ব নির্ধারণ, বিক্রয়পত্র এবং বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় রীতিনীতির বিশদ বিবরণ রাখত। এর মাধ্যমে জমিদারি ভূসম্পত্তি গোপন করা বা বেনামী করা এবং রায়তদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করা বেশির ভাগই রোধ করত। দিনাজপুর অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বড় বড় জমিদারদের সদর কাছারি সংলগ্ন একটি করে কানুনগো কাছারি থাকত। রাজস্ব আদায় পরিদর্শন ও আদায় ঠিকমত হচ্ছে কিনা তার জন্য আমিল বা আমিলগুজার থাকত। ঘোড়াঘাট সরকারে প্রধান আমিলরা পরগণা ও গ্রামের স্তরে আমিল, শিকদার, আমিন, বিতিক্‌চি, মুনসিফ, থানাদার, পাটোয়ারি ও অন্যান্য এবং চৌধুরী ও মণ্ডলদের মত আধা কর্মচারীদের সাহায্য পেতেন। রাজস্ব আদায় শেষ হয়ে গেলে আমিলদের নিজ নিজ এলাকার রাজস্ব আদায়, বকেয়া ও হ্রাসের বিবরণ কানুনগোর কাছে জমা দিতে হত। কানুনগোর কাজ

ছিল সেগুলিকে জমিদার ও অন্যান্যদের প্রদত্ত বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। মাঝারি বা বড় জমিদারগুলিতে সাধারণত আমিল নিযুক্ত করা হত না। ঘোড়াঘাট সরকার সেইসময় প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল থেকে শহর অঞ্চল পর্যন্ত ওয়াকাই নিগার এবং সাওয়ানিহ নিগার নিযুক্ত করতেন। তাঁদের কাজ ছিল তাদের এলাকায় যা ঘটত তার সংবাদ সরকারকে দেওয়া। তখন বাজারে ওজন মাপ পরীক্ষার জন্য মুহতাসিবদের নিযুক্ত করা হত। মোগল শাসনে রাজভৃত্য হিসাবে গণ্য কানুনগো, ওয়াকাই নিগার, সাওয়ানিহ নিগার ও মুহতাসিবরা জমিদারদের উপর নিয়ন্ত্রক হিসাবে কর্মরত থাকতেন।[৬]

মোগল শাসনে ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা ও বাংলা সুবায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ফলে প্রশাসনে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। দিনাজপুর রাজের মত জমিদারদের পক্ষে প্রচলিত হারের কমে জমি ইজারা পেতো। তাঁরা কৃষিযোগ্য জমি গোপন করতে এবং হাট, গঞ্জ ও অনিয়মিত দানের জন্য জমি বরাদ্দের অভিপ্রায়ে প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের নানা উৎকোচ দিয়ে হাত করে নিত, এই সময় বহু কানুনগো, নায়েব কানুনগো ও চৌধুরী নিজেদেরকে জমিদারে পরিণত করার জন্য তাঁরা নিজের মৌলিক সততা ও সরকারি দায়িত্ব বিসর্জন দিয়ে এক একজন বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়ে বসেছিলেন। প্রধান জমিদারদের উপর এই সময় ফৌজদার ও সুবাদারের কর্তৃত্ব ক্রমশই শিথিল হয়ে পড়ায় জমিদারদের কেউ কেউ চাকলাদারের পদে উন্নীত হয়েছিল। এর ফলে, রায়তরা ক্রমেই জমিদার শ্রেণির দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। পরবর্তী নবাবি আমলে এই অবস্থা আরও চরমে উঠেছিল।[৭]

মোগল শাসন আমলে দিনাজপুরে দিওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারের জন্য ঘোড়াঘাট প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে কাজী এবং নায়েব কাজীদের নিয়োগ করতেন। এই কাজী ও নায়েব কাজী ছাড়াও আলোচ্য সময়কালে অন্যান্য যাঁরা বিচারকের ভূমিকা পালন করতেন তাঁদের মধ্যে জমিদার, ফৌজদার, কোতোয়াল, মুফতি, আমিন ও কানুনগো ছিলেন। তাঁরা সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দিওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারে অংশ গ্রহণ করতেন। মোগল আমলে সাধারণতঃ থানাদার, কোতোয়াল ও কাজীর কাছেই পেশকৃত মামলার সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে জমিদার বা আমিনরাই ছিলেন বিচারের হর্তাকর্তা। স্বার্থের কারণে এই জমিদাররা সরকার নিযুক্ত কাজীদেরকে সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ অথবা বিনাবাধায় নিজ কর্তব্য পালনে বিঘ্নিত করতেন। ফলে, মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে বিলম্ব করা বা চাপা দেওয়া জমিদারদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। দিওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারে বড় জমিদারদের অংশগ্রহণ বা ক্ষুদ্র জমিদারদের বিচার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ, এই অধিকার মোগল সুবাদার বা ফৌজদাররা বিলোপ করে নাই। তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন বিচারের ক্ষেত্রে অনেকটাই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন। দেনা, চুরি ও সাধারণ বিবাদের অভিযোগ তাঁদের কাছেই করা হতো। এইসব মামলা নিষ্পত্তির জন্য জরিমানা করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল। জমিদারদের এলাকায় কোনও ফৌজদারি দফতর না থাকার ফলে ক্ষুদ্র জমিদাররা আটক বা প্রাণদণ্ড সংক্রান্ত জটিল মামলাগুলি নিকটবর্তী থানাদার বা কাজীর কাছে পাঠাতেন। জমিদারদের প্রধান

কাজই ছিল অধীনস্থ ভূমি ভোগ দখলকারী ও রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় ও যথাসময়ে খাজনা প্রদানে অক্ষম ব্যক্তিদের সম্পর্কে পদক্ষেপ নেওয়া এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তি করা; এই ব্যাপারে তাঁরা অতিরিক্ত কর্তৃত্ব জাহির করতেন। ধনাঢ্য জমিদারদের প্রদত্ত সনদে সব সময়ে শর্ত থাকত যে অবাধ্যদের বহিষ্কার ও শাস্তি দেবার বিষয়ে নিজেকে পরিশ্রমের সঙ্গে নিয়োগ করা।

অজ্ঞানতা, দারিদ্র্য, রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা প্রভৃতি কারণে দিনাজপুরের কৃষকদের পক্ষে জমিদারি বিচার বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়া অস্বাভাবিক ছিল। জমিতে অধীনস্থ স্বত্বভোগী রায়ত, তালুকদার অথবা টপ্পাদারদের ভয়ে দিনাজপুরের শক্তিশালী রাজা বা জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবে এই রকম কারও ঘাড়ে দুটো মাথা ছিল না! অভিযোগ জানাতে তারা ভয়ে কাঁপতো, ইতস্তত করত। সরাসরি ফৌজদারি বা দিওয়ানি আদালতে অথবা সরাসরি নবাবের কাছে অভিযোগ জানানো সর্বদাই বিপজ্জনক ও দুঃসাধ্য ছিল সাধারণ ও নিপীড়িত প্রজাদের পক্ষে। পরবর্তী নবাবি আমলেও এই অবস্থা চলছিল। এর পরিবর্তন ঘটেছিল ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন আমলে।[৮]

মোগল শাসনকালে দিনাজপুরের তাজপুর হেমতাবাদ অঞ্চল মোগলদের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল। ঘোড়াঘাটে মোগল-আফগান যুদ্ধকালে এবং পরবর্তীতে মোগলশাসন থেকে পলাতক প্রচুর আফগান বিদ্রোহী ঘোড়াঘাট থেকে পালিয়ে এসে এই অঞ্চলে বসতি গড়ে ছিলেন। গৌড়ে আফগান অধিকার কালে তাজপুর হেমতাবাদ অঞ্চলের ফৌজদার ছিলেন তাহির ইমাম। হুমায়ুনের নেতৃত্বে তাজপুর-হেমতাবাদ দখল করতে এলে হেমতাবাদ অঞ্চলে তাহির ইমামের সঙ্গে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহির ইমাম প্রাণ হারান এবং প্রচুর সেনার মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে মোগলরা এই অঞ্চল দখল করেন এবং তাজপুরকে একটি উন্নত জনপদে পরিণত করেন। মোগল শাসন আমলে হেমতাবাদের অদূরে বালিয়াদিঘির বিখ্যাত সাধক ও পীর সুলতান হাসান যুরিয়ানা বাহরানাকে বাংলার সুবাদার শাহজাহানের পুত্র শুজা ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে একটি ফরমান দিয়েছিলেন। ফরমানটি এই অঞ্চলের উপর মোগল আধিপত্যবাদের অনুকূলে একটি বিশ্বস্ত দলিলরূপে পরিচিত। মোগল শাসন আমলেই দিনাজপুর সহ বাংলার সর্বত্র প্রত্যন্ত অঞ্চলে অঞ্চলে কিছু কিছু রাজবংশের উদ্ভব ঘটেছিল, যাঁরা মোগল আনুগত্য স্বীকার করেও অনেকটাই স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। এমনই একটি দৃষ্টান্ত হল দিনাজপুর রাজবংশ। ষোল শতকের শেষভাগে এই রাজবংশের উদ্ভব ঘটেছিল।

৪. দিনাজপুর অঞ্চলের উৎস ও নামকরণ

মোগলদের রাজস্ব প্রশাসনের বিভাগীয় প্রধান দফতর এবং গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী সামরিক ঘাঁটি ঘোড়াঘাট এই নামের প্রচলন থেকে এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডটি সতেরো শতকে দিনাজপুর নামে পরিচিতি লাভ করে। দিনাজপুর নামে পরিচিত এলাকাকে কেন্দ্র বিন্দু করে একচেটিয়া জমিদারির উত্থান প্রাচীন প্রশাসনিক কেন্দ্র বিষয় ও পরে সরকারে এক নতুনমাত্রা যোগ করে। এই নতুনমাত্রা যোগের ফলে পরবর্তী কালে দিনাজপুর জেলা

রূপে খ্যাতি লাভ করে। কথিত যে, দিনাজ নামের একজন তার পরিবার ও অনুগামী সহকারে যেখানে বসবাস শুরু করেন, এ জেলার নতুন বসতি সমূহের নামকরণের রীতি অনুযায়ী সেই স্থান দিনাজপুর নামে পরিচিত হয়।[৯] দিনাজপুর নামের শাব্দিক অর্থ দিনাজের শহর। আবার, কেউ কেউ বলেন মুসলমান অধিকারের যুগে একজন হিন্দু জমিদার নিঃশব্দে ক্ষমতা সঞ্চয় করে নিজেকে গৌড়ের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন এই হিন্দু জমিদারটি ছিলেন দিনাজপুরের প্রভাবশালী ভূস্বামী রাজা গণেশ। তিনি 'দনুজ মর্দনদেব' নাম ধারণ করেন। ফার্সি পণ্ডিতেরা 'দনুজ' শব্দটি উচ্চারণ করতেন 'দিনওয়ায়' রূপে ; শব্দটি ক্রমে বিবর্তিত হয়ে 'দিনওয়াজ' অর্থাৎ দনুজ > দন - উ- য > দন - ওয়া - য > দিন - ওয়া - জ রূপে পরিণত হয়। সতেরো শতকে মুসলিম শাসকরা 'দিনওয়াজ' শব্দটিকে বেছে নেন, যার বাংলা 'দিনাজ'। তারসঙ্গে 'পুর' যোগ করে স্থানটি দিনাজপুর নামে পরিচিত হয়। ফার্সিতে গণেশ দনুজ মর্দনদেবকে বলা হত 'দিওয়ান - ই - দিন- পয়ায'। মুসলিম শাসকরা ইংরেজিতে তার তর্জমা করলেন 'Hakim of Dynwas' অর্থাৎ দিনাজের হাকিম। আবার পরবর্তীতে গণেশ দনুজ মর্দনদেব সম্পর্কে ইংরেজরা লিখলেন 'Perhaps a Petty Chief of Dynwaj' যার অর্থ দিনাজের এক সামন্ত।[১০]

কোনও স্থানের নামকরণ নির্ণয় করা খুব কঠিন, তবে দিনাজপুর নামটি খুব প্রাচীন নয়। এই শহরের বয়স তিন'শ বছরের মত। দিনাজপুরের রাজা রামনাথ রায় শহরটিকে গড়ে তুলেছিলেন। কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক সন্ন্যাসী রাজা প্রাণনাথের বাবা শুকদেব রায়কে তাঁর জমিদারি দিয়ে রাজা করেছিলেন বলে কথিত। প্রাণনাথ পরবর্তীতে রাজা হলে তিনি বাণগড়ে বসতি গড়ে রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু প্রাণনাথের পুত্র রাজা রামনাথ বাণগড়ের আরও পূর্ব দিকে পূনর্ভবা নদী (কাঞ্চন নদী) তীরে ও কালিকানন্দ ব্রহ্মচারীর সমাধি স্থানের সামনে প্রাসাদ তৈরি করলেন। বাণগড় থেকে ইট, পাথর, পাথরের গেট প্রভৃতি এনে নিজ বাড়িতে লাগালেন এবং ক্রমে একটি নগর তৈরি করলেন। বর্ষাকালে বাণগড় থেকে জলপথ দিয়ে যাতায়াত ছিল কষ্টকর। রাজা রামনাথের বাণগড় থেকে দিনাজপুর সদরে আসার এটিও ছিল অন্যতম কারণ। কালিকানন্দজী ছিলেন প্রকৃত ব্রহ্মচারী। তিনি দীন ও দরিদ্রের রাজা, তাই তাঁকে ব্রহ্মচারী বলা হত। তাঁরই সম্পত্তি থেকে এতবড় জমিদারি। দীন ও দরিদ্রের রাজা কালিকানন্দ স্মরণে রাজা রামনাথ তাই নগরের নামকরণ করলেন দীনরাজপুর। এ জেলার মানুষ 'র' কে 'অ' আর 'অ' কে 'র' বলেন। তার থেকেই 'দীনরাজপুর' হয়ে যায় 'দিনাজপুর'।[১১] দিনাজপুর নামকরণ এভাবে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

৫. দিনাজপুর রাজের উদ্ভব ও বংশ

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে রাজা গণেশের বংশীয় বিষ্ণু দত্ত নামে এক রাঢ়ীয় কায়স্থ দিনাজপুরে বাস করতেন এবং সরকার পিঞ্জরা তাঁর জমিদারি ছিল। তিনি রাজা গণেশের উত্তরাধিকার সূত্রে পিঞ্জরা সরকারের জায়গির ছিলেন। বিষ্ণু দত্তের মৃত্যুর

পর তাঁর পুত্র শ্রীমন্ত দত্ত সরকার পিঞ্জরার এই জমিদারি লাভ করেন। শ্রীমন্ত দত্তের হরিশ্চন্দ্র নামে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। তিনি পুত্র ও কন্যার মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি সমান ভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে পুত্রের নিঃসন্তান মৃত্যু হওয়ায় দৌহিত্র শুকদেব ঘোষ সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

শুকদেব ঘোষের পিতা হরিরাম ঘোষ রাজা শ্রীমন্ত দত্তের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। হরিরাম ঘোষের পিতা দেবকীনন্দন ঘোষ ও পিতামহ ভগবান বর্দ্ধন কুঠির জমিদারের দেওয়ান ছিলেন। ইদ্রাকপুর জমিদারির সাত আনা অংশ এই ভগবানই পেয়েছিলেন। রাজা শুকদেব রায় পিতার সাত আনা বর্দ্ধনকুঠির জমিদারিও লাভ করেন। এইভাবে দিনাজপুর রাজের উত্থান ঘটে। শুকদেব রায় থেকে পরবর্তীতে দিনাজপুর রাজবংশ শুরু হয়।

রাজা শুকদেবের পর তাঁর তিন পুত্র রামদেব, জয়দেব ও প্রাণনাথ যথাক্রমে রাজত্ব করেছিলেন। রাজা প্রাণনাথের দত্তকপুত্র রাজা রামনাথ মুর্শিদকুলী খাঁর বন্দোবস্তের সময় বর্তমান ছিলেন। রামনাথ একজন সুবিজ্ঞ ও প্রতিভাশালী ভূস্বামী বলে পরিচিত ছিলেন। প্রাচীন বাণরাজার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্য হতে বিপুল অর্থ তিনি পেয়েছিলেন বলে কথিত। প্রবাদ আছে যে, মুর্শিদাবাদের নবাবরা পর্যন্ত রামনাথের কাছ থেকে অনেক সময় ঋণ গ্রহণ করতেন। রামনাথের পর তাঁর পুত্র বৈদ্যনাথ রাজা হন। রাজা বৈদ্যনাথের পর তাঁর দত্তকপুত্র দিনাজপুর রাজসিংহাসনে বসেন রাজা রাধানাথ। রাজা রাধানাথের দত্তক পুত্র রাজা গোবিন্দনাথ অল্প কিছুদিন সিংহাসনে বসার পর মৃত্যু হলে তাঁর মহিষী মহারানি শ্যামমোহিনী দত্তকপুত্র রূপে গিরিজানাথকে গ্রহণ করেন। গিরিজানাথ নাবালক অবস্থায় রাজ্য শাসন করেন। গিরিজানাথ মহারাজ উপাধি লাভ করেন। মহারাজ গিরিজানাথের পর তাঁর পুত্র জগদীশনাথ দিনাজপুর রাজসিংহাসনে বসেন।[১২] মহারাজ জগদীশনাথের পুত্র কুমার জলধিনাথ অল্পবয়সেই মারা যান (১৯৪১ খ্রিঃ)। মহারাজ জগদীশনাথ রায়বাহাদুর পর্যন্ত দিনাজপুর-রাজ নানা রাজনৈতিকপট-পরিবর্তনের পরও বলবৎ ছিল।

উল্লেখ্য যে, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর বন্দোবস্তের সময় দিনাজপুর জমিদারির পরগণার সংখ্যা ছিল ৮৯টি এবং রাজস্ব ৪ লক্ষ ৬২ হাজার ৯ শো ৬৪ টাকা নির্দ্ধারিত হয়েছিল। হান্টার সাহেবের বিবরণে (১৮৭৬ খ্রিঃ) জানা যায়, সেই সময়ে দিনাজপুর জমিদারি বহু পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সুবৃহৎ জমিদারি তখনও ছিল এবং বার্ষিক ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা রাজস্ব প্রদান করা হত। রাজা রাধানাথের সময় দিনাজপুর জমিদারি বহুল পরিমাণে নীলাম হয়ে যায়। দিনাজপুর রাজাদের বহু সম্পত্তি দিনাজপুরের অন্যতম জমিদার রায় সাহেবদের হস্তগত হয়েছিল। পাঁচবিবি থানার শিরোটি গ্রামে রায়সাহেবদের মস্ত কাছারি ছিল এবং রংপুর জেলার (বর্তমান গাইবান্ধা জেলা) গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তর্গত গুমাণী গঞ্জেও অপর বড় একটি কাছারি ছিল। এই কাছারি দুটির অধীনে বহু সম্পত্তি বগুড়া জেলার অন্তর্গত হয়েছিল।[১৩]

ফ্রান্সিস বুকানন 'দিনাজপুর রিপোর্টে' দিনাজপুর জমিদারি, জনপ্রিয় ভাবে যা 'দিনাজপুর রাজ' নামে পরিচিত, সতেরো শতকের প্রথম দিকে যার প্রতিষ্ঠা হয় এর উত্থান ও পরবর্তীতে বিকাশ সম্পর্কে যে বিবরণ রেখে গেছেন সেই প্রতিবেদনটিই দিনাজপুর রাজাদের সম্পর্কে যথার্থ এবং নির্ভরশীল। দিনাজপুর জমিদারির উত্থান ও বিকাশ ব্যাপারে ই. ভি. ওয়েস্ট মেক্ট, এফ. ও. বেল প্রমুখ বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছেন।[১৪]

কাশী নামক এক ব্রহ্মচারীকে ঘিরে দিনাজপুর রাজের উত্থান ঘটেছিল। এই ভূ-ভাগের হাবেলি পিঞ্জরা, বিজয়নগর, নীরপুর, ডিহিনগর, দায়োরা, সলিমাবাদ, এইসব অঞ্চলের বিশাল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন ওই কাশী নামক ব্রহ্মচারী। লোক প্রবাদ যে, তাঁর এই বিশাল ভূ-সম্পত্তির মূল উৎস ছিল চামুণ্ডা-বিদ্যেশ্বরী দেবীর নামে উৎসর্গকৃত দেবোত্তর ভূমি। এই যোগীপুরুষের মৃত্যুর পর শ্রীমন্ত দত্ত তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। বুকানন সাহেব শ্রীমন্ত দত্তকে সুবাবাংলার নায়েব কানুনগো বলে উল্লেখ করেছিলেন। অপরদিকে ই. ভি. ওয়েস্টমেক্ট শ্রীমন্ত দত্তকে কাশী ব্রহ্মচারীর একজন শিষ্যরূপে বর্ণনা করেছেন। শ্রীমন্ত দত্তের কন্যা বর্ধমান জেলার এক কুলীন কায়স্থ হরিরাম ঘোষের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন এবং তাঁদের পুত্র শুকদেব (১৬৪২ - ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর মাতামহ শ্রীমন্ত দত্তের সমস্ত জমিদারি লাভ করেন। শুকদেব বা তাঁর পিতা হরিরাম ঘোষ পার্শ্ববর্তী ক্ষেত অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জমিদারির মালিক ক্ষেতলাল পরিবারের জমিদারির দেওয়ান পদে কাজ করেন এবং শুকদেব ইদ্রাকপুর নামে পরিচিত বেশ বড় একটি জমিদারির সাত আনা ভাগও লাভ করেন। এইভাবে শুকদেব তাঁর মাতামহের জমিদারি এবং নতুন করে অর্জিত ইদ্রাকপুরের সাত আনা ভাগ এই উভয় সম্পত্তির অধিকারী হন। এই কারণেই শুকদেবকে দিনাজপুর জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়।

শুকদেবের পর তাঁর পুত্র প্রাণনাথ (১৬৮২ - ১৭২২ খ্রিস্টাব্দ) এবং প্রাণনাথের দত্তক পুত্র রামনাথ (১৭২২ - ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) এই জমিদারি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। প্রাণনাথ ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী এবং জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করতেন। একইসঙ্গে তিনি ছিলেন একজন অত্যাচারী শাসক যার কূট বুদ্ধিতে আশপাশের জমিদাররাও সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতেন। বাংলার সুবাদার আজিমুস্‌সান প্রাণনাথকে একটি সনদ প্রদান করেছিলেন। নবাব মুর্শিদকুলীর নতুন রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থায় দিনাজপুরের জমিদার প্রাণনাথকে আকবর নগর বা ঘোড়াঘাটের চাকলাদার নিযুক্ত করেছিলেন। প্রাণনাথের সুকীর্তির নিদর্শন স্বরূপ দিনাজপুর রাজবাড়ি সংলগ্ন শুকসাগর নামক সুবিশাল দিঘির উত্তরপাড়ে একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ, প্রাণ সাগর দিঘি,[১৫] কান্ত নগরে কান্তজীর নবরত্ন মন্দির নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন ইত্যাদি। দিনাজপুর রাজবাড়ী থেকে একটি কালো পাথরের শিলালিপি পাওয়া গেছে, তাতে ভাষা সংস্কৃত, অক্ষর বাংলায় লেখা আছে।

শাকে সৈক যুর্গ হুতার গণিতে দোনাস্তি নমো হরে
নৃপ শ্রী শুকদেব রায় তনুজঃ শ্রী প্রাণনাথো নৃপঃ
প্রাদাদিষ্টক ঘ্রাবিনির্মিত মহা মঞ্চং গৃহ্যভ্যন্তরং
চূড়া চক্রধ খণ্ডিতেন্দ্রু সুধয়া সৌধং চিরঞ্জীবিন।। ১৬২১

অনুবাদ ঃ " ১৬২১ শকাব্দে (১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দ) দীর্ঘ জীবন কামনায় রাজা শুকদেবের পুত্র রাজা প্রাণনাথ ইষ্টক খোদিত মূর্তিযুক্ত ইষ্টক দ্বারা মন্দিরের ভিতর ও বাহির সজ্জিত করিয়া চূড়াচক্র বসাইয়া চাঁদের মত সুন্দর এই মন্দির নির্মাণ করেন।"[১৬]

প্রাণনাথের দত্তক পুত্র রামনাথ (১৭২২ - ১৭৬০) উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিষয় সম্পদকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তিনিও পিতার মত অত্যাচারী শাসক ছিলেন। টোডরমল্লের সময়ে এই জমিদারির রাজস্বের সঙ্গে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের রাজস্বের হিসাবের তুলনা করলেই বোঝা যায় রামনাথের আমলের জমিদারির একটি রাজস্ব চিত্র। ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে ৯৯টি পরগণা সম্বলিত দিনাজপুর জমিদারির রাজস্ব ছিল ৫ লক্ষ ৬ হাজার ৪শো ৩১ সিক্কা রুপি, আর ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে এই জমিদারি ছিল ১২১টি পরগনা নিয়ে গঠিত এবং এর বার্ষিক খাজনা ছিল ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪ শো ৩৩ সিক্কা রুপি। জমিদারির এই বিশালত্বের দরুণ জমিদারির অধিকারী রামনাথের দাপট এতই প্রবল ছিল যে বাংলার মুসলমান সুবাদারেরা পর্যন্ত তাঁকে ক্ষমাশীলতার চোখে দেখতেন। রামনাথের এই জমিদারি-আভিজাত্য দেখে তাঁরা তাঁকে মহারাজ বাহাদুর উপাধি দিতে ভোলেন নি।[১৭]

রামনাথ তাঁর রাজত্বকালে অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করে গেছেন। তাঁর নিদর্শন স্বরূপ রামসাগর, রামডারাখাড়ি, ভিখাহারে বিন্দুবাসিনী মন্দির, বিন্দোলে মার্তন্ড ভৌরবের মন্দির, কান্তনগরে কালিয়াকান্তজীর মন্দির ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কান্তনগরের মন্দিরের উত্তরপূর্ব কোণে ভিত্তি দেয়ালে যে শিলালিপিটি রয়েছে, তাতে কান্তনগরের বর্গাকারে নির্মিত ও ৫১ ফুট বাহু বিশিষ্ট ত্রিতল মন্দিরের ৯টি চূড়া বা রত্নবিশিষ্ট নবরত্ন মন্দিরটির যার গায়ে গায়ে রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণের কাহিনি পোড়ামাটির চিত্র ফলকের মাধ্যমে তুলে ধরা আছে; এই অপূর্ব শৈল্পিক সৌকর্য উঁচুমানের ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দিরটি যে রাজা প্রাণনাথ শুরু করেছিলেন এবং রাজা রামনাথ সমাপ্ত করেছিলেন ওই শিলালিপিতে তারই উল্লেখ রয়েছে। শিলালিপির ভাষা সংস্কৃত, অক্ষর বাংলা । তার পাঠ এই রকম ঃ

শ্রী শ্রী কান্তঃ
শাকে বেদাব্ধি কালক্ষিতি পরিগণিতে ভূমিপঃ প্রাণনাথ
প্রাসাদাঞ্চ্যতিরম্য সুরাতি নবরত্নাখ্যা মস্মিন্ন কার্য্যাৎ।
রুক্মিণ্যাঃ কান্ত তুষ্টৌ সমুদিত মনসা রামনাথেন রাজ্ঞা
দত্তঃ কান্তায় কান্তস্য তু নিজ নগরে তাত সংকল্প সিদ্ধৌ।।

অনুবাদ : "প্রাসাদতুল্য অতিরম্য সুরাতি নবরত্ন দেবালয়ের নির্মাণ কার্য নৃপতি প্রাণনাথ কর্তৃক আরব্ধ হয়। রুক্মিণীকান্তের তুষ্টি ও পিতার সংকল্পসিদ্ধির নিমিত্ত ১৬৭৪ শাখে (১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ) নৃপতি রামনাথ কান্তের নিজনগরে কান্তের উদ্দেশ্যে এ মন্দির উৎসর্গ করেন।"[১৮]

দিনাজপুরের পূর্বে অবস্থিত রাজবাড়ি সংলগ্ন রাজারামপুর গ্রামখানি রাজা রামনাথের স্মৃতিকে আজও বহন করে চলেছে। এখানে তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ শ্রেণির হিন্দুদের নিয়ে এসে বসতি স্থাপন করে দিয়েছিলেন।

রাজা রামনাথের পর দিনাজপুর রাজসিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র রাজা বৈদ্যনাথ (১৭৬০-১৭৮০)। তাঁর সময়ে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দিওয়ানি লাভ করে (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ) এবং তখন থেকেই শুরু হয়েছিল একটি কার্যকরী ঔপনিবেশিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে রাজা বৈদ্যনাথ কোনও উত্তরাধিকারী না রেখেই মারা যান। তাঁর বিধবা পত্নী রানি সরস্বতী তিন বছরের শিশু রাধানাথকে (মৃত্যু ১৮০১) দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। রাজা রাধানাথের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী প্রাণসুন্দরী দত্তক পুত্র রূপে গোবিন্দনাথকে গ্রহণ করেন ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। রাজা গোবিন্দনাথের মৃত্যু হয় ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে। রাজা গোবিন্দনাথের মৃত্যুর পর দিনাজপুর রাজ জমিদারির ভার ন্যস্ত হয় তাঁর পুত্র রাজা তারকনাথের উপর। রাজা তারকনাথের মৃত্যু হয় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে। রাজা তারকনাথের মৃত্যুর পর তারকনাথের বিধবা পত্নী শ্যামমোহিনী দেবী জমিদারি দেখাশুনার দায়িত্বভার দেবার জন্য দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন গিরিজানাথকে। রাজা গিরিজানাথের মৃত্যু হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে। তাঁরা মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জগদীশনাথ দিনাজপুর রাজ জমিদারির ভার নেন। রাজা জগদীশনাথের পুত্র জলধিনাথ, তিনি অল্পবয়সেই মারা যান। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের পর জগদীশনাথ সেই সময়ের পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে আসেন এবং ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

উল্লেখ্য যে, ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে রাজা বৈদ্যনাথের মৃত্যুর পর পরই কমিটি অব রেভিনিউ দিনাজপুর রাজ পরিবারকে এই ভূ-সম্পত্তি দেখাশোনা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং দেবী সিং নামে একজন ইজারাদারের সঙ্গে অত্যন্ত চড়াহারে দুই বছরের জন্য মে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে এপ্রিল ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজস্ব বন্দোবস্ত করে। অতিরিক্ত হারে রাজস্ব আদায়ের জন্য দেবী সিং দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলে কৃষক ও অন্যান্যদের উপর নানা রকম অত্যাচার ও জোর জবরদস্তি শুরু করলে এই অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা এবং হিংসাত্মক কৃষক বিক্ষোভ দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক সরকারের বন্দোবস্তে বাংলার একটি বড় জমিদার দিনাজপুর রাজ কি করে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সে আলোচনা আধুনিক যুগ পর্বে বিস্তারিত ভাবে থাকবে। দিনাজপুরের জমিদার বংশ মোগলদের পৃষ্ঠপোষকতায় সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল এবং রাজা রামনাথের আমলে তা গৌরবের শীর্ষে উঠেছিল। বুকানন সাহেবের বিবরণে জানা যায়, তখন পিঞ্জরা (হাবেলী

দিনাজপুর রাজের বংশ
হরিশ্চন্দ্র
শ্রীমন্ত দত্ত
কন্যা
শুকদেব রায় (১৬৪২ - ১৬৭৭)
জয়দেব (১৬৭৭ - ১৬৮২)
প্রাণনাথ (১৬৮২ - ১৭২২, জয়দেবের ভাই)
রামনাথ (১৭২২ - ১৭৬০)
বৈদ্যনাথ (১৭৬০ - ১৭৮০)
সরস্বতী (বৈদ্যনাথের বিধবা পত্নী)
রাধানাথ (দত্তক পুত্র, মৃত্যু ১৮০১)
প্রাণসুন্দরী (রাধানাথের বিধবা পত্নী)
গোবিন্দনাথ (দত্তক পুত্র ১৮১৭ ; মৃত্যু ১৮৪১)
তারকনাথ (১৮৪১ - ১৮৬৫)
শ্যামমোহিনী (তারকনাথের বিধবা পত্নী)
গিরিজানাথ (দত্তক পুত্র, ১৮৭৮ - ১৯১৯)
জগদীশ নাথ (১৯১৯ - ১৯৬২) [১১]
জলধিনাথ (১৯২৫ - ১৯৪১)
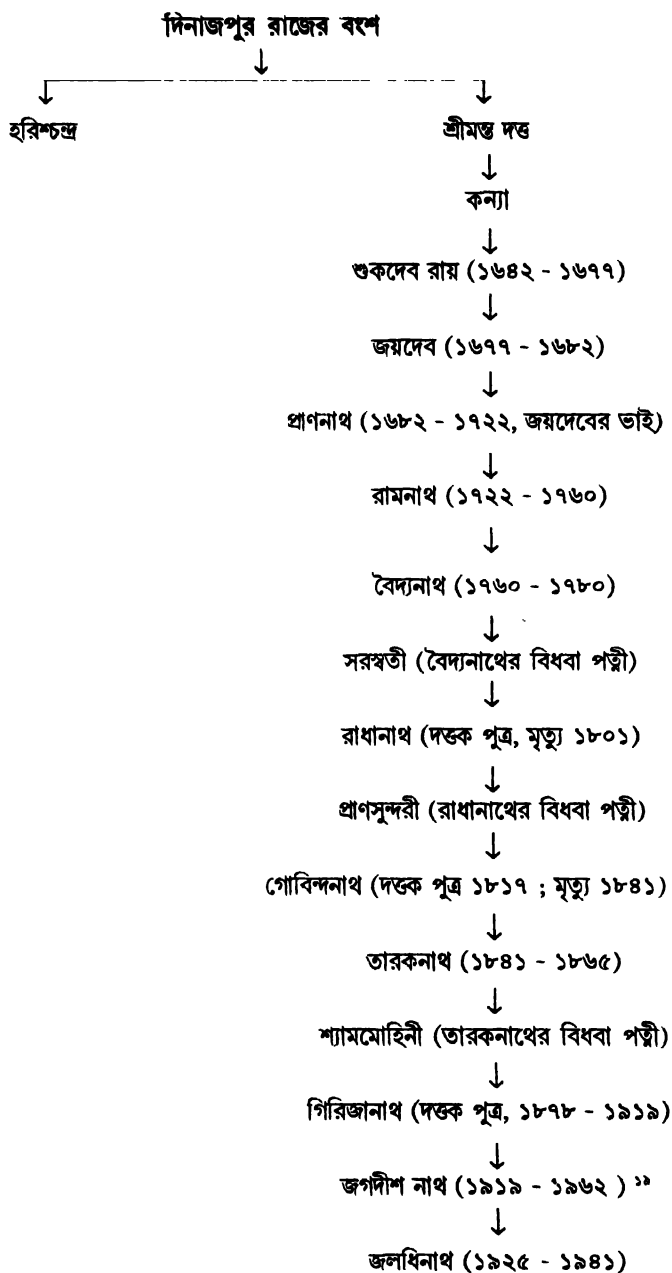
-পিঞ্জরা), ঘোড়াঘাট, বারবকাবাদ, তাজপুর, এই চারটি সরকার দিনাজপুর রাজের অধীনে ছিল এবং এর আয়তন ছিল পাঁচ হাজার তিনশ চুয়াত্তর বর্গ মাইল।

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. প্রভাসচন্দ্র সেন, *বগুড়ার ইতিহাস* (নবাবি আমল), পৃ. ২৪৮, ২৪৯।
২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (মধ্যযুগ), পৃ. ২৭।
৩. প্রভাসচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।
৪. বর্দ্ধনকুঠিঃ বর্তমান রংপুর জেলার অধীনে গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তর্গত।
৫. প্রভাসচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২-৭৩।
৬. A. Akhtar, *The Role of the Zamındars ın Bengal 1707-1722*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1982, p. 18-30.
৭. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, 'দিনাজপুরের প্রশাসনিক ইতিহাস: প্রাচীন ও মধ্যযুগ,' *দিনাজপুর: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ১৫৫, ১৫৬।
৮. ঐ, পৃ. ১৫৬।
৯. E. V. West Macott : 'The Territorial Aristocracy of Bengal - The Dinajpur Raj', *The Calcutta Review*, Vol. Lv, p. 208.
১০. ধনঞ্জয় রায়, 'স্থান নাম মাধুর্য', *দৈনিক বসুমতী*, ২৮ অক্টোবর, ২০০১, পৃ.৩।
১১. *দৈনিক বসুমতী পাত্রিকা*, ২৮ অক্টোবর, ২০০১, পৃ. ৩।
১২. প্রভাসচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭, ২৭৮। উল্লেখ্য, প্রভাসচন্দ্র সেনের লিখিত *বগুড়ার ইতিহাস*-এ রাজা গোবিন্দনাথের পুত্র রাজা তারকনাথের উল্লেখ নেই, তিনি লিখেছেন, রাজা গোবিন্দনাথের মৃত্যু হলে তাঁর মহিষী মহারানি শ্যামমোহিনী দত্তকপুত্র রাজা গিরিজানাথের নাবালক অবস্থায় রাজ্য শাসন করেন। পৃ. ২৭৭, ২৭৮, রচনাকার।
১৩. প্রভাসচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮, ২৮৯।
১৪. E. V. West Macott, 'The Territorial Aristocracy of Bengal - The Dinajpur Raj', *Calcutta Review*, 1872 ; F. O. Bell, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Dinajpur*, 1942.
১৫. প্রাণসাগর : বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধীনে গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত।
১৬. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *দিনাজপুর মিউজিয়াম*, পৃ. ১৬০।
১৭. Francis Buchanan, *Account of the District of Zila Dinajpur*, p. 255.
১৮. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮।
১৯. Dr. Chittaranjan Acharyya, *Short History of Dinajpur Raj up to Eighteenth Century*, উত্তর দিনাজপুর জেলার অষ্টম বর্ষপূর্তি উৎসব স্মরণিকা, ২০০০, পৃ. ১০ এবং E. V. West Macott, *Dinajpur Gazettier*, p.20.

সপ্তম অধ্যায়

নবাবি আমলে দিনাজপুর

১. দিনাজপুরে নবাবি আমল

বস্তুতপক্ষে মোগলসম্রাট বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ) বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটতে শুরু করে। মোগল অধিকারভুক্ত বহু অংশ ক্রমে স্বাধীন হয়ে যেতে থাকে। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সুবার সুবেদার পদে মুর্শিদকুলী খাঁ নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে দিল্লির অকর্মণ্য সম্রাটরা দুর্বলতায় ও আত্মকলহে জর্জরিত হয়ে পড়ায় মোগল সাম্রাজ্য চরম দুর্দশায় পড়ে গিয়েছিল। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে বাংলা হতে দিল্লি দরবারে শুধুমাত্র রাজস্ব পাঠান হত এবং বাদশাহী সনদের বলেই সুবেদারি পদে নতুন নিয়োগ হত। এই ব্যবস্থার ফলে বাংলার সুবেদারেরা প্রায় স্বাধীনভাবেই কাজ করতে লাগলেন এবং বংশপরম্পরায় সুবেদার বা নবাবের পদ অধিকার করে থাকতে লাগলেন। এরফলেই বাংলায় নবাবি আমল সূচিত হয়েছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার সুবেদার হয়ে রাজস্ব বিভাগের দিকে খুব বেশি ঝোঁক দিয়েছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর পর শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খাঁ, সরফরাজ খাঁ, আলীবর্দী খাঁ এবং সিরাজউদ্দৌলা বাংলার নবাব হন এবং নবাবি শাসনের এই ধারা পলাশীর যুদ্ধের পরেও চলেছিল।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ নতুন রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থায় দিনাজপুরের জমিদার প্রাণনাথকে আকবর নগর বা ঘোড়াঘাটের চাকলাদার নিযুক্ত করেছিলেন। এই রাজস্ব কাজের সুবিধার জন্য সমস্ত বাংলাকে মুর্শিদকুলী খাঁ ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেছিলেন এবং সমস্ত বাংলার ওই ১৩টি চাকলার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চাকলা ছিল আকবর নগর বা ঘোড়াঘাট চাকলা। প্রাণনাথ যখন এই চাকলার চাকলাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন সরকার বরবকাবাদ, ঘোড়াঘাট, জান্নাতাবাদ, পূর্ণিয়া ও তাজপুর এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল তাঁর জমিদারির মধ্যে, যা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার আয়তনের চেয়েও অনেক বড় ছিল। এই অংশগুলি নিয়েই পরবর্তীতে দিনাজপুর জেলা গঠিত হয়। দিনাজপুর জমিদারিতে তখন ১২১টি পরগনা ছিল, এর সঙ্গে যুক্ত ছিল পূর্ব মালদহের কিছু অংশ, পরগনা সরূপপুর (পার্বতীপুর থানা),পাস্তল ও জাসিদা (নবাবগঞ্জ ও পোর্ষা থানা)। ১২১টি পরগনার আয়তন ছিল ১১১৯ বর্গমাইল। সমস্ত বাংলায় এই সময় দিনাজপুরের রাজা ছাড়া উল্লেখযোগ্য জমিদারের সংখ্যা হাতে গোনা যেত।[১]

১৭২২ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁর রাজস্ব সরকার দিনাজপুর জমিদার প্রাণনাথকে

নিজ দায়িত্বের প্রতি মনোযোগী করে তুলেছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ রাজস্ব বিভাগে পরিবর্তন আনার জন্য নতুন করে যে সব ইজারাদারদের নিযুক্ত করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। এই সময় সরকারের আয়ের মূল উৎসই ছিল জমিদার প্রদত্ত খাজনা। নবাবি আমলে বাংলায় অসংখ্য জমিদারি ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলাকে যে ১৩টি চাকলায় ভাগ করে দিয়েছিলেন তার এক একটি চাকলার অধীনে ক্ষুদ্র জমিদারকেও চাকলাদারের অধীনে অধীনস্থ করে দিয়েছিলেন। এই জোটবদ্ধকরণের নীতির অন্তরালে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের কাছ থেকে অতীতের বকেয়া, অনাদায়ি কিছু পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা। বিপুল সংখ্যক পরগণাকে মুর্শিদকুলী খাঁ কয়েকজন বিশ্বস্ত রাজস্ব ইজারাদার বা কর্মচারীর অধীনে দিয়ে জমিদারি স্বত্বের এই কেন্দ্রীকরণের নীতি তাঁর কাছে এবং পরবর্তী নবাবদের কাছেও খুব লাভজনক হয়েছিল। নবাবরা অল্প ব্যয়ে কয়েকজন বড় জমিদারদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করার ফলে তাঁরা লাভবান হয়েছিলেন এবং সরকারেরও টাকা কম খরচ হত। কিন্তু এর ফলটা দাঁড়াল অন্যরকম। দিনাজপুরের জমিদার প্রাণনাথ বলতে গেলে বিনা বাধায় তাঁর প্রতিবেশী জমিদার ও তালুকদারদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে নিজের জমিদারি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। আঠারো শতকের প্রথমভাগে প্রাণনাথ চাকলাদারের পদ তো পেয়েইছিলেন সেই সঙ্গে কানুনগো অথবা চৌধুরী পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর ফলে যে দরবারের সঙ্গে প্রাণনাথের ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই ব্যবস্থায় একচেটিয়া সুবিধাভোগী জমিদাররা সমৃদ্ধি লাভ করে। দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথও এর বাহিরে ছিলেন না। নবাবি আমলের সূচনায় বাংলার প্রশাসনিক ইতিহাসে তিনি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তেমনি তাঁর চল্লিশ বছরের জমিদারের শাসন কাজে দিনাজপুরও বাংলার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

২. নবাবি আমলে দিনাজপুর রাজ

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর পর বাংলার নবাব রূপে সিংহাসনে বসেন শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খাঁ। ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে বিহার প্রদেশ বাংলা সুবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এই সময় শুজাউদ্দীন বাংলাকে দুইভাগে ভাগ করে পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বাংলার শাসনভার নিজের হাতে রেখেছিলেন এবং পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর বাংলার অবশিষ্ট অংশের জন্য ঢাকায় এবং বিহার ও উড়িষ্যা শাসনের জন্য আরও দুইজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত করেছিলেন। দিনাজপুর অঞ্চলের শাসনভার নবাব নিজের হাতেই রেখেছিলেন। মুর্শিদ-কুলীর উত্তরাধিকারী সুজাউদ্দীন এই সময় আবওয়াব আরোপ করে দিনাজপুর জমিদারির রাজস্ব আরও বৃদ্ধি করতে নির্দেশ দিলেন। এদিকে ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথ মারা গেলে তাঁর দত্তক পুত্র ও উত্তরাধিকারী রামনাথ রাজ সিংহাসনে বসেন। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব শুজাউদ্দীনকে রামনাথ ৪২১,৪৫০ টাকা উপঢৌকন দিয়ে দিনাজপুরের জমিদারির দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তৎকালীন নদীয়ার জমিদার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মত রামনাথও মুর্শিদাবাদের নবাবের খুবই প্রভাবশালী

আমাত্য ছিলেন। সেই সুবাদে রামনাথ নবাবের কাছ থেকে তিনটি সনদ লাভ করেছিলেন। এর ফলে, রামনাথ পতিরাম, পত্নীতলা ও গঙ্গারামপুরের জমিদারত্ব লাভ করেছিলেন। রাজা রামনাথের বিরাট ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য দেখে রংপুরের নব নিযুক্ত ফৌজদার সৈয়দ মহম্মদ খাঁ ঈর্ষায় ও বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। কথিত যে, সৈয়দ মহম্মদ খাঁ এক বিশাল সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে দিনাজপুর শহরে নিকটবর্তী রাজবাড়ি আক্রমণ ও লুঠ করতে এগিয়ে আসেন। এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে রামনাথও এগিয়ে চললেন সৈয়দ মহম্মদ খাঁ ও তার দলবলের সঙ্গে লড়াই করতে। দুপক্ষের তুমুল যুদ্ধে সৈয়দ মহম্মদ খাঁ শেষ পর্যন্ত রামনাথের হাতে বন্দী হলেন। বাংলার নবাব সুজাখানের অনুরোধে পরে পরাজিত সৈয়দ মহম্মদ খাঁকে রামনাথ মুক্তি দিয়েছিলেন।

রাজা রামনাথ (১৭২২ - ৬০) প্রায় বিয়াল্লিশ বৎসর দিনাজপুরের জমিদার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তন সহ বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর সময়ে নবাব শুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর বাংলার পরবর্তী নবাব হয়েছিলেন সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি অল্প কিছুদিন শাসন কাজ চালানোর পর আলীবর্দী খাঁ বাংলার সিংহাসনে বসেন (১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ)। এই সময় বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামা প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাঙালিরা মারাঠা সেনাদের বর্গী বলতেন। বর্গীদের এই অকথ্য অত্যাচারে বাংলার ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তেমনি ধন, প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য দলে দলে লোকেরা ভাগীরথীর পূর্বদিকে পালিয়ে যেতে লাগল। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিবছর মারাঠারা বাংলায় এসে গ্রাম ও নগর আক্রমণ করে লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অত্যাচার ও উৎপীড়ন করেছিল বাংলার মানুষের উপরে। নবাব আলীবর্দী খাঁকে বর্গীর হাঙ্গামা প্রায় সকল সময়েই ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। আলীবর্দী খাঁ কখনও তাদেরকে অর্থ দিয়ে শান্ত করে রাখতেন আবার কখনও যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন।

বর্গীরা যদিও দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুরে তেমন কোনও তৎপরতা চালাতে পারেনি কিন্তু রাজমহল তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি। মুর্শিদাবাদের নবাব মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য অধীনস্থ জমিদারদের কাছ থেকে অর্থ ও সেনা সংগ্রহ করতেন। মারাঠাদের পুনঃপুন আক্রমণের সময় বাংলার জমিদাররা নবাবকে অর্থ ও সেনা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। দিনাজপুরের রাজা রামনাথ ওই সময় প্রচুর আর্থিক সাহায্য ও সেনা দিয়ে নবাবের অর্থনৈতিক গুরুভার লাঘব করেছিলেন। এই সময় নবাব আলীবর্দী সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রতিরক্ষার জন্য রাজা রামনাথকে ১০টি কামান সরবরাহ করেছিলেন বলে কথিত।[২] ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে নবাবের সঙ্গে মারাঠাদের, উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি চুক্তির ফলে বাংলা থেকে বর্গীর আক্রমণ বন্ধ হয়। ফলে, বাংলাদেশে আবার শান্তি ফিরে আসে। নবাব আলীবর্দী আমলে বাংলায় ইংরেজ ও ফরাসি বণিকদের আনাগোনা বেড়ে যায়। তখনও পর্যন্ত বাংলায় ইংরেজ ও ফরাসিদের কোন দুর্গ নির্মাণ করার অধিকার ছিল না। ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলীবর্দী দিনেমার (ডেনমার্ক দেশের অধিবাসী) বণিকদেরকে শ্রীরামপুরে বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করতে প্রথম অনুমতি দিয়েছিলেন।

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় সারা বাংলায় বিদেশিদের চক্রান্ত শুরু হয়। বিশেষ করে মীরজাফরের ষড়যন্ত্রে এই সময় বাংলায় ইংরেজদের প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। পরিণামে, ইংরেজদের উত্থান ও পলাশী প্রান্তরে নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন ঘটেছিল।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের রাজা রামনাথের মৃত্যু হয়। রাজা রামনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বৈদ্যনাথ দিনাজপুর রাজসিংহাসনে বসেন। তাঁর আমলে মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবার ছিল নানা অন্তর্কলহে জর্জরিত। এই সময় মীরজাফরের পুত্র মীরনের অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে (৩ জুলাই, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যু হলে ইংরেজরা তার সুযোগ নিয়ে নবাবের উপর তাদের আধিপত্য আরও কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সুযোগে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ভ্যান্সিটার্ট ইংরেজ কোম্পানির কলকাতা প্রেসিডেন্সির গভর্ণর হয়ে আসলেন। কলকাতা প্রেসিডেন্সির গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের ষড়যন্ত্রে মীরজাফরের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বাংলার শাসনকাজ চালাতে লাগলেন মীরকাশিম। মীরজাফর নামে নবাব রইলেন, কিন্তু মীরকাশিম নায়েব সুবাদার হয়ে শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়েই তাঁর পুরোপুরি কর্তৃত্ব বজায় রাখলেন। এই সময় নানা যুদ্ধ বিগ্রহ, পুনঃপুন পরাজয়, সেনানায়কদের বিশ্বাঘাতকতা এই চরম সংকটে পড়ে মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকার ইংরেজদের কাছে পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মীরজাফর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন মৃত্যু আসন্ন। তাই তড়িঘড়ি করে মীরজাফর ইংরেজ কর্মচারী ও প্রধান প্রধান ব্যক্তির সম্মুখে তাঁর নাবালক পুত্র নজমুদ্দৌলাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে তাঁকে মসনদে বসালেন এবং নন্দকুমারকে তাঁর দিওয়ান নিযুক্ত . করলেন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি মীরজাফরের মৃত্যু হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মৃত্যুর পরেই বাংলার নবাবি আমল ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দেই শেষ. হয়ে যায়।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ মীরজাফরের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত দিনাজপুরের রাজ-জমিদারি চলেছিল রাজা বৈদ্যনাথের (১৭৬০ - ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ) অধীনে। সেই সময়েও বাংলার বড় জমিদারগুলির অন্যতম জমিদার ছিলেন দিনাজপুরের রাজা । রাজা রামনাথের মৃত্যুর পর রাজা বৈদ্যনাথ দিনাজপুর রাজ সিংহাসন অধিকার করার ফলে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই কান্তনাথ রাজ সিংহাসন নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছিলেন। কান্তনাথের ষড়যন্ত্রে রাজা বৈদ্যনাথ বেশিদিন সিংহাসনে বহাল থাকতে পারেন নি।[৩] কান্তনাথ এই সময় মীরকাশিমের সঙ্গে কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নানানভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। ফলে কান্তনাথের কানভাঙানিতে মীরকাশিম রাজা বৈদ্যনাথের উপর কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বিপুল অর্থ দাবি করে বসলেন। রাজা বৈদ্যনাথ বাংলার সুবাদার মীরকাশিমের ওই বিপুল অর্থের দাবি মেটাতে না পারায় মীরকাশিম রাজা বৈদ্যনাথের উপর ভয়ানক চটে যান এবং রাজা বৈদ্যনাথকে তিনি মুঙ্গেরের দুর্গে আটক করেন। এই সুযোগ বুঝে রাজা বৈদ্যনাথের বৈমাত্রেয় ভাই কান্তনাথ, মীরকাশিমের কাছে দিনাজপুর জমিদারি প্রদানের জন্য নবাবকে রাজি করাতে

সক্ষম হয়েছিলেন। পরে, কান্তনাথের বিরোধিতা সত্ত্বেও মীরকাশিম কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত রাজা বৈদ্যনাথকে নবাব মীরজাফর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

মোগল ও নবাবি আমলে দিনাজপুর ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত ঘাঁটি। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে দিনাজপুর একদিকে নববিজিত সুবা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা, অপরদিকে কোচবিহার, কোচ হাজো এবং আসামের মাঝখানে প্রাচীর (প্রাবর) বা বেড়া রূপে কাজ করত। দিনাজপুর ও ইদ্রাকপুরের মতো বৃহৎ জমিদারিগুলির ক্রমান্বয়ে উন্নতির ফলে সুবার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ফৌজদারের সঙ্গে জমিদারেরাও ভাগ করে নিতেন। মোগল আমলে রাজস্ব ব্যবস্থার বিভাগীয় সদর দফতর হিসাবে যেমন ঘোড়াঘাট গুরুত্ব পেয়েছিল তেমনি দিনাজপুর রাজের রাজধানী হিসাবে দিনাজপুর একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কেন্দ্ররূপে উন্নতি লাভ করেছিল। বন্দর, বাজার এবং পূর্ণিয়া, কোচবিহার ও কাছাড়, দিনাজপুর সংলগ্ন এই প্রতিবেশী অঞ্চলগুলি থেকে আগত বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা নিয়ে দিনাজপুর আঠারো শতকের প্রথমার্ধে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধিলাভ করেছিল। দিনাজপুর অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপিত দুর্গ, প্রাসাদ, স্তূপ, মন্দির, মসজিদ, দরগাহ, দিঘি ও অসংখ্য জলাশয়, এই অঞ্চলের শুধু অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বচ্ছলতারই সাক্ষ্য নয়, আলোচ্য সময়ে দিনাজপুর সদর শহর ও তার চারপাশের এলাকার গুরুত্বেরও পরিচায়ক বলা যায়। এখাঁকার প্রধান ও ছোট জমিদার ছাড়াও, জোতদার, তালুকদার, তাঁদের দেওয়ান, নায়েব, গোমস্তা, অনুচরেরা এবং প্রচুর পুলিশ, পাইক ও সামরিক কর্মচারীরা এই এলাকার উন্নতি ও জনগণের কল্যাণ কামনা এবং সমৃদ্ধিতে যে অবদান রেখেছিলেন তা বলাই বাহুল্য। সুবেদার ও ফৌজদারদের অধীনে দিনাজপুরের প্রধান জমিদারেরা প্রত্যেকেই উন্নতি লাভ করছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক মিত্রতা নীতির ফলে, বিশেষ করে স্থানীয় বাছাই করা জমিদাররা, যাঁদের উপর নবাবরা বেশিরকম নির্ভরশীল ছিলেন, তাঁরা অধিক লাভবান হয়েছিল। এইসব জমিদারদের বিপুল ক্ষমতা ও স্বীকৃতিস্বরূপ সম্রাটরা ও পরবর্তী নবাবরা তাদেরকে 'রাজা', 'মহারাজা' পদবিতে ভূষিত করেছিলেন এবং পদ অনুযায়ী নবাবরা তাঁদেরকে সম্মান সূচক পোশাক (খেলাত) প্রদান করতেন। আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের ষড়যন্ত্রে অন্যান্যদের সঙ্গে দিনাজপুরের রাজা রামনাথও যে যোগ দিয়েছিলেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তার কারণ, সরকার ও প্রধান জমিদারদের মধ্যে সর্বদাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত বিদ্যমান ছিল। রামনাথ লক্ষ্য করেছিলেন যে দূরবর্তী সুবার উপর শাহী নিয়ন্ত্রণ হ্রাস এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে নবাবের কর্তৃত্বের অবক্ষয়, এই দুটি কারণে রামনাথ বুঝতে পেরেছিলেন ইংরেজদের বিপক্ষে যাওয়া মূর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়, তাই তিনি সময়ের মূল্য দিয়েছিলেন। ফলে একচেটিয়া ক্ষমতা লাভ রাজা রামনাথকে আরও সাহায্য করেছিল।[৪]

৩. দিনাজপুর রাজদরবারের রাজনীতি ও শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো

সম্রাট আকবরের শাসন আমল থেকে শুরু করে অর্থাৎ দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের

(১৬৮২ - ১৭২২) জমিদারি দায়িত্বভার গ্রহণ করা থেকে আরম্ভ করে রাজা রামনাথের পুত্র রাজা বৈদ্যনাথের (১৭৬০ - ১৭৮০) সময়কাল পর্যন্ত দিনাজপুর রাজদরবারের রাজনীতি ও শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো কেমন ছিল এই নিরিখে তা ফিরে দেখা যাক। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামা, বিদেশিদের চক্রান্ত বিশেষ করে ইংরেজ উত্থান ও পলাশী প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর একটার পর একটা নিয়ামক ঘটনা দ্রুত বাংলার বুকে ঘটে যায়। দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথের সময়টা ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল। পলাশীর যুদ্ধ ছাড়াও ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লির মোগল সম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানি লাভ করে এবং তখন থেকেই দিনাজপুর জেলার দেওয়ানি ব্রিটিশ শাসনের অধীনভুক্ত হয়। এই দ্বৈত শাসনের সময়কালে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে নেমে আসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, যা বাংলার ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত, দিনাজপুরও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পায় নি। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ দেওয়ানি লাভের পর এদেশ থেকে যতটা সম্ভব বেশি অর্থ সংগ্রহ করাই ছিল মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে অগ্রসর হতে গিয়ে শুরু হয়ে যায় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ইংরেজদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। প্রজার হিতসাধন বা চাষীদের মঙ্গল চিন্তা করার সময় ছিল না তাদের। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আবার এই সময় খরায় প্রচুর শস্যহানি হয় বাংলার সর্বত্র। খাদ্যের জন্য আর্তরব ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দিনাজপুর। এই সময়ে বাংলার বহু সংখ্যক জমিদার এবং রায়ত নির্ধারিত অংকে রাজস্ব দিতে না পারায় নিগৃহীত হয়েছিলেন। দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথ প্রজাদের প্রচুর রাজস্ব মকুব করায় কোম্পানির দাবির ১৩৭০৯৩২ টাকার মধ্যে ১৩৭০৯৩২ টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হলেন। ফলে, রাজা বৈদ্যনাথের বিরুদ্ধে কোম্পানির আমলারা গুরুতর অসহযোগিতার অভিযোগ আনলেন। দিনাজপুরে রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে জমিদারের কর্মচারীদের পাশাপাশি এই সময় ইংরেজ প্রতিনিধিদের উপস্থিতি রাজস্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। রাজা রামনাথের সময়ে রাজস্বের পরিমাণ যেখানে নির্ধারিত হয়েছিল ১২.৫ লক্ষ টাকা, যা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বলবৎ ছিল অথচ বৈদ্যনাথ জমিদারি লাভ করলে ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬.৫ লক্ষ টাকা। ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে রাজা বৈদ্যনাথের জমিদারির রাজস্ব আদায়ের কাজ দেখাশোনার জন্য কোম্পানি এইচ, কট্রেল নামে একজন সুপারভাইজারকে নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর সুপারভাইজার পদ পরিবর্তন করে কালেক্টর পদ করা হলে ডাবলু ম্যরিয়ট দিনাজপুর জেলার কালেক্টর হন। তখনও দিনাজপুর জমিদারির ব্যবস্থাপনা রাজা বৈদ্যনাথের হাতেই থাকে। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর রাজের রাজস্ব জমার পরিমাণ ছিল ১৪৬০৪৪৫ টাকা। দিনাজপুর রাজদরবারে এইসব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটই পরবর্তীতে জমিদারি উৎখাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। রাজা বৈদ্যনাথ প্রায় ২০ বছর দিনাজপুরের জমিদারির দায়িত্বভার পালন করেছিলেন। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় বৈদ্যনাথ মৃত্যু বরণ করলে তাঁর পত্নী রানি সরস্বতী দেবী রাধানাথ নামে একটি বালককে দত্তক রূপে গ্রহণ করেন এবং নাবালক জমিদারের

অভিভাবিকা রূপে জমিদারি পরিচালনা করেন। সেইসময় গভর্নর জেনারেল ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। বৈদ্যনাথের পত্নী রানি সরস্বতী ৭৩০টি স্বর্ণমুদ্রা উত্তরাধিকার ফি প্রদান করে রাধানাথকে বৈদ্যনাথের উত্তরাধিকারী হিসাবে নিযুক্ত করার জন্য আবেদন করেন। হেস্টিংস ৭৩০টি স্বর্ণমুদ্রা উত্তরাধিকার ফি গ্রহণ করে রাধানাথকে বৈদ্যনাথের উত্তরাধিকারী রূপে স্বীকৃতি দেন।[৫] রাধানাথ অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকার দরুন ওয়ারেন হেস্টিংস দেবী সিং নামক এক কর্মচারীকে দিনাজপুরের জমিদারি পরিচালনার জন্য ম্যানেজার হিসাবে পাঠান। দিনাজপুরের জমিদারি নানা ষড়যন্ত্রের ছোবলে এই সময় বিপর্যস্ত হয়ে যায় এবং ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে রাধানাথ পরলোক গমন করলে পরবর্তী অল্প সময়ের মধ্যে দিনাজপুর জমিদারিরও বিলুপ্তি ঘটে যায়। এই সময় থেকেই সূচিত হয় দিনাজপুর রাজবংশের আরও এক নতুন ইতিহাস। সেই ইতিহাসের বিস্তৃত বিবরণ 'আধুনিক যুগে দিনাজপুর' খণ্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

রাজা প্রাণনাথ থেকে শুরু করে রাজা বৈদ্যনাথ পর্যন্ত দিনাজপুর রাজ-জমিদারি শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামোটি কেমন ছিল বিশেষত জমিদারির সনাতনী শাসন পদ্ধতি এবং তার মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণে রেখে তাঁরা কি ধরনের কলা কৌশল ব্যবহার করতেন তা ফিরে দেখা যাক। প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, দিনাজপুর রাজের জমিদারি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ মুখ্যত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল, একটি খাজনা আদায় অপরটি জমিদারিতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বলা বাহুল্য যে এই দুটি শক্ত কাজেই জমিদারকে বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হত। রাজারা মুখ্যত জমিদারি নিয়ন্ত্রণ এবং খাজনা আদায়ের কাজ তিনটি প্রশাসনিক স্তরে সম্পন্ন করতেন। প্রথমটি কেন্দ্রিয় দপ্তর, দ্বিতীয়টি পরগনা দপ্তর এবং তৃতীয়টি গ্রাম দপ্তর। এইসব দপ্তর ছাড়াও জমিদারি সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় নবাবদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও মধ্যস্থতা করার জন্য দিনাজপুরের রাজারা মুর্শিদাবাদেও একটি যোগাযোগ দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীতে ইংরেজরা দায়িত্বভার গ্রহণ করলে কলকাতায় যাতে সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা যায় তার জন্য কলকাতাতেও একটি যোগাযোগ দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দিনাজপুর রাজাদের প্রশাসনিক স্তরে জমিদারির সার্বিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য দিনাজপুর শহরে একটি কেন্দ্রিয় দপ্তর স্থাপিত হয়েছিল, যা সদর কাছারি নামে পরিচিত ছিল। এই সদর কাছারির প্রধান কর্তাকে বলা হত দেওয়ান। জমিদারি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সকল বিষয়ে জমিদারকে ইনি সাহায্য করতেন। দেওয়ানের অধীনে থাকতেন একজন নায়েব দেওয়ান ও চারজন হিসাব রক্ষক, এই হিসাব রক্ষকরা মজুমদার নামে পরিচিত ছিলেন। জমিদারের এই ছয়জন কর্মচারীই ছিলেন মূল কর্মকতা, যাঁদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলা হত। এই উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দ্বারাই রাজার পরিষদ গঠিত হত। এঁরাই মূলত জমিদারির মুনশী, উকিল, আমিল, বকশী, চাকলা, আদালত, নকল, সদর এবং ব্যাংকিং ও মুদ্রাসংক্রান্ত ইত্যাদি বিভাগগুলি তত্ত্বাবধান করতেন।

রাজার দেওয়ানের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল মফস্বলের কাছারি ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা। পরগনার দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তা চৌধুরীদের

সঙ্গেই প্রধানত চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা হত। চৌধুরী ছাড়াও ইজারাদার অথবা খুত কিনাদার ও সাধারণ রায়তরাও কেন্দ্রের নির্দেশে বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে প্রতিবেদন পাঠাতে পারতেন। দেওয়ান সমস্ত বিষয় যেমন, খরা বা বন্যার কারণে ফসলহানি,খাজনা আদায়ে মন্দা, জনসংখ্যা হ্রাস, ডাকাত, সন্ন্যাসী বা ফকিরদের অনুপ্রবেশ, লুঠতরাজ ইত্যাদি রাজার কাছে তার সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করতেন এবং পরে রাজার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য চৌধুরীদের জানিয়ে দেওয়া হত। প্রয়োজন হলে জমিদার এসব বিষয় তদন্তের জন্য কেন্দ্র থেকে আমিন নামে একজন কর্মকর্তাকে পাঠিয়ে দিতেন। জমি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করেই কেন্দ্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর সদর কাছারির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১২২ জন, সে বছর এই ১২২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য দিনাজপুর রাজের খরচ হয়েছিল ২৪ হাজার সনত রুপি। ওই একই সালে মুর্শিদাবাদে উকিলের দপ্তরে ১০৬ জন উকিল নিযুক্ত ছিলেন, যাঁদের জন্য খরচ হয়েছিল সেই বছর (১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ) ৯৬৬০ সনত রুপি। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জমিদারি ৬৫টি পরগণা নিয়ে গঠিত ছিল। প্রতিটি পরগণার জন্য ছিল একটি করে পরগণা কাছারি। এই পরগণা কাছারির আকার নির্ভর করত সংশ্লিষ্ট পরগণার আয়তন ও গুরুত্বের উপর। দিনাজপুরের রাজাদের সমগ্র পরগনা কাছারির জন্য বার্ষিক ব্যয় ছিল ৫৬ হাজার ৯শো ৯৮ সনত রুপি। সাধারণত প্রতিটি পরগনা কাছারির জন্য থাকতেন ১জন চৌধুরী, ১ জন পেশকার, ১ জন আমিন, ১ জন কারকুন, ১ জন পোদ্দার, ১ জন জমাদার, ৯ জন পিয়ন ও ১ জন দফতরি বার্ষিক ৮৭৭ টাকা সনত রুপি খরচে নিযুক্ত থাকত। উল্লেখ্য যে, সাধারণত পরগনার সদর কাছারির কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তাদের পারিশ্রমিক নগদ টাকায় পেতেন কিন্তু 'তিয়ানত' পরগনা নামে পরিচিত অঞ্চলের জন্য আরেক ধরনের কর্মকর্তা কর্মচারী ছিল যাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হত ভূমির মাধ্যমে। সাধারণত যে ভূমিগুলি তাদের দেওয়া হত সেগুলি ছিল খাজনাযুক্ত বা খাজনা মুক্ত। এই ভূমিগুলি মূলত জমা চাকরানভূমি এবং বেজমা চাকরান ভূমি নামে পরিচিত ছিল।[৬]

গ্রামস্তরে পরগণার চৌধুরী নামক কর্মচারীর অধীনে থাকত বিপুল সংখ্যক অধস্তন খাজনা আদায়কারী কর্মী। এদের একদলকে গ্রাম কোতোয়াল বলা হত, এরা মূলত গ্রামেই থাকতেন। অপর আরো একটি শ্রেণিকে বলা হত পাইক। এরা সাধারণত পরগণা দপ্তর এবং গ্রাম অথবা খুতকিনাদারের মধ্যে বার্তা বাহকের কাজ করত। দিনাজপুর রাজ-জমিদারিতে এদের সংখ্যা ছিল ১০ হাজারের বেশি। এরা পারিশ্রমিক হিসাবে টাকা পেত না, বিনিময়ে এদেরকে ভূমি দেয়া হত। তাছাড়া, দিনাজপুর রাজাদের গ্রামভিত্তিক প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় ছিল মণ্ডল, পাটোয়ারি এবং সামান্য সংখ্যক গ্রাম কোতোয়াল ও পাইক। কোতোয়াল ও পাইকরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও বার্তা বহনের দায়িত্বে থাকত। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, গ্রাম মণ্ডল, যারা একাধারে জমিদারের কর্মকর্তা এবং গ্রামের নির্বাচিত প্রতিনিধি, এইরকম মণ্ডলের সংখ্যা ছিল

৬৫ জন এবং তাদের জন্য মোট ৮৩৩ বিঘা জমি প্রদান করা হয়েছিল। এছাড়া ছিল পাটোয়ারি, যারা জমিদারের একজন অধস্তন কর্মকর্তা, এরা গ্রামেই থাকতেন এবং গ্রামের রাজস্বের হিসাব রাখতেন এবং মন্ডলকে খাজনা আদায়ে সাহায্য করতেন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বটা ছিল জমিদারির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দিনাজপুর জমিদারিতে তিয়ানত নামে পরিচিত দপ্তরটি সদর ও মফস্বল দুটি জায়গাতে এই কাজের দায়িত্ব পালন করত। এছাড়া, পাহাড়ী লোক বা সন্ন্যাসীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য দিনাজপুরের রাজারা সীমান্ত অঞ্চলে কতগুলি ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দিনাজপুর শহরে রাজা দুটি স্বতন্ত্র তিয়ানত নিয়োগ করতেন। একটি রাজবাড়িতে অপরটি সদর কাছারিতে। রাজবাড়ি তিয়ানতের অধীনে ছিল মোট ২২১৪ কর্মচারী, তারা পারিশ্রমিক হিসাবে ৫৬১৯০ বিঘা নিষ্কর জমি ভোগ করত। এদের মধ্যে ছিল ২১ জন অশ্বারোহী, ১০৯ জন পিয়ন, ৪৯৭ জন পাইক এবং ৯৮ জন শিকার পাইক। সেই সময় সদর কাছারিতে ছিল ৭ জন অশ্বারোহী এবং ৫০৯ জন পাইক। রাজার শালবাড়ি ও রাজনগরে বাসস্থান ছিল। সেখানে তিনি মাঝে মাঝেই যেতেন। এই দুটি বাসস্থানের জন্য ছোট ছোট বাহিনী মোতায়েন থাকত। অপর আরও একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে, দিনাজপুর জমিদারের নগদ বেতনভোগী সশস্ত্র বাহিনীও ছিল। এই বাহিনীর মধ্যে ছিল ৭৭ জন অশ্বারোহী এবং ৪৬৪ জন বন্দুকধারী। এদেরকে বার্ষিক ২৪ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হত। নগদ বেতনভোগী এই সশস্ত্র বাহিনীটি ছিল মূলত সাবেক মোগল সরকারের দেওয়া দিনাজপুর জমিদারের মসনব।[৭]

লর্ড কর্নওয়ালিশের জমিদারি বন্দোবস্ত পূর্ববর্তী সময়ে দিনাজপুর জমিদারির স্থাপনা সমূহের নির্বাহ খরচ কি রকম হত তার চিত্রটি এবার ফিরে দেখা যাক। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত প্রবর্তনের আগে দিনাজপুর রাজ জমিদারির ব্যয় হত মূলত সরকারি রাজস্ব, জমিদারি প্রশাসন গত, রাজ প্রাসাদের খরচ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যয়। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জমিদারির আয় ছিল ২০৩৭৭৪৪ রুপি। এই হিসাবে বিশাল বাজে জমিন সম্পদকে অবশ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। আলোচ্য সময়ে জমিদারির রায়তদের কাছ থেকে মোট সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১৮৪২১০৫ সিক্কা রুপি। এর থেকে সরকারি রাজস্ব ১২৭৫৭৬৮ সিক্কা রুপি দেওয়ার পর জমিদারের কাছে মোট ৫৬৬০০ রুপি থাকত।

দিনাজপুর রাজ-জমিদারির সদর কাছারির জন্য খরচ ছিল ২৪ হাজার সনত রুপি, মুর্শিদাবাদের উকিলের জন্য ৯৬৬০ রুপি, সদরে জমিদার নগদ বেতনে একটি বাহিনী নিয়োজিত করতেন তার জন্য বার্ষিক খরচ ছিল ২১৬২১ রুপি, তাছাড়া সদর কাছারিতে ১২১ জন কর্মচারী ছিল যাদের বেতনের পরিবর্তে ২৩৩১৯ বিঘা চাকেরাণ জমি দেয়া হতো। রাজবাড়ির বার্ষিক খরচ ছিল ১৯২১৯২ রুপি (১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ)। দিনাজপুর জমিদারিতে বেনারসে অবস্থিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় হত, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শেও-দেও খরচা ১৬২৭৯ রুপি, বাট্টাবির্ত ২৬২০৮ রুপি, ব্রাহ্মণ বির্ত ৭৭১৭ রুপি, সর্বমোট ৫০২০৪ রুপি। রাজা বৈদ্যনাথ বেশ কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন

করেছিলেন, যার জন্য তিনি ২৩৩৭৬ রুপি বরাদ্দ করেছিলেন। দিনাজপুরের জমিদার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য ৭৩৫৮৫ রুপি ব্যয় করতেন। এই বার্ষিক অনুদান ছাড়াও জমিদার বাজে জমিন নামে পরিচিত ১৬৬৬৩৫ বিঘা নিষ্কর জমি দেবোত্তর হিসাবে উৎসর্গ করেছিলেন।[৮]

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দেই প্রকৃতপক্ষে বাংলার নবাবি আমল শেষ হয়ে গিয়েছিল।

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. কে. এম. করিম, 'আঠারো শতকে দিনাজপুর-নবাবী আমল', *দিনাজপুর ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* পৃ. ৭৭, ৭৮।

২. আবুলকালাম মোহম্মদ যাকারিয়া, *দিনাজপুর মিউজিয়াম,* পৃ. ৩৩।

৩. C. Stewart, *History of Bengal,* p. 431.

৪. S. Akhtar, *The Role of the Zamindars in Bengal, 1707 - 1722,* p. 104, 105, 106, 107, 108 (published form the Asiatic Society Bangladesh, Dhaka, 1982).

৫. এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, *বাংলাদেশ জেলা গেজিটিয়ার - দিনাজপুর,* ১৯৯১, নূরুল ইসলাম খাঁ সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলাদেশ; নিখিল সুর, *ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ,* কলকাতা, ১৯৮১ ; অণিমা মুখোপাধ্যায়, *আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ,* কলকাতা, ১৯৮৭।

৬. শিনকিচি তানিগুচি, 'ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভে দিনাজপুর জমিদারির প্রশাসনিক কাঠামো', *দিনাজপুর ঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* (শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত) পৃ. ১৬৮, ১৬৯।

৭. শিনকিচি তানিগুচি, ঐ, পৃ. ১৭১, ১৭২।

৮. এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, শিনকিচি তানিগুচি, ঐ, পৃ. ১৬৫, ১৮৮।

অষ্টম অধ্যায়

মানব সমাজ

১. মধ্যযুগে দিনাজপুরের অর্থনৈতিক অবস্থা

মুসলমান বিজয়ের আগে বাংলায় পাল ও সেন যুগের রাজাদের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকদের মতে, সেই আমলে প্রাচীনকালের মুদ্রারই প্রচলন ছিল। তাছাড়া, দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ছোটখাটো ব্যাপারে কড়িই মুদ্রার কাজ করত। মুসলমান যুগে বাংলার মুসলমান সুলতানেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেই নিজের নামে মুদ্রা বের করতেন। বাংলা দিল্লি সরকারের অধীনভুক্ত হলে দিল্লির সুলতানের মুদ্রারই প্রচলন ছিল অধিকতর। সপ্তদশ শতকের পর থেকে মোগল সম্রাটদের মুদ্রাই বাংলায় প্রচলন ছিল। সেই সময় রূপোর মুদ্রার নাম ছিল টঙ্কা। এই টঙ্কা শব্দ থেকেই টাকা শব্দের উৎপত্তি। সাধারণ কেনাবেচায় কড়ির ব্যবহার ছিল অধিক। অষ্টাদশ শতকেও আড়াই হাজার কড়ি এক টাকার সমান ছিল।[১] দ্বাদশ হতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা ধন-সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। দেশের শস্য-সম্পদ, শিল্প ও বাণিজ্যই ছিল এর প্রধান কারণ। সপ্তদশ শতকের সূচনায় মোগল শাসন বাংলার সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের একটি সুবায় পরিণত হয়। এই সময় কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প আরো উন্নত হয়েছিল। ইউরোপের বিভিন্ন জাতি ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ প্রভৃতি বাংলায় বাণিজ্য বিস্তার করায় প্রচুর অর্থাগম হত।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আমলের পূর্বে বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের সীমানা কতখানি ছিল তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায় না। জেলারূপে ঘোষিত হবার পর যে অঞ্চল প্রশাসনিক অর্থে দিনাজপুর নামে পরিচিত হয়েছিল তার সীমা ছিল আনুমানিক পূর্ব ও পশ্চিমে করতোয়া-মহানন্দা নদী দিয়ে বেষ্টিত, উত্তরের সীমা পূর্ণিয়া-মোরাঙ্গ-ভূটান ডুয়ার্স পর্যন্ত। দক্ষিণে ছিল পুনর্ভবা-গঙ্গার সঙ্গমস্থল, পরবর্তী সময়ে নদী খাত পরিবর্তন করায় এই সীমাও অস্পষ্ট হয়ে যায়। মোগল আমলে এক বিশাল জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল এই অঞ্চল। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে আসে। দিনাজপুরের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর তথ্য কোম্পানি আমল থেকে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে নিশ্চয়তার সঙ্গে পাওয়া যায় এবং ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু প্রাক্-মোগল আমলের তথ্যাদি অপ্রতুল। মোগল আমলের তথ্যাদি সংক্ষিপ্ত। সে কারণে ব্রিটিশ যুগে দিনাজপুরের আর্থ-সামাজিক কাঠামো যত নিশ্চয়তার

সঙ্গে ব্যাখ্যা করা যায়, তার আগের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের ইতিহাস ঠিক অনুরূপভাবে ততখানি অনুমান নির্ভর। সাধারণভাবে বলা যায় মধ্যযুগে দিনাজপুরের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভর করে। আউশ, আমন ও বোরো ধানই ছিল এখানকার প্রধান অর্থকরী ফসল। স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পরও এখানে প্রচুর পরিমাণে চাল উদ্বৃত্ত থাকে, যা রপ্তানি করে কৃষকেরা প্রচুর অর্থ পেত। ধান ছাড়াও অন্যান্য অর্থকরী ফসল ছিল ইক্ষু, সরিষা, মরিচ ইত্যাদি। মধ্যযুগে এমন কয়েকটি বিদেশি কৃষিজাত দ্রব্য বাংলায় প্রথম আমদানি হয় যার প্রচলন পরবর্তী কালে খুবই বেশি হয়েছিল। এর মধ্যে তামাক ও আলু আমেরিকা হতে ইউরোপীয় বণিকেরা সপ্তদশ শতকে এদেশে এনেছিলেন। বাংলার বর্তমান যুগের একটি বিশেষ সুপরিচিত দ্রব্য পাট অষ্টাদশ শতকের প্রথমে বিদেশে পরিচিত হয়। যে নীলের চাষ এখানে উনিশ শতকে প্রাধান্য লাভ করেছিল তাও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আরম্ভ হয়। অষ্টাদশ শতক শেষ হবার আগেই এখান থেকে নীল ও পাটের রপ্তানি আরম্ভ হয়। যতদিন পর্যন্ত করতোয়া-পুনর্ভবা-আত্রাই প্রধান প্রবাহ ছিল, ততদিন পর্যন্ত এই নদীপথে পণ্য সামগ্রী মুর্শিদাবাদ-ঢাকা যেত। করতোয়া-পুনর্ভবা-গঙ্গা ছিল এর প্রধান বাণিজ্য সূত্র। উৎকৃষ্ট বস্ত্রের জন্য মালদহের খুব সুনাম ছিল। মির্জা নাথান সে সময় ৪ হাজার টাকা দিয়ে মালদহে একখণ্ড বস্ত্র কিনেছিলেন। সে আমলে উৎকৃষ্ট বস্ত্রের মূল্য এর থেকেই ধারণা করা যায়। এখানকার রেশম শিল্প ও চট শিল্প কৃষি প্রধান দিনাজপুর জেলার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তী ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, আত্রাই ও মাথাভাঙা নদীর মাধ্যমে দিনাজপুরের ভূষি বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে বছরে প্রায় ৪০ হাজার মণ চটের ব্যাগ রপ্তানি করা হত। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের আরও একটি পরিসংখ্যান থেকে রায়গঞ্জ ও কালকামারা হতে রপ্তানিকৃত চালের পরিমানের কথা জানা যায়। রায়গঞ্জের বন্দর বাণিজ্য কেন্দ্র হতে রপ্তানিকৃত চালের পরিমাণ ছিল ৮০৪৬২ মণ এবং কালকামারা বাণিজ্য বন্দর থেকে রপ্তানিকৃত চালের পরিমাণ ছিল ৭১২২৩ মণ।[২] মধ্যযুগেও যে এ সব দ্রব্য দিনাজপুরের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করত উপরের উল্লেখিত তথ্য থেকে অনুমান করা যায়। সেইকালে দিনাজপুরে আমদানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল লবণ যা সাধরণত নারায়ণগঞ্জ থেকে সংগ্রহ করা হত।

বাঙালি সওদাগরদের সমুদ্রপথে দূর বিদেশে বাণিজ্য যাত্রার কথা বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা উল্লেখ করেছেন। ইংরেজ বণিক ও পর্যটক স্ট্রেন শ্যাম মাষ্টার তাঁর ডাইরিতে লিখেছেন, '১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে মালদা ছিল প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। উত্তর পশ্চিম ভারতের বিশেষত আগ্রা, গুজরাট এবং বেনারসের বণিকেরা প্রতিবছর বাণিজ্য করতে আসত এবং এখানকার সূতি ও সিল্ক বস্ত্র কিনে নিয়ে যেত যার মূল্য ১৫লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা।' ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে শেখ ভিক নামে এখানকার একজন ব্যবসায়ী তিনটি জাহাজে মালদহী বস্ত্র নিয়ে রাশিয়ায় যাত্রা করেছিল। কিন্তু দুটি জাহাজ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ডুবে গিয়েছিল।[৩] পর্তুগিজ বণিক জাঁয়া দে বারোস (১৪৯৬-

১৫৭০) লিখেছেন যে, গৌড় নগরী বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। নয় মাইল দীর্ঘ এই শহরে প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক বাস করত এবং বাণিজ্য দ্রব্য সম্ভারের জন্য সর্বদাই রাস্তায় এত ভিড় থাকত যে লোকের চলাচল খুবই কষ্টকর ছিল। মধ্যযুগের বাংলা আখ্যানে ও সাহিত্যে এই অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্যের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। দিনাজপুরের লোককবিদের রচিত পাঁচ-ছয়শো বছর আগে বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলিতে পল্লী গ্রামের অর্থনৈতিক চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় গ্রামীণ হাটগুলির বর্ণনায়। উদ্বৃত্ত সামগ্রী স্থানীয় হাট, গঞ্জ, বাজার বা নগরে বিক্রির ব্যবস্থা থাকায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সেতুবন্ধ তৈরি হয়েছিল। বণিকগণের বসবাস ও ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধির চিত্র বর্ণিত হয়েছে দিনাজপুরের লোককবি তন্ত্রবিভূতির *মনসাপুরাণ*-এ। চাঁদ সদাগরের সৈন্যদের মনসার সঙ্গে যুদ্ধের সময় সৈন্য গমনাগমনের পথ ছিল বিভিন্ন হাট।

'জয়হাট বিজয়হাট করঞ্জাহাট দিয়া।
সৈন্যেতে লক্ষের বাড়ী বেড়িল আসিয়া।'

পঞ্চদশ শতকে লোককবি মাণিক দত্ত দেখেছিলেন, সুন্দর রাজার হাটে হাজার বিদেশি বণিককে সওদাপত্র করতে। সেখানে অগণিত ব্যবসায়ী, দোকানদার, অগণিত মণিমুক্তো, রুবি, বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম ও সুন্দর কাপড়, মখমল, পট্টু, ভুষনাই, বাটদরা, ঢাকাই, মালদই, সূক্ষ্ম সুন্দর কারুকাজ মণ্ডিত বিলাতি দ্রব্য, সস্তা ও সহজলভ্য। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে তিনি লিখেছেন,

'রাজার সভাতে আইল সাধু ধনপতি।
দোলাতে নাম্ভিয়া সাধু করিল প্রণতি।।'

মাণিক দত্তের বর্ণনায় হাটের দিন বা বারের উল্লেখ আছে 'নগর মধ্যে হাট পড়ে শনি মঙ্গলবারে'। আবার বিভিন্ন দ্রব্যের নামানুসারে হাটগুলির নামকরণ করা হয়েছিল, যেমন বাণিয়া হাট, গোওাল হাট, তৈলঙ্গা হাট, মোদকি হাট, হালুই হাট, পুড়ি হাট, কুড়ি হাট, কামার হাট, মালী হাট, তিয়র হাট, চাড়াল হাট, মাছুয়া হাট ইত্যাদি। আবার জগজ্জীবন ঘোষাল *মনসামঙ্গল* কাব্যে দিনাজপুর অঞ্চলের বাণিজ্য-বিনিময় বড়ই আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী জলে ভাসার কালে তিনি এই অঞ্চলের উৎপন্ন ও আমদানী যোগ্য জিনিসপত্রের বিবরণ দিয়েছেন।

'কাঁচা হরিদ্রা তোলে পুরাণ সুকুতা।
ইহার বদলে নিব পাটনে গজমুক্তা।।
মাসকলাই আদার সুট আর তোলে জিরা।
মরিচ লবঙ্গ দিয়া বদল নিব হীরা।।
নারিকেল তাল বেল আর কাঁঠাল আম।
এ সব ফলনেই আছে বড় কাম।।
পাটের ধকড়া মেখলা আর যত শাড়ি।
যতন করিয়া নেই কাপড়েত জড়ি।।'

মধ্যযুগের ইতিহাসে তথা মোগলযুগে আন্তঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে হাটের গুরুত্বকে উপেক্ষা করা যায় না। গ্রামীণ হস্তশিল্পীদের জীবিকা নির্ভর করত গ্রামীণ হাটগুলির উপরেই। এইসব কুটির শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মৃৎশিল্প, তুলা ও তুলাজাত দ্রব্য, রেশমশিল্প, চটশিল্প, বাঁশ ও বেতশিল্প। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই কুটিরশিল্পে নিযুক্ত থাকত। পাটের লাছি থেকে হাতের তাল্লার মাধ্যমে সূক্ষ্ম সুতো তৈরি করে দিনাজপুর অঞ্চলের রাজবংশী নারীরা এক ধরনের পরনের কাপড় তৈরি করত যা দেওটা বা দোস্তি বা ফোতা নামে পরিচিত। তাছাড়া, পাটের লাছির অবাঞ্ছিত অংশ বাদ দিয়ে চিকন অংশ দিয়ে তৈরি হত বিছানার চাদর, বসবার আসন ও চটের থলি। আবার কুড়ি ইঞ্চি চওড়া করে এক একটি পাটের ফাটিয়া তৈরি হত। এ রকম তিনটি ফাটিয়া একত্রে জোড়া দিয়ে এক একটি 'ধোকড়া' তৈরি হত। পাটের তৈরি এ সব সামগ্রী ছিল মোটা ও টেকসই, যা সাধারণত লোকজীবনের নিম্নবর্গের মানুষেরা ব্যবহার করত। এছাড়া বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি হত মাদুর, ঝুড়ি, চাটাই, কুলা, চালুনি, মাছ ধরার জন্য ডিংডই, বানা বা চোষ, খলুই ইত্যাদি। সাধারণভাবে এসব জিনিসের ব্যাপক চাহিদা ছিল। চটের থলি ধোকড়া, বাঁশ ও বাঁশের চাটাই সেই যুগে প্রধানত নদীপথে দেশী নৌকা দ্বারা রপ্তানি করা হত। সেই সময় জিনিসপত্রের দাম ছিল সস্তা। ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী মুর্শিদাবাদে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ছিল এই রকম, প্রতি টাকায় খুব ভাল চাউল (বাঁশফুল) ১ মণ ১০ সের, মোটা (দেশনা ও পুরবী) চাউল ৪ মণ ২৫ সের, উৎকৃষ্ট গম (প্রথম শ্রেণী) ৩ মণ, তৈল (প্রথম শ্রেণী) ২১ সের, ঘি (প্রথম শ্রেণী) সাড়ে ১০ সের, দ্বিতীয় শ্রেণী সাড়ে ১১ সের।[৪] এই নিরিখে দিনাজপুর অঞ্চলে ওইসব সামগ্রীর মূল্য যে আরও সস্তা ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। দিনাজপুর অঞ্চলের দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে প্রাপ্ত একটি পরিসংখ্যানে জানা যায় যে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে প্রতি টাকায় ৩ থেকে ৪ মণ চাল বেচাকেনা হত।

মধ্যযুগের শেষভাগে বিভিন্ন জিনিসপত্রের মূল্য খুব সস্তা হলেও সাধারণ কৃষক ও প্রজাদের দুঃখ ও দুর্দশার শেষ ছিল না। এর অন্যতম একটি কারণ ছিল রাজকর্মচারীদের অযথা অত্যাচার ও উৎপীড়ন। মাণিক দত্তের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্য থেকে জানা যায়, রাজার হাটে মূল্যবান সামগ্রী যথা হস্তী, ঘোড়া, ভোট কম্বল বিক্রি হত। কিন্তু ভাঁড়ুদত্তের কু-চক্রান্তে কলিঙ্গরাজ কালকেতুর গুজরাট নগর আক্রমণ করায় নগর ও হাট দুইই ধ্বংস হয়েছিল।

> 'হাট লুঠ করি খাত্র বাইশ হাজার।
> ভাঙ্গিল নাবাল রাজ্য করিল ছারখার।।'

দিনাজপুর অঞ্চলেও সেই যুগে খাজনার টাকা না দিতে পারলে হিন্দুদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিলামে বিক্রি করা হত। কর্মচারীরা কৃষকদের নারী ধর্ষ করত এবং পিয়াদারা নানা প্রকার উৎপীড়ন করত। লোকেদের দুর্দশার আরও একটি কারণ ছিল যুদ্ধের সময় সেনাদের লুঠপাট। দু'পক্ষের সেনারাই লুঠপাট, নারী নির্যাতন প্রভৃতিতে এত অভ্যস্ত ছিল যে, সেনাদের আগমন বার্তা শুনলেই গ্রাম ছেড়ে লোকে দূরে পালিয়ে যেত। তাছাড়া,

সেনারা গ্রাম লুঠপাট করে বহু নর-নারীকে বন্দী করে দাসরূপে বিক্রি করত। মধ্যযুগে দিনাজপুর অঞ্চলের সাধারণ লোকের অবস্থা খুব ভাল ছিল এরকম মনে করার কারণ নেই। তবে দু'বেলা দু'মুঠো খাবার দুঃখ হয়ত বর্তমান সময়ের তুলনায় কম ছিল।

২. ধর্মমত ও সামাজিক রীতিনীতি

মধ্যযুগে দিনাজপুরের রাজনৈতিক ইতিহাসে মুসলমানেরাই ছিলেন রাজপদের অধিকারী, হিন্দুরা ছিল তাদের দাস মাত্র। সেই সময় কোনো হিন্দুর পক্ষে রাজপদ অধিকার করা যে কত অসম্ভব ছিল রাজা গণেশের কাহিনিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে পর্তুগিজ পর্যটক দুয়ার্তে বারবোসা বঙ্গদেশ সম্পর্কে লিখেছিলেন যে রাজ অনুগ্রহ পাবার জন্য প্রতিদিন হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে হিন্দু সমাজে নিম্নশ্রেণির লোকেদের অনেক সময় জোর করে মুসলমান করা হত, আবার কেউ কেউ স্বেচ্ছায় ফকির ও দরবেশদের প্রভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। এইসব কারণে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই যে ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণির হিন্দু সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এ কথা সত্য যে, বঙ্গদেশে পাল রাজত্বকালে অনেক বৌদ্ধ ছিল। সেন রাজারা বিশেষ করে বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথা, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য এবং জাতিগত স্তরবিন্যাসকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; তার ফলে বহু বৌদ্ধ সমাজের নিম্নস্তরে পতিত হয়। মধ্যযুগকে ধর্মান্ধতার যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের অনেক কদাচার, নিষ্ঠুরতা, অবিচার ও অত্যাচারই ছিল এই ধর্মান্ধতার ফল।

মুসলমান আধিপত্যের সূচনায় তুর্কি সেনাদল ও ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের নিয়ে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত দিনাজপুরেও মুসলমান সমাজ সর্বাগ্রে গঠিত হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে আরবিয়, তুর্কি ও পারিসিক জাতিভুক্ত উচ্চ শ্রেণির মুসলমানও এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। সেইসময় বাংলার মুসলমান সুলতানরা এইসব জ্ঞানী-গুণী মুসলমানদেরকে অর্থ ও সম্মান দিয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এর ফলে বাংলার বাইরের ইসলাম সভ্যতার সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল এবং সংখ্যায় অল্প হলেও এরাই বাংলার মুসলমান সমাজে উচ্চতর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবর্তন করেছিলেন। আরবি ও ফার্সি সাহিত্যে উন্নতি এদের দ্বারাই সম্ভবপর হয়েছিল এবং এদের দ্বারাই ইসলাম ধর্মের দ্রুত প্রসার হতে লাগল। তুর্কি-আফগান আধিপত্যের সূচনার পূর্বে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত দিনাজপুর অঞ্চলেও তান্ত্রিক ধর্মের খুব প্রভাব ছিল। মুসলমানেরা বাংলা জয় করবার পর অনেক সুফি, দরবেশ ও পীর এইসব তান্ত্রিক সাধুকে স্থানচ্যুত করে তাদের বাসস্থানেই দরগা প্রতিষ্ঠা করতেন। আবার পীর ও দরবেশ সুফিরা অনেকসময় হিন্দু অধিকৃত অঞ্চলগুলি জয় করবার জন্য যুদ্ধও করতেন। দিনাজপুরের মুসলমান সমাজে খাঁটি ইসলামের অতিরিক্ত এবং অননুমোদিত কতকগুলি সংস্কার ও প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দুদের গুরুবাদ অর্থাৎ গুরুর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি মুসলমান পীরের প্রতি ভক্তিতে রূপান্তরিত

হয়েছিল। যেমন, সত্যপীর, ঘোড়াপীর, জিনডুপীর, মাদারীপীর প্রভৃতির পূজায় পর্যবসিত হয়েছিল। পুত্রহীনা নারীর পুত্র লাভের জন্য নানা অনুষ্ঠান, মাদারীকে ভোজ্যদান, বৃক্ষে দড়ি বা কাপড় বাধা ইত্যাদি নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের কুসংস্কার তাদের সঙ্গে মুসলমান সমাজেও প্রবেশ করেছিল।

মধ্যযুগে এখানকার সামাজিক রীতিনীতিতে হিন্দু সমাজে জাতিভেদের কিছু প্রভাব মুসলমান সমাজেও দেখা যায়। এর কারণ বাংলার মুসলমান সমাজে কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। এদের মধ্যে সৈয়দ, আলিম, শেখ, কাজী, মোল্লা ইত্যাদি। কিন্তু এই শ্রেণি বিভাগ হিন্দুদের জাতিভেদের মত কঠোর ছিল না। ষোড়শ শতকের গোড়ায় পর্তুগিজ বারবোসা মুসলমানদের সম্বন্ধে লিখেছেন যে, বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা সাদা জোব্বা পরে, এর তলে লুঙ্গির মত কোমরে জড়ান কাপড় এবং উপরে কোমরে রেশমের কোমরবন্দ হতে রৌপ্যখচিত তরবারি ঝুলানো থাকত। হাতে মণি-মানিক্যখচিত অনেকগুলি আংটি এবং মাথায় সূক্ষ্ম তুলার কাপড়ের টুপি। তাদের স্ত্রীদের পরণে থাকত মূল্যবান বস্ত্র ও অলংকার, কিন্তু তারা পর্দানসীন। সাধারণ লোকেরা খাটো কুর্তা ও মাথায় পাগড়ি পরে। সকলেই জুতো ব্যবহার করে। ধনীদের জুতোয় রেশম ও সোনার সুতোর কাজ। মুসলমান সমাজে উচ্চশিক্ষা সাধারণত ফার্সি ভাষার সাহায্যেই হত। অনেকে আরবি ভাষারও চর্চা করতেন। বিদ্যা শিক্ষার জন্য মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। সুফিদের দরগাতেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সাধারণত বিদেশি স্বল্পসংখ্যক অভিজাত মুসলমান উর্দু ব্যবহার করতেন। তাছাড়া সকলেই বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলত। মুসলমান সমাজে ধর্মীয় উৎসবাদির মাধ্যমে সামাজিক জীবনকে অনেকাংশে প্রভাবিত করত। ঈদুলফিতর ও ইদুলআযহা ছিল দুটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব। তাছাড়া ছিল 'শব-ই-বরাত', 'ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী', 'মহরম' ইত্যাদি। নিম্নশ্রেণির মুসলমানের মধ্যে বংশানুক্রমিক বৃত্তি অনুসারে অনেক রকম শ্রেণি বিভাগ ছিল। যেমন, গোলা, জোলা, মুকেরি, পিঠারি, কাবাড়ি, সানাকার, হাজাম, তীরকর, কাগজি, দরজি, বেনটা, রংরেজ, হালান, কসাই ইত্যাদি। প্রকাশ্যে মদ্যপান হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই নিন্দনীয় ছিল, কিন্তু গোপনে মাদক দ্রব্যের খুবই প্রচলন ছিল। মুসলমানেরা নানা রকমের পশুপক্ষীর মাংস, মিষ্টান্ন, তাজা ও শুকনা কাবুলী ফল, আচার প্রভৃতি খেতে ভালবাসত। রুটির পরিবর্তে অধিকাংশ মুসলমানই ভাত খেত। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পান খেত এবং পান সুপারি দিয়ে অতিথিকে সমাদর করতো। গরীব লোকেরা ভাত, লবণ ও শাক এবং সামান্য কিছু তরকারীর ঝোল খেত। কখনও দই ও দুধ খেত। সেকালে মাছও খুব সুলভ ছিল না। পান্তাভাতের জল গরিবদের প্রিয় খাদ্য ছিল।[৫]

মধ্যযুগে হিন্দু সমাজ পরিচালিত হত মূলত প্রাচীন যুগের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে। ধর্মকে কেন্দ্র করে এর সাহিত্য সমাজ শিল্প গড়ে উঠেছিল। হিন্দুরা প্রাচীন স্মৃতির মর্যাদা রক্ষা করে চলত। সেই যুগে মনু যাজ্ঞবল্ক্য, প্রভৃতি প্রামাণিক স্মৃতিশাস্ত্রের নতুন নতুন টীকা এবং স্মার্ত পণ্ডিতেরা সে সম্পর্কে নতুন নতুন প্রবন্ধ রচনা করে প্রতি অঞ্চলে

যে সব নতুন প্রথা প্রচলিত হয়েছে তার সঙ্গে শাস্ত্রের সঙ্গতি রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। সে কালে হিন্দু সমাজে যাগযজ্ঞাদির বিশেষ প্রচলন দেখা যায় না। সমাজে ব্রতানুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। হিন্দু সমাজের পূজাপার্বণে তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রয়োগ, তান্ত্রিক মণ্ডল, মুদ্রা, যন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার ছিল লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় দিক থেকে সমাজে সকল সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল তার মধ্যে প্রধান শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব। এই তিনটি প্রধান সম্প্রদায় ছাড়াও দিনাজপুর অঞ্চলে সৌর, গাণপত্য, পাশুপত, পাঞ্চরাত্র, কাপালিক, কৌল প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। হিন্দু সমাজে কালীপূজা, দুর্গাপূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। পূজাপার্বণের মধ্যে দুর্গাপূজা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য লাভ করেছিল। তাছাড়া, ব্রহ্মপূজা, শিবপূজা, ষষ্ঠীপূজা, সরস্বতীপূজা, লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদির প্রচলন ছিল। শিবরাত্রি, একাদশী, দোলযাত্রা, রথযাত্রা, হোলি, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হত।

মধ্যযুগে হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। জাতিভেদ প্রথার কঠোরতার কারণে হিন্দু সমাজে বহু শ্রেণি, উপশ্রেণি ও মিশ্রশ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। এরা গ্রামে ও শহরে বসবাস করত। অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত লোকেরা যেমন ডোম, চণ্ডাল, চামার, খটিক, এদের বসতি ছিল গ্রাম বা শহরের প্রান্তসীমায়। চার জাতির নীচে ছিল অন্ত্যজদের অবস্থান। এরা উঁচু শ্রেণির কাছে অস্পৃশ্য ছিল। বিভিন্ন শ্রেণির লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন পেশায় যুক্ত থাকত এবং পেশাগতভাবে তারা বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যেমন, গন্ধবণিক, তন্তু, কর্মকার, মালাকার, জালিয়া, ছুতোর, ধোপা, করাতি, মালো, ইত্যাদি। মুসলমান শাসনের গোড়ার দিকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকরা হিন্দুদের নিয়োগ করত না। দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর থেকে এই অঞ্চলে মুসলমান অভিবাসীদের আগমন বন্ধ হয়ে যাওয়াতে মুসলমান শাসকেরা শাসন কার্য পরিচালনার জন্য স্থানীয় লোকেদের সহায়তা প্রয়োজন অনুভব করলেন। এর ফলে তারা স্থানীয় লোকেদের প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করেন এবং হিন্দুদের ব্যাপকভাবে সামরিক এবং বেসামরিক বিভাগে নিয়োগ করতে থাকেন। মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থায় এভাবেই হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, অপর দিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের অবস্থা ভাল হয়ে ওঠে। সমাজ জীবনে হিন্দুদের ধর্মীয় স্বাধীনতাও ছিল এবং স্বাধীনভাবেই তারা তাদের সাংস্কৃতিক জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন। হিন্দু সমাজে পর্দাপ্রথা নিম্নবর্গের মহিলাদের মধ্যে তেমন ছিল না বললেই চলে, উচ্চশ্রেণির হিন্দু রমণীরা এ প্রথা মেনে চলতেন।

সেকালে বাঙালি পুরুষেরা ধুতি, চাদর ও স্ত্রীলোকেরা খালি গায়ে শাড়ি পরত। পুরুষেরা সাধারণত পায়ে জুতো ও খড়ম ব্যবহার করত। গরিব মানুষেরা কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত এক প্রস্থ ধুতি পরত। অনেক সময় ওই কাপড়ই কোমরে নেংটির মত জড়ানো থাকত। অবস্থাপন্ন হিন্দুরা তাদের শারীরিক সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য সচেষ্ট ছিলেন। মাথার চুল লম্বা রাখতেন ও মসৃণ করার জন্য তারা নানান ধরনের তেল ব্যবহার করতেন। গায়ে চন্দনের গুঁড়ো, চন্দন পঙ্ক, অগরু, কর্পূর, কস্তুরী এই সব সুগন্ধী

দ্রব্যাও ব্যবহার করতেন। বিবাহিত নারীরা মাথার মাঝখানে সিঁথি করে সিঁথিতে সিঁদুর পড়তেন। চোখের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য তারা চোখে কাজল পরতেন এবং কপালে তিলক ব্যবহার করতেন। সামর্থ্য অনুযায়ী হিন্দু রমণীরা নানা রকমের অলংকার পড়তেন, যেমন, পায়ে বাগ, ছড়, মল, হাতে কাটাবাজু, খাড়ু, চুড়ি বা বালি, হাতের আঙুলে আঙ্গুট (আংটি), গলায় তাবিজ, হার, মাথায় সিঁথিপাটি, কানে মাকড়ী, বালি, ঝুমকা, কানপাশা, নাকে নোলক, নাকমতি ইত্যাদি। এইসব অলংকার সাধারণত সোনা ও রুপো দিয়ে তৈরি হত। হিন্দু সমাজে খাদ্য-খাবারের মধ্যে ছিল ভাত, ঘি, মাখন, বিভিন্ন রকমের মিষ্টি এবং নানা ধরনের সব্জী। মূলত নিরামিষ আহারের প্রচলনই ছিল বেশি। অনেকে মাছ খেতেন, মাংসের মধ্যে খাসি, হরিণ, মেষ, কবুতর, কাউঠা খাওয়ার চল ছিল। প্রকাশ্যে মদ্যপান হিন্দু-মুসলমান উভয় সামাজেই নিন্দনীয় ছিল, কিন্তু গোপনে মাদকদ্রব্যের খুবই প্রচলন ছিল।

মধ্যযুগে প্রিয় খেলা ছিল পাশা খেলা। তাছাড়া, পোলো খেলা, পায়রা ওড়ানোর প্রতিযোগিতা, সাঁতার, গাছে চড়ার প্রতিযোগিতা, কুস্তি গেন্দুয়া বা গেরু খেলা ইত্যাদি খুবই জনপ্রিয় খেলা ছিল। *চৈতন্য ভাগবত* গ্রন্থে রামায়ণের কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে যাত্রা অভিনয়ের কথা জানা যায়। শঙ্খ, ঘণ্টা, ডম্ফ, মৃদঙ্গ, জগঝম্প, ডম্বরু, ও বিষাণ, এইসব বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল। সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল পাঁচালী গান, কথকতা, তরজা ও কবিগান। তরজা ও কবিগানে মাঝে মাঝে অশ্লীলতার প্রাধান্য থাকত, এগুলিকে খেউড় বলা হত। সে কালের লোকেরা পোষা পাখীর পায়ে নুপুর লাগাত ও অনেক টাকা খরচ করে পাখির খাঁচা নির্মাণ করত। ধনী বিলাসীদের গৃহে বিভিন্ন ধরনের সোনা রূপোর কাজ করা আসবাবের বর্ণনা পাওয়া যায়, যেমন, পালঙ্ক, মশারি, শীতল পাটি, কম্বল, গালিচা, আয়না, সোনার কাজ করা দোলা, শামিয়ানা, বিভিন্ন ধরনের চামর, গজদন্ত পাশা, সোনার পিঁড়ি, ইত্যাদি।

বৃহত্তর দিনাজপুর মধ্যযুগীয় সমাজে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করলেও ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে এই অঞ্চলের সামাজিক জীবন দুটি সমান্তরাল ধারায় বিকাশ লাভ করেছিল। এই দুটি ধারায় বিকাশ লাভ করলেও তারা একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। দীর্ঘদিনের মেলামেশার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমানরা হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আবার, কোনও কোনও ক্ষেত্রে হিন্দুরাও মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মোগল আমল থেকেই হিন্দু সংস্কৃতি এখানকার মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠান-রীতিনীতি মুসলমান সমাজে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছিল। মোগল সম্রাট আকবর দীন-ই-ইলাহীর মাধ্যমে এদেশের হিন্দু-মুসলমান সবাইকে একই সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন। তাঁর এ চেষ্টা সফল হয়নি। নবাবি আমলেও দিনাজপুর অঞ্চলে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন প্রথা মুসলমান সমাজেও দেখতে পাওয়া যায়। নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা ও মীরজাফর হিন্দুদের 'হোলি' উৎসবে যোগ দিতেন। মীরজাফর মৃত্যুর সময়ে দেবী কীর্তিশ্বরীর পাদোদক পান করেছিলেন। মধ্যযুগে বিশেষ করে হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ মুসলমানদের মধ্যে একটি বহুল প্রচলিত প্রথা ছিল। আবার

মুসলমান পীরের হিন্দু মুরীদ এবং হিন্দু যোগীর মুসলমান শিষ্য গ্রহণ মুসলমান মানসে হিন্দু চিন্তাধারা ও লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাবেরই ফল। আবার মুসলমান সমাজে হিন্দুদের অনুকরণে যে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হতো, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মুসলমানদের মহরম উৎসব। মুসলমান সমাজে হিন্দুদের অনুকরণে প্রচলিত দেবদেবতার পূজা, পীরপূজা, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি যে অনুষ্ঠিত হতো তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'তাজিয়া' নির্মাণ এবং দশম দিবসে 'মঞ্জিল মাটি' তাও দুর্গাপূজার প্রতিমা গঠন ও দশমীর দিনে বিসর্জনের মত। হিন্দুদের গুরুপূজার কায়দায় পরিণত হয়েছিল মুসলমানদের পীরপূজা, পীরের দরগায় উরুস এবং আলি-আল্লাহ্‌দের মাজারের অতিরিক্ত জিয়ারত উপলক্ষে শেষপর্যন্ত সেগুলিকে হিন্দুদের তীর্থস্থানের মত গড়ে তোলা হয়েছিল। নিম্নবর্গের মুসলমান সমাজে হিন্দুদের পৌরাণিক সমুদ্র দেবতার মত খাজা খিজিরকে মেনে চলা, তাঁকে লক্ষ্য করে ফাতেহা পড়া, হিন্দুদের পূর্বপুরুষের নামে স্মৃতি তর্পণের মত নদীতে পয়সা ও মিষ্টান্ন অর্পণ করা, হিংস্র বন্য পশুদের উপরেও পীরদের মাহাত্ম্য ও প্রভাব স্বীকার করে পীরের সাহায্যে হিংস্র পশুদের শান্ত রাখা এবং তাদের উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আত্মপ্রসাদ প্রভৃতি রীতিনীতি ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজজীবনে হিন্দু প্রভাবজাত।[৬]

এই সংস্কৃতির ফলে সে যুগে উভয় জাতির মধ্যে এক ধরনের সমঝোতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তবে এই রকম সম্পর্কের কিছুটা অবনতি মাঝে মাঝে ঘটেছে কিন্তু তা স্থায়ীভাবে তেমন কোনও তিক্ততা সৃষ্টি অথবা আন্তরিকতার সম্পর্ককে নষ্ট করতে পারেনি।

৩. সাহিত্য

মধ্যযুগে এই অঞ্চলে বহু রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভাষা ও সাহিত্য একটি স্বাধীন সত্তায় ক্রমবিকশিত হয়েছিল। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এখানকার অবদান অত্যন্ত গৌরবময়। দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী, মালদহ ও মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল বরেন্দ্র অঞ্চল। প্রাচীন পুরাকীর্তি ও প্রত্নতত্ত্বময় বরেন্দ্রভূমির মধ্যে প্রাচীনতম অংশ হিসাবে দিনাজপুর অঞ্চল ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর মূল কারণ ছিল বরেন্দ্রভূমির মধ্যে এর অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতম স্থানে এবং হিমালয় পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত বলেই সমুদ্রের তলদেশ থেকে জেগে ওঠা প্রাচীনতম ভূমি বলে এর পরিচয় ছিল অধিকতর। প্রাচীনতম স্থানই যে সভ্যতা বিকাশে গৌরবময় ঐতিহ্যকে ধারণ করে থাকে ভাষা-সাহিত্যের পরিচয়েই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এদেশে আর্যদের আগমনের পূর্ব থেকেই সংস্কৃতের অনুশীলন শুরু হয়েছিল। প্রাপ্ত মৌর্য ও গুপ্তযুগের লেখমালার ভিত্তিতে অনুমান করা হয় যে খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বা তারও পূর্বে বঙ্গদেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ছিল। এরই ফলে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই বাঙালির হাতে সংস্কৃত চর্চা একটি বিশেষ রীতিতে উপনীত হয়েছিল, পরবর্তীতে যা আলংকারিকদের অভিধায় 'গৌড়ীয় রীতি' অভিধায় আখ্যায়িত

হয়। বঙ্গদেশে নব্যন্যায়ের চর্চা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। সমস্ত নৈয়ায়িকগণের মধ্যে গদাধর ভট্টাচার্যকে দিনাজপুর অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট নৈয়ায়িক রূপে উল্লেখ করা যায়। তিনি বগুড়ার[৭] অধীনে লক্ষ্মীচাপড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম জীবাচার্য। নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক হরিরাম তর্কবাগীশের কাছে তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অসাধারণ প্রতিভা এবং অবিচলিত উৎসাহ নিয়ে তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক রূপে পরিগণিত হন। গদাধর ভট্টাচার্যের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন ও মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। ইনি *ব্রহ্মনির্ণয়* নামে একখানি বেদান্তভাষ্য, *কুসুমাঞ্জলী*-র ব্যাখ্যা, *মুক্তাবলী*-র টীকা এবং তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি ও তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকের *গাদাধরী* নামক সুবৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। গাদাধরী নব্যন্যায়ের ছিল মূল্যবান গ্রন্থ এবং গদাধর ভট্টাচার্যের অক্ষয় কীর্তি। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকেও গদাধর ভট্টাচার্য জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। তাছাড়া, এই অঞ্চলেরই কবি জগদীশ তর্কালঙ্কারের *রহস্য প্রকাশ* নামে কাব্য (১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ), আদমদিঘি থানার অধীনে তালশন গ্রামের পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের *কৃতভাষ্য* নামে সারস্বত ব্যাকরণের সুবৃহৎ পরিশিষ্ট সম্বলিত গ্রন্থ (১৫৭২ খ্রিস্টাব্দ), কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্যের *ঋজু দীপিকা* ও *প্রভাবতী সারস্বত* ব্যাকরণের টীকা ভাষ্য সম্বলিত গ্রন্থ, রাম বিদ্যালঙ্কারের *রাম রাজ্যাভিষেকম* নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য, কবি বল্লভের *রসকদম্ব* ইত্যাদি গ্রন্থ সংস্কৃত ও বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য নিদর্শন। এইসব পণ্ডিতেরা এই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে যেমন গৌরববর্ধন করেছিলেন তেমনিই গৌড়বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। কবি বল্লভের *রসকদম্ব* কাব্যের কিছু পরিচয় ঃ

"না পুড়িও মোর অঙ্গ না ভাসাও জলে।
মরিলে রাখিও বাঁধি তমালের ডালে।।
কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পারব হাম পিয়া দরশনে।।"[৮]

মধ্যযুগে আরও একটি মূল্যবান গ্রন্থ অদ্ভুতাচার্য্যের *রামায়ণ*। কীর্তিবাসী *রামায়ণ* হতে এটি ছিল অনেক বড়। কবির প্রকৃত নাম ছিল নিত্যানন্দ আচার্য। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন করতোয়ার পশ্চিমে ও আত্রাই নদীর উত্তরকূলে কুণ্ডগ্রাম নামক স্থানে। নিত্যানন্দ আচার্য শৈশবকাল হতেই অদ্ভুত কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তাই লোকে তাঁকে 'অদ্ভুতাচার্য্য' আখ্যা দিয়েছিলেন। অদ্ভুতাচার্য্য *রামায়ণ*-এ কবির পরিচয় দিয়েছেন এভাবে ঃ

"অদ্ভুত আচার্য্য বন্দো কবি মহাজন।
যাহার প্রসাদে লোকে শুনে রামায়ণ।।
তার পিতামহো বন্দো নামেতে মারকণ্ড।
যাহাতে জন্মিয়াছে পুরুষ প্রচণ্ড।।

* * *

আত্রাইর তীর সেহি কুরুক্ষেত্র সমান।
মহাপুণ্য স্থান সেই পুরাণে ব্যাখ্যান।।
করতোয়া পশ্চিমভাগে জাহ্নবীর সীমা।
হেন পুণ্য স্থান সেহি নাহিক উপমা।।
করতোয়ার পশ্চিমে আত্রাইর উত্তরকূলে।
মহাপুণ্য স্থান সেই পুরাণেত বোলে।।
অমৃত কুণ্ডগ্রাম নাম অধিকারী তার।
শ্রীনিবাস আচার্য্য সাধুর আচার।।
তার ঘরে জনমিল যে চারি কুমার।
মেনকার উদরে চারি ব্যাস অবতার।।
জেষ্ঠ্য তিনজন অতি বিচক্ষণ মস্ত।
অতি মূর্খ আছিল কনিষ্ঠ নিত্যানন্দ।।
সপ্তম বৎসরের শিশু অক্ষর নাহি চিনে।
খেলাইয়া ফিরে সব রাখালের সনে।।
মাঘ মাসের ভীম একাদশী তিথি।
সপ্নাদেশে প্রসন্ন হইল রঘুপতি।।

* * *

সপ্তকাণ্ড পুঁথি করিল পয়ার প্রবন্ধে।
অদ্ভুত আচার্য্য মুখে বোলে রামচন্দ্রে।।
প্রভুর কৃপা হইল রচিতে রামায়ণ।
অদ্ভুত নাম হইল সেহি সে কারণ।।

* * *

তপোবলে হৈল তার এ তিন কুমার।।
জয় বিজয় হৈল আর শিবানন্দ।
একত্রে তিনেক বর দিলা রামচন্দ্র।।"[৯]

অদ্ভুতাচার্য্য *রামায়ণ* রচনাকালে মুসলমানেরা হিন্দুর জাতি ধ্বংস করতে চেষ্টা করত। সেকালে জাতিতে ওঠবার প্রায়শ্চিত্ত যে অত্যন্ত সহজ ছিল কবি তার রচনার একস্থানে সে কথা বর্ণনা করেছেন ঃ

"বলকার জাতি যদি লএত জবনে।
ছয়গ্রাস অন্ন যদি করায় ভক্ষণে।।
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেইজন।
মুনির কথা শুনি হাসে দেব নারায়ণ।।"

বরেন্দ্রভূমির করঞ্জ[১০] গ্রাম নিবাসী নিত্যানন্দ ছিলেন একজন খ্যাতিমান কবি ও স্মার্ত। তিনি চতুর্দশ শতকেও জীবিত ছিলেন। তাঁর রচিত *কৃষ্ণানন্দ* কাব্য ও *স্মৃতিকৌমুদী* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত *হরিচরিত* পুস্তকের কবি চতুর্ভুজের তিনি ছিলেন পিতামহ। বরেন্দ্রভূমির আরও একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন রামচন্দ্র কবি ভারতী। তিনি

ত্রয়োদশ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই সংস্কৃত চর্চায় বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করে শ্রুতি, স্মৃতি এবং কাব্য প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী হন। ময়ূর ও বাণের রচিত *শতক* কাব্যের অনুসরণে রামচন্দ্র *ভক্তিশতক* নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। কাব্যটিতে ১০৭টি শ্লোক রয়েছে এবং এটি অলংকার শাস্ত্র নির্দেশিত পদ্ধতিতে রচিত। এছাড়া, *বৃত্তরত্নাকর পঞ্জিকা* নামে অপর একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। বরেন্দ্রভূমির বীরবতী নামক স্থানে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গণপত ও মাতার নাম দেবী। হলায়ুধ ও অঙ্গিরস নামে তাঁর দুই অনুজ ছিলেন।[১১] বরেন্দ্রভূমির করঞ্জ অঞ্চলের আর একজন বিখ্যাত কবি তাঁর রচনা প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁর নাম চতুর্ভুজ। চতুর্ভুজের গ্রন্থের নাম *হরিচরিত কাব্যম্*। কাব্যটির সমাপ্তিকাল ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ বলে জানা যায়। কবি লিখেছেন, তিনি বাস করতেন 'ভাগীরথী-পরিসরে'-'বহু শিষ্টজুষ্টে'-'শ্রী রামকেলি নগরে'।[১২] রামকেলির নাম বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। শ্রীশ্রী মহাপ্রভু এই নগরে তিনদিন বাস করে হরিনাম অমৃত বিতরণ করেছিলেন। হোসেন শাহের বিশ্বস্ত মন্ত্রী রূপ-সনাতন এই নগর হতেই সংসার ত্যাগ করেছিলেন। চতুর্ভুর্জের *হরিচরিত কাব্যম*-এর বর্ণনার বিষয় কৃষ্ণলীলা। কবি রচনাকালে বিজ্ঞাপনের জন্য লিখে গেছেন ঃ

> 'শর-বিধু-মনুভিঃ শকস্য বর্ষে পরিগণিতেহম নভস্য শুস্থরুপক্ষে।
> প্রতিপদি শশি-বাসরে সম্পূর্ণং হরিচরিতহবয় - নবকাব্যমেতৎ।।'[১৩]

বঙ্গদেশে তুর্কি আক্রমণের প্রায় দুশো বছর পর্যন্ত বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলে রচিত কোনও কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়নি। চৈতন্য প্রভাবিত কাব্যের প্রভাব এই অঞ্চলে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আবার, মুসলমান শাসনামলে রাজভাষা ফার্সি চর্চার কারণে এই অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষা চর্চা অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে ইংরেজ শাসনের আমলে তা আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে প্রাচীন ও আধুনিক দুটি ধারায় বিভাজিত হয়ে পড়ে। সংস্কৃত চর্চার প্রাচীন ধারাটি ছিল টোল - চতুষ্পাঠী শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ, অপরদিকে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সংস্কৃত ভাষার দ্বিতীয় ধারাটি প্রবাহিত হতে থাকে। মধ্যযুগে বৈষ্ণব কাব্য মূলত রাধাকৃষ্ণের লীলা, কৃষ্ণবিষয়ক আখ্যান বা চৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে বহু কাব্য রচিত হয়েছিল। মধযুগের প্রারম্ভে লক্ষ্মী ধরের *চক্রপানি বিজয়* এবং অমরমাণিক্য রচিত *বৈকুণ্ঠবিজয়* কাব্য ও নাট্য সাহিত্য দুখানি রচিত হয়েছিল। এই কবিরা কেউই বৃহত্তর দিনাজপুর বা বরেন্দ্রভূমির অধিবাসী ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের দু'জনেরই রচনার বিষয় ছিল দিনাজপুরের বাণগড় নগরীর বাণাসুরের কন্যা উষার সঙ্গে কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ, বাণ কর্তৃক অনিরুদ্ধের নিগ্রহের সংকল্প, বাণের সঙ্গে কৃষ্ণের তুমুল সংগ্রাম, শঙ্কর এবং কার্তিকেয় বাণের সহায় থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণের হাতে তার পরাজয় ও পৌত্র এবং পৌত্রবধু সহ কৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন।

বৈষ্ণব তীর্থপীঠরূপে পরিচিত বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের অধীনে অতি প্রাচীন পল্লী রামকেলি। গৌড়ের বাদশা হোসেন শাহের রাজত্বকালে একদা চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাবার উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়ে পথে সপরিকর এই রামকেলিতে কয়েকদিন অবস্থান

করেছিলেন। মহাপ্রভু তাঁর পদধুলি দিয়ে চিরকালের জন্য বৈষ্ণব তথা ভক্তদের কাছে রামকেলিকে এক পুণ্যভূমিতে পরিণত করে গেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশিষ্ট পদকর্তারা সনাতন ও রূপ গোস্বামী, রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামী (ষোল-সতের শতক) এই রামকেলি পল্লীতেই বসবাস করেছিলেন। সনাতন গোস্বামী (১৪৮৮ - ১৫৫৮) *দিক্ প্রদর্শনী* নামক *হরিভক্তি বিলাসের* টীকা, শ্রীমদ্ভাগবত-এর দশ স্কন্ধের *বৈষ্ণবতোষিণী* নামক টীকা, *লীলাস্তর* ও টীকাসহ দুইখণ্ড *ভাগবতামৃত* প্রণয়ন করেন। রূপ গোস্বামী (১৪৮৯-১৫৬৩ খ্রিঃ) *হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ, কৃষ্ণ জন্মতিথি, গণোদ্দেশ দীপিকা, স্তবমালা, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলি কৌমুদী, আনন্দ মহোদধি, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, প্রযুক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা, মথুরামহিমা, পদ্যাবলী, নাটক চন্দ্রিকা, লঘু ভাগবতামৃত, গোবিন্দ বিরূদাবলী* প্রভৃতি গ্রন্থরচনা করেন। জীব গোস্বামীর *হরিনামামৃত ব্যাকরণ, সূত্রমালিকা, কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, গোপাল বিরূদাবলী, মাধবমহোৎসব, সংকল্প বৃক্ষ, ভাবার্থসূচক চম্পূ* প্রভৃতি ২৫খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১৪]

ষোলো ও সতেরো শতকের *মনসা মঙ্গল*-এর দুই কৃতী কবি তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষাল দিনাজপুর জেলার ভূমিতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তন্ত্র বিভূতি, সম্ভবত কবির নাম ছিল বিভূতি, তান্ত্রিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে তন্ত্রবিভূতি নামে পরিচয় লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত মনসামঙ্গলের নাম *মনসাপুরাণ*। কাব্যখানি কবির নামেই *তন্ত্রবিভূতি* রূপে পরিচিত। কবির রচনায় মনসার অষ্টনাগ সজ্জায় অষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনায় পদ্মার মনোহর রূপ ঃ

চতুর্ভুজ মূর্তি পদ্মা দেখিতে সুন্দর।
নানা আভরণ সর্প অঙ্গের উপর।।
ই কালনাগিনী দেবীর শিরে কেশভার।
সেতিতে লাগিল দেবীর আগুণ্যা চিএগর।।
সিন্দুরিয়া নাগ দেবীর সিন্দুর উজ্জল।
পুএগচিএগ নাগ দেবীর নএগনে কাজল।।
যুএগ নাগে দেবীর যুগল হইল ওষ্ঠ।
পাতগুা নাগে দেবীর হৈল জিহ্বা গোট।।
দশ নিএগ নাগ দেবীর দশন হইল।
দন্তমধ্যে ভ্রমর যেন গুঞ্জরিতে লাগিল।।
গোয়ানি মুগুলিএগ করিএগ সাজনি।
মাথায় ধরিল ছত্র অহিরাজ ফণি।।[১৫]

দিনাজপুর জেলার অধীনে কোচ আমোরা (যার অপর নাম কুড়িয়া মোড়া) গ্রামে[১৬] জগজ্জীবন ঘোষাল জন্মগ্রহণ করেন। দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের তিনি সমসাময়িক ছিলেন। চর্যাপদের কাল থেকে মঙ্গলকাব্যের যুগান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ নয়শো বছরের সময়কালে তিনিই একমাত্র কবি যার সন্ধান তিনি নিজেই দিয়েছেন, তাঁর রচিত *মনসামঙ্গল*-এ দিনাজপুরের কবিরূপে। কবি এভাবে তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন ঃ

চৌধুরী রূপ রায় সর্বদেশে গুণ গায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তার পুত্র ঘনশ্যাম তার পুত্র অনুরাম
বিরচিল জগৎ জীবন।।
ঘোষাল ব্রাহ্মণ রাঢ়ী কোচ আমোরোত বাড়ী
প্রাণনাথ নরপতি দেশে।
বন্দিয়া মনসা পায় জগৎজীবন গায়
পুরাণ সমাপ্ত তার শেষে।।

বিষহরি পদ্মপুরাণ কাব্যের অপর আরও একজন কবি হলেন জীবনকৃষ্ণ মৈত্রেয়। তিনি বগুড়ার অধীনে করতোয়া নদীর উত্তরে লাহিড়ী পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত কাব্য হতে জানা যায় যে, তিনি নাটোরের রানি ভবানীর রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত কবি জীবন মৈত্রেয় *পদ্মপুরাণ*-এ রাণী ভবানীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের রাজ্যের প্রজা বলে নিজেকে উল্লেখ করেছেন।

সে সতী পুণ্যবতী রাণী ভবানী।
মহারাণী বলি তাকে ভুবনে বাখানি।।
যার পুত্র রামকৃষ্ণ রাজা রাজ্যেশ্বর।
অপার মহিমা যশ ভুবনে যাহার।।
তাহার রাজ্যতে বাস ভিক্ষা করি খাই।
কহে কবি জীবন মৈত্র নির্দয় গোঁসাই।।

জীবন মৈত্রের ভণিতায় *উষাহরণ* নামক একখানি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র কাব্য পাওয়া যায়। *উষাহরণ*-এর এই আখ্যান তাঁর রচিত *পদ্মপুরাণ*-এর দেবখণ্ডেও রয়েছে। বাণ-দুহিতা উষাই যে শাপভ্রষ্ট হয়ে বেহুলারূপে চাঁদ সওদাগরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, *পদ্মপুরাণ*-এ তাই লেখিত হয়েছে ঃ

যদি উষা হই সতী সাহসে জিয়াব পতি
ন্যায়ে জিনিব দেবের নগর।

জীবন মৈত্রের *উষাহরণ* নামক কাব্যের কিছু অংশ ঃ

মদন দেবের বেটা মুখপদ্ম চন্দ্রছটা
আইলেন উষার বাসরে।
শূন্যপথে ভর করি আইলা উষারপুরী
প্রহরী জাগিছে থরে থরে।।

* * *

দেখিয়া উষার ঠাম মদনে হানিল বাণ
নয়ন ভরিয়া রূপ দেখে।
কখন উষার তরে বাহু পসারিয়া ধরে
কখন চুম্বন দেয় মুখে।।

পসারিয়া দুই বাহু যেন চন্দ্রে ধরে রাহু
উষাবতী মেলিল নয়ন।
নয়নে নয়ন খেলা বাড়িল মদন জ্বালা
বিরচিল শ্রীমৈত্র জীবন।।

মধ্যযুগে এই অঞ্চলের কবি মাণিক দত্তের রচিত *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্য বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কবি তাঁর রচিত পুঁথিতে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তাতে বলেছেন যে, তাঁর নিবাস ফুলুয়া নগর। ফুলুয়া নগর বর্তমান মালদহের অধীনে ফুলবাড়ী বলে অনেকে মনে করেন। মানিক দত্তের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের নমুনা।

অঝোরে কান্দিয়া চক্ষুর মোছে পানি।
মোর স্বামীর নিন্দা কর অধম জননী।।
যত কন্যা আছে তোমার জগত-সংসারে।
কেহ দাসী কেহ দাস কি কব তাহারে।।
শক্তিরূপী দেবী যাহার সন্ধান।
বিষ্ণুরূপী বসোয়া যাহার বাহন।।
তোমার স্তান - না জানিলে সে দেব কেমন।
ভূত ভূত বলি তুমি বোল কার তরে।
পঞ্চভূত আত্মা দেখ তোমার শরীরে।।
সংসারে যত দেখ তাহাতে ব্যাপন।
এমত দেবতাকে বোলে কেমনে অধম।।
যেখানে স্বামীর নিন্দা না রহিব আমি।
আজি হৈতে তোর মুখ না দেখো জননী।।[১৭]

মধ্যযুগে প্রাচীন বাংলাভাষায় রচিত মঙ্গলকাব্যগুলি আমাদের এই অঞ্চলের লোক জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতা এবং শ্রমলব্ধ পাণ্ডিত্যকেই বৈশিষ্ট্য দান করেছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এগুলি অপূর্ব নিদর্শন। বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* বাংলা ভাষা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। চৈতন্য - পূর্ববর্তী কালের রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার প্রাচীনতা দিনাজপুর-রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত বাংলা ভাষার কথ্যরূপ বলে অনেকে মনে করেন। এই কাব্য দেশান্তরিত হয়েছিল, উত্তরবঙ্গের রংপুর অঞ্চল হতে ঘুরে বিষ্ণুপুরে পুঁথিটি গিয়েছিল বলে অনেকের ধারণা।[১৮] মধ্যযুগে দিনাজপুর অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জনপ্রিয়তা ছিল অতুলনীয়। এর মূল কারণ এই অঞ্চলের লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে এখানকার সমাজের রীতিনীতি, আচার ব্যবহারের অনেক সাদৃশ্য কাব্যটি থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে-সেইকালের সমাজ জীবনের খণ্ডচিত্র ঃ

গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসওঁ
কিবা মরোঁ আনলে পুড়িআঁ।
তবেঁ বা মোঞঁ কাহ্নের ঝগড় এড়াওঁ

কিবা মরোঁ খরল খায়িআঁ
যোগিনী রূপে মো দেশান্তর লইবো।।
আনল কুন্তল কিবা তনু তে আগিবোঁ।
কাহ্নত লাগিআঁ কিবা বিষ খাইআঁ মরিবোঁ।।[১১]

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের মুসলমান লেখকেরা হিন্দু লেখকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত পরে অংশগ্রহণ শুরু করেন। বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা যে আরবি-ফার্সি নয় বাংলা, এই উপলব্ধি করতে তাঁদের কয়েক শতাব্দী লেগেছিল। কবি সৈয়দ সুলতানের লেখা হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সতেরো শতকের প্রথম দিকেও বাঙালি মুসলমানেরা বাংলাভাষাকে 'হিন্দুয়ানি ভাষা' বলতেন। মধ্যযুগে রাজদরবারের ভাষা ছিল ফার্সি। সভ্রান্ত মুসলমানেরা মুখে ফার্সির কথ্য ভাষা ব্যবহার করেতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও তার পরে অনেক ইংরেজি শব্দও বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এভাবে মধ্যযুগে বাংলাভাষা বিদেশী ভাষার সাহায্যে সমৃদ্ধিলাভ করেছে।

৪. স্থাপত্য-শিল্প

মধ্যযুগে বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলে স্থাপত্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলমান আধিপত্য-কালে বিশেষত সুলতানি আমলে নির্মিত মসজিদ ও সমাধি ভবন, মোগল যুগে মসজিদ, সমাধিভবন, স্তম্ভ ও তোরণ ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল। এগুলি নির্মাণে স্থাপত্য শিল্পের কয়েকটি বিশেষত্ব ধরা পড়ে। প্রথমত, এগুলি প্রধানত ইটের তৈরি। স্তম্ভ ও কোনও কোনও স্থানে প্রাচীরের বহিরাবরণের জন্য পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। কখনও আদ্রতা থেকে রক্ষার জন্য সর্বনিম্নে একসারি পাথর বসানো হয়েছে। ইটের গাঁথনি মজবুত করার জন্য চুন ব্যবহার করা হত, মোগল আমলে পলেস্তারার জন্য চূণের ব্যবহার হত। সুলতানি আমলের মসজিদ-স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল একখণ্ড জমির উপর স্থাপিত এবং ভারি ধরনের বৃষ্টিপাত মোকাবিলার জন্য প্রকোষ্ঠযুক্ত ইমারত, যার অনুন্নত বাইরের অংশটি হত বাঁকানো কার্নিশযুক্ত এবং তিন অথবা চারটি শ্রেণিবদ্ধ খিলানযুক্ত প্রবেশপথ। তাছাড়া, ছাদের প্রতিকোণে আটকোণা ধরনের চূড়া সদৃশ মিনার থাকত। অনুচ্চভাবে নির্মাণের ফলে ছাদের উপরে গম্বুজ স্থাপনে সমগ্র স্থাপত্যটির কাঠামোও ছিল অনেকটা অবনমিত অর্থাৎ বাংলার বাঁকানো চালের কুঁড়ে ঘরের কাঠামোর মত। মসজিদের দেয়ালের গায়ে থাকত বিভিন্ন ধরনের নকশা এবং ক্রমে ক্রমে তার পরিবর্তন হয়। এর কারণ এগুলি সাধারণত হিন্দুযুগের অনুকরণে করা হত। হিন্দু মন্দিরের গায়ে চারকোণা প্রস্তর ফলকের উপর মানুষের মূর্তি খোদাই করা হত। কিন্তু ইসলাম ধর্মে মানুষের মূর্তি গঠন নিষিদ্ধ হওয়ায় তার পরিবর্তে নানা রকমের লতাপাতা ও জ্যামিতিক নক্সা খোদাই করা হত।

বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলে স্বাধীন সুলতানি যুগে নির্মিত মসজিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শনটি হল সুলতান সেকেন্দার শাহ কর্তৃক নির্মিত হজরত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ। ১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এই মসজিদটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫৫ মিটার এবং প্রস্থে

প্রায় ৯২ মিটার আয়তন বিশিষ্ট। মসজিদটির মধ্যস্থলে বিস্তৃত এক অঙ্গনসহ চারদিক ঘেরা। স্থাপত্যটিতে ব্যবহৃত হয়েছে ২৬০টি থাম ও ছাদ নির্মাণের জন্য খিলানযুক্ত ৩০৬টি গম্বুজ। হজরত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদে পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ ভাস্কর্যও মৃৎশিল্পকলার বিশেষ লক্ষণীয় দিক। এখানে উদ্ভিজ্জ ও জ্যামিতিক ধর্মী বিভিন্ন নকশাযুক্ত টেরাকোটা-অলংকরণ ফলক রয়েছে। তাছাড়া মসজিদের মিহরাবের উপর খিলানের 'টিম্পানাম' অংশে নিবদ্ধ রয়েছে পোড়ামাটির ভাস্কর্য সজ্জা। পোড়ামাটির অলংকরণ সজ্জার এই ঐতিহ্য বাংলায় বহু প্রাচীন। আদিনা মসজিদ অলংকরণের ক্ষেত্রে পাল-সেন আমলের শিল্পকলার ঐতিহ্য থেকে আহরিত নকশা প্রভৃতির সঙ্গে মুসলমানদের পশ্চিম এশিয়া থেকে আনীত অ্যারাবেস্ক ও সারাসেনিক শিল্পকাজের উপাদানগুলির মিলন-মিশ্রনে উদ্ভূত যে নকশার প্রতিফলন ঘটেছে তা আঞ্চলিক ভাস্কর্য শৈলীর এক অনন্য নিদর্শন। পাণ্ডুয়ার একলাখি সমাধি সৌধের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। চতুষ্কোণ একটি বাঁকানো কার্নিশযুক্ত কক্ষের উপর গম্বুজ নির্মাণের মধ্যে এটির গঠন আকৃতি যে বাঁকানো চালের কুটিরের অবয়ব দ্বারা অনুপ্রাণিত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তাছাড়া কার্নিশের নীচ বরাবর অনুভূমিকভাবে উৎকীর্ণ রয়েছে পোড়ামাটির জ্যামিতিক ও ফুললতাপাতার নকশাযুক্ত ভাস্কর্যফলক। চতুষ্কোণ বন্ধনীতে রয়েছে শিকলে ঝুলন্ত ফুলের নকশা এবং এর নীচে দেয়ালের মধ্যস্থল বরাবর কয়েক সারিতে নিবদ্ধ নানা ধরনের জ্যামিতিক ও নকাশি অলংকরণযুক্ত পোড়ামাটির টেরাকোটা ভাস্কর্য ফলক। ঐতিহাসিক আবিদ আলির মতে, এর সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠাকাল ১৪১২-১৫ খ্রিস্টাব্দ।

পূর্ব দিনাজপুরে[২০] চেহেলগাজীর সমাধির পাশে একটি প্রাচীন মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায়। মসজিদের উৎকীর্ণ কাল ৮৬৫ হিজরি বা ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ। শিলালিপি থেকে জানা যায় মসজিদটি গৌড়ের সুলতান বারবক শাহের সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা উলুখ নুসরত খান নির্মাণ করিয়েছিলেন। আয়তনে মসজিদের মূল সৌধটি দৈর্ঘ্যে ১৬ ফুট এবং প্রস্থেও ১৬ ফুট, চতুস্কোনিক এই সৌধের দেয়ালের প্রশস্ততা ৩ ফুটের অধিক। মসজিদের বারান্দাটি ছিল ১৬ ফুট লম্বা ও ৬ ফুট প্রশস্ত। মসজিদের মূল কক্ষের পূর্ব দেয়ালে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ পথগুলি বাঁকানো খিলান করে নির্মিত। মসজিদের মিহরাবগুলিতে লতাপাতা ফুল ও জ্যামিতিক অলংকরণযুক্ত পোড়ামাটির টেরাকোটা ভাস্কর্যফলক রয়েছে।

বাদশাহ শাহজাহানের আমলে (সতেরো শতক) বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার অধীনে কসবা মহশো মৌজার অন্তর্গত কমলাবাড়ি হাট অঙ্গনে গরিবুল্লা হাসান ঠক্কপোষ-এর দশ গম্বুজ মসজিদ রয়েছে। মসজিদের ভেতরে মিহরাবে 'টেরাকোটা' ভাস্কর্য-ফলকে উৎকীর্ণ নকশি কাজ ছাড়াও শিকলে ঝুলন্ত ঘণ্টা প্রতিকৃতিব ফলকও লক্ষ্য করা যায়। মসজিদটির একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হল এটির নিবদ্ধ গোলাকার এক প্রস্তর ফলকে, আরবি-তুগরা হস্তলিখন পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ একটি প্রতিষ্ঠাফলক। মসজিদটি ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। বুকানন লিখেছেন, কুতুব শাহর প্রতিষ্ঠিত এই মসজিদ

অলংকৃত হয়েছে অবিশ্বাসী, নাস্তিকের লুণ্ঠন করা পাথর ও পিলার দিয়ে। কুতুবশাহ কে ছিলেন ইতিহাস তাঁর হদিশ দিতে পারেনি।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অমৃতখণ্ড নামক স্থানে একটি প্রাচীন ধ্বংস-প্রায় মসজিদ রয়েছে। অবহেলিত পরিত্যক্ত এই মসজিদটি স্থানীয়ভাবে জানা যায় বাদশাহ হুমায়ুণের আমলে নির্মিত। আয়ত ক্ষেত্রকার ভূমি-নকশার উপর স্থাপিত বাঁকানো কার্নিশযুক্ত ভগ্নাবস্থায় হলেও এটি ছিল তিন গম্বুজযুক্ত। এর সামনের দেয়ালে নিবদ্ধ হয়েছে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ ফুল লতাপাতার নকশি অলংকরণ ফলক, যা বাংলার 'টেরাকোটা' ভাস্কর্যের এক অনন্য নিদর্শন। মধ্যযুগে নির্মিত আরও একটি প্রাচীন ইটের তৈরি তিন গম্বুজযুক্ত মসজিদ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারি থানার অধীনে বড়হরা গ্রামে রয়েছে। মসজিদটি মোগল আমলে নির্মিত বলে স্থানীয়ভাবে জানা যায়। মসজিদের ভেতরে মিহরাবে 'টেরাকোটা' ভাস্কর্য ফলকে উৎকীর্ণ 'নকশি' কাজ ছাড়াও শিকলে ঝুলন্ত ঘণ্টা প্রতিকৃতির ফলকও লক্ষ্য করা যায়।

গঙ্গারামপুর থানার অধীনে নারায়ণপুর মৌজায় পীরপালগ্রামে রয়েছে গৌড়বঙ্গ বিজেতা বক্তিয়ার খিলজীর সমাধি। আজও কালের সঙ্গে টিকে আছে তুর্কিবীরের সমাধি জরাজীর্ণ অবস্থায় কোনমতে সংগ্রাম করে। দেবকোটের শাসনকর্তা আলীমর্দান কর্তৃক ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে এই সমাধি ভবনটি নির্মিত হয়েছিল স্থানীয় ভাবে জানা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জল বৃষ্টি ঝড়ে এবং রৌদ্রে সমাধি ভবনটি ধ্বংস হয়ে গেছে, শুধু অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে কবরস্থানটি। সমচতুস্কোণ সমাধি বেদীটির দৈর্ঘ্য ১০ ফুট এবং প্রস্থও ১০ ফুট। প্রাচীন ইট ভগ্নদশা সমাধির চারদিকে দাঁত বের করে তাকিয়ে আছে। কিছু অংশ হালে সিমেন্ট দিয়ে সারানো হয়েছে। ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ এই কবর নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। তাঁরা বলেন, এই কবর হল পীর বাহারুদ্দীনের মাজার, কিন্তু প্রবল জনশ্রুতি হল এটি বুড়াপীর মহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর সমাধি।

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার অধীনে আনুমানিক সতেরো শতকে নির্মিত একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির বিন্দোল গ্রামের ভৈরব মন্দির। মন্দিরটির উপরিভাগের স্থাপত্য গম্বুজাকৃতি। মন্দিরের গায়ে নিবদ্ধ জ্যামিতিক, ফুল-লতাপাতা ও শিকলে ঝোলানো ঘণ্টার নকশা আছে কিন্তু মানুষ বা পশুপাখির মূর্তি সেখানে অল্প । এইসব উৎকীর্ণ টেরাকোটা অলংকরণগুলির সঙ্গে পাণ্ডুয়ায় মুসলমান স্থাপত্য সৌধে উৎকীর্ণ অলংকরণ-সজ্জায় হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে। এই ধরনের টেরাকোটা অলংকরণযুক্ত বাংলার সর্বপ্রাচীন মন্দিরগুলির একটি অন্যতম নজীর বিন্দোলের ভৈরব মন্দির। এই মন্দিরের স্থাপত্যশৈলীর বিশেষত্ব হল মন্দিরের চার দেয়ালের উপরের অংশের কার্ণিশ বাঁকানো হলেও চালাটি গম্বুজাকৃতি এবং তার গাত্রালংকারে ব্যবহৃত হয়েছে প্রথাগত টেরাকোটা ফলক। বর্তমানে মন্দিরের বারান্দার যতখানি অবশিষ্ট অংশ আছে সেখানে ৮টি ছোট ছোট গম্বুজ আছে এবং গম্বুজগুলি সমস্তই কোণাকৃতি। মসজিদের গম্বুজ যেমন উপুড় করা বাটির মত হয় সে রকম নয়। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে রয়েছে কিছু কালো পাথরের নকশা। বারান্দায় চারকোণা বড় বড় থাম আছে, সেখানেও টেরাকোটা

অলংকরণযুক্ত পোড়ামাটির কাজ আছে। সম্রাট আকবরের শাসনামলে দিনাজপুর জমিদারির উত্থান ঘটে। সতেরো শতকের শেষেরদিকে রাজা প্রাণনাথ (১৬৮২-১৭২২) দিনাজপুর জমিদারির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রাজা প্রাণনাথই বিন্দোলের ভৈরব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন ।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত তপন থানার ভিখাহার গ্রামে সতেরো শতকের শেষের দিকে রাজা প্রাণনাথের জমিদারির শাসনকালে ভিখাহারের প্রাচীন মন্দিরবাসিনী মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণত পল্লীর গ্রাম-গ্রামান্তরে বসবাসের কুটির হিসাবে সর্বাধিক দেখতে পাওয়া যায় চারচালা ছাদ বিশিষ্ট মাটির বাড়ি। এ রীতির কুটিরের চারদিকের দেওয়ালে নেমে আসে সমত্রিভুজাকৃতি চারটি ঢালু চাল, যার নীচের বহিরেখাটি হয় ধনুকের মত বাঁকানো। এই চারচালা কুটিরের আদলে বাঙালি স্থপতিরা সেই রীতিতে নির্মাণ করেছিলেন মন্দিরটি। এই মন্দিরটির ভিত্তিভূমি বর্গাকার, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ২৩ বর্গ ফুট করে। মন্দিরের প্রবেশ পথও একদুয়ারি। মন্দিরের স্থাপত্য শৈলীর উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল মন্দিরটির উপরিভাগে গম্বুজাকৃতি এবং খিলানযুক্ত। মন্দিরের গায়ে অসংখ্য টেরাকোটা পোড়া মাটির অলংকরণ ফলক ছিল যা বর্তমানে বেশির ভাগই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখনও গাত্রালংকারে ব্যবহৃত টেরাকোটা ফলকগুলির মধ্যে ধনুকধারী পুরুষ, পাগড়ী পরা সৈনিক, নৃত্যরত নারীপুরুষ, হাতির উপর দাঁড়ানো ঘোড়া তারপর কলস ইত্যাদি স্থাপত্যটিকে সুষমামণ্ডিত করেছে। ভিখাহারের বিন্দুবাসিনী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা প্রাণনাথ রায়। এছাড়া, বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পূর্ব দিনাজপুর জেলা সদর হতে ১২ মাইল দূরে রয়েছে বিখ্যাত কান্তজীর মন্দির। স্থাপত্য শিল্পকলা ও টেরাকোটার বিচিত্র অলংকরণসমৃদ্ধ এই মন্দির যেন শিল্পখচিত পৌরাণিক মহাকাব্য। কারুকার্যখচিত কান্তনগরের নবরত্ন মন্দির দেশীয় ও বিদেশীয় অগণিত মানুষের প্রশংসা অর্জন করেছে। মন্দিরের গাত্রালংকারে পোড়ামাটির ফলকে যে সব মূর্তি ও দৃশ্য রয়েছে তা থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙালির জীবন-যাত্রা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথ রায় ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে কান্তমন্দিরের কাজ শুরু করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র রাজা রামনাথ রায় ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি নির্মাণের কাজ শেষ করেছিলেন।

দিনাজপুর রাজপ্রাসাদ

দিনাজপুর রাজবাড়ি অনধিক চারশো বছরের প্রাচীন। মধ্যযুগের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য শিল্পকলার শ্রেষ্ঠতম ও বৃহত্তম নিদর্শন দিনাজপুর রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদটি সম্পর্কে ১৯১২ খ্রিস্টাদে এফ. ডব্লু. স্ট্রং সাহেব লিখেছেন, "The Maharaja Bahadur's residence is collection of brick buildings of various periods partly in European and partly in Hindu style surrounded by a high wall."[২১] চারিদিক থেকে উচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা মূল প্রাসাদসহ বৃহত্তর রাজবাড়ি প্রায় ১০ একর জমির উপর অবস্থিত। রাজপ্রাসাদটি প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত। আয়নামহল ও রানিমহল।

রানিমহলের চারদিকে দুর্গের মত উচু ও প্রশস্ত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। প্রাণনাথ ও রামনাথের আমলের তৈরি রানিমহলটি ভগ্নদশা ও জরাজীর্ণ হওয়ার ফলে রাজা জগদীশনাথ রায়ের আমলে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে পুরানো রানিমহল ভেঙে তার উপর আধুনিক নকশায় দ্বিতল রানিমহল নির্মিত হয়। আয়নামহল মধ্যযুগের স্থাপত্যাদর্শে নির্মিত বহুকক্ষ বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন। রাজা প্রাণনাথ ও রামনাথের আমলের তৈরি আয়নামহলের পূর্ব ও দক্ষিণ বাহুতে ছিল প্রাসাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে সুচারুভাবে সুশোভিত কক্ষগুলি যেমন, সভাকক্ষ, জলসাঘর, মিছিল ঘর এবং দক্ষিণ বাহুতে ছিল বিচিত্র রঙে নকশায়িত মূল্যবান মার্বেল পাথর মণ্ডিত রাজার দরবার গৃহ। আয়নামহলের নীচতলার বিরাট কক্ষটি ছিল রাজকীয় পাঠাগার। এই কক্ষের সংলগ্ন দক্ষিণ কোণ ঘেঁষে দ্বিতলে উঠবার জন্য বৃত্তাকার কৌশলে নির্মিত উন্মুক্ত সিড়ি ছিল। সিড়ির নীচেই ছিল কুমির পোষার একটি বড় ঘর।

রাজপ্রাসাদের সদরমহল এলাকাটি সবচেয়ে সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। আয়নামহলের পূর্বদিক থেকে পদ্মদিঘির পশ্চিমপাড় পর্যন্ত বিস্তৃত এই জায়গাটি রাজবাড়ির পারিবারিক কাজে ব্যবহার হত, এখানে ছিল সুন্দর সাজানো -গোছানো উঠান। আয়নামহলের প্রবেশ পথ এদিকেই ছিল। মাঝখানে ছিল ফুলের বাগান। সেখানে ছিল নানাজাতের, বিভিন্ন রঙের দুষ্প্রাপ্য দেশী ও বিদেশী ফুলের গাছ যা শোভিত ও সুচারুভাবে কেয়ারি করা। তারপরেই দাড়ানো পূর্বমুখী আয়নামহলের সুবিশাল দ্বিতল অট্টালিকা। দোতলায় ওঠার জন্য ছিল রঙবেরঙের ইট দিয়ে তৈরি উন্মুক্তভাবে সংস্থাপিত গোলাকার সিড়ি। রাজপ্রাসাদের সদরমহলের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাড়ানো তাল, তমাল, দেবদারু, পাম, বিলেতি বার্চ ইত্যাদি নানা জাতের দুর্লভ গাছ। যার কিছু নিদর্শন আজও রয়ে গেছে। এরপাশেই ছিল টেনিস কোর্ট। এর কিছু দুরে একটি উচু বেদীর উপর রাখা ছিল বিখ্যাত বাণগড় স্তম্ভ, বিভিন্ন প্রস্তর মূর্তি ইত্যাদি। এছাড়া ছিল ঠাকুরবাড়ি ও হীরাবাগ এলাকা। ঠাকুরবাড়ি ও হীরাবাগ এলাকার উপর অসংখ্য দালান ও কক্ষ গবাক্ষ। রাজবাড়িতে প্রবেশের জন্য ছিল ৬টি দরওয়াজা বা দেউড়ী অর্থাৎ প্রবেশ পথ : ধর্ম দেউড়ী, সিংহ দেউড়ী, বেলতলীর দেউড়ী (নাটমন্দিরে যাওয়ার প্রবেশপথ), ঠাকুর বাড়ির দেউড়ী, হাতিশালার দেউড়ী, হীরাবাগ দেউড়ী। এসব ছাড়াও ছিল রাজপ্রাসাদ থেকে একটি বিশেষ দূরত্বে গভীর পরিখার দ্বারা পরিবেশিত অংশে রাজকর্মচারীদের বাসাবাড়ি, রাজঅতিথি ভবন, ডাকবিভাগ, দাতব্য চিকিৎসালয়, আখড়া, রাজবাড়ির প্রয়োজনে সেবকশ্রেণির কর্মচারী যেমন, কামার, কুমোর, ডোম, মেথর প্রমুখদের বাসাবাড়ি। তাছাড়াও ওই স্থানে ছিল রাজকীয় ফুলবাগান, সব্জিবাগান, পদ্মসাগর, শুকসাগর, মাতাসাগর এইসব নামের বৃহৎ জলাশয়। এসব ওই পরিখাবেষ্টিত বৃহত্তর এল্লাকাটির মধ্যেই ছিল। মূল প্রাসাদ সহ বৃহত্তর রাজবাড়ির এলাকা প্রায় ১০ একর জমির উপর থাকলেও ওই মূল বাড়ি থেকে একটি বিশেষ দূরত্বে গভীর পরিখার দ্বারা পরিবেশিত রাজবাড়ির এলাকার আয়তন ছিল প্রায় তিনশো বিঘা। মধ্যযুগের নির্মিত পুরাতন এই রাজপ্রাসাদের গাঠনিক বৈশিষ্ট্য ও বহু দালানকোঠার সমাকীর্ণতা বঙ্গদেশে

খুব বেশি ছিল না বললেই চলে। ইউরোপীয় ও হিন্দুরীতিতে গড়া এই রাজপ্রাসাদের স্থাপত্যিক নিদর্শন বঙ্গদেশে খুব কম খুঁজে পাওয়া যায়। পরিতাপের বিষয় যে, মধ্যযুগে নির্মিত দিনাজপুর রাজবাড়ি বর্তমানে ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে। ঐতিহাসিক এই রাজপ্রাসাদের সমস্ত দালান-কোঠা এখন খসে খসে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। সংস্কার ও সংরক্ষণ অভাবে মধ্যযুগের নির্মিত দিনাজপুর রাজপ্রাসাদ দ্রুত এগিয়ে চলেছে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে।[২২]

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (মধ্যযুগ), পৃ. ২১৬।

২. W. W. Hunter, *Statistical Account of Bengal, Dinajpur,* Vol.VII, London 1876.

৩. Bengal District Gazetteers, Malda : G. E. Lamborn, p. 71.

৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

৫. ঐ, পৃ. ২৩৭, ৩০৭।

৬. হুমায়ুন আবদুল হাই, *মুসলিম সংস্কারক ও সাধক*, পৃ. ১৯, ২২।

৭. বগুড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পূর্বে প্রাচীন দিনাজপুর অঞ্চলেরই অধীনে ছিল। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর অঞ্চলের অনেকগুলি ভূভাগ নিয়ে নবগঠিত বগুড়া জেলা গঠিত হয়।

৮. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, পৃ. ৭০। কবিবল্লভ, পিতার নাম রাজবল্লভ, মাতার নাম বৈষ্ণবী, নরহরি দাস ছিলেন কবির দীক্ষা গুরু। মুকুট রায় নামক ব্রাহ্মণ বন্ধুর অনুরোধে ১৫২০ শকাব্দে তিনি *রসকদম্ব* কাব্যখানি রচনা করেন। করতোয়া নদীর তীরে মহাস্থান গড়ের কাছে আমবাড়া গ্রামে বাস করতেন।

৯. প্রভাসচন্দ্র সেন, *বগুড়ার ইতিহাস*, ৩০৫ - ৩০৬।

১০. করঞ্জ ঃ দিনাজপুর জেলায় 'করঞ্জ' নামে গ্রামের সংখ্যা খুব বেশি নেই। বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার অধীনে 'করঞ্জি' নামে একটি সাবেক গ্রাম রয়েছে। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বেশ কয়েকটি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও অনেকগুলি জলাশয় প্রমাণ করে যে গ্রামটি একদা কল্লোলমুখর জনপদ ছিল। করঞ্জ-ই কি পরবর্তী কালে করঞ্জি। কারো কারো উচ্চারণে গ্রামটি 'করঞ্জ' নামেও উচ্চারিত হয়।

১১. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান*, পৃ. ৪৬ - ৪৭।

১২. রামকেলি : বর্তমান মালদহ জেলার অধীনে গৌড়ের অন্তর্গত।

১৩. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *গৌড়ের কথা*, পৃ. ৮৩।

১৪. দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।

১৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, পৃ. ৩৬৩, ৩৬৫।

১৬. কোচ আমোরা বা কুড়িয়া মোড়া গ্রাম ঃ বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার অধীনে ইটাহার-রায়গঞ্জ থানা সংলগ্ন বিহার সীমান্ত অঞ্চলে। কারো মতে, বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার অন্তর্গত উদয়-পাঁচগা গ্রাম। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে রায়গঞ্জ থানার অধীনে

কমলাবাড়ি—এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা লোককবি ভদ্রেশ্বর রায়ের (বয়স ৮০) কাছ থেকে একটি জরাজীর্ণ পোকায় কাটা খাতায় 'প্রাচীন রায়গঞ্জ' পরিচিতি নামে একটি দীর্ঘ কবিতা সংগ্রহ করেছিলাম। রায়গঞ্জের পরিচিতি প্রসঙ্গে কবি *মনসামঙ্গল*-এর রচয়িতা জগত জীবন ঘোষালের পরিচয় বর্ণনা করেছিলেন ঃ

বরেন্দ্র দেশে মহারাজা প্রাণনাথ নাম।
কুলিক সমীপে বাম কুচিয়া মোরে ধাম॥
গায়ক কবিরে আনে নৃপঃ আদর করিয়া।
রচিল জগত জীবন মনসা মঙ্গল॥

১৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬।

১৮. ড. পার্শ্বনাথ রায়চৌধুরী, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুনর্মূল্যায়ন*, পৃ. ১৫৭ এবং এ ব্যাপারে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক রয়েছে।

১৯. ঐ, পৃ. ১৪৭।

২০. বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধীনে পূর্ব দিনাজপুর জেলা।

২১. F. W. Strong, *Dinajpur Gazetteer*, p.131.

২২. দিনাজপুর রাজপ্রাসাদ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে *Encyclopaedia of Brtanica*, Vol. I , Cambridge University Press. p. 1196 ; ১৯৯৭ সালে দেখা রচনাকার।

তৃতীয় পর্ব

আধুনিক যুগ

প্রথম অধ্যায়

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ঃ ১৭৬০-১৮০১

১. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও রাজা বৈদ্যনাথ

রাজা রামনাথ রায়ের মৃত্যুর পর দিনাজপুর রাজ-জমিদারির শাসন ভার ন্যস্ত হয় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বৈদ্যনাথের ওপর। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বৈদ্যনাথ জমিদারি লাভ করলেও তাঁর জ্ঞাতি ও আত্মীয়বর্গরা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র শুরু করেন। বৈদ্যনাথের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কান্তনাথের সঙ্গে বৈদ্যনাথের ষড়যন্ত্র চরমে উঠলে মিরকাশেম ও কোম্পানির আমলা ভ্যান্সিটার্টের অমত সত্ত্বেও মিরজাফরের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত বৈদ্যনাথই জমিদারি লাভ করেছিল। এর জন্য অবশ্য অনেক জলঘোলা হয়েছিল। রাজা রামনাথের মৃত্যুর পর (১৭৬০) ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে সমৃদ্ধ দিনাজপুর জমিদারি ১২১টি পরগনা নিয়ে গঠিত ছিল।

রাজা বৈদ্যনাথ এই বিশাল জমিদারি লাভ করার ফলে রাজস্ব আদায় ও বিলিব্যবস্থা এবং বিচার-বিধান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনিও এক সমান্তরাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করলেন। তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল রাজস্ব সংগ্রহ। এই রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান রসদই ছিল ভূমিরাজস্ব ও বিবিধ কর, মাশুল আদায়। অভাবে কৃষকদের ঋণপ্রদান,[১] বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ (পুলবন্দি), হাট, বাজার, মেলা থেকে সংগৃহীত রাজস্ব ইত্যাদি। এ সব কাজ জমিদারের অভ্যন্তরীণ (মফস্বল) দফতর সমূহের এক জটিল ব্যবস্থার মাধ্যমে যা সদর দফতরের জমিদারের কর্মচারীদের দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হত। তাছাড়া রাজধানী মুর্শিদাবাদেও স্বতন্ত্র জমিদারির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিশেষ উকিলের নেতৃত্বে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান ছিল। দিনাজপুরের মত বৃহৎ জমিদারিতে স্ব স্ব এলাকায় নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য পুলিশ বাহিনী গঠিত হয়েছিল। এর মূল কারণ ছিল জমিদারকে রায়তদের কাছ থেকে সরকারের প্রাপ্ত ফসলের অংশ সময়মত আদায় এবং সরকারি কোষাগারে তা নিরাপদে জমা দেওয়া নিশ্চিত করতে হত, জমিদারি এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য নিরাপদ নিশ্চিত করাও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর এসবের জন্যই দিনাজপুর রাজ-জমিদারিতে পুলিশি প্রশাসন গড়ে ওঠে এবং তা নিয়ন্ত্রিত হতো থানা অথবা পুলিশকেন্দ্রের মাধ্যমে। বাংলায় আলিবর্দির আমল থেকে জমিদারদের পুলিশি প্রশাসন গড়ে তোলার প্রথা প্রথম চালু হয়েছিল। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে রাজা বৈদ্যনাথের শাসনকালে দিনাজপুর জমিদারির থানাগুলিতে ৬৭৪৩ জন ডাক কর্মচারি ও পাইক ছিল।[২] অবশ্য ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের পুলিশ নিয়ন্ত্রণবিধি সমূহের মাধ্যমে জমিদারদের চিরকালের মতো পুলিশি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

রাজা বৈদ্যনাথের শাসনকালে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে। এর ফলে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানি প্রাপ্তি দিনাজপুরের শাসন ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন আনে। তখন থেকেই শুরু হয় দিনাজপুর রাজ-জমিদারির হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে একটি কার্যকরী ঔপনিবেশিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা প্রথম পদক্ষেপরূপে দিনাজপুর জমিদারি থেকে বর্ধিত হারে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার জন্য ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে একজন আমিল নিযুক্ত করলেন। এর পরেই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিলেন রাজস্ব আদায়ের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ এবং নজরদারি। এই সময় জেলা রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহের জন্য একজন ইংরেজ সুপারভাইজার নিযুক্ত করলেন। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করলেন ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫)। তিনি বাংলার প্রত্যক্ষ শাসনভার গ্রহণের ফলে কমিটি অফ সার্কিটের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে স্বল্পমেয়াদি বন্দোবস্তের স্থলে 'পাঁচশালা পত্তনি' ব্যবস্থা চালু করলেন। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কমিটি অফ সার্কিটের প্রতিনিধিরা দিনাজপুর পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত নেন যে, বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে পাঁচটি প্রাদেশিক কাউন্সিল কমিটি গঠিত হবে তাদের একটি দিনাজপুরে থাকবে এবং এর অধীনে থাকবে সিলবারি, পূর্ণিয়া, রংপুর, ইদ্রাকপুর, বাহারবন্দ, কোচবিহার ও রাঙামাটি অঞ্চল। দিনাজপুরে কোম্পানি সরকারের প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠন হবার ফলে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে তাজপুরে[৩] স্থাপিত হয় মফস্বল দেওয়ানি আদালত। এই আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল হাভেলি, পিঞ্জরা বা দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, রংপুর, ইদ্রাকপুর, মালদহ এবং গঙ্গা নদীর পূর্ব দিকে অবস্থিত রাজশাহী জেলার একাংশ। অবশ্য এর এক বছর পরে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে অন্যান্য এলাকার মতো দিনাজপুরের প্রাদেশিক কাউন্সিলও বিলুপ্ত হয় এবং এই সময় থেকেই জেলা গঠন পদ্ধতি শুরু হয় এবং জেলাগুলিকে ব্রিটিশ কালেক্টরের অধীনে আনা হয়।

রাজা বৈদ্যনাথের শাসন আমলেই দিনাজপুর জমিদারি ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। এর মূল কারণ ছিল অনেক। পলাশির যুদ্ধের পর দেশের প্রতিরক্ষার ভার ক্রমে ক্রমে কোম্পানির কাছে হস্তান্তরিত হওয়ায় জমিদারের সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়া হয় এবং সেইসূত্রে দিনাজপুর রাজের চাকরাণ জমিগুলি পর্যায়ক্রমে বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেনাবাহিনী কমিয়ে ফেলা বা সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়া হলে প্রজাদের যে অংশ অতীতে দিনাজপুর জমিদারির প্রত্যক্ষ শাসনে ছিল, তাদের ওপর রাজা বৈদ্যনাথের সর্বময় কর্তৃত্ব দুর্বল হয়। উপরন্তু হঠাৎ করে বৃহৎ জমিদারের ঘাড়ে সশস্ত্র পোষ্যদের একাংশের বেকারত্বের সমস্যার বোঝা এসে পড়ে। তাছাড়াও এ সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীর অনেকেই চুরি ডাকাতির পেশা অবলম্বন করায় নিরাপত্তাও বিপন্ন হয়। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দেও রাজা বৈদ্যনাথের মোট জমিদারির এলাকা ছিল ৪১১৯ বর্গ মাইল। এই মোট এলাকার ৪১ হাজার ১৮৮ বিঘা চাকরাণ জমি বরকন্দাজ, পাইক ও পেয়াদাদের দখলে ছিল। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের সুপারভাইজার কটরেল সাহেব একটি প্রস্তাব দিয়ে রাজা বৈদ্যনাথকে বলেন যে দিনাজপুর রাজার সৈন্য সংখ্যা বার্ষিক দশ হাজার টাকা ব্যয়ে অর্ধেকের কম করে আনা এবং সৈন্যদের নগদ বেতনের পরিবর্তে ৬২ হাজার ৬৭৩ বিঘার খাজনা প্রদান

করতে হবে। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে কটরেল সাহেবের পর দিনাজপুরের সুপারভাইজার মিঃ ভ্যান্সিটার্ট একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, তিনি ওই বছর দিনাজপুর জমিদারির বার্ষিক রাজস্ব ২০ লাখ রুপি অনুমান করেন। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, সম্পূর্ণ রাজস্ব থেকে ৪ লাখ ৩০ হাজার সনত রুপি রাজস্ব যে পরিমাণ পরগনা থেকে আদায় হবে সেগুলি ইজারাদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। জমিদারির বাকি যে অংশটুকু যা তার বক্তিগত ব্যবস্থাপনায় থাকত, সেগুলিও ইজারা ও খাস জমিতে ভাগ করা হত। মিঃ ভ্যান্সিটার্টের মতে পুরানো ইজারাদাররা জমিদারের ভূসম্পত্তির প্রায় ৬০ ভাগের দায়িত্বে বহাল থাকত এবং দিনাজপুরের রীতি অনুযায়ী নতুন করে চুক্তি হোক বা না হোক দাবিকৃত খাজনার জন্য তারা দায়ী থাকত। ভ্যান্সিটার্ট জমিদারির এই অংশটুকুর জন্য ইজারাদারদের সঙ্গে নতুন করে বন্দোবস্ত করেন।[৪] এর ফলে খাজনার পরিমাণ নিয়ে সব সময়ই জমিদার ও রায়তের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার সূচনা হতে থাকে। এক ধরনের স্থানীয় প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখতে গিয়ে রায়তদের মধ্যে জমিদারের আমলারা ভয় দেখাতে শুরু করে। পরিণামে, রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে জমিদার ও রায়তদের মধ্যে এক উদ্ভূত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

২. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

পলাশির যুদ্ধের কিছু পরেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলে কথিত যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ১৭৭০ সালে সূচিত হয়েছিল তা শুধু গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই ডেকে আনেনি, বাংলার লাখ লাখ মানুষের সঙ্গে দিনাজপুরের মানুষও চরম দুঃখভোগ ও মৃত্যুবরণ করেছিল। এই দুর্ভিক্ষে দিনাজপুরের বহু গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদকে রক্ষার জন্য মহম্মদ রেজা খাঁ সরাসরি এক আদেশ জারি করে বললেন, 'দিনাজপুরে যেটুকু চাল রয়েছে তা ক্রয় করে মুর্শিদাবাদে পাঠাতে হবে।' এই অদ্ভুত আদেশ দিনাজপুরের তৎকালীন সুপারভাইজার পিয়ার্স সাহেব মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন, 'যেটুকু শস্য পাওয়া যাবে তা কিনে মুর্শিদাবাদে পাঠাতে হবে, সরকারের এই আদেশের অর্থ সমস্ত দেশে অনিবার্য ধ্বংস।' ছিয়াত্তরের মন্বন্তর মালদায় অনেক মানুষের প্রাণ নিয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মালদায় যতগুলি তাঁত বসিয়েছিল তার অর্ধেক গ্রাস করেছিল দুর্ভিক্ষ। মালদায় অর্ধেকের বেশি তাঁতি দুর্ভিক্ষে টিকে থাকতে পারেনি। দুর্ভিক্ষের বছরে দিনাজপুরে দানছত্র খোলা হয়েছিল। দিনাজপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গোপীমণ্ডল দুর্ভিক্ষের ত্রাণ তহবিলে ৫০,০০০ টাকা কোম্পানিকে দিয়েছিলেন। ১৭৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রচণ্ড খরায় দিনাজপুরের সমস্ত জলাশয়গুলি শুকিয়ে গিয়েছিল। আবহাওয়া এমনই শুষ্ক হয়ে উঠেছিল যে, ঘরবাড়ি, ধর্মশালা, মজুত ঘর, গাছপালা সবই যেন আগুনের বারুদ। দিনাজপুরের মজুত শস্য ভাণ্ডারগুলি তখন ছিল রায়গঞ্জ ও পুর্ণিয়া অঞ্চলে। ধানভর্তি গোলাগুলি গেল পুড়ে। ভস্মীভূত হল মানুষের খাদ্য। এই রকম অবস্থায় রাজা বৈদ্যনাথ মন্বন্তরের বছরে প্রচুর রাজস্ব মকুব করায় সরকারের দাবির ১৩ লাখ ৭০ হাজার ৯৩২ টাকার মধ্যে ১৭০৯৩২ টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হলেন।[৫]

৩. সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ

দুর্ভিক্ষের পর দিনাজপুরে চোর ডাকাতের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। চোর ডাকাতের ভয়ে দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নির্জন ও জনশূন্য হয়ে পড়ে। স্থানীয় দুর্বৃত্ত ছাড়াও সন্ন্যাসী, ফকির ও নাগারা এই সময় বিভিন্ন অঞ্চলে উপদ্রব শুরু করে। মন্বন্তরের পর থেকেই রাজা বৈদ্যনাথের সুবিস্তৃত জমিদারির বহুস্তরে বিন্যস্ত শাসনযন্ত্রের কলকব্জাগুলি অকেজো হয়ে যেতে শুরু করেছিল। এর ফলে একদিকে যেমন প্রজাদেব ওপর অত্যাচার বাড়ছিল অন্যদিকে তেমনি শাসাল রায়তরা অবাধ্য হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন রাজনীতির দ্বারা খাজনা আদায় রাজা বৈদ্যনাথের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তদুপরি ছিল হেস্টিংস-এর নতুন ইংরাজ-শাসনতন্ত্র। দিনাজপুর রাজ-জমিদারিতে কতখানি রাজস্ব আদায় হতে পারে জানবার জন্য হেস্টিংস নিলাম করে পাঁচ বছরের ইজারা বিক্রি করতে মনস্থ করলেন। জমিদার ও বাইরের লোক যে সবচেয়ে বেশি হাঁকবে সেই মহলের ইজারা পাবে। রাজা বৈদ্যনাথের সামনে এক সর্বনাশা মরণ ফাঁদ। এই মরণ ফাঁদে পড়ে দিনাজপুরের কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক বিদ্রোহ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। অত্যাধিক হারে জমির ওপর কর ধার্য করার ফলে কৃষকেরা জমি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবিকার একমাত্র উপায় লুণ্ঠন করতে বাধ্য হয়েছিল। হেস্টিংস তখন ভারতীয় আইন লঙ্ঘন করে অমানবিক দমননীতি গ্রহণ করলেন। হেস্টিংসের কঠোর দমননীতি প্রয়োগেও বিক্ষোভ দমন করা গেল না, বরং ধূমায়িত সেই বিক্ষোভই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আগুনে পরিণত হল।[৬]

গ্রামের পর গ্রাম পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে সেগুলি দস্যু ও তস্করদের আবাসস্থলে পরিণত হল। শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে রাজা বৈদ্যনাথের আর আগের গুরুত্ব ছিল না। চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠনের সঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দেখা দিল উপসর্গরূপে। দিনাজপুরে বুরহান ফকিরদের প্রভাব ছিল বেশি। এরা মাদারি নামে পরিচিত ছিল। হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো এরা গায়ে ছাই মাখত, মাথায় ও গলায় পড়ত লোহার শেকল। শিকার বা উপবাস করা প্রায় অপ্রচলিত ছিল তাদের মধ্যে। এদের নেতা ছিলেন কানপুরের মজনুশাহ। পূর্ববঙ্গে যাওয়ার পথে কুমারগঞ্জের কাছে ফকিরগঞ্জে অবস্থান করে তিনি দিনাজপুর সদরে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে দিনাজপুরের বিখ্যাত মেলা সাধু নেকমর্দানের সমাধি দর্শন করেন এবং মেলায় সমবেত ফকিরদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। এই সময় মাদারি ফকিরদের নেতা মজনুশাহ দিনাজপুরে বার বার আক্রমণ চালিয়ে স্থানীয় মানুষদের মনে ও কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গ্রাম্য রচনা 'মজনুর কবিতায়' হিদুস্থানী ফকির দল সম্পর্কে গ্রামবাসীদের মনে যে কীরকম ভয় আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল সেই ভাবই ফুটে উঠেছে ঃ

> সহজে বাঙালিলোক অবশ্য ভাগুয়া।
> আসামী ধরিতে ফকির যায় পাড়া পাড়া।।

তখন ঃ

> ফকির আইল বলি গ্রামে পৈল হুড়
> পাছুয়া বেপারী পালায় গাছে ছাড়্যা গুর॥
> নারীলোক না বান্দে চুল না পরে কাপড়।

সর্বস্ব ঘরে থুয়া পাথারে দেয় নড় ॥
হালুয়া ছাড়িয়া পালায় লাঙ্গল জোয়াল।
পোয়াতি পলায় ছাড়ি কোলের ছাওাল॥
বড় মনুষ্যের নারী পালায় সঙ্গে নিয়া দাসী ।
জটার মধ্যে ধন লয়া পালায় সন্ন্যাসী॥

নারী নির্যাতনের বর্ণনা ঃ

ভাল মানুষের কুলবধু জঙ্গলে পালায়।
লুটুরা ফকির যত পাছে পাছে ধায়॥
যদি আসিলাগপাস জঙ্গলের ভিতর।
বাজে আসি ধরে যেন লোটন কৈতর।।
বসন কাড়িয়া লয় চাহে আলিঙ্গন।
যুবতি কাকুতি করি কি বলে বচন।।
দন্তে কুটা করি বাপু ধরি হাত পাও।
আতিথি ফকির তোমরা দুনিয়ার বাপ-মাও।।

ধর্ষিতা মেয়েরা ফকিরকে শাপ দেয় ঃ

লাজে নাহি কথা রাখে গুপ্তভাবে।
ধর্ম্মসাক্ষী করি তারা মজনুকে শাপে॥
তারা বলে ঈশ্বর এহি করুক।
মজনু গোলামের বেটা শীঘ্র মরুক।।[৭]

গোঁসাইদের সম্বন্ধেও, গাঁয়ের লোকের ত্রাস কিছুমাত্র কম নয় ঃ

মঙ্গলবারের দিন আইল ছয়শত সন্ন্যাসী।
তারা কাশীবাসী, মহাঋষি, উর্দ্ধ বাহুর ঘটা॥
সন্ন্যাসী আইল বল্যা লোকের পড়ে গেল শঙ্কা।
হাজারে হাজারে, বেটারা লুঠ করিতে আইসে।।
বেটাদের অস্ত্র আছে, রাখে কাছে বন্দুক সঙ্গি তীর।
তামার চিমীটা, খাপে ঢাল, ঢাকা শির।।[৮]

এই সময় নবাবি সেরেস্তায় খাজনা আদায়ের একটি নির্মম চিত্র দিনাজপুর ঘোড়াঘাটের লোককবি আবদুল সুকুর মহম্মদ লিখে রেখে গেছেন ঃ

কারে কারে ইটের উপর করে রেখেছে খাড়া ।
চাবুকের চোটে কার পোস্ত দিচ্ছে নাড়াচাড়া।।
কারে কারে ফেলে রেখেছে সিংহ মাছের গাড়ি।
পিষ্টে তুলে মারে জোড়া বেত্তের বাড়ি॥
তামাক খেয়ে গুল কারু ছাপ ধচ্চে গায় ।
লঙ্কা মরিচের ঠোঙা কারো নাকে দেয়।।
সাড়াশি লাগাএ কারো টানে নাক কান।
কেউ বলে ... আমার চেরাকি কড়ি আন।।[৯]

রাজা বৈদ্যনাথের জমিদারিতে সন্ন্যাসী ফকিরদের অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার ফলে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ৩ ফেব্রুয়ারি ইংরেজ সেনাপতি স্টুয়ার্ট একটি বড় সেনাদল নিয়ে দিনাজপুরে সন্তোষপুরের দুর্গটি বিদ্রোহীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে এলে দুই দলে এক ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত জয়ের কোনও আশা নেই দেখে বিদ্রোহীরা দুর্গ হতে সুশৃঙ্খল ভাবে পালিয়ে ভুটানের সীমান্ত অঞ্চলে চলে যান। ইংরেজবাহিনী শেষে সন্তোষপুরের দুর্গ দখল করে।[১০] ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর রাজ-জমিদারির ইদ্রাকপুর নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কৃষ্ণপ্রসাদ দিনাজপুর প্রাদেশিক কাউন্সিলকে জানালেন যে, ভবানীপুরে প্রায় একশো সন্ন্যাসী সমবেত হয়েছে দেবী ভবানীর পূজা উপলক্ষে, বস্তুত এইসব সন্ন্যাসীরা ছিল অত্যন্ত সাধারণ নিরস্ত্র তীর্থযাত্রী। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীদের সন্ন্যাসী ভীতি ও সরকারের প্রতি আনুগত্য ও ফকিরদের সম্পর্কে অসত্য, অর্ধসত্য বা অতিরঞ্জিত প্রতিবেদন সরবরাহ করত জমিদারদের কর্মচারীরা। হেস্টিংসের ব্যক্তিগত সংবাদ বাহক তাজপুরের আমিলবাবু রামলোচন বোস হরেরামপুরে[১১] মজনুশাহের লুণ্ঠনের খবর পাঠালেন। সন্ন্যাসী ও ফকিররা উভয়েই কোম্পানির শত্রু হলেও এদের মধ্যে কিন্তু কোনও সদ্ভাব ছিল না। উভয়ের মধ্যে শত্রুতা নতুন করে দেখা দিয়েছিল ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে। ব্যাপারটা সন্ন্যাসী ও ফকিরদের কাছে মোটেই শুভ ছিল না। বিশেষত নাগা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ফকিরদের বিরোধ ছিল প্রবল। অবশ্য মজনুশাহের সঙ্গে ভবানী পাঠকের বন্ধুত্ব ছিল গভীর। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে বৈদ্যনাথের জমিদারিতে মজনুশাহ আবার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছিলেন। ঘোড়াঘাটের জমিদার এবং হেস্টিংসের সংবাদ বাহক রাজা গৌরনাথ খবর পাঠালেন যে, মজনুর ১৫০ জন সশস্ত্র ফকির মসিনদা পরগনার বলওয়া গ্রামে এসে পৌঁছেছে। প্রকৃতপক্ষে এ খবর রটনা মাত্র। কারণ জমিদাররা অনেকেই তখন এই ধরনের গুজব ছড়িয়ে দিয়ে রাজস্ব মকুব করবার জন্য আর্জি পেশ করত। মজনুশাহ দিনাজপুর সহ অন্যান্য অঞ্চলে এই সময় একনাগাড়ে চালিয়ে গিয়েছিলেন তার অভিযান।[১২] এই অবস্থায় একদিকে যখন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা, অপরদিকে কোম্পানির প্রশাসনিক পদক্ষেপসমূহ এবং দিনাজপুর রাজের অভ্যন্তরীণ বিবাদ, এ-সবের বৃত্তে দিনাজপুরের শাসনব্যবস্থা তথা রাজা বৈদ্যনাথের সনাতনী ক্ষমতা কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে যেতে লাগল। পরিবর্তনের এই যুগসন্ধিতে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে এক সুন্দর সকালে রাজা বৈদ্যনাথ সবকিছু তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছে ফেলে রেখে চিরদিনের মতো পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন।

৪. গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস ও নাবালক রাজা রাধানাথের তত্ত্বাবধায়ক

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথ (১৭৬০-১৭৮০) কোনও উত্তরাধিকারী না রেখেই মারা যান। বৈদ্যনাথের বিধবা পত্নী রানি সরস্বতী তিন বছরের শিশু রাধানাথকে দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। রাজা বৈদ্যনাথের মৃত্যুর পর পরই কমিটি অফ রেভিনিউ জমিদারের এই পরিবারকে সমস্ত ভূ-সম্পত্তি দেখাশোনা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এই সময় দত্তক পুত্র রাধানাথ ও বৈমাত্রে ভাই কান্তনাথের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদ যখন চরমে ওঠে তখন রাজস্ব সমিতির দেওয়ান ও নায়েব কাননগো মুর্শিদাবাদের গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পরামর্শ মতো গভর্নর জেনারেল

রাধানাথকে জমিদারি প্রদান করলেন। রাধানাথ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলে গভর্মেন্টকেই তার তত্ত্বাবধানের ভার নিতে হয়েছিল। কমিটি অফ রেভিনিউ নাবালক রাজার তত্ত্বাবধানের জন্য দেবী সিং নামক একজন ইজারাদারকে দিনাজপুর জমিদারির দেওয়ানরূপে নিযুক্ত করলেন। কমিটি অফ রেভিনিউ ১৭৮১ খ্রিস্টাদের মে থেকে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত দেবী সিংহের সঙ্গে অত্যন্ত চড়া হারে দু'বছরের জন্য দিনাজপুর জমিদারির রাজস্ব বন্দোবস্ত চুক্তি করলেন। এই চুক্তির ফলে দিনাজপুরের সাধারণ মানুষ ভাবলেন যে, রাধানাথ যখন বৈদ্যনাথের দত্তক তখন গভর্নর জেনারেল তাকে জমিদারি দিয়ে ভালই করেছেন। এদিকে বৈমাত্রেয় ভাই কান্তনাথের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ যখন তুঙ্গে তারা তখন গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের দরবারে আবেদন করে জানালেন যে দিনাজপুরের জমিদারি তাদের পূর্বপুরুষ হতে চলে আসছে, উভয়েই সমানভাবে উত্তরাধিকারী হতে পারে। ইংরেজ গভর্নর তখন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পরামর্শ নিলেন এবং দেবী সিংহের মাধ্যমে রাধানাথকে সম্পত্তি দেবার পূর্বে হেস্টিংস সাহেবের নাম করে ৪ লক্ষ টাকা দাবি করে বসলেন। দেবী সিং নাবালক রাজার আত্মীয়বর্গকে এ কথাও জানিয়ে দিলেন যে ৪ লক্ষ টাকা দিতে না পারলে রাধানাথের জমিদারি প্রাপ্তি নিয়ে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হবে। প্রস্তাব মতো ৪ লক্ষ টাকা দেবার অঙ্গীকার করে বালক রাধানাথের দিনাজপুর জমিদারি প্রাপ্তির উপায় করে নিলেন। নাবালক রাধানাথের কাছ থেকে ৪ লক্ষ টাকা নিয়ে হেস্টিংস ভীষণভাবে কলঙ্কিত ও অভিযুক্ত হলেন। যে নাবালক প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়ে তাদের কাছে বিচারের আশায় উপস্থিত হয়েছে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে যে গভর্নমেন্টের পালনীয়, তার নিকট এরকম বিচার বিক্রয় যে অতি লজ্জার ও ঘৃণার কথা তাতে সন্দেহ নেই। ৪ লক্ষ টাকার মধ্যে হেস্টিংস নিজে ৩ লক্ষ টাকা পেয়েছিল বলে প্রমাণ। অবশিষ্ট ১ লক্ষ টাকা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ আত্মসাৎ করেন।[১৩] এই ঘটনায় ওয়ারেন হেস্টিংস অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

রাজা বৈদ্যনাথের বিধবা পত্নী রানিমাতা সরস্বতী দেবী তার ভাই জানকীরাম সিংহকে জমিদারি দেখভালের দায়িত্ব দেন। প্রথম দিকে জমিদারি ব্যবস্থাপনা সাধারণ গতিতে চলতে থাকে। দেবী সিংহ দেওয়ানি গ্রহণের ফলে ইংরেজ বিদ্বেষী ও কোম্পানি সরকারের রাজ্য বিস্তারের পরিপন্থী দিনাজপুর রাজবংশের তিনি সমস্ত ক্ষমতা হরণ করে নেন। এমনকি রাজ-সরকারের অধীনে সমস্ত পদস্থ রাজকর্মচারীদের তিনি বিতাড়িত করেন। এরফলে দিনাজপুর জমিদারিতে চরম ভাগ্য বিড়ম্বনা দেখা দেয়। দেবী সিংহের অত্যাচারের প্রধান রঙ্গভূমি হয়ে দাঁড়ায় এই দিনাজপুর প্রদেশ। তখন দিনাজপুর-রংপুরের পলিটিক্যাল অফিসার ছিলেন গুডল্যাড সাহেব। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে নাবালক রাজা রাধানাথের সময় দিনাজপুরের প্রাদেশিক কাউন্সিল বিলুপ্ত হয় এবং এই সময় থেকে দিনাজপুরকে জেলারূপে গণ্য করার পদ্ধতি শুরু হয় এবং জেলাগুলিকে ব্রিটিশ কালেক্টরের অধীনে আনা হয়। যদিও দিনাজপুর কালেক্টরেটের সরকারি বিবরণী ১৭৮৬ সালের আগে পাওয়া যায়নি। সম্ভবত দিনাজপুরের প্রথম কালেক্টর ছিলেন ম্যারিয়ট, যিনি সীমিত দায়িত্ব ভোগ করেন। পরবর্তী আরও দুইজন কালেক্টর স্বল্পকালীন ক্ষমতা ভোগ করেছিলেন। এঁরা হলেন রেডফার্ন ও ভ্যান্সিটার্ট।

৫. দিনাজপুরের দেওয়ানি লাভ ও দেবী সিংহ

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে দেবী সিংহ মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে দিনাজপুরের নাবালক রাজার দেওয়ান নিযুক্ত হলেন। বৈদ্যনাথের বিধবা পত্নী রানি সরস্বতীদেবী যদিও অভিভাবিকারূপে রইলেন, তা সত্ত্বেও দেবী সিংহই কার্যত সমস্ত বিষয়ে ভার গ্রহণ করলেন। অনেকে মনে করেন যে দেবী সিংহ হেস্টিংস সাহেবকে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে দিনাজপুরের দেওয়ানি লাভ করায় সেই টাকা সংগ্রহের জন্য তিনি অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন। দেবী সিংহ ইজারা নিয়ে জমিদার ও প্রজাদের ওপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করলেন। প্রথমে জমিদার ও ভূস্বামীদের ওপর অসম্ভব কর চাপিয়ে দিলেন। কর দিতে অস্বীকার করলে অমনি তাদেরকে কারাগারে পাঠিয়ে অশেষ যন্ত্রণা দিতেন। জমিদারদের দড়ি দিয়ে বেঁধে অত্যাচারের মধ্য দিয়ে শেষমেষ দেবী সিংহ তাদের সম্মতি আদায় করে নিতেন। কেউ একবার কর দিতে রাজি না হলে তার আর নিস্তার ছিল না। দিন দিন নতুন করের বোঝায় পিষ্ট হয়ে যেত। শেষে জমিদাররা যখন কর দিতে অসমর্থ হয়ে পড়তেন তখন রাজস্ব অনাদায়ের জন্য তাদের সমস্ত জমিদারি অল্পমূল্যে বিক্রি হয়ে যেত। দেবী সিংহ নিজেই সেই জমিদারির ক্রেতা ছিলেন। দিনাজপুর প্রদেশে সেই সময় অনেক স্ত্রী-জমিদারও ছিলেন; তাঁদের মধ্যে অনেকেই সম্ভ্রান্ত মহিলা। দেবী সিংহের হাতে তাঁরাও অত্যাচারিত হতে লাগলেন। দেবী সিংহ সেই সমস্ত স্ত্রী-জমিদারদের ভবনের চারিধারে প্রহরী নিয়োগ করে নাজির ও সেনা দিয়ে তাদের ধন, রত্ন, অলংকারাদি ক্রোক করে নিতেন। এইসব কাজে স্ত্রী লোকই নিযুক্ত হত। এইভাবে অর্থশালী জমিদার ও ভূস্বামীদের লাঞ্ছনার একশেষ করে নিরীহ প্রজা ও কৃষকদের ওপর এবার তার নির্মম অত্যাচার শুরু হল।

কৃষকদের উৎপাদিত শস্যে রাজস্ব দেওয়ার চিরাচরিত নিয়ম বাতিল করে দেবী সিংহ রাজস্ব প্রদানের নতুন নিয়ম চালু করলেন। এই নিয়মে কৃষকদের নগদ অর্থে রাজস্ব দিতে বাধ্য করলেন, উৎপাদিত শস্যে নয়। কৃষকদের সামনে এগিয়ে এল আরও এক অর্থনৈতিক সংকট। তাদের হাতে নগদ অর্থ না থাকায় তারা বাধ্য হত শস্য বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করতে; আর এই সুযোগ গ্রহণ করল ইংরেজ বণিকরা। তারা বিভিন্ন জায়গায় শস্য খরিদপত্রের কেন্দ্র খুলে কৃষকদের বাধ্য করত নীচু দরে শস্য বিক্রি করতে। সেই শস্য গুদামজাত করে ইংরেজ বণিকরা বর্ষাকালে প্রচুর মুনাফায় বিক্রি করত। কৃষকেরা তাদের পরিশ্রমের ফসলের যথার্থ মূল্য না পাওয়ার দরুন তাদের ক্রমাগত সর্বনাশের পথে নিয়ে গেল। রায়তরা রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে দেবী সিংহের লোকজনেরা এসে তা আদায়ে নির্মম অত্যাচার শুরু করল। কৃষকের রাজস্ব বাকি পড়লে তার জমি তুলে দেওয়া হত নিলামে। পুরানো রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থায় রায়তের রাজস্ব বাকি পড়লে তার ওপর অত্যাচার করা হত ঠিকই, কিন্তু কখনই তাকে জমিচ্যুত করা যেত না। এইভাবে জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে জমি ক্রয় বা বন্ধক দেওয়ার অধিকার সৃষ্টি হল। আর সেই সুযোগ নিল জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী ও মহাজনরা। বর্ধিত রাজস্ব বাকী পড়ায় বহু রায়ত জমি বিক্রি করতে বাধ্য হল। এই ভাবে ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকল ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা। একদিকে দেবী সিংহের অত্যাচার অন্যদিকে মধ্যস্বত্বভোগী ও মহাজনদের

অত্যাচারে নিরীহ কৃষকেরা তাদের অত্যাচারীকে শুধু শত্রু মনে করেই চুপ করে বসে রইল না, বাধ্য হল বিদ্রোহ করতে।

প্রথম বছরে (১৭৮১ খ্রিঃ) দেবী সিংহ দিনাজপুরের নাবালক রাজার দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে পরের বছরে রংপুর ও ইদ্রাকপুর প্রদেশ দুটির ইজারা বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। রংপুর অঞ্চলে সেই সময় রাক্ষস প্রকৃতির বেশ কিছু সুদের কারবারী ছিল। দেবী সিংহ সেইসব সুদখোরদের কাজে লাগিয়ে দিনাজপুর ও রংপুরের বিপন্ন কৃষকদের কাছ থেকে শতকরা বার্ষিক ছশো টাকা সুদ আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিল। সুদের টাকা না দিলে দেবী সিংহের লোকেরা কৃষকের ঘরবাড়ি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিত।'এই নির্মম ও পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে নারীরাও রক্ষা পেত না। স্বামীর কোল থেকে স্ত্রীকে ছিনিয়ে তার সতীত্ব নষ্ট করা হত এবং সাধারণের সামনে তাদের উলঙ্গ করে বেত্রাঘাত করত। অনাহারে রংপুর বসতি কৃষকদের মধ্যে ঘোর কষ্ট দেখা দিল। বাবা ছেলেকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। স্বামী স্ত্রীকে চির-বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল। দেবী সিংহের এই রকম নির্মম পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দিনাজপুর রংপুরের প্রজারা বিদ্রোহ করতে শুরু করে দিল। নির্মম অত্যাচারে জর্জরিত কৃষকরা কিছুতেই কর দিতে স্বীকৃত হল না, তারা কর বন্ধ আন্দোলনের ডাক দিলেন।

ইজারাদার দেবী সিংহের অবর্ণনীয় শোষণ উৎপীড়নের প্রতিশোধ নিতে দিনাজপুর-রংপুরের কৃষকরা প্রথমে সভাসমিতি করতে লাগল। রংপুরের কালেক্টরের কাছে তাদের দাবি সংক্রান্ত একখানি আবেদনপত্র পেশ করে এই দাবি পূরণের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। কিন্তু রংপুরের কালেক্টর গুডল্যাড দাবি পূরণের জন্য কোনও চেষ্টাই করলেন না। কৃষকরা সশস্ত্র বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তারা কালেক্টর সাহেবকে জানিয়ে দিলেন আর খাজনা দেবে না এবং এই শাসন মেনে নিতেও প্রস্তুত নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকেরা সমবেতভাবে দিনাজপুরের ভূমিহীন কৃষক নূরুলউদ্দীন নামে এক ব্যক্তিকে তাদের পরিচালক নির্বাচিত করে তাকে 'নবাব' ঘোষণা করলেন। নূরুলউদ্দীন উত্তরবঙ্গের কৃষকদের এই বিদ্রোহের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে দয়াশীল নামে একজন বৃদ্ধ ক্ষেতমজুরকে তার দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। নূরুলউদ্দীন এক ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে দেবী সিংহকে কর না দেবার জন্য আদেশ জারি করলেন। এবং বিদ্রোহের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য কৃষকদের ওপর 'ডিংখরচা' নামে বিদ্রোহের চাঁদা ধার্য করলেন। এইভাবে উত্তরবঙ্গের সমস্ত হিন্দু-মুসলমান কৃষক একত্রিত হয়ে সম্মিলিত ভাবে দেবী সিংহের বর্বর-সুলভ শোষণ উৎপীড়ন ও ইংরেজ অপশাসনের মূলোচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হল।[১৪] ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে সমস্ত রংপুর পরগনায় বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে দিনাজপুরের বিভিন্ন পরগনায়। বিদ্রোহী কৃষকেরা সমস্ত অঞ্চল থেকে দেবী সিংহের কর সংগ্রহকারীদের বিতাড়িত করে। বহু কর্মচারীকে তারা মেরে ফেললেন। রংপুরের টেপা ও ফতেপুর চাকলায় বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করে। এই সময় বিদ্রোহীদের আহ্বানে কোচবিহার ও দিনাজপুরের বহু স্থানের কৃষকেরা 'নবাব' নূরুলউদ্দীনের বাহিনীতে যোগ দিয়ে নিজ নিজ অঞ্চলের নায়েব ও গোমস্তাদের বিতাড়ন করেন। এই রকম ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দেবী সিংহ কিন্তু চুপ করে বসে রইলেন না। তিনি ভয় পেয়ে রংপুরের কালেক্টর

গুডল্যাডের শরণাপন্ন হলেন। দেবী সিংহের লুঠের টাকা গুডল্যাডও পেতেন, তাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মেছিল। কালেক্টর গুডল্যাড দেবী সিংহকে কৃষকদের বিক্ষোভের মুখ থেকে বাঁচাতে অবিলম্বে কয়েকজন পুলিশ পাঠালেন। লেফটানান্ট ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে ইংরেজ সেনারা প্রথমে মোগলহাট বন্দর আক্রমণ করলেন। মোগলহাট ছিল দেবী সিংহ ও ইংরেজ শাসনের বড় ঘাঁটি। ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণের খবর পেয়ে এদিকে কৃষকেরা প্রথমে ডিমলার জমিদার গৌরমোহন চৌধুরীর নিকট আশ্রয় নেয়। জমিদার তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করায় একটা তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হয়, তাতে গৌরমোহনের মৃত্যু ঘটে। কোম্পানির সেনারা কৃষক প্রজাদের সামনে দেখলেই বন্য পশুর মতো গুলি করতে করতে এগিয়ে যায়। মোগলহাটে প্রজাদের সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীর লড়াই হয়। এই বিদ্রোহে দেওয়ান দয়াশীল বর্মনের মৃত্যু ঘটে, নবাব নূরুলউদ্দীন গুরুতর আঘাত পেয়ে অল্পদিন পরে মারা যান। দলে দলে প্রজাদের বন্দি করে কোম্পানি সেনারা রংপুরে বিজয় উৎসবে মেতে উঠলেন। প্রজাদের যা কিছু ছিল সবই এবার লুণ্ঠিত হল এবং ঘরবাড়ি আগুনে পুড়ে গিয়ে ভস্মস্তূপের কলেবর বাড়িয়ে তুলতে লাগল। এর ফলে সমস্ত উত্তরবঙ্গ জনমানবশূন্য শ্মশানের চেয়েও ভয়াবহ হয়ে উঠল।[১৫]

কোম্পানির কর্তৃপক্ষ যেখন দেখল যে দেবী সিংহের রাজস্ব অনেক দিন হতে পাওয়া যাচ্ছে না এবং তার অনাচার-অত্যাচারের কথা শুনতে পেল, তখন তারা দেবী সিংহের হাত থেকে রাজস্ব আদায়ের ভার তুলে নেন এবং জমিদার ও প্রজাদের দেবী সিংহের কাছে খাজনা দিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। দেবী সিংহকে কলকাতায় ডেকে কৈফিয়ৎ দিতে বললেন গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস। দেবী সিংহ প্রজাদের রক্ত শোষণ করে ৭০ লাখেরও বেশি টাকা নিয়ে কলকাতায় উপস্থিত হলেন। হেস্টিংস দেবী সিংহের বিচারের জন্য যে কমিটি গঠন করেছিলেন, সঞ্চিত বিপুল অর্থ দিয়ে সেই কমিটির বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে দেবী সিংহ বশীভূত করে রাখলেন। তার বিচারের ভার পড়ল মহম্মদ রেজা খাঁর ওপর। বিচারে দেবী সিংহ অপরাধমুক্ত হয়ে নিষ্কৃতি পেলেন। হেস্টিংসের পক্ষে দেবী সিংহকে আর কোনও সরকারি কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এর কিছুদিন পরে হেস্টিংস ইংলন্ডে চলে যান এবং লর্ড কর্নওয়ালিশ গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। দেবী সিংহ এতকাল লুণ্ঠনের দ্বারা যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন তার দ্বারাই সে ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে রাজা উপাধি নিয়ে ও লুণ্ঠিত অর্থ দ্বারা বিপুল ভূসম্পত্তি সওদাপত্র করে মুর্শিদাবাদের নশীপুর রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।[১৬]

রংপুর জেলার ইটাকুমারি গ্রামের লোককবি রতিরাম দাস। তাঁর রচিত *জাগের গান*-এ দেবী সিংহের চরিত্র ও তার নির্মম অত্যাচারের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। এই গাথাকাব্যটির অংশবিশেষ ঃ

কোম্পানির আমলেতে রাজা দেবী সিং।
সে সময়েতে মুলুকেতে হৈল বার ডিং।।
যেমন যে দেবতার মরতি গঠন ।
তেমনই হৈল তাঁর ভূষণ বাহন।।
রাজার পাপেতে হৈল মুলুকেতে আকাল।
শিওরে রাখিয়া টাকা গৃহী মারা গেল।।

অত্যাচারের চিত্র ঃ

কত যে অজানা পাইবে তার লেখা নাই।
যত পারে তত নেয় আরও বলে চাই।।
দেও দেও চাই চাই এইমাত্র বোল।
মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল।।
মানীর সম্মান নাই মানী জমিদার।
ছোট বড় নাই সবে করে হাহাকার।।
সোয়ারিত চড়িয়া যায় পাইকে মারে জুতা।
দেবী সিংহের কাছে আজ সবে হলো ভোঁতা।।[১১]

দেবী সিংহের অপশাসনের পরে (১১৯০ বঙ্গাব্দ) দিনাজপুর প্রদেশের ঘোড়াঘাট বর্দ্ধন কুঠির নয় আনা অংশে একটি প্রজা বিদ্রোহ হয়। বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল বংশানুক্রমিক জমিদারকে সরিয়ে ইংরেজ আমলা গুডল্যাড সাহেব দেওয়ানকে জমিদারি ইজারা দেন। প্রজার মনোমত জমিদারকে বদলে আমলা দেওয়ান হয় কর্তা। প্রজারা চাঁদের জায়গায় জোনাকিকে মানতে নারাজ। ফলে সশস্ত্র প্রজা বিদ্রোহ হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিনাজপুর ঘোড়াঘাটের লোককবি কৃষ্ণহরি দাস প্রজা ধর্মের জিগির তুলে রাজার কাছে প্রজার দায়বদ্ধতার কথা তুলে একটি কাব্য রচনা করেন। ঘটনাভিত্তিক এই কাব্যটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মধ্য দিয়ে রচিত হয়। এর লেখন্দার ছিলেন তাহের মামুদ। লোককবি কৃষ্ণহরি কাব্যের একটি অংশে রাজার কাছে প্রজার দায়বদ্ধতার কথা তোলে ঃ

যে হইবে আমার প্রজা, আইবে তামান,
রংপুর সাহেবের কাছে কর আবেদন।
পিতামহ মহাশয় যত বংশাবলী,
তোমা সবে লয়ে করেছে ঠাকুরালী।
আমি রাজা হইয়া করিলাম কোন কাজ,
কেননা আমার শিরে পড়িলেক বাজ।
প্রজা হইয়া যদি মোরে না কর তালাস,
তবে শ্রীবৎস রাজার মত হব বনবাস।

প্রজারা একজোট হয়ে কোম্পানির কালেক্টরের কাছে যায় ঃ

শুন সাহেব বন্দে নেওয়াজ নছাপের ধ্বনি,
আইলাম সকল প্রজা ইনছাপ কর শুনি।
কেতাব দেখি কর ইনছাপ তবে কেন এমন ;

* * *

সাহেব তোমার লম্বা দস্ত আমরা নাচার প্রজা,
তোর কেতাবে কি শিখিল দেওয়ান হউক রাজা।
জোনাই পোকা উদয় হল, চন্দ্র হল পাত,
হাতে ছান্দি দিয়া উরসে পল রাজা গৌরনাথ।

কোম্পানির 'ইনসাফ' আইনমাফিক, কেতাবী সাহেবের দাপটও বেশি। প্রজা বিক্ষোভের মাঝে প্রজারা সাহেবকে ঘিরে যে দাবি জানায় তাতে থাকে ধর্মের দোহাই ঃ

রায়ত বলে সাহেব তুমি ধর্ম দিকে চাও,
দেওয়ানকে খারিজ করি রাজাকে রাজ্য দেও।
দেওয়ান খারিজ কর্ত্তে কেন পাও ব্যাথা,
দেওয়ান কি দেবে তার বাপের ঘরের টাকা?
দিলে মোরাই দেব।

প্রজার ক্ষমতার জয়গান ঃ

দেওয়ান বলে রায়ত সব কর্ত্তে পারে,
কাকেও সগ্গে তোলে কাকো আছড়ে মারে।
রায়ত লইয়া সবার ঠাকুরালী
যত দেখ সোনার বালা রায়তের কড়ি।[১৮]

৬. আর্থিক প্রশাসনিক চাপ ও বাংলার একটি বড় জমিদারের বিলুপ্তি

দেবী সিংহের ইজারাদারিতে দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলে কৃষক ও অন্যান্যদের ওপর নানারকমের অত্যাচার ও জোরজবরদস্তির ফলে যে বিশৃঙ্খলা এবং হিংসাত্মক কৃষব বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল কোম্পানি সরকারের হস্তক্ষেপে তা পরিবর্তিত হয়। কোম্পানি প্রবর্তিত ইজারাদার তথা নিলাম ডাকের মাধ্যমে জমি বন্দোবস্ত প্রথার অবসান ঘটে এবং জমিদারদের সঙ্গে ঔপনিবেশিক সরকারের বন্দোবস্ত করার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার ভার দিনাজপুর জমিদারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলারূপে ঘোষিত হয়।ওই বছর বোর্ড অফ রেভিনিউ-এর প্রতিষ্ঠা এবং কালেক্টর হিসাবে জি. হ্যাচ (G. Hatch) দিনাজপুর জেলার দায়িত্ব লাভ করেন। কালেক্টর হিসাবে নিয়োগপত্র পেয়ে প্রথমেই তিনি রানি সরস্বতীদেবীর ভাই জানকীরাম সিংহকে দেওয়ান পদ থেকে সরানোর উদ্যোগ নেন। এর মূল কারণ ছিল জানকীরাম সিংহ কৃষকদের ওপর গুরু করভার চাপালেও কোম্পানির নির্দিষ্ট প্রাপ্য মেটাতে অক্ষম হন। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে রাজা রাধানাথ ষোল বছরে পদার্পণ করলে তিনি তাঁর জমিদারি ব্যবস্থাপনা ফিরে পান। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে রাধানাথ জমিদারি ব্যবস্থাপনা ফিরে পেলেও জমিদারিতে কোনও পরিবর্তন আনতে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এমনকি গভর্নর জেনারেল রাধানাথের নিজের জমিদারিতে কর্মচারী নিয়োগেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ওই বছরেই রাধানাথ মোট উৎপন্নদ্রব্যের শতকরা ৭৫.৫ হারে বর্ধিত রাজস্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি রাখতে সক্ষম হননি বলে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল তার মোহর বাজেয়াপ্ত করে কোষাগার তালাবন্ধ করে রাখেন। তা সত্ত্বেও রাজস্ব বিভাগের কোনও উন্নতি না হওয়ার দরুন রাধানাথকে কোম্পানি সরকার চড়া হারে রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে রাজি হতে বাধ্য করেন। কালেক্টর জজ হ্যাচ এই সময় দিনাজপুর জমিদারি দেখভালের জন্য জানকীরাম সিংহের স্থানে রামকান্ত রায়কে (১৭৯৭) দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত করেন। রামকান্ত ছিলেন হ্যাচের খুবই ঘনিষ্ঠজন এবং নবনিযুক্ত দেওয়ানরূপে তিনি জমিদারি সম্পর্কিত সমস্ত কাজ কালেক্টরের সরকারি দপ্তরেই করতে থাকেন। কালেক্টর হ্যাচ তার

নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ভূসম্পত্তি ব্যবস্থাপনার আমূল সংস্কার করতে রামকান্তকে নির্দেশ দেন। রাজা রাধানাথ দিনাজপুর জমিদারির রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে রাজি হওয়ায় সরকারের রাজস্ব পাওনা মেটাতে কলকাতার মহাজন, জেলার সরকারি কর্মচারী এবং রামকান্তের কাছ থেকেও বিপুল অঙ্কের টাকা ধার করলেন। কিন্তু ঋণের ক্রমবর্ধমান পরিমান এবং ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে রবিশস্যের অনুৎপাদন জমিদারের নতুন ঋণপ্রাপ্তিকে চরম বাধাগ্রস্ত করে বকেয়া খাজনার পরিমাণকে বৃদ্ধি করে তুলেছিল। ফলে রাধানাথ ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাজস্ব বোর্ডের আদেশানুক্রমে জমিদারির একাংশ বিক্রি করে দেন। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে দিনাজপুর রাজ্-জমিদারির বড় বড় অংশ প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি শুরু হয়। আঠারো শতকের শেষের দিকে দিনাজপুর রাজের প্রায় সমগ্র জমিদারি হস্তান্তরিত হয়ে যায়।[১৯] ফলে রাধানাথ অসহায় হয়ে পড়ে। এই সময় জেলাটিতে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের ঘন ঘন অভিযানে রাধানাথের পক্ষে রাজস্ব সংগ্রহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের কালেক্টর বার্ড সাহেবকে তিনি জানালেন যে সন্ন্যাসীদের তৎপরতা বন্ধ করতে না পারলে রাজস্ব সংগ্রহ একেবারেই অসম্ভব, জমিদারের কয়েকজন বরকন্দাজ দিয়ে সন্ন্যাসী-ফকিরদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায় না। সরকার বাধ্য হয়ে শোভান আলির গ্রেপ্তারের জন্যে ৪ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক ১৮০০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের পরে সন্ন্যাসী ফকিরদের তৎপরতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[২০] এদিকে পাওনাদাররা যখন শুনতে পেল দিনাজপুর রাজের জমিদারি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে তখন তারা টাকার জন্য রাধানাথকে তাগাদা দিতে শুরু করল। পাওনাদাররা তাকে বন্দি করে জেলে দেবার হুমকি দিতে লাগল। অসহায় রাধানাথ কার্যত তখন নিরুপায়, নিজবাসগৃহে বন্দির মতই ছিলেন। বৃহৎ জমিদার বংশগুলিকে স্থানীয় ক্ষমতা ও প্রভাবের উৎসরূপে মোগলরা যেভাবে আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিতে শক্তিশালী করে তুলেছিল, কোম্পানি সরকার সেই জমিদারকুলকে শুধুমাত্র রাজস্ব ইজারাদার হিসাবে গণ্য করে ক্ষমতা ও প্রভাবের আধারকে ধ্বংস করার দিকে মন দিয়েছিল। দিনাজপুরে উপযুক্ত কালেক্টরেট ব্যবস্থা গঠনের ফলে রাজস্ব শাসনব্যবস্থায় কোম্পানি সরকার শুধুমাত্র তুলনাহীন নিয়ন্ত্রণই করলেন না, দিনাজপুর রাজের সেনাবাহিনীর বিরাট অংশের বিলুপ্তি সাধন করে কালেক্টরের অধীনে নিয়মিত পুলিশ বাহিনীর প্রবর্তনও করলেন। জমিদারের বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতাও দখল করে নিলেন। এভাবেই আঠারো শতকের প্রাক্-চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে দিনাজপুর রাজ-জমিদারির প্রথাগত শাসনব্যবস্থায় ভাঙন ধরে এবং নতুন শাসকরা তার পরিবর্তন ঘটায়। বস্তুত ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ, এই দুই বছরের মধ্যেই বাংলার একটি বড় জমিদার বিলুপ্ত হয়ে যায়।

গৃহবন্দী অসহায় রাধানাথের আমলেই ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দিনাজপুর রাজ পরিবারের চরম ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়। এর ফলে সব রকমের প্রশাসনিক পরিবর্তনের শিকার হয় উত্তরবঙ্গের এই সমৃদ্ধ জনপদ ও তার কেন্দ্র দিনাজপুর শহরটি। রাজ পরিবারের সৌভাগ্য সূর্য অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনাজপুরের বুকেও নেমে আসে পতনের বিষাদ ছায়া। দিনাজপুর অঞ্চলের সার্বিক

গুরুত্ব যার ওপর নির্ভরশীল ছিল, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, সংস্কৃতি, সবকিছুই মূলত এই রাজ-পরিবারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। স্বভাবতই রাধানাথের দুর্দশা যখন থেকে শুরু হল তখন থেকেই দিনাজপুরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং জনসংখ্যাও কমে যেতে লাগল। রাজা রাধানাথের নাবালকত্বের সুযোগ নিয়ে কোম্পানির জমিদারির কর্মকর্তাদের মধ্যে এমন দলাদলি ও স্বার্থান্বেষী কর্মকাণ্ড শুরু হল তাতে শাসনভার ফিরে পাবার কয়েক বছরের মধ্যেই রাধানাথ তাঁর জমিদারি হারিয়ে একেবারে পথের ভিখারিতে পরিণত হলেন। মাত্র ২৪ বছর বয়সে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ভগ্নহৃদয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।[২১] রেখে গেলেন তাঁর বিধবা পত্নী রানি প্রাণসুন্দরী দেবীকে, আর তাঁর দত্তক পুত্র গোবিন্দনাথকে (১৮১৭-১৮৪১)।[২২]

৭. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নতুন রাজন্যবর্গ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিনাজপুর রাজ দরবারে হস্তক্ষেপের আগে, অর্থাৎ মোগল শাসনের অবক্ষয় ও পরবর্তীতে ব্রিটিশ ক্ষমতার উত্থানকালে, এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে এ যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর জেলাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত ঘাঁটি হিসাবে। যা মোগলদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকারূপে চিহ্নিত হয়েছিল। অবস্থানগত কারণে এই স্থানটি একদিকে নববিজিত সুবা বাংলা, বিহার ও ওড়িশা, অপর দিকে কুচবিহার কোচহাজো ও অসমের মাঝখানে প্রবর অঞ্চল রূপে কাজ করত। মোগল আমলে রাজস্ব বিভাগীয় সদর দফতর হিসাবে যেমন ঘোড়াঘাট গুরুত্ব পেয়েছিল তেমনি দিনাজপুর রাজের রাজধানী হিসাবে দিনাজপুর একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করেছিল। বিপুল সংখ্যক জনসমষ্টির সমন্বয়ে দিনাজপুর আঠারো শতকের গোড়ার দিকে দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধিলাভ করেছিল। এই সময় প্রধান ও ক্ষুদ্র জমিদার ছাড়াও, জোতদার, তালুকদার, তাদের দেওয়ান, নায়েব, গোমস্তা, অনুচরবৃন্দ এবং অসংখ্য সিপাই ও সামরিক কর্মচারী নিজ এলাকার উন্নতি ও জনগণের সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সুবাদার ও ফৌজদারদের শাসনকালে দিনাজপুরের জমিদাররা উন্নতিলাভ করেছিলেন মূলত শাসনব্যবস্থার ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগে ফাঁক পূরণের জন্য। নবাবি আমলে বিশেষ করে মর্শিদকুলি খাঁর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক মিত্রতা নীতির ফলে কিছু কিছু স্থানীয় বাছাই করা জমিদার ছিলেন, যাঁদের ওপর পরবর্তী নবাবরা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন, ফলে সেইসব জমিদাররা অধিক লাভবান হয়েছিল। তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তির স্বীকৃতিস্বরূপ সম্রাটরা ও পরবর্তী নবাবরা তাদেরকে 'রাজা' বা 'মহারাজাধিরাজ' এমনকি পদ অনুযায়ী খেলাত বা সম্মানসূচক পোশাক প্রদান করেছিল। তা সত্ত্বেও প্রধান জমিদারদের মধ্যে সর্বদা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত লেগে থাকত সরকারের সঙ্গে। এ সব থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে দূরবর্তী সুবার ওপর শাহী নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়েছিল এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে নবাবের কর্তৃত্বের অবক্ষয় হয়েছিল এবং তারই সুযোগে জমিদারদের একচেটিয়া ক্ষমতালাভে সাহায্য করেছিল।

আঠারো শতকের শেষের দিকে দিনাজপুর রাজ-জমিদারি বিলুপ্তি হওয়ার পেছনে অন্যান্য কারণের মধ্যে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শুরু থেকেই দিনাজপুর একটি সমস্যাসঙ্কুল

এলাকা ছিল। প্রথমত, অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলরূপে দিনাজপুরের দুর্নাম ছিল, দ্বিতীয়ত, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, চন্দননগর, পাটনা এবং ঢাকার মত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল থেকে দিনাজপুরের অবস্থান ছিল অনেক দূরে, তৃতীয়ত, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের ঘন ঘন অভিযান, চতুর্থত, দিনাজপুর-রাজের অভ্যন্তরীণ বিবাদ, পঞ্চমত, মিশনারিদের কাজে অসাফল্য। এ সব নতুন শাসকদের জন্য সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছিল। এই সব কারণেই ব্রিটিশ সুপারভাইজার ও কালেক্টররা এমনকি রাজস্ব বোর্ড পর্যন্ত একসময়ে শক্তিশালী দিনাজপুর রাজ-জমিদারিটির উত্তরাধিকার ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার জটিল সমস্যাগুলিতে জড়িয়ে পড়েছেন। যার ফলে নতুন শাসকরা তাদের যে মূল লক্ষ্য ছিল রাজস্ব আদায়, সেই রাজস্ব আদায়ের ভার তুলে দিয়েছিল দেশি আমিল, দেওয়ান ও নায়েবদের ওপর। ফলে নতুন শাসকরা শুধু কৃষকদের দুঃখ দুর্দশাই বৃদ্ধি করেননি, জমিদারদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে শেষ পর্যন্ত জমিদারি বকেয়ার দায়ে সূর্যাস্ত আইনে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এভাবে কোম্পানির পূর্ণ দেওয়ানি লাভ ও পরবর্তীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দিনাজপুরেও স্থানীয় পর্যায়ে সরকার, জমিদার ও রায়তের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের সনাতনী প্রথার পরিবর্তন ঘটেছিল।

হেস্টিংসের রাজত্বে রেজা খাঁ; গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেবী সিংহ, হরে রাম কুখ্যাত ইজারাদারদের অমানুষিক উৎপীড়ন ও শোষণের ফলে গোটা বাংলায় যখন কৃষকের বিদ্রোহে আগুন জ্বলে উঠেছিল, সেই আগুনে ইংরেজরা দেখল বাংলায় তাদের শাসন প্রায় অস্তমিত হয়ে যাবার মত। এই সংকট মুহূর্তে পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ ভূমি রাজস্ব পুনর্নির্ধারণের আয়োজন করলেন। এই নতুন রাজস্ব নির্ধারণের পূর্বে জমির পরিমাপ বা তার উৎপাদনশক্তি নির্ধারণের দিকে না গিয়ে তাঁরা বাংলার ভূমি রাজস্ব নির্ধারিত করলেন দুইকোটি আটষট্টি লক্ষ টাকায়। এই বন্দোবস্ত ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে দশ বৎসরের জন্য এবং ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে 'বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্'-এর নির্দেশে 'চিরস্থায়ী' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কোম্পানি সরকার এরপর জমির ওপর নিজ অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে সে অধিকার সরকারের রাজস্ব আদায়কারী জমিদারদের ওপর ন্যস্ত করেছেন। ইংরেজ সরকারের আধিপত্য ও তার শাসনের একটা সুদৃঢ় ভিত সুরক্ষার মতলবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্যকে তারা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অন্তরালে ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্য থেকে এমন একটি নতুন শ্রেণি তৈরি করা, যে শ্রেণি এই দেশের মধ্যমণি হয়ে থাকবে এবং দেশের বিদ্রোহী কৃষকের বিক্ষোভ থেকে এই শাসনকে রক্ষা করতে পারবে এবং তাদের শাসন-ভিত সুদৃঢ় হবে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের অন্তরালে ছিল জমির ওপর নতুন নতুন ভূ-স্বামী শ্রেণির সৃষ্টি করে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কোম্পানি সরকারের ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাহিদা পূর্ণ করা।

এই সময় কৃষক বিদ্রোহ দমনের জন্য কোম্পানির শাসকদের অর্থের চাহিদা ক্রমশ বেড়ে গিয়েছিল। কোম্পানি সরকারের এই বেড়ে যাওয়া অর্থের চাহিদা পূরণ ইংল্যান্ড থেকে পাঠানো কোম্পানির কর্তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই কোম্পনির কর্তারা

এদেশের অর্থই এদেশের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকারের জন্য পরিচালিত যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমেই যুদ্ধ ও শাসনকাজের সমস্ত খরচ তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন নতুন রাজন্যবর্গের যে সৃষ্টি হয়েছিল সেইসব ভূস্বামী গোষ্ঠীই প্রতি বৎসর কৃষকদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে ভূমি রাজস্ব হিসাবে শাসকদের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে দেবার ভার গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে জমিদারি প্রথামূলক নতুন ভূমি ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে এক অভিনব ভূমি বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ভূমির ওপর কৃষকের সমষ্টিগত-অধিকারমূলক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের ভিত ধ্বংস করে ভূমির উপর থেকে কৃষকের সমস্ত অধিকার নিশ্চিহ্ন করে জমিদারদের ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এর দরুন ভূমির মূল স্বত্বভোগী হয়েছিল জমিদারকূল। পরবর্তীতে এই মূল স্বত্বভোগী জমিদাররাই শাসকদের সম্মতি নিয়ে তাদের সহকারী রূপে সৃষ্টি করেছিল 'তালুকদার', 'জোতদার' প্রভৃতি নামধারী উপস্বত্বভোগীদের অপর একটি বিরাট শ্রেণি। উনিশ শতকের সূচনা থেকেই এই সব স্বত্ব ও উপস্বত্বভোগীদের সমস্ত ভার পড়ে অসহায় কৃষককূলের ওপর। আর তখনই কৃষক ভূমির ওপর সমস্ত স্বত্ব হারিয়ে চির দাসত্বের বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে গেল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দিনাজপুর রাজের সমস্ত জমিদারিই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এর মূলে ছিল রাজা রাধানাথ নির্দিষ্ট সময়ে তাদের দেয় রাজস্ব সরকারের হাতে প্রদান করতে পারেননি। রাজস্ব বাকি পড়ার দরুন রাধানাথের সমস্ত অংশই বিক্রি হয়ে যায়। রাধানাথের জমিদারির সমস্ত অংশই কিনেছিল বর্ণহিন্দু শ্রেণির ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি আর মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ধনী ব্যক্তিগণ, মহাজন এবং কোম্পানির বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দিগণ। দিনাজপুরে এরাই রাধানাথের জমিদারি গ্রাস করে ফেলেছিল। এভাবে পুরাতন অভিজাত জমিদারের পরিবর্তে একটি নতুন জমিদার শ্রেণি দিনাজপুরে আবির্ভূত হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দিনাজপুর সংলগ্ন রংপুর অঞ্চলে কিছু মুসলমান ভূ-স্বামীর জমিদারিও নিলামে উঠেছিল। এরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত না থাকার ফলে। জমির খুঁটিনাটি বিষয় ও হিসাবপত্র সম্পর্কে এরা ওয়াকিবহাল ছিল না। এদের জমিদারির বেশিরভাগ অংশগুলিই কিনেছিলেন হিন্দু বানিয়া এবং নিম্ন বেতনভুক নায়েব গোমস্তারা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই অঞ্চলের মুসলমানদের অবস্থা চরম শোচনীয় আকার ধারণ করেছিল।

দিনাজপুরে নতুন ব্যবসায়ী জমিদাররা ছিলেন মূলত শহরের অধিবাসী। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বৃত্তি ছিল শহরকেন্দ্রিক। মুনাফা লাভ করা ছাড়া তাদের অন্য কোনও দিকে, বিশেষত, গ্রামাঞ্চলের কৃষি উন্নয়নের দিকে লক্ষ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ ছিল না। এই নতুন জমিদার শ্রেণির ধনসম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল উচ্চ চাকরি, ব্যবসা বা মহাজনী কারবার করে। তাই খাস জমিতে অধিক শস্য ফলানো সম্বন্ধে তাদের কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। এই মুনাফালোভী ব্যবসায়ী জমিদাররা তাদের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে গ্রামাঞ্চলে সুবিধামতো বিভিন্ন স্থানে ভূসম্পত্তি কিনতে থাকে, জমিজমা জামিনস্বরূপ রেখে কৃষকদের ঋণ দিতে থাকে। এক সময় ঋণের বোঝা সহ্য করতে না পেরে কৃষকেরা তাদের সমস্ত ভূসম্পত্তি

তুলে দেয় নব্য জমিদারদের হাতে। এই সমস্ত ভূসম্পত্তি কিনে নিয়ে নতুন রাজন্যরা বিনা ঝুঁকিতে উদ্বৃত্ত মুনাফা লাভের জন্য নতুন বিলি বন্দোবস্তের দ্বারা শহরে বসবাস করতে থাকেন। এর ফলে, ব্যবসায়ী জমিদারদের কেনা নতুন বিলিবন্দোবস্তে জমিজমায় ফসল না হলেও যাতে তারা মুনাফা আদায় করতে পারে তারজন্য তারা নির্দিষ্ট বাৎসরিক খাজনার শর্তে স্থানীয় সম্পদশালী ব্যক্তিদের কাছে জমি পত্তনি দিতে আরম্ভ করে। ফলে জমিদার ও কৃষকের মাঝে মধ্যবর্তী পত্তনি প্রথার সৃষ্টি হয় এবং এই পত্তনিদাররাই কৃষকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসে।[২৩] এই জমিদারি প্রথার ফলে দিনাজপুর জেলার কৃষিতে ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার জাল বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং কৃষিতে মূলধন লগ্নীকারী নতুন জমিদাররা কৃষিকাজের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'অনুপস্থিত জমিদার' হিসাবে নিজের ভূসম্পদ হাতে পাওয়া উদ্বৃত্ত মুনাফা নিয়ে শহরের বিলাসব্যসনে ডুবে থাকে। নতুন ভূমি ব্যবস্থায় যারা দিনাজপুর রাজের জমিদারির বিভিন্ন অংশ কিনে নিয়ে বড় জমিদারে পরিণত হয়েছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল ১২, মাঝারি জমিদারের সংখ্যা ২৪, বড় ক্ষেত মালিক ছিল ১০। বাইরে থেকে আসা যে সব ব্যবসায়ী, মুৎসুদ্দি ও বেনিয়ান দিনাজপুর জমিদারির অন্যান্য যে অংশগুলি কিনেছিল তার সংখ্যা ছিল ৭ জন। দিনাজপুরে কিছু বড় জোতের মালিক ছিল মুসলমান শ্রেণিভুক্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় 'বন্ধকি' প্রথা নামে যে শোষণ প্রথা গ্রামাঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছিল এদের এক অংশ সেই সুদের কারবার করতেন, অপরাংশ মুসলমান জমিদারের নায়েব বা গোমস্তার কাজ করতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দিনাজপুরে নতুন রাজন্যবর্গের ভূস্বামীশ্রেণি মূলত বর্ণহিন্দু, মহাজনশ্রেণি হিন্দু, আর কৃষকেরা হল মুসলমান ও অবর্ণ হিন্দু। ভূমি বিন্যাস জনিত গ্রামাঞ্চলের এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবিদ্বেষের মানসিকতার ইন্ধন জুগিয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দিনাজপুর জেলায় নতুন নতুন ব্যবসায়ী জমিদারবর্গের তালিকা দেবার আগে এখানে বলে রাখি, ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর রাজ এস্টেটের জমিদার রাধানাথের মৃত্যুর পর রাধানাথের বিধবা পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর (১৮০১) হাতে রাজসম্পত্তির দায়ভার ন্যস্ত হয়। রানি সরস্বতী তখন বৃদ্ধা। রাধানাথের কোনও পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁর বিধবা পত্নী গোবিন্দনাথকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন (১৮১৭-৪১খ্রিঃ)। এই সময় একটার পর একটা ক্ষমতার উৎস ও সমৃদ্ধির উপাদান হারিয়ে পরিবারটির যে কী করুণ অবস্থা হয়েছিল ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে রানি সরস্বতী দিনাজপুরের কালেক্টরের কাছে তা বর্ণনা করেছিলেন একটি ফরিয়াদে। তিনি লিখেছিলেন, 'ইংরেজ সরকার যখন এ দেশের ক্ষমতায় আসীন হন তখন আমাদের পরিবারটি ছিল বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী এবং দেশের অত্যন্ত অভিজাত ও শ্রদ্ধাভাজন গোষ্ঠী। চাকলা দিনাজপুর ইত্যাদি যা আমার প্রয়াত পুত্র রাধানাথের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমিদারি তা থেকে বার্ষিক ১৯ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা রাজস্ব অনায়াসেই সংগ্রহ করা হত। অথচ আজ আমরা নিদারুণ দারিদ্র ও চরম দুর্দশার মধ্যে কালাতিপাত করছি।''[২৪] বাংলার একটি বড় জমিদারের শেষ পরিণতি কতখানি মর্মান্তিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল তা রানি সরস্বতীদেবীর ফরিয়াদ থেকে জানা যায়। সরকারি ও নিজস্ব আমলাদের ষড়যন্ত্রের

কারণে জমিদারি বাঁচাতে গিয়ে বাজারে প্রচুর দেনা করতে হয়েছিল। এ দেনা শোধ করতে গিয়ে রাজপ্রাসাদের বহু পাকা ঘর বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। এতেও কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। পাওনাদারদের অর্থ পরিশোধ করতে রাজার সমস্ত হাতি, ঘোড়া, গরু-মহিষও নিলামে বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। এই রকম বিপর্যয়ের মুখে দিনাজপুর রাজ পরিবার তাদের জমিদারির ৬১টি পরগনার মধ্যে কেবলমাত্র একটি পরগনা নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া নিলামে বিক্রির সময় ৮টি 'লট' বা অংশ রাজা রাধানাথের মা রানি সরস্বতী ও রাধানাথের বিধবা পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী বেনামে কিনে রেখেছিলেন। এমনিভাবে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায় রাজপরিবারটি।[২১]

বড় জমিদার

এস্টেটের নাম	জমিদারের নাম	ঠিকানা
দিনাজপুর রাজ এস্টেট	গোবিন্দনাথ রায়, তারকনাথ রায়, গিরিজানাথ রায়, জগদীশনাথ রায়	রাজ বাড়ি, দিনাজপুর সদর
রায়সাহেব এস্টেট	রায়সাহেব রাধাগোবিন্দ রায় কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় পূর্ণেন্দু নারায়ণ রায়	ক্ষেত্রি পাড়া, দিনাজপুর, সদর
মালদুয়ার এস্টেট	রাজা টঙ্কনাথ রায় সত্যনাথ রায় শেষনাথ রায়	ঠাকুর গাঁ, দিনাজপুর
জগদল এস্টেট	বীরেন্দ্র কিশোর চৌধুরী	জগদল, ঠাকুর গাঁ, দিনাজপুর
খাঁন এস্টেট	মুন্সী মোহম্মদ আলী খাঁ	ক্ষেত্রি পাড়া দিনাজপুর সদর
হরিপুর এস্টেট	কুমার বিশ্বনেন্দু রায়চৌধুরী	হরিপুর, দিনাজপুর
চূড়ামন এস্টেট	ঘনেশ্যাম চৌধুরী জগৎবল্লভ চৌধুরী গুরুপ্রসাদ রায়চৌধুরী	চূড়ামন, দিনাজপুর
বাইন এস্টেট	ক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী	বাইন, দিনাজপুর
রানিগঞ্জ এস্টেট	কেশব লাল ঝাঁ চক্রবর্তী যাদব লাল ঝাঁ চক্রবর্তী	রানিগঞ্জ, দিনাজপুর
অন্নদাময়ী এস্টেট	অন্নদাময়ী রায়	দিনাজপুর সদর
গৌরাঙ্গ সুন্দর এস্টেট	গৌরাঙ্গ সুন্দর মিত্র	দিনাজপুর সদর
নাহার এস্টেট	খেতাব চান্দ নাহার বিজয় সিং নাহার ধীর সিং নাহার	সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর

মাঝারি জমিদার

এস্টেটের নাম	জমিদারের নাম	ঠিকানা
ঘোষ এস্টেট	তুলসী ঘোষ	রাজারামপুর, দিনাজপুর
ছোট রাজবাড়ীরগড় এস্টেট	দ্বিজেন্দ্র বিহারী রায় নকুল বিহারী রায়	বড়বন্দর, দিনাজপুর
ন্যায় বাগীশ এস্টেট	কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ	ক্ষেত্রিপাড়া, দিনাজপুর
সেন এস্টেট	কৃষ্ণ চন্দ্র সেন	কালীতলা, দিনাজপুর
গুপ্ত এস্টেট	রায়বাহাদুর জ্যোতিষ গুপ্ত চুনি গুপ্ত	বালুবাড়ী, দিনাজপুর
মনহলি এস্টেট	যোগেশ ব্যানার্জী	তপন, দিনাজপুর
কর এস্টেট	গোষ্ঠ বিহারী কর শিব প্রসাদ কর	গণেশতলা, দিনাজপুর
মজুমদার এস্টেট	জানকি মজুমদার	চাউলিয়া পট্টি, দিনাজপুর সদর
চক্রবর্তী এস্টেট	শ্রীশ চন্দ্র চক্রবর্তী যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী	বড়বন্দর, দিনাজপুর
ঘুঘুডাঙ্গা এস্টেট	সেরাজউদ্দিন চৌধুরী মইনউদ্দিন চৌধুরী	ঘুঘুডাঙ্গা, দিনাজপুর
মারনাই এস্টেট	মহেন্দ্রনারায়ন পালচৌধুরী	মারনাই, দিনাজপুর
গিরি গোঁসাই এস্টেট	রঘুনন্দন গিরি গোঁসাই জানকি গিরি গোঁসাই	রায়গঞ্জ, দিনাজপুর
চ্যাটার্জী এস্টেট	কামিক্ষ্যা চ্যাটার্জী	বিন্দোল, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর
বোল্লা এস্টেট	হরিমোহন গাঙ্গুলী	বোল্লা, দিনাজপুর
মাহিষ্য এস্টেট	সুধীর দাস	বালুরঘাট, দিনাজপুর
নালাহার এস্টেট	আজিজুল হক চৌধুরী নাসির উদ্দিন চৌধুরী	নালাহার, দিনাজপুর
গোলকুঠি এস্টেট	কেশরী বিবি	স্টেশন বাজার, দিনাজপুর
মজুমদার এস্টেট	প্রতাপ মজুমদার	বটুন, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর

এস্টেটের নাম	জমিদারের নাম	ঠিকানা
খড়পা এস্টেট	মুসা মোহম্মদ চৌধুরী	বালুরঘাট, দিনাজপুর
গোকুল এস্টেট	গোকুল চন্দ্র চৌধুরী	গুদরীবাজার, দিনাজপুর
বড়াল এস্টেট	অতুল বড়াল, গোবিন্দ বড়াল, দ্বারিকা বড়াল, বিশ্বম্ভর বড়াল, গোপী সুন্দরী দেবী চৌধুরানী	পাহাড়পুর, দিনাজপুর
পিটার এস্টেট	এ. পি. পিটার, চার্লস পিটার	মিশন রোড, দিনাজপুর
ঘোষ এস্টেট	কৃষ্ণলাল ঘোষ	পাতিরাম, বালুরঘাট, দিনাজপুর
সান্যাল এস্টেট সাহেব কাছারি	শ্রীনাথ সান্যাল, রাজেন সান্যাল	বালুরঘাট, দিনাজপুর

বড় জোতমালিক

জোতের নাম	মালিকের নাম	ঠিকানা
সিংহ রায় জোত	অসিত মোহন সিং রায়	খাঁপুর, পতিরাম, দিনাজপুর
দাস জোত	প্রেমচন্দ্র দাস	তিলনী, পোরসা, দিনাজপুর
ভালে মোহাম্মদ জোত	ভালে মোহাম্মদ	প্রাণসাগর, দিনাজপুর
পীর সাহেব জোত	পীর শাহ মতলুব মিঞা	ক্ষেত্রিপাড়া, দিনাজপুর
মণ্ডল জোত	প্রতাপ মণ্ডল	বালিয়ারি, দিনাজপুর
মোল্লাহার জোত	রহমত তুল্লা চৌধুরী	হরিরামপুর, দিনাজপুর
চৌধুরী জোত	নলিনী মোহন চৌধুরী	শিবগঞ্জ, দিনাজপুর
কাবুলিয়ালা জোত	মুশা মহাম্মদ খান	ভিখাহাব, দিনাজপুর
ছোট কুঠি জোত	শাসকরণ দাগা	দিনাজপুর, সদর
বড় খোদা- ছোট খোদা জোত	বড় খোদা, ছোট খোদা	আলেয়াখোয়া, ঠাকুর গাঁ, দিনাজপুর

অন্যান্য জমিদারদের জমিদারি

এস্টেটের নাম	জমিদারের নাম	ঠিকানা
পিরালি এস্টেট (পাতিরাম)	রঘুনন্দন ঠাকুর রণেন্দ্র মোহন ঠাকুর শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর	কলকাতা
জানবাজার এস্টেট (বড়বাজার)	রাণীরাসমনি	নাটোর
কোলকালিমুন্ড এস্টেট (নয়া বাজার গঙ্গারামপুর)	নৃসিংহ নন্দী চৌধুরী, হরগোপাল নন্দী চৌধুরী	বর্ধমান
শীতলাই এস্টেট (বীরগঞ্জ)	যামিনী মোহন গাঙ্গুলী	পাবনা
লাহিড়ী এস্টেট (ডালিম গাঁ)	দিনেশ লাহিড়ী	রংপুর
কুঠি কাছারি এস্টেট	ধনপৎ সিং	আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
কাশিম বাজার এস্টেট	কৃষ্ণকান্ত নন্দী; লোকনাথ নন্দী	শ্রীপুর, মুর্শিদাবাদ

বড় জমিদার, মাঝারি জমিদার, বড় জোত মালিক এবং অন্যান্য জমিদারদের জমিদারির যে তালিকা দেওয়া হল তা সম্পূর্ণ নয়। দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আরো কিছু জমিদার ও বড় জোতের মালিক ছিলেন তাঁদের নাম সংগ্রহ করতে পারিনি। দিনাজপুর জেলায় সবচেয়ে পুরানো জমিদার হলেন দিনাজপুর রাজ এস্টেট। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ঐ জমিদারি সম্পূর্ণ বিলুপ্তি হয়ে যাওয়ার পর এ রাজবংশের জমিদার গোবিন্দনাথ রায় পুনরায় হাল ধরেছিলেন। জেলায় তিনজন মহিলা জমিদার ছিলেন, এঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন হিন্দু, একজন মুসলমান। বঙ্গদেশে গিরি সম্প্রদায়ের এস্টেট প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। গিরি এস্টেটের রঘুনন্দন গিরি গোঁসাই ছিলেন উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত। এ জেলায় একজন কাবুলিওয়ালা জমিদার ছিলেন। সুদূর আফগানিস্থান থেকে এসে জেলায় সুতো, কাপড়, হিং, আখরুট, খেজুর প্রভৃতি বিক্রি করতেন এবং গ্রাম্য চাষীদের টাকা দাদন দিতেন। শুধু মাত্র কর্জ টাকার সুদেই পত্নীতলা, পোশা ও তপন নানা অঞ্চলে ইনি পাঁচ হাজার বিঘা জমি কিনেছিলেন বলে জানা যায়।

৮. নীল চাষি বিদ্রোহ

দিনাজপুর জেলায় বাঙালি চাষিরা তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বুকের রক্ত আর চোখের জলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে যে সংগ্রামী ঐতিহ্য রচনা করেছিল বাঙালির ইতিহাসে তা এক গৌরবময় অধ্যায় সূচিত করেছে। সে অধ্যায়ের এক উজ্জ্বলপর্ব দিনাজপুরের নীল বিদ্রোহ। শাসক ইংরেজরা মূলত ব্যবসায়ী বুদ্ধি নিয়েই এদেশে হাজির হয়েছিলেন। ডাচ্, পর্তুগিজ, ফরাসি এ সব ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের হটিয়ে দিয়ে তাঁরা প্রখর বাস্তববুদ্ধির কৌশলে নিজেদের সাম্রাজ্য কায়েম করেছিল। তাঁদের সজাগ বণিক-বুদ্ধি বঙ্গদেশের উর্বর ফসল ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হল। খাদ্য-ফসলের পরিবর্তে বাণিজ্য-ফসল রূপে এদেশের মাটিতে নীলকে প্রচুর পরিমাণে ফলাতে পারলে যে মুনাফা হবে অন্য কোনও বাণিজ্য-ফসলে তা সম্ভবপর হবে না। কারণ, ইংলন্ডে তখন অসম্ভব দ্রুতগতিতে বস্ত্র শিল্প এগিয়ে চলেছে। কাপড় রং করার জন্য নীলের খুবই প্রয়োজন। ফলে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা দেখলেন এই সুবর্ণ সুযোগ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নীলের ব্যবসায় বিপুল মুনাফা লুণ্ঠনের সুযোগ দেখে কোম্পানি বাংলাদেশের ব্যবসায়ে লব্ধ মুনাফা থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে নীলকর নামে একদল দস্যুতুল্য শোষক সৃষ্টি করেন। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলায় বেশ কটি নীলকুঠি তৈরি হয়। এ সময়ের কিছু আগে দিনাজপুর জমিদারির শাসনভার ন্যস্ত ছিল রাজা বৈদ্যনাথের হাতে এবং ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে রাজা বৈদ্যনাথের মৃত্যুর পর রাজা রাধানাথের ওপর (১৭৮০-১৮০১)। দিনাজপুরে নীলকর সাহেবরা রাজা বৈদ্যনাথ এবং রাজা রাধানাথের কাছ থেকে প্রচুর জমি বন্দোবস্ত নিয়ে নীলের কাজ শুরু করেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন নতুন রাজন্যবর্গ সৃষ্টি হয়। এ সময় দিনাজপুরের কিছু কিছু জমিদার তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শরিক কিংবা পার্শ্ববর্তী জমিদারকে বিপদে ফেলার উদ্দেশ্যে নিজের এলাকায় নীলকরদের ডেকে এনে জমি দিয়ে বসিয়েছিলেন। কোনও কোনও জমিদার নীলকর দস্যুদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তারা কখনই স্বেচ্ছায় নীলকরদের কাছে জমি বিক্রি করেন নি— এও দেখা গেছে। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, এক বছরেই (১৭৮৩ খ্রিঃ) সাহেবরা বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে বার-তেরশ মণ নীল সংগ্রহ করে বিদেশে রপ্তানী করেন। ভারতীয় মূল্যে সাহেবরা এই নীল কিনতেন এক পাউন্ড এক টাকা চার আনা দরে, আর ইংলন্ডে নিয়ে গিয়ে ওই এক পাউন্ড বিক্রি করতেন পাঁচ টাকা থেকে সাত টাকা দরে। ফলে, বঙ্গদেশে নীলের চাষ এত ব্যাপক ভাবে হয় যে ১৮১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে এক লাখ আঠাশ হাজার মণ নীল তৈরী হয়েছিল এবং সে সময় একমাত্র সমস্ত পৃথিবীর নীলের চাহিদা মিটিয়েছে এই বঙ্গদেশের কৃষকেরাই।

দিনাজপুর জেলার সুজানগর, মাহিনগর, মথুরাপুর, দেলওয়ারপুর, বাজিতপুর, রাধাবল্লভপুর, কান্তনগর, সন্তোষ, সুলতানপুর, জাহাঙ্গীরপুর, সমঝিয়া, দেবীকোট, করদহ, জগদল, এসব পরগণাতে ছিল নীল চাষের প্রচলন।[২৬] নীলকর সাহেবরা এসব পরগণার বিস্তর জমিতে নীলের চাষ শুরু করে। কম খরচে অধিক ফসল পেতে হলে নীলের চাষ ছিল লাভজনক। এ চাষে নীলকরের বিশেষ দায়িত্ব থাকত না। তাঁরা চাষিকে সামান্য

কিছু টাকা দাদন দিয়ে সমস্ত দায়িত্ব চাষির উপর ন্যস্ত করত। কৃষকেরা কত পরিমাণ জমিতে নীল চাষ করবে তাও মেপে দিতো নিজস্ব মাপদন্ড দিয়ে। এই মাপদন্ড ছিল সাধারণ মাপদন্ড অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ। চাষির এগারো বিঘায় নীলকরের হতো মাত্র সাত বিঘা। কোনও চাষি নীল বুনতে অস্বীকার করলে নীলকরের কারাগারে বন্দি হয়ে তাকে অশেষ শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হতো। ঘরবাড়ি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতো, স্ত্রী-পুত্র ভিখারি হতো। চাষির সঙ্গে নীলকরের চুক্তিপত্র ছিল চিরজীবনের দাসখত-স্বরূপ। এই চাষ করে চাষিদের কোনও লাভই হতো না। প্রতি বিঘায় দশ থেকে বারো বান্ডিল করে নীল গাছ হতো এবং এরকম এক হাজার বান্ডিলে পাঁচ মণ করে নীল প্রস্তুত হত। দশ বান্ডিল গাছ হতে দুই সের নীল রং প্রস্তুত হতো যার দাম ছিল দশ টাকা এবং প্রতি মণ দু'শ টাকা করে। এই দশ বান্ডিল নীলগাছের জন্য চাষি পেত টাকায় চার বান্ডিল হিসেবে দু'টাকা আট আনার মত। দশ বান্ডিল গাছ থেকে রং প্রস্তুত করতে নীলকরের একটাকার অনেক কম লাগতো। ফলে দু'সের নীলের মোট খরচ হতো তিন টাকা আট আনা আর নীলকর সাহেব দাম পেত দশ টাকা। সুতরাং নীলকরের দু'সেরে লাভ থাকত ছয় টাকা আট আনা এবং এক মণে যার বাজার দর মণ প্রতি দুশো টাকা এবং লাভ থাকতো একশো ত্রিশ টাকা।[২১] সাধ্য অতিরিক্ত শ্রমের বিনিময়ে চাষীকে শূন্য ডালা নিয়ে বাড়ী ফিরতে হতো। এরপর ছিল চাষির উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। চাষির দুটি নীলের বান্ডিলকে ধরা হতো একটি নীলের বান্ডিল, নীলকররা বেপরোয়া নষ্ট করে দিতো চাষীদের ফসল। চাষীরা এর প্রতিবাদ করতে গেলে অবাধ্য চাষীদের খোয়াড়ের মধ্যে বে-আইনিভাবে আটকে রেখে অন্যায়ভাবে তাদের বেত মারত। সাহেবরা একে মিষ্টি ভাষায় বলতেন, 'শ্যামচাঁদ'। নীলচাষিদের ওপর যে কি অমানুষিক নির্যাতন হতো চাষিরা তা নিয়ে অনেক গান বেঁধেছিল। তার একটি গানের ভাব হচ্ছে ঃ

> নীলকর সাহেবের আগাম টাকায় সুদ জমে তিন পুরুষ ধরে।
> সাহেব যখন প্রথম আসে— সে আসে ভিখিরীর মতো।
> কিন্তু শেষে তারি কল্যাণে দূর্বা গজায় রায়তের হাড়ে।
> সাহেব ঢোকে ছুঁচ হয়ে আর বেরোয় ফাল হয়ে।
> পঙ্গ পালের মতো এসে তারা বাঙালার ক্ষেতখামার উচ্ছন্নে দিলে।
> প্রজারা যায় রসাতলে সাহেব কিন্তু ফিরেও তাকায় না সেদিকে।
> সবই যখন গেল, তখন ভগবান ছাড়া এই দুঃখ কাকেই বা জানাব?
> রাতে যখন চোখ বুজি—তখনো চোখের সম্মুখে ভেসে বেড়ায় সাদা সাদা মুখ।
> ভয়ে প্রাণ উড়ে যায় পাখির মত।
> যন্ত্রণার দহনে অনুক্ষণ জ্বলে পুড়ে যায় চাষির হৃদয়।

দিনাজপুর জেলায় গুরুত্বপূর্ণ নীলকুঠিগুলি ছিল ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ধামাইর থানার অন্তর্গত বাদাল নীলকুঠি। এই কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন স্যার চার্লস উইলকিন্স্। নীল ও রেশম এই দুইয়েরই চাষ হত সেখানে। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে মালদহের গোয়ামালতি

নীলকুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই সনে চার্লস গ্রান্ট কমারশিয়াল রেসিডেন্ট হিসাবে গোয়ামালতি কুঠিতে আসেন এবং নিজ খরচে এখানে নীলের চাষ শুরু করেন। তিনি নিজেই এই চাষের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালন করেন এবং পরে তাঁর এজেন্টরূপে মেসার্স ক্রেটন অ্যান্ড এলাটন সাহেবকে নিযুক্ত করেন। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই কুঠির কাজ সাড়ম্বরে চলে। জেলার টাঙ্গন ও পুনর্ভবা নদী দুটির মাঝখানের অঞ্চল দিয়ে আরো অনেকগুলি নীলকুঠি তৈরি হয়। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ, এই দু'বছরের মধ্যে কুঠিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির মধ্যে মহিপাল দিঘি নীলকুঠি ও মদনাবতী নীলকুঠি, এ দুটি অন্যতম। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে চালর্স গ্রান্ট বোর্ড অফ ট্রেড-এর সভ্য হয়ে কলকাতা চলে গেলে মালদহের গোয়ামালতি নীলকুঠির কমারশিয়াল রেসিডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত হন জজ উডনি। মহিপাল দিঘি ও মদনাবতী নীলকুঠি দুটি তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠা করে নীলের চাষ শুরু করেন। এ চাষে আর্থিক সাফল্য লাভ করায় এ দুই কুঠির কাছাকাছি অঞ্চলে জজ উডনি আরো চারটি নীলকুঠি স্থাপন করেন। এগুলি হল, সাবেক বামনগোলা থানার টাঙ্গন নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত মাধববাটি নীলকুঠি, বংশীহারী থানার অধীনে খিদিরপুর নীলকুঠি, বিরল থানার অন্তর্গত সাদামহল নীলকুঠি এবং ইটাহার থানার অধীনে মহানন্দা নদীর পাড়ে চূড়ামন নীলকুঠি। এ সব কুঠির দায়িত্বে দিলেন জন টমাস, উইলিয়াম কেরি, নীলকর ক্রেইগ্‌টন প্রমুখ। তাছাড়া, কালিয়াগঞ্জ থানার মাহিনগর এবং কুমারগঞ্জ থানার অধীনে এনায়েতপুর নীলকুঠি, এ দুটি নীলকুঠি পরিচালনা করতেন নীলকর হোয়াইট। এসব কুঠি পরিচালনা ছাড়াও দিনাজপুর জেলার নীলকরেরা বর্তমান রতুয়া থানার অধীনে খৈলসানাকুঠি, কালিয়াচক থানার অধীনে নাজিরপুর, নারায়ণপুর ও বাকরাবাদকুঠি, সাবেক ইংলিশবাজার থানার অন্তর্গত সিঙ্গাতলাকুঠি এবং বর্তমান মানিকচক থানার অধীনে মথুরাপুর নীলকুঠি। দিনাজপুরে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ব্যাপকভাবে নীল চাষ সূচিত হয়েছিল। এ সময় নীলচাষিরা শারীরিক ও মানসিক — এই দুই দিক দিয়েই নীলকর দস্যুদের অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর সদরে নীল ব্যবসার বৃহৎ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। গণেশতলা মৌজার রায়সাহেব জমিদারদের সাবেক বাড়ি, কাছারির আদালত কুঠি, ঘুঘুডাঙ্গা জমিদারদের সাবেক বাড়ি, সি অ্যান্ড বি অফিস ইত্যাদি সৌধগুলি ছিল নীলকরদের সাবেক কুঠি। দিনাজপুর জেলার নীলকুঠিগুলির মূল পরিচালক ছিলেন মিঃ হোয়াইট নামে একজন ইংরেজ নীলকর। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলা শহর গঠিত হলে ওই সালে জজ হ্যাচ নামক একজন ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন একাধারে রাজস্ব আদায়কারী, প্রশাসক ও জেলার বিচারক। এই বিপুল ক্ষমতার অধিকারী জজ হ্যাচকে নীলকর অধ্যক্ষরা যেমন চার্লস গ্রান্ট, মিঃ হোয়াইট, জজ উডনি প্রমুখরা গ্রাহ্য করতেন না। কালেক্টরের ক্ষমতাকে তাঁরা বুড়ো আঙ্গুল দেখাতেন। নীলকরদের ক্ষমতা এতই প্রবল ছিল যে ধরাকে সরা জ্ঞান করতেন। দিনাজপুরের দু'শো বছর আগের প্রশাসনিক কড়চা থেকে জানা যায়, 'জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গোমস্তাদের জুলুমের খবর আসছে কালেক্টরের কাছে। চাষীদের অবস্থা শোচনীয়। দোকানীরা ত্রাসের মধ্যে

দিন কাটাচ্ছে। দালালে ছেয়ে গেছে সমস্ত জেলা। কিছু কর্মচারী নিয়ে শাসনভার চালাতে কালেক্টর জজ হ্যাচ হিমসিম খাচ্ছেন। কলকাতা থেকে রাজস্ব বোর্ড কড়া ভাষায় তাঁকে চিঠি লিখছে, আর এই পরিস্থিতিতে মালদহ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেসিডেন্ট চার্লস গ্রান্ট হ্যাচকে চোখ রাঙাচ্ছেন।' আরো একটি ঘটনা, '১৭৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একজন ফরাসি গোমস্তা পালকিতে চড়ে সন্তোষ, সুজানগর ও মাহিনগর পরগণায় তাঁত শিল্পীদের কাজকর্ম দেখে বেড়াচ্ছিলেন। গোমস্তা সাহেব ইংরেজ কোম্পানির চাকর হলেও তার পালকিতে উড়ছিল ফরাসি পতাকা। এক দালাল রেসিডেন্টকে খবর দিতেই রেসিডেন্ট চার্লস গ্রান্ট তেলে বেগুণে জ্বলে উঠলেন। ২৮ শে সেপ্টেম্বর কালেক্টর হ্যাচ সাহেবকে ধমক দিয়ে চিঠি লিখলেন ইংরেজ রাজত্বে এসব কি হচ্ছে? সে বারেই কিঙ্কর পোদ্দার নামে এক দালাল কিছু তাঁত শিল্পীদের কাছে নিজেকে কোম্পানির আমলা পরিচয় দিয়ে খবরদারি শুরু করে। তার অত্যাচারে টিকতে না পেরে তাঁত শিল্পীরা কালেক্টরের কাছে নালিশ জানায়। হ্যাচ সাহেবের নির্দেশে কিঙ্করকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ খবর পেয়েই রেসিডেন্ট গ্রান্ট সাহেব ৭ই ডিসেম্বর হ্যাচ সাহেবকে গালাগাল দিয়ে চিঠি লিখলেন: 'তোমার দুঃসাহস দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। তুমি কি আক্কেলে আমার লোককে গ্রেপ্তার করে সরকারি আইন ভঙ্গ করলে?'

চার্লস গ্রান্টের এই দৃষ্টান্তের পর জজ উডনির সঙ্গে কালেক্টর হ্যাচ সাহেবের একটি ঘটনা, '১৭৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে আবার এক ঝামেলা। মাহিনগর পরগণার তাঁত শিল্পীরা একযোগে ঠিক করলেন এক বছর আগে মালগুজারি খাজনা তারা ঠিক দেবেন, কিন্তু অন্যান্য পাওনা তারা ঠিক মেটাবেন না। রাজস্ব ঠিকমত আদায় হচ্ছে না বলেই ইতিমধ্যে কালেক্টর রেভিনিউ বোর্ডের কড়া চিঠি পেয়েছেন। কাজেই তাঁত শিল্পীদের বুঝিয়ে বলার জন্য তিনি দু'জন পেয়াদা পাঠালেন, তাদের নাম পঞ্চানন্দ চৌধুরী এবং বাণীশ্বর রায়। পেয়াদা দু'জন আর কোন কথা নয়— অকুস্থলে গিয়েই তাঁত শিল্পীদের গ্রেপ্তার করে স্থানীয় এক কাছারি বাড়ীতে বেঁধে রাখল। চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। হ্যাচ সাহেবের হস্তক্ষেপে তাঁতিরা মুক্তি পেল বটে, কিন্তু ১০ জানুয়ারি মালদহের রেসিডেন্ট জজ উডনি সাহেব কালেক্টর হ্যাচ সাহেবের পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করে এক চিঠি পাঠালেন।'[২৮]

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুরে নীলচাষিদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার শুরু হয়। নীলচাষিদের ঘরের বৌ, বোন, কন্যা ও বিধবাদের টেনে এনে তাদের সতীত্ব নষ্ট করতেও নীলকররা দ্বিধা করতো না। দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় ১৭৮০-র রাজ দশকের গোড়ায় দেবী সিংহের অত্যাচার প্রবল আকার ধারন করেছিল। দিনাজপুর রাজ জমিদারের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হয়েও দেবী সিংহ ছিল লম্পট ও শ্বেতাঙ্গ নীলকর প্রভুদের নারী সরবরাহের এজেন্ট। দিনাজপুর সদরে নীলকর ম্যান্ডেভিল সাহেবের কুঠিটি ছিল সহস্র লুণ্ঠিতা রমণীর বন্দীশালা। ম্যান্ডেভিল সাহেবের উপভোগের জন্য 'অঙ্গনা খোঁয়াড়' তৈরী হয়েছিল। সেখানে কুল বধুদের ধরে এনে বোঝাই করে রাখা হতো। এই অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে থুররম সর্দার, বৈর্য্যনারায়ণ বর্মণ, রাজীব

মন্ডল, হুনা সর্দার, কৃপারাম সরকার, রামানারায়ণ মণ্ডল প্রমুখ কোম্পানির বিভিন্ন অফিস ও সাহেবদের কুঠিতে ডাকাতি করে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে বিরল থানার অধীনে সাদামহল নীলকুঠির অধ্যক্ষ ক্রেইগটন সাহেব নীলচাষিদের উপর ভীষণ অত্যাচার ও শারীরিক নির্যাতন শুরু করে। কুঠির চাষিরা নীলকরের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করলে নীলকর ক্রেইগটন গ্রামের লোকজন, জমিদার ও তার কর্মচারীদের দমন করে নীলকুঠিতে সকলকে আটকে রাখেন।[২৯]

দিনাজপুরের কৃষক সমাজ ও সাধারণ মানুষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে, ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ, দেবী সিংহের অত্যাচার, সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ, এ সব কারণে এমনিতেই পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছিল। এসব পরিস্থিতি কৃষকের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। উৎপীড়ন আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজ রুখে দাঁড়ায়। প্রাণ থাকতে নীলের চাষ আর করবে না বলে তারা প্রতিজ্ঞা নেয়। বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল, বিক্ষোভ থেকে বিস্ফোরন সৃষ্টি করে নীলচাষির দল। বাংলার প্রায় ৬০ লাখ চাষি এগিয়ে এসেছিল এই মহাসংগ্রামে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮০৪-১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে নদিয়া জেলার বিখ্যাত চৌগাছা গ্রামের কৃষকবীর এবং নীল বিদ্রোহের নেতা বিশ্বনাথ সর্দার ও তাঁর কয়েকজন অনুচর দিনাজপুর জেলে আটক হন। কিছু দিন থাকার পর বিশ্বনাথ ও তাঁর অনুচরেরা দিনাজপুর জেল ভেঙ্গে পালিয়ে যান এবং দিনাজপুর মালদহের গ্রামাঞ্চলে আত্মগোপন করে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা নীলাচাষিদের লড়াইয়ে অংশ নেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে, বিরল থানার সাদামহল নীলকুঠিতে বেশ কয়েক'শ রায়ত জড়ো হয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। নীল বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় বাকরাবাদ কুঠির একটি ঘটনা, সে সময় দিনাজপুর ও মালদহের রায়তদের মধ্যে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ২০শে মার্চ বিদ্রোহীরা বাকরাবাদ নীলকুঠি আক্রমণ করে। এ কুঠির দায়িত্বে ছিলেন নীলকর মিঃ ডেভিড অ্যাণ্ড্রুজ। বিদ্রোহী চাষিরা প্রথমে কুঠি আক্রমণ করে কুঠির মূল্যবান খাতাপত্র নষ্ট করে দেয়। পরে ঘরের ভেতর প্রবেশ করে আসবাবপত্র ভাঙচুর করে এবং ম্যানেজারের কাছ থেকে বন্দুক ও তলোয়াল লুঠ করে নেয়। এরপর লড়াকু চাষিরদল সৌহাস বিশ্বাস, মোরাদ বিশ্বাস ও লালচাঁদ বিশ্বাসের নেতৃত্বে নীলকর লিয়নস সাহেবের কুঠি আক্রমণ করে। মোরাদ বিশ্বাস ছিলেন মিষ্টার লিয়নসের বিশ্বস্ত রাজস্ব আদায়কারী। তাঁরই নেতৃত্বে বহু মুসলমান চাষি এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ২১শে মার্চ, এদিন কয়েক হাজার চাষি কুঠার, সড়কি, তলোয়াল সহ লিয়নসের কুঠি আক্রমণ করে। অপ্রত্যাশিত এ ঘটনায় নীলকর লিয়নস অতর্কিতে তার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ চাষিদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করে। এর ফলে, ঘটনাস্থলে দু'জন নিহত ও পাঁচজন চাষি গুরুতরভাবে আহত হয়। এই কুঠির পাশেই ছিল নদী। সৌভাগ্যক্রমে ওই সময় এইচ. এম. এস. পায়োনীয়ার নামে একটি স্টীমার কুঠির পাশে নদীতে এসে পড়ে এবং তারা লিয়নসকে রক্ষা করে। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে মোরাদ বিশ্বাস, লালচাঁদ বিশ্বাস, রতন মন্ডল প্রমুখ নেতারা ধরা পড়ে এবং তাদের

বিচারের জন্য বহরমপুর জেলে ধরে আনে। এর কিছুদিনের মধ্যে আরও চৌত্রিশ জন বিদ্রোহী রায়ত ধরা পড়ে। হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী সম্পাদিত *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হয়।

১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ এবং ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে নীলকরদের সঙ্গে নীলচাষিদের লড়াইয়ের ফলশ্রুতিতে ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়েছিল চাষিদের কাছে মাথা নত করতে। একটি নির্দেশ নামায় জানা যায়, 'নীল সংক্রান্ত বিবাদে পুলিশের কাজ হল রায়তকে রক্ষা করা যাতে করে তাদের দখলি জমিতে তারা নীলকর বা অপর কারো মর্জিমাফিক ফসল উৎপাদন করতে বাধ্য না হয়ে নিজেদের খুশিমত ফসল উৎপাদন করতে পারে। এই বিদ্রোহের আগুন কিছুটা নিভে আসার সঙ্গে সঙ্গে ডব্লু. এস. শিটন কার-এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। এই কমিটি বিস্তৃত সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে আগস্ট সরকারের কাছে সুবৃহৎ রিপোর্ট দাখিল করেন। বিদেশী ও দেশী ব্যক্তিদের মধ্যে ১৩৪ জনকে মুখ্য সাক্ষ্যদানকারী হিসাবে গ্রহণ করে জেরা করা হয়। এঁদের মধ্যে গোয়ামালতি কনসার্ণের জে. জে. গ্রে, অপরজন সিঙ্গিটোলা ও বয়লী কনসার্ণের পি. ম্যাকার্থার ছিলেন। কমিশনের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়েছিল যে চাষের অজুহাতে নীলকরদের প্রশ্রয় দিয়ে সরকার হঠকারিতা ও অবিমিশ্রকারীতারই প্রশ্রয়দাতা হয়েছেন।[৩০] ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে কৃত্রিম নীল আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত এদেশেও নীলের চাষ ক্রমশ হ্রাস পেতে পেতে অবশেষে বন্ধ হয়ে যায়। দিনাজপুর জেলায় নীলচাষের জায়গায় দখল করে নেয় ধান, পাট, কলাই ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ফসল।

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. অভাবে কৃষকদের ঋণ প্রদান, দিনাজপুর অঞ্চলে যার নাম ছিল তাক্‌ভি।
২. শিরীন আখতার, 'আঠারো শতকে দিনাজপুরের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস-জমিদারদের ক্ষমতা', *দিনাজপুর, ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ১৫৩, ১৫৪, ১৫৮।
৩. বর্তমান উত্তরদিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ অঞ্চল।
৪. শিনকিচি তানিগুচি, 'ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভে দিনাজপুর জমিদারির প্রশাসনিক কাঠামো', *দিনাজপুর, ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ১৮০।
৫. ধনঞ্জয় রায়, *বিশ শতকের দিনাজপুর ঃ কৃষক আন্দোলন* ও *মন্বন্তর*, পৃ. ১৮,১৯।
৬. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, পৃ. ২৭,২৮।
৭. রজতকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, পৃ. ২৮৫, ২৮৬।
৮. ঐ, পৃ. ২৮৬।
৯. ধনঞ্জয় রায়, *বাংলা পুঁথিতে দিনাজপুরের গণ জাগরণ ও তার ইতিহাস প্রসঙ্গ*, উত্তর দিনাজপুর জেলার ৮ম বর্ষপূর্তি উৎসব সংখ্যা, ২০০০, পৃ. ১৪।
১০. সুপ্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

১১. হরেরামপুর ঃ বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর, সাবেক তাজপুর (বর্তমান রায়গঞ্জ) বিভাগের অধীনে ছিল।

১২. নিখিল সুর, *ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ* , পৃ. ৫৯-৬০।

১৩. নিখিল নাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী,* পৃ. ৩২৫, ৩২৬।

১৪. সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯০-৯১।

১৫. নিখিল নাথ রায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৫৭-৩৫৮।

১৬. সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯২, ৯৩।

১৭. পরিতোষ দত্ত, *কৃষক সংগ্রামের প্রতিবাদী কবি রতিরাম দাস,* পৃ. ৩১।

১৮. গৌতম ভদ্র, *ইমান ও নিশান,* পৃ. ২২৪-২২৫।

১৯. শিরীন আখতার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৬০।

২০. নিখিল সুর, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬৫-৬৬।

২১. Ratnalekha Ray, *Change in Bengul Agrarian Society, c. 1760-1850* , pp.170-177 (New Delhi-1979).

২২. সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে দিনাজপুরের রাজ পরিবারের দুর্দৈব ও রাজা রাধানাথের কার্যকলাপ নিয়ে দ্বিজ জগন্নাথ একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা লেখেন', দ্রষ্টব্য ঃ *ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা,* পৃ. ১২০-১২৩।

২৩. সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩৯-১৪০।

২৪. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, 'ঔপনিবেশিক কালে নগরায়ণ-উনিশ শতকে দিনাজপুর শহরের বিকাশ ও উন্নয়ন', *দিনাজপুর ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* পৃ. ৩৮৫।

২৫. ঐ, পৃ. ৩৮৫।

২৬. এ সব পরগণা অধিকাংশই ছিল বর্তমান বালুরঘাট, রায়গঞ্জ ও সাবেক ঠাকুর গাঁ মহকুমার অধীনে।

২৭. সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত,* (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৯৭২, পৃ. ২০৪,২০৫।

২৮. *প্রতিলিপি* (সাহিত্য পত্রিকা), পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা, ১৪৮৮, বালুরঘাট, পৃ. ৫৯, ৬০।

২৯. ঐ, পৃ. ৭৯।

৩০. এ বিষয় বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যাবে ধনঞ্জয় রায়, 'দিনাজপুর জেলার নীল বিদ্রোহের ইতিহাস', *মূল্যায়ন,* নরহরি কবিরাজ সম্পাদিত, ২৭ বর্ষ ১৩৩৮, নববর্ষ পৃ. ২৫ থেকে ৩৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কোম্পানি আমল ও প্রশাসনিক সংস্কার ঃ ১৮০১-১৮৫৭

১. দিনাজপুর জেলা গঠন ও থানাসমূহ

ভৌগোলিক দিক দিয়ে প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির উত্তরাঞ্চল নিয়ে গঠিত এই জেলা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এ জেলার উচ্চতা — কোনও স্থানই একশত ফিটের বেশি উঁচু নয়। ছোট বড় নদী প্রবাহের দরুণ দিনাজপুর জেলার সবখানেই সমতল ভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবরের সময় তাঁর ভূমি মন্ত্রী টোডরমল বাংলা প্রদেশকে ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি পরগণায় বিভক্ত করেন। এগুলি হল ঃ ১. ঘোড়াঘাট, ২. পিঞ্জরা, ৩. বাজুহা, ৪. জন্নতাবাদ বা গৌড়, ৫. পূর্ণিয়া, ৬. তাজপুর, ৭. বারবাকাবাদ, ৮. সিলেট, ৯. সোনার গাঁও, ১০. ফতেহাবাদ, ১১. চাঁটগা, ১২. টান্ডা/রাজমহল/আকবর নগর, ১৩. শরীফাবাদ, ১৪. সেলিমাবাদ, ১৫. মান্দারান, ১৬. সাতগাঁও, ১৭. মাহমুদাবাদ, ১৮. খালিফাবাদ, ১৯. বগলা বা বাকলা। এর মধ্যে সরকার তাজপুর, সরকার পিঞ্জরা এবং সরকার ঘোড়াঘাট দিনাজপুর ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার তাজপুর, পিঞ্জরা ও ঘোড়াঘাটের সদর দফতরসমূহ বৃহত্তর দিনাজপুরেই অবস্থিত ছিল।[১]

১৭২২ খ্রিস্টাব্দে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য বাংলা-সুবাকে আবার নতুন করে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। এগুলি হল ঃ ১. বন্দর বালাশোর, ২. হিজলী, ৩. মুর্শিদাবাদ, ৪. বর্ধমান, ৫. হুগলী বা সাতগাঁও, ৬. ভূষণা, ৭. যশোর, ৮. আকবর নগর (রাজমহল), ৯. ঘোড়াঘাট, ১০. কড়িবাড়ি, ১১. জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) ১২. শ্রীহট্ট, ১৩. ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)। এর মধ্যে ঘোড়াঘাট চাকলার অধীনে ছিল আদি দিনাজপুর জেলা। আবার আকবর নগর চাকলার বেশ কিছু অংশও এ জেলার অন্তর্গত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। আদি দিনাজপুর জেলার সূচনায় সরকার তাজপুর, সরকার পিঞ্জরা, সরকার জান্নাতাবাদ, এই তিনটি সরকারের বেশ কিছু অংশ এবং সরকার ঘোড়াঘাট, সরকার পূর্ণিয়া ও সরকার বারবাকাবাদ, এইসব সরকারের অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই জেলা। তখন জন্নতাবাদ সরকারের অধীনে মোট মহলের সংখ্যা ছিল ৬৬টি এবং রাজস্ব ছিল ১৮৮,৪৬,৯৬৭ দাম (৪,৭১,১৭৪ টাকা এবং ৭ দাম)। পূর্ণিয়া সরকারের অধীনে ছিল ৯টি মহল, রাজস্ব ছিল ৬৪, ০৮, ৭৭৫ দাম (১,৬০,২১৯ টাকা এবং ১৫ দাম)। তাজপুর সরকারের অধীনে ২৯টি মহল

এবং রাজস্ব ছিল ৬৪, ৮৩, ৮৫৭ দাম (১,৬২,০৯৬ টাকা ও ১৭ দাম)। তাছাড়া, ঘোড়াঘাটের অধীনে মোট ৮৪টি মহলের রাজস্ব ছিল ৮০,৮৩, ০৭২ টাকা ১/২ দাম (২, ০২, ০৭৬ টাকা বা ৩২ ১/২ দাম)। কারো কারো মতে, বৃহত্তর দক্ষিণ রংপুর, বৃহত্তর দক্ষিণ পূর্ব দিনাজপুর ও বৃহত্তর উত্তর বগুড়া জেলা নিয়ে গঠীত হয়েছিল ঘোড়াঘাট সরকার। দিনাজপুর ও রংপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত সরকার পিঞ্জরা; এর মহলের সংখ্যা ২১টি এবং এর রাজস্ব ছিল ৫৮, ০৩, ২৭৫ দাম (১, ৪৫, ০৮১ টাকা ও ৩৫ দাম)। বারবাকাবাদ সরকারের অধীনে ছিল ৩৮টি মহল, রাজস্ব ছিল ১,৭৪, ৫১, ৫৩২ দাম (৪, ৩৬, ২৮৮ টাকা ও ১২ দাম)।[২]

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোগল সম্রাট শাহ আলম-এর কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করলে ওই বৎসরেই দিনাজপুরের জমিদারি ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে। তখন দিনাজপুর জমিদারিতে পরগণা ছিল ১২১টি এবং এর আয়তন ছিল ১১১৯ বর্গমাইল। সেই সময় বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা এবং পূর্ব মালদহের কিছু অংশ এর অধীনে ছিল। বাংলার প্রথম গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসে দেওয়ানি প্রশাসনের কিছু সংস্কার সাধন করেন। তিনি বাংলাকে ১৯টি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত করেন। প্রতিটি জেলার জন্য শাসনভার ন্যস্ত করা হয় 'কালেক্টর' নামক একজন ইংরেজ কর্মচারীর অধীনে। এইভাবে বাংলায় 'জেলা' নামে প্রশাসনিক ইউনিট প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। জেলার অধীনে বড় জমিদারির নাম অনুসারে জেলার নামকরণ করা হয়। এইভাবে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম, বঙ্গকে যে ১৯টি জেলায় বিভক্ত করা হয়, তার নামগুলি ঃ হুগলী, মাহমুদশাহী, নদীয়া, দিনাজপুর,[৩] রংপুর, বীরভূম, যশোহর, ঢাকা, রাজশাহী, লক্ষরপুর, রোকনপুর, ত্রিপুরা, কালিন্দা (নোয়াখালী), জাহাঙ্গীরপুর, চুনাখালী, চট্টগ্রাম, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং কলকাতা। জেলা সৃষ্টির সময় ভূমি প্রশাসন ও ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হয় কালেক্টরের হাতে। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীকে ৫টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। এই সময় জেলার সংখ্যা আরও ৯টি বাড়িয়ে মোট ২৮টি করা হয়। কয়েকটি জেলা নিয়ে ওই সালেই গঠিত হয় একটি প্রদেশ। এই প্রদেশগুলির নাম কলকাতা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও ঢাকা প্রদেশ।[৪]

১. কলকাতা প্রদেশ ঃ সদর দফতর ছিল কলকাতায়। জেলার সংখ্যা ছিল ৬টি। এগুলি হ'ল, চব্বিশ পরগণা, হুগলী, হিজলী, নদীয়া, যশোহর, মাহমুদশাহী।
২. বর্ধমান প্রদেশ ঃ সদর দফতর বর্ধমান। জেলার সংখ্যা ৪টি। বর্ধমান, মেদিনীপুর, বিষেণপুর (বাঁকুড়া), বীরভূম।
৩. মুর্শিদাবাদ প্রদেশ ঃ সদর দফতর ছিল মুর্শিদাবাদ। জেলার সংখ্যা ৭টি। রাজশাহী পূর্ব ও পশ্চিম, রোকনপুর, চুনাখালী, লস্করপুর, জাহাঙ্গীরপুর এবং খাস তালুক।
৪. দিনাজপুর প্রদেশ ঃ সদর দফতর দিনাজপুর। জেলার সংখ্যা ৫টি। এগুলি হল, দিনাজপুর, শিলবর্ষ (বগুড়া), রংপুর, ইদ্রাকপুর ও কুচবিহার।
৫. ঢাকা প্রদেশ ঃ সদর দফতর ঢাকা। জেলার সংখ্যা ৪টি। এগুলি হল, ঢাকা,

আটিয়া (ময়মনসিংহ), কাগমারী, বড়রাজু (পাবনা)।[৫] তখন চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরা জেলা দুটিকে কোনও প্রদেশ ভুক্ত করা হয়নি।

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে জেলাগুলিকে আরো শক্তিশালী প্রশাসনিক ইউনিটে পরিণত করার উদ্দেশ্যে জেলা কালেক্টরের হাতে সর্বময় ক্ষমতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সময় জেলাগুলিকে এমনভাবে পুনগঠন করার নীতি গ্রহণ করা হয় যাতে কোনো জমিদারি বিভক্ত না হয়ে এক জেলায় অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মোটের উপর কোনও জেলার ভূমি রাজস্বের পরিমাণ যেন পাঁচ লক্ষ টাকার কম না হয়। কোম্পানি সরকারের এই নীতির ভিত্তিতে জেলার সংখ্যা ২৮ এর স্থলে ১৪টি জেলা করা হয়। জেলাগুলি হ'ল ঃ বীরভূম, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা, যশোহর, ঢাকা, রাজশাহী, দিনাজপুর, ভুলুয়া, ময়মনসিংহ, রংপুর, বর্ধমান ও নদীয়া। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিটি জেলায় দেওয়ান পদ বিলুপ্ত করে জেলা কালেক্টরকে জেলার বিচার সংক্রান্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ নবাবের কাছ থেকে নিজামতের সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে নেন এবং সমস্ত ফৌজদারি ও পুলিশি ক্ষমতা জেলা কালেক্টরের হাতে ন্যস্ত করেন। এই প্রথম আধুনিক জেলা প্রথা সূচিত হয়। এই প্রথায় জেলা কালেক্টরের হাতে বিচার, পুলিশ ও রাজস্ব বিভাগের ক্ষমতা থাকার জন্য, এই তিন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকায়, কালেক্টররা স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠে। এর ফলে লর্ড কর্ণওয়ালিশ জেলাগুলিতে দু'টি কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করেন। একটি কালেক্টর-এর কর্তৃপক্ষ, অপরটি সিভিল জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট-এর কর্তৃপক্ষ।

১৭৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে দিনাজপুর জেলায় নানান পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন, শাসক বর্গের প্রশাসন, প্রতিরক্ষা এবং রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। এই সময় বিস্তীর্ণ এলাকার উপর সুদৃঢ় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ রক্ষার জন্য জমিদারদের উপর সরকারের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ-এর সময় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রথম থানার উদ্ভব হয়। ওই সময় দিনাজপুর জেলার আয়তন ছিল বিশাল এলাকা জুড়ে। জেলা সদর থেকে দীর্ঘসময় একদিন অথবা দুই দিন লেগে যেতো মফস্বলের গ্রাম-গ্রামান্তরে যেতে। শান্তি-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ রাখা কঠিন হয়ে পড়ত। এর দরুণ চুরি-ডাকাতি বেড়ে যায় এবং পল্লীর অভ্যন্তরে মারাপিট, খুন, রাহাজানি, ইত্যাদি সমাজ বিরোধী কাজকর্ম বেড়ে যায়।[৬] এই অবস্থা দূর করার জন্য দিনাজপুর জেলাকে ২২টি থানায় বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি থানার ভার ন্যস্ত করা হয় একজন দারোগার উপর। তার অধীনে ন্যস্ত হয় নিয়ামত পুলিশবাহিনী। দিনাজপুর জেলাকে প্রথম যে ২২টি থানায় বিভক্ত করা হয় তার নাম ঃ ১. দিনাজপুর, ২. বীরগঞ্জ, ৩. কালিয়াগঞ্জ, ৪. হেমতাবাদ, ৫. বংশীহারী, ৬. জগদ্দল, ৭. মালদহ, ৮. পতিরাম, ৯. গঙ্গারামপুর, ১০. বদলগাছি, ১১. লালবাজার, ১২. পত্নীতলা, ১৩. পোর্শা, ১৪. চিন্তামণ, ১৫. হাওড়া, ১৬. নওয়াবগঞ্জ, ১৭. ঘোড়াঘাট বা রাণীগঞ্জ, ১৮. ক্ষেতলাল, ১৯. পীরগঞ্জ, ২০. রানিশংকৈল, ২১. রাজারামপুর, ২২. ঠাকুর গ্রাম।[৭]

সিপাহী বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত দিনাজপুর জেলায় ২২টি থানাই অটুট ছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত

থেকে ব্রিটিশ সরকার অধিগ্রহণ করে। ওই সময়ের পর থেকে দিনাজপুর জেলার ২২টি থানাকে কখনও সংকোচন এবং কখনও বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম উইলসন হান্টার দিনাজপুর জেলার পরিসংখ্যান ও বিবরণ সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে হান্টারের বিবরণে আগের ২২টি থানার পরিবর্তে ১৭টি থানার পরিচয় পাওয়া যায়। আগের জগদ্দল, মালদহ, লালবাজার, ক্ষেতলাল ও বদলগাছি থানার কোনও উল্লেখ নেই।[৮] তখন দিনাজপুর জেলার আয়তন ছিল ৪০৯৫.১৪ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ ১ হাজার ৯ শত ২৪ জন।

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক এক আদেশ বলে কয়েকটি জেলাকে নিয়ে একটি করে বিভাগ সৃষ্টি করেন। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহকুমা প্রশাসনিক ইউনিট সৃষ্টি করা হয়। স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসন কাঠামোয় গ্রামীণ এলাকায় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ইউনিয়ন গঠিত হয়। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে শহর এলাকায় গঠিত হয় দিনাজপুর শহরে মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা।[৯] উল্লেখ্য, ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও পাবনা নিয়ে গঠিত হয় রাজশাহী বিভাগ। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং, জেলাগুলি রাজশাহী বিভাগের অধীনভুক্ত করা হয়। তখন ঐ বিভাগের নামকরণ করা হয় রাজশাহী ও কুচবিহার বিভাগ। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহার সেখানকার রাজার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ওই সময় এই বিভাগের নতুন নামকরণ হয় রাজশাহী বিভাগ। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মালদহ জেলা রাজশাহী বিভাগভুক্ত হয়।

জেলা প্রশাসনের সুবিধার জন্য দিনাজপুর জেলায় প্রথম কয়েকটি থানাকে নিয়ে একটি মহকুমা গঠন করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর সদর মহকুমা গঠিত হয়। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরগাঁও মহকুমা গঠিত হলেও ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে তা লুপ্ত হয় এবং পুনরায় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরগাঁও মহকুমা প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১০] ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, পোর্শা, পত্নীতলা ও ফুলবাড়ী থানার সমন্বয়ে বালুরঘাট মহকুমা গঠিত হয়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলার পশ্চিম সীমানা ছিল নাগর নদী এবং পূর্ব সীমানা ছিল করতোয়া নদী পর্যন্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই জেলার অধীনে ছিল মালদহ ও বগুড়া জেলা এলাকা এবং রাজশাহী জেলার কিছু অংশ। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে মালদহ জেলা গঠিত হয় এবং ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে বগুড়া জেলা।[১১] এই জেলা দুটি গঠনের সময় দিনাজপুর জেলার বেশ কয়েকটি থানা জেলা দুটির অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দেও দিনাজপুর জেলার আরও কিছু অংশ বগুড়া ও মালদহ জেলাভুক্ত হওয়ার উদ্যোগ অব্যহত থাকে। দিনাজপুর জেলা থেকে মহাদেবপুর থানা ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী জেলার অধীনভুক্ত করা হয়।[১২] ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জনের বাংলা ভাগের সিদ্ধান্তের ফলে দিনাজপুর নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ-এর ফলে দিনাজপুর আবার আগের জায়গায় ফিরে যায়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের পর কোন একটি সময়ে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ২.২০ বর্গমাইল এলাকা দিনাজপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে হিলি থানা দিনাজপুর জেলা ভুক্ত হয়। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৮ই

জানুয়ারি দিনাজপুর জেলার পোর্শা থানার চারটি মৌজা, তপন থানার চারটি মৌজা প্রশাসনিক সুবিধার জন্য মালদহ্ জেলার বামনগোলা থানার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।[১৩]

প্রশাসনের সুবিধার জন্য আগের ২২টি থানাকে পরিবর্তন করে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ১৭টি থানায় পরিণত করা হয়।[১৪] থানাগুলি হল ঃ ১. দিনাজপুর, ২. রাজারামপুর, ৩. বীরগঞ্জ, ৪. কালিয়াগঞ্জ, ৫. হেমতাবাদ, ৬. বংশীহারী, ৭. গঙ্গারামপুর, ৮. পতিরাম, ৯. পত্নীতলা, ১০. পোর্শা, ১১. চিন্তামণ, ১২. হাবরা, ১৩. নওয়াবগঞ্জ, ১৪. ঘোড়াঘাট, ১৫. পীরগঞ্জ, ১৬. রানিশংকৈল ১৭. ঠাকুরগ্রাম।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের পর ১৭টি থানাকে পরিবর্তন করে প্রশাসনের সুবিধার্থে আবার ৩০টি থানায় পরিণত করা হয়। থানাগুলি হল ঃ ১. দিনাজপুর, ২. চিরিরবন্দর, ৩. পার্ব্বতীপুর, ৪. নওয়াবগঞ্জ, ৫. ঘোড়াঘাট, ৬. বিরল, ৭. কুশমণ্ডি, ৮. বংশীহারী, ৯. কালিয়াগঞ্জ, ১০. হেমতাবাদ, ১১. রায়গঞ্জ, ১২. ইটাহার, ১৩. বালুরঘাট, ১৪. কুমারগঞ্জ, ১৫. গঙ্গারামপুর, ১৬. তপন ১৭. ফুলবাড়ী, ১৮. ধামইরহাট, ১৯. পত্নীতলা, ২০. পোর্শা, ২১. ঠাকুরগাঁও, ২২. আটবাড়ি, ২৩. বালিয়াডাঙ্গি, ২৪. হরিপুর, ২৫. রানিশংকৈল, ২৬. পীরগঞ্জ, ২৭. বোচাগঞ্জ, ২৮. বীরগঞ্জ, ২৯. কাহারুল, ৩০. খানসামা। এরমধ্যে প্রথম ১২টি থানা নিয়ে দিনাজপুর সদর মহকুমা গঠিত হয়। ৮টি থানা নিয়ে বালুরঘাট মহকুমা এবং ১০টি থানা নিয়ে ঠাকুরগাঁও মহকুমা প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্তের ফলে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ জেলার ৩০টি থানার মধ্যে ৯টি সম্পন্ন এবং ১টি অংশ বিশেষ থানাকে পশ্চিম বাংলাভুক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় পরিণত করেন। বাকী ২০টি থানার সম্পন্ন অংশ এবং হিলির অংশ বিশেষ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পূর্ব দিনাজপুর জেলা গঠিত হয়। ওই সময় পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্ব দিনাজপুর জেলার সঙ্গে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ জলপাইগুড়ি জেলার দেবীগঞ্জ, বোদা, তেতুলিয়া ও পঞ্চগড় থানাগুলিকে দিনাজপুর জেলাভুক্ত করেন। দিনাজপুর জেলার সাবেক পোর্শা, পত্নীতলা ও ধামইরহাট থানাগুলি রাজশাহী জেলায় স্থানান্তরিত করা হয়।[১৫]

দেশভাগের পর বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, গঙ্গরামপুর ও তপন থানা নিয়ে বালুরঘাট মহকুমা গঠিত হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে বালুরঘাট মহকুমায় অন্তর্ভুক্ত হয় হিলি থানা। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, ইটাহার, কুশমন্ডি ও বংশীহারী থানা নিয়ে গঠিত হয় রায়গঞ্জ মহকুমা। দিনাজপুর জেলার সাবেক থানাগুলি যথা ঃ দিনাজপুর সদর, রাজারামপুর, ক্ষেতলাল, লালবাজার, বদলগাছি, জগদল, চিন্তামণ, হাবরা, নবাবগঞ্জ, পুরুষ বা পোর্শা, পত্নীতলা, পতিরাম, ঠাকুরগ্রাম, বীরগঞ্জ, বামনগোলা, আটোয়ারী, হরিপুর, রানিশংকৈল বংশীহারী, মালদহ, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট, আদমদিঘি, হরিপুর, কাহারুল, খানসামা, বিরল, চিরিরবন্দর, পার্ব্বতীপুর, ফুলবাড়ি, ইটাহার, কুশমন্ডি, তপন, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, গঙ্গরামপুর ও ঘোড়াঘাট। এইসব থানার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী, প্রত্নতত্ত্ব, জীবন ও সংস্কৃতির কিছু পরিচয় দেওয়া হল।

পত্নীতলা থানা

পত্নীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত স্থানই পত্নীতলা। পতিপরায়ণা পত্নী থেকে পত্নীতলা নামকরণ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এই থানার নিকটেই রয়েছে মহিসন্তোষ নামে একটি প্রাচীন জনপদের অস্থিত্ব। কথিত যে, প্রথম মহিপালদেবের প্রাদেশিক রাজধানী বা জয়স্কন্ধাবার ছিল। শিক্ষায় উন্নত এই থানায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বসতি ছিল অধিকতর। পাল রাজারা এখানে এসে ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে শান্তিজল নিতেন। পাল আমলে এই অঞ্চলে শিল্পকলায় চরম উন্নতি লাভ করেছিল। এখানকার প্রস্তর ও ভাস্কর্য শিল্প সারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। পালবংশের পতনের পর গৌড়ীয় প্রস্তর শিল্পের অবনতি শুরু হয়। সুলতান রুকন-উদ্-দীন বারবাক শাহের আমলে (১৪৫১-৭৬) বারবকাবাদ শহর এখানে গড়ে উঠেছিল। সুলতান বারবাক শাহ মহিপালের রাজদরবার ও প্রাসাদ মসজিদে পরিণত করেছিলেন। বারবকাবাদে একটি টাঁকশালও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মীনহাজ তাঁর বিখ্যাত *তবকাত-ই-নাসিরী* গ্রন্থে লিখেছেন, এখানেই মহম্মদ বখ্তিয়ারের সঙ্গী-ও লখনৌতি রাজ্যের শাসনকর্তা মহম্মদ শিরান খিলজীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল। মোগল আমলের প্রথমদিকেও এই থানার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের পর প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য পত্নীতলা[১৬] থানাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। তখন গভর্নর জেনারেল ছিলেন স্যার জন এ্যাডাম (১৮২৩ খ্রী)। একটি অংশ পত্নীতলা থানাতেই থেকে যায়। অপর অংশটি নিয়ে গঠিত হয় নতুন থানা ধামইরহাট। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী পত্নীতলা থানার মোট এলাকা ছিল ১৪৯ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল ৬৮ হাজার ৪ শত ৮৬ জন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে এই থানাটি দিনাজপুর জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজশাহী জেলায় স্থানান্তরিত হয়।[১৭]

পতিরাম থানা

বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের অন্যতম শরিক রণেন্দ্র মোহন ঠাকুরের বিশাল জমিদারি এখানে। তাছাড়া, পিরালি কাছারি এবং পতিরাম মেলার জন্যও জায়গাটির খ্যাতি রয়েছে। পতিরামের আরও একজন জমিদার ছিলেন কৃষ্ণলাল ঘোষ। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই জমিদার পরিবারের অবদান ছিল অপরিসীম। আত্রাই নদীর মনোরম বাঁকে প্রাচীন এই থানাটি ধান, পাট, এবং আখের চাষের জন্য খ্যাত ছিল। এখানে অতীতের বিদ্যেশ্বরী মন্দির প্রাচীন দেবস্থান। দিনাজপুরের মহারাজা বৈদ্যনাথের আমলে এই থানার নাজিরপুর অঞ্চলের খাঁপুর গ্রামে সিংহবাহিনী দেবীর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে হান্টার সাহেবের বিবরণে ঐতিহ্যমণ্ডিত এই থানাটির এলাকা ছিল ২৯৩ বর্গমাইল, গ্রামের সংখ্যা ৬৪৯টি, বাড়ীর সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৮১ এবং লোকসংখ্যা ৬৬ হাজার ৮ শত ৬৬ জন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বালুরঘাটে মুন্সেফি আদালত চালু হয়। ওই সময় প্রশাসনিক সুবিধার জন্য পতিরাম থেকে থানাটি তুলে নিয়ে গিয়ে থানার হেডকোয়ার্টার বালুরঘাটে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পতিরামের পরিবর্তে থানাটির নতুন নামকরণ হয় বালুরঘাট থানা নামে। ১৯৪১ সনের আদমশুমারি অনুযায়ী বালুরঘাট থানার মোট এলাকা ছিল

১৮১ বর্গমাইল, মোট জনসংখ্যা ৯২ হাজার ১৬ জন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বালুরঘাট মহকুমা গঠিত হয়। বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, তপন, ফুলবাড়ি, পোর্শা, পত্নীতলা, ধামইরহাট, এই মোট ৮টি থানা বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়।

ঠাকুরগ্রাম থানা

দিনাজপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ একটি থানা। ঠাকুরগ্রাম আসলে ঠাকুরগাঁ নামেই বহুল প্রচলিত। থানা হেড কোয়ার্টারটি ছিল টাঙ্গন নদীর তীরে। নদীর অপর পাড়ে রয়েছে মহারাজা রামনাথের তৈরি রাজ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এবং একটি প্রাচীন গোবিন্দ মন্দির। যোগাযোগের সুবিধার জন্য এখান থেকে রাজা প্রাণনাথের প্রিয় প্রাসাদ প্রাণনগর পর্যন্ত একটি খাল খনন করিয়েছিলেন রাজা রামনাথ, এই খালটি রামদাঁড়া নামে পরিচিত।

ঠাকুরগ্রাম হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের একটি উন্নত জনপদ। প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এই থানার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই থানার গড়েয়ারহাট গ্রামটি সাবেক স্মৃতি চিহ্ন বিজড়িত। কিছুকাল আগেও এই গ্রামে চিরত্ন সামগ্রী বেশ কিছু ঢিবি ছিল। সেসব আজ সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছে। একদা এখানে যে একটি উন্নত জনপদ ছিল তা এখানকার অনেকগুলি মজে যাওয়ার পুকুর, কিছু দিঘি দেখলেই বোঝা যায়। ঠাকুর-গ্রাম থানার তিন মাইল দূরে যেখানে বর্তমানে বাংলাদেশ রাইফেলস বাহিনীর আঞ্চলিক প্রধান দপ্তর, ওই অঞ্চলে একদা প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসবাহী অসংখ্য ঢিবি ছিল। কিছুকাল আগেও এই অঞ্চলে যে এক বিরাট নগরীর ধ্বংসাবশেষ ছিল তা এলাকার বয়স্ক মানুষের কাছে জানা যায়। এই নগরীর পাশ দিয়েই একদা বয়ে যেতো করতোয়া নদী। এই অঞ্চলে বর্তমানে গোবিন্দনগর দুর্গ নামে একটি সাবেক দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে। সাবেক ঠাকুরগ্রাম বিভাগটি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা শহরের মর্যাদা লাভ করেছিল। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সার্স রিপোর্টে মোট ১০টি থানা নিয়ে ঠাকুরগাঁও মহকুমা গঠিত হয়। থানাগুলি হল ঃ ঠাকুরগাঁও, বালিয়াডাঙ্গী, আটওযারী, রানিশংকৈল, হরিপুর, পীরগঞ্জ, বোচাগঞ্জ, বীরগঞ্জ, খানসামা ও কাহারুল। ওই সময় ২৫০ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল এই থানা, মোট জনসংখ্যা ছিল ১ লাখ ৩৩ হাজার ৬ শত ৭৮ জন।[১৮]

বীরগঞ্জ থানা

আখের গুড়, তিল ও রবিশস্যের জন্য খ্যাতি ছিল এই থানা। বীরগঞ্জ থানার পশ্চিম-উত্তর প্রান্তে অবস্থিত কাঠগড় নামক স্থানটি প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে খ্যাত। এখানে রাজার দিঘি নামে প্রাচীন জলাশয়ের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব দেখে এবং জায়গায় জায়গায় বড় বড় পরিখার চিহ্ন দেখে মনে হয় একদা একটি সু-রক্ষিত দুর্গ নগরী এখানে ছিল। এই থানার সিঙ্গরা, ওজালপুর, গোপালপুর, শিতলাই, ঝলঝলি ইত্যাদি গ্রামগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতি নিদর্শনে ভরপুর। এখান থেকে প্রাচীন কয়েকটি সূর্য ও বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলি দিনাজপুর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এই থানার মোট সীমানা ছিল ৩০৩ বর্গ কিলোমিটার, গ্রামের সংখ্যা ছিল ৪৬৬, বাড়ির সংখ্যা ২৪

হাজার ৮ শত ৩৫ এবং লোকসংখ্যা ১ লাখ ৫০ হাজার ৯৭ জন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাসে এই থানার সীমানা অনেক অংশ কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১৫৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৬৮ হাজার ৬৯ জন।

বামনগোলা থানা

সাবেক জগদ্দল থানার পরিবর্তে বামনগোলা নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। প্রশাসনিক সুবিধা ও যোগাযোগের সুবিধার জন্য টাঙ্গন নদীর তীরে এই থানার হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয়। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে মালদহ জেলা গঠিত হলে এই থানাটি মালদহ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই থানার পুরানো বারিন্দা, বাঁশুড়া, বেরল, গোবিন্দপুর, ফরিদপুর, সিমলা, জগদলা, মদনাবতী, শিববাটি প্রভৃতি গ্রামগুলি প্রত্নরত্নে ভরপুর। টাঙ্গন নদী এই থানাকে সুজলা সুফলা ভূখন্ডে পরিণত করেছে। প্রাচীন গম্ভীরা পূজা ও উৎসব এই থানার ঐতিহ্যবাহী লোকউৎসব। জগদলা গ্রামে এখনও একটি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

পাল বংশীয় রাজা রামপালের সহধর্মিনীর নামে পরিচিত মদনাবতী একটি ঐতিহাসিক পল্লী। এই গ্রামের মেঘডম্বর দিঘির দক্ষিণ তীরে বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ মহামতি উইলিয়ম কেরী তাঁর মিশনারী জীবনের কর্মকান্ড শুরু করেছিলেন। প্রথম বিদ্যালয়, বঙ্গলিপির প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র, প্রথম কৃষি খামার মহামতি উইলিয়ম কেরী এখানেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম নির্দশন *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র* মদনাবতী গ্রামে বসেই লিখেছিলেন বাঙালি মুন্সী রামরাম বসু। সংস্কৃত পণ্ডিত কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় উইলিয়ম কেরীর শিক্ষকরূপে সংস্কৃত ও হিন্দুদের বেদ, পুরাণ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রগুলি পড়িয়েছিলেন।

এই থানার অধীনে শিববাটি গ্রাম ছিল ব্রাহ্মণী নদীর তীরে। কৈবর্ত বিদ্রোহের নায়ক দিব্যের ভাই রুদোক এবং তার পুত্র ভীমের নানা স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এখানে দীর্ঘদিন ধরে সাড়ম্বরে ভীমের কীর্তিকথা নিয়ে ভীম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মানুষেরা এখানে ভীমের প্রশস্তি এবং বীরগাঁথা অবলম্বন করে লোকগান করেন।

> "বরেন্দ্রভূমি পূজি সগায় সঙ্গে নিয়া ভীমক।
> সুখে কাটাই হামরা এই জগতে আজা কৈবর্ত দিব্যক।।
> এমনি একদিনেতে আইলো ঝড় উথাল-পাতালি হায়রে।
> পশ্চিম দিক হইতে আমপাল আইলো কৈবর্তদের নিধনে।।
> ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ নাগিলো বরেন্দ্র হইলো ছারখার।
> হেই না দেখে কৈবর্তরা ফের বান্ধিলো পাল রাজাক।।
> যুদ্ধ ক্ষেত্রে কৈবর্ত ভীম মৃত্যুক রচিলো।
> আজা হইলো আমপাল ফের কৈবর্ত ভূমিতে।।"[১৯]

এখানকার হরিহর শিবমন্দিরটি রাজা ভীম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বলে কথিত। মন্দিরের শিব লিঙ্গটির উচ্চতা গৌরীপট থেকে প্রায় সাড়ে সতেরো ইঞ্চির মত। স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে জানা যায়, পূর্বে এর উচ্চতা ছিল প্রায় আট-নয় ফুট। বাঁশের মই বানিয়ে উপরে উঠে এখানে একসময় শিবের মাথায় জল ঢালা হত। চৈত্রমাসে চড়ক সংক্রান্তির

রাত্রিতে এখানে মেলা বসে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে এই রচনাকারের দেখা ওই মেলায় হরেকরকম সাপের চামড়া বিক্রি হত। মেলার এ একঅভিনব আকর্ষণ। বর্তমানে এই থানার আয়তন ২০৫.৯১ বর্গ কিলোমিটার, মৌজা ১৪৫টি এবং গ্রামের সংখ্যা ১৪১টি।

আটোয়ারী থানা

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হলে তেতুলিয়া, বোদা, দেবীগঞ্জ, চিলাহাটি, ডোমার, আটোয়ারী, ও পঞ্চগড়, এই ৭টি থানা নিয়ে পঞ্চগড় নামে একটি নতুন জেলা গঠিত হয়। আটোয়ারী বর্তমানে পঞ্চগড় জেলার অধীনে একটি উপজেলা। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে এই থানার সীমানা ছিল ৮১ বর্গমাইল। মোট জনসংখ্যা ৪৩ হাজার ২ শত ১৮ জন। ঠাকুরগাঁও সদর থেকে পশ্চিমদিকে অবস্থিত সাবেক আটওয়ারী থানাটি ধান উৎপাদনের জন্য সুনাম ছিল।

হরিপুর থানা

প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতি ঘেরা এই থানার গেড্ডা একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে যত্রতত্র প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্র দেখা যায়। কথিত যে, পালরাজা রামপাল বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য কৈবর্তরাজা ভীমের বিরুদ্ধে এখান থেকেই প্রথম যুদ্ধযাত্রা সূচিত করেন। রামপালের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ যখন প্রবল, সেই সময় হাতির পিঠে চড়ে ভীম ছুটতে ছুটতে ভুলবশত রামপালের সেনা ছাউনিতে চলে যান। রামপালের সেনারা ভীমকে তখন আটক করেন। রাজা ভীমকে আটক থাকতে দেখে ভীমের সেনারা ভয়ে পালিয়ে যায়। ওই সময় ভীমের বন্ধু হরিবর্মণ পলায়নরত সেনাদের সংঘবদ্ধ করে আবার যুদ্ধ করতে থাকেন। রামপালের পুত্র তখন প্রচুর অর্থ দিয়ে হরিবর্মণকে হাত করেন এবং যুদ্ধে ভীমবাহিনী পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে রামপালের সেনারা ভীমের চোখের সামনেই ভীমের পরিবারবর্গকে মেরে ফেলে এবং শেষে অসংখ্য তীরের আঘাতে ভীমকেও হত্যা করা হয়। রামপাল রাজ্য ফিরে পেলে হরিবর্মণকে প্রচুর অর্থ ও উপাহার দিয়েছিলেন। হরিবর্মণের নাম থেকেই স্থানটির নাম হরিপুর হয়েছে বলে কথিত। এই অঞ্চলে এই রকম লোককাহিনি এখনও শোনা যায়। প্রাক্-স্বাধীনতা কালে এই থানার সীমানা ছিল ৭৮ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ২৭ হাজার ৪ শত ৪ জন।[২০]

আদমদিঘি থানা

সাবেক দিনাজপুর জেলার এই থানাটি বর্তমানে বাংলা দেশ রাষ্ট্রের বগুড়া জেলার অধীনে একটি উপজেলা। রুকিন্দিপুর, গোপীনাথপুর, আক্কেলপুর, তিলকপুর, রায়কালী, নশরৎপুর, ছাতিনপুর, সান্তাহার, কুন্দগ্রাম, চাঁপাপুর এবং আদমদিঘি, এই ১১টি অঞ্চল নিয়ে থানাটি গঠিত হয়েছিল। গ্রামের সংখ্যা ছিল ৫৮৩, আয়তন ১ লাখ ১৬ হাজার ৩ শত ৩৪ একর। পিঞ্জরা ও ঘোড়াঘাট, বাজুহা, বারবাকাবাদ প্রভৃতি সরকারের অধীনে ছিল এই গ্রামগুলি। কথিত যে, আদম নামে একজন অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন ফকির বাস করতেন এখানে। নাটরের রানি ভবানী তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। আদম ফকিরের

নামে একটি দিঘি ও দিঘির পাড়ে আদম বাবার দরগা নির্মাণ করে তিনি ফকিরকে উৎসর্গ করেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান, এই উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ আদম বাবাকে শ্রদ্ধা করেন। এই দিঘি ও আদমের নাম হতে স্থানটির নাম হয় আদমদিঘি।

লোকমুখে কথিত যে, দেবপাল নামে একজন রাজার প্রাসাদ ছিল এখানে। এই থানার পূর্ব দিকে তালশন গ্রামে সারস্বত ব্যাকরণের টীকাকার পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের জন্ম স্থান ছিল। *কৃতভাষ্য, রাজু দীপিকা* ও *প্রভাবতী* এই নামে সারস্বত ব্যাকরণের তিনি টীকা রচনা করেছিলেন। এই বংশে প্রচুর পণ্ডিতজন জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। এখানেই ছাতিন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন পুণ্য শ্লোকা রানি ভবানী। জয়া দুর্গা মন্দিরটি এই গ্রামেই রানি ভবানীর মা স্থাপিত করেছিলেন। আদমদিঘি সাবেক থানাটির কাছে ছাতিন গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী পুকুরের পাড়ে তপস্যা করে আত্মরাম চৌধুরী রানি ভবানীর মত কন্যারত্ন লাভ করেছিলেন। এখান থেকে নীল সরস্বতী, বাসুদেব ও সূর্যমূর্তি এখনও রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সেন্টারে স্মৃতি বহন করে চলেছে।

রানিশংকৈল থানা

প্রাচীন এই থানার ৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত নেকমর্দান নামক স্থানে শেখ নাসির-উদ-দীন-নেকমর্দান নামে বিখ্যাত এক মুসলিম দরবেশের মাজার ছিল। এই সমাধিস্থলকে উপলক্ষ করে কোম্পানি আমলের অনেক আগে থেকেই বিরাট মেলা বসত। এই থানার ভবানন্দপুর গ্রামটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। গুপ্তযুগের নানান নিদর্শন পাওয়া গেছে এখানে। গ্রানাইট পাথরের বড় বড় স্তম্ভ, প্রাচীন ইট, মৃৎপাত্র ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়। প্রচুর জলাশয় এই গ্রামটি জুড়ে। এখানকার গড়গ্রাম, পূর্বে চন্দ্রহার ও চামারদিঘি এবং কয়েক মাইল বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে সুবিশাল গড়টি প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদে ভরপুর।

রানিশংকৈল থানা সদরে এক ধ্বংসপ্রাপ্ত সুবিশাল দুর্গের লাগোয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত কুলিক নদী। এই নদীর তীরে মালদুয়ার জমিদার বাড়ি। এখান থেকে আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীর একটি তাম্রলিপি পাওয়া যায়।

এই লিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে 'মহমাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ জটোদা নদীতে স্নান করে ঢেক্করী হতে পিপোল্ল মণ্ডলান্ত পাতী গাপ্পিটিপ্যাক বিষয়ে দিগ্‌ঘাঘোদিকা গ্রাম নিব্বোক শর্মাকে দান করেছিলেন।' লিপিটি থেকে আরও জানা যায় যে, 'ঈশ্বর ঘোষের পিতা ছিলেন ধবল ঘোষ, পিতামহ বল ঘোষ এবং প্রপিতামহ ছিলেন ধূর্ত ঘোষ এবং শেষের ব্যক্তিটি ছিলেন রাঢ় অঞ্চলের অধিপতি।'[২১] মহলবাড়ি এই থানার আরও একটি প্রত্নস্মৃতি অঞ্চল। এখানে হোসেন শাহর আমলের শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে বলে জানা যায়।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সাবেক এই থানাটির সীমানা ছিল ১৮৬ বর্গমাইল, গ্রামের সংখ্যা ১৯৮টি, বাড়ির সংখ্যা ১৫ হাজার ৫ শত ৭ জন এবং লোকসংখ্যা ছিল ৭৮ হাজার ৬ শত ৯৬ জন। ১৯৪১ সালের সেন্সাসে সাবেক সীমানার পরিবর্তন হয়ে ১১১ বর্গমাইলে দাঁড়ায়। মোট জনসংখ্যা ৪৮ হাজার ৪ জন ছিল।

বংশীহারী থানা

চিরন্ত কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ, অসংখ্য প্রস্তর খণ্ড, মূর্তি, মূল্যবান প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে এই থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে এবং বর্তমান কালেও পাওয়া যাচ্ছে। এই থানার আধার মানিক, পাথরঘাটা, বড় কসবা, কিসমত কসবা, আরজি-হাজারি কসবা প্রভৃতি গ্রামে হিন্দু-বৌদ্ধযুগের নানান প্রত্ন নির্দশন পাওয়া যায়। এই থানার পশ্চিম প্রান্তে একডালা নামক গ্রামটিতে ইতিহাসের ঐতিহ্যমন্ডিত একডালা দুর্গের অবস্থান নির্ণয় করেছেন আধুনিক যুগের কিছু কিছু ঐতিহাসিক। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহের আক্রমণ প্রতিহত করতে আশ্রয় নিয়েছিলেন সুলতান ইলিয়াস শাহ ও সিকান্দার শাহ। এই ঘটনা চতুর্দশ শতাব্দীর। স্টেপলটন সাহেবের মতে গৌড় সুলতান হুসেন শাহের বাসস্থান ছিল এখানে। চিরামতী (শ্রীমতী) এবং বালিয়া নদীর মধ্যবর্তী এই অঞ্চলে হিন্দু স্থাপত্যেরও প্রচুর নির্দশন আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। একডালায় প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুমূর্তির পাদদেশে খোদিত আছে ধর্মপালের রাজত্বকালের ষষ্ঠ বিংশতি বর্ষের কথা। ধর্মপালের ষষ্ঠ বিংশতি বর্ষ তাও প্রায় ৮ শত খ্রিস্টাব্দে উদ্‌যাপিত হয়েছিল। এখান থেকে পাওয়া গেছে একটি দুষ্প্রাপ্য গজসিংহের মূর্তি। পুন্ডিগ্রাম থেকে পাওয়া গেছে পদ্মপানি অবলোকিতেশ্বর মূর্তি, পাওয়া গেছে মনসা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, বিষ্ণু, কারুকাজ সমন্বিত পাথরের দরজার কাঠাম, শিলাখণ্ড ইত্যাদি। এই থানার অদূরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ আরও একটি অঞ্চল বৈরহাট্টা। মহাভারতের বিরাট রাজার নামের সঙ্গে যুক্ত এই আলোক উজ্জ্বল অঞ্চলটি। এখানে সাবেক কালের বড় বড় দিঘি রয়েছে। সে সব দিঘির কাব্যকথা ও কিংবদন্তি আজও এই অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে ফেরে। এইসব দিঘির পাড় থেকে চামুন্ডা, উমামহেশ্বর, গণেশ, সূর্যমূর্তি, সারি সারি ইটের দেয়াল, এইসব দেখে কেউ কেউ বলেন, এগুলি পালরাজার বিজয়স্তম্ভ, কেউ কেউ বলেন, নিরীক্ষণ স্তম্ভ। আলতাদিঘির সঙ্গে পান্ডবদের বনবাসের কাহিনী এই অঞ্চলের লোকশিল্পীদের গাওয়া রামবনবাস পালায় আজও প্রচার পেয়ে থাকে।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এই থানার মোট সীমানা ছিল ২৫৫ বর্গমাইল, গ্রামের সংখ্যা ৫৯৮, বাড়ির সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার ৪ শত ৬৭ এবং লোকসংখ্যা ছিল ৭৮ হাজার ২ শত ৮৮ জন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে সাবেক থানার সীমানার পরিবর্তন হয়ে দাড়ায় মোট ১৩৪ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল ৫০ হাজার ২২ জন। এই থানায় মহেন্দ্র নামে গ্রামটি প্রত্নরত্নে ভরপুর। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে এখানে সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল তা এই অঞ্চলের বড় বড় জলাশয়, ভগ্নইট, ভগ্নমূর্তি, ভগ্ন শিলাখণ্ড দেখলেই বোঝা যায়। যমপুকুর এখানকার এক লৌকিক রহস্যময় পুকুর। এখানে যমপূজা হয়। মানুষের ধারণা, এখানেই আমাদের স্বর্গ-নরকের চালানদার যম রাজার প্রাসাদ। এর কাছেই ছিল একটি প্রাচীন ঢিপি, যা বর্তমানে সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছে, নাম, গদাধাম। এই গ্রামটিকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের লোকগাঁথা ও লোকগানের শেষ নেই। কথিত যে, বৈগান গাঁ-এর রাজা ছিলেন দনুজনাথ। এই গ্রামেরই এক রূপবতী নর্তকীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের একমাত্র পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার নাম রাখা হয়

মহেন্দ্র। মহেন্দ্র বড় হয়ে বুদ্ধি কৌশলে প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হন। প্রজারা তার কল্যানমূলক কাজে ধন্য ধন্য রবে রাজারূপে তাকে নির্বাচন করেন। তারই নামে রাজ্যের নাম হয় মহেন্দ্র।

এই রকম বিভিন্ন ঘটনার কাহিনি নিয়ে বর্তমান হরিরামপুর থানার দানগ্রাম নিবাসী লোককবি প্রফুল্ল কুমার মহন্তের কাছ থেকে ১৯৯০-৯১ সনে *মহেন্দ্র আখ্যান* নামে একটি লোক গাঁথা সংগ্রহ করেছিলাম। তারই কিছু অংশ ঃ

"সত্যকথা বলব এবার মহেন্দ্র আখ্যান বর্ণন হামার।
বৈগান গাঁ-র আজার সঙ্গত্ বিহা হইলো নরতিকী চন্দ্রার॥
চন্দ্রার গর্ভে জনম লইলো দনুজ সুত মহেন্দ্র-র।
উপে গুণত চন্দ্রাপুত মালিক হইলো পরগণার॥"

বংশীহারী থানা অঞ্চলের আরও একটি প্রত্ন সমৃদ্ধ গ্রাম হরিরামপুর। একদা উন্নত জনপদ ও বন্দরের যে অস্তিত্ব ছিল এখানে তা এই অঞ্চলের দিঘি, ভগ্ন অট্টালিকা, মন্দির এবং বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন থেকে পাওয়া যায়। এখান থেকে ২২ হাত বিশিষ্ট একটি দুর্গামূর্তি পাওয়া গেছে, যা বঙ্গদেশে আর কোথাও পাওয়া যায় নি বলে জানা যায়। দিনাজপুর জেলার লোককবি জগজ্জীবন ঘোষালের *মনসা মঙ্গল* কাব্যে এই থানার বিভিন্ন স্থানের নাম পাওয়া যায় এবং এই এলাকা যে ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নত ছিল তারও পরিচয় পাওয়া যায়।

গঙ্গারামপুর থানা

এই থানার প্রতিষ্ঠা পর্ব ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে হান্টারের রিপোর্টে এই থানার মোট পরিধি ছিল ২৩৩ বর্গ কিলোমিটার। তখন গ্রামের সংখ্যা ছিল ৪৮৫টি এবং মোট লোকসংখ্যা ৭৫ হাজার ১ শত ৯৬ জন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সেন্সাস রিপোর্টে এই থানার মোট পরিধি কমে দাড়ায় ১২৭ বর্গমাইল, মোট জনসংখ্যা ছিল ৫২ হাজার ৮ শত ৯২ জন, গ্রামের সংখ্যা ২০৬টি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪১টি, ২টি পোস্টঅফিস, ২টি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। তখন এ থানায় কোনও উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গারামপুর হাই ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। গঙ্গারামপুর থানায় ছিল ১ জন ইন্সেপেক্টর, ২ জন এস. আই., ৫ জন এ. এস. আই. এবং ৩২ জন কনেস্টবল। মোট ৮টি ইউনিয়ন বোর্ডে থানাটি বিভিক্ত ছিল। ৮টি ইউনিয়নে ছিল ৭৩ জন চৌকিদার ও ১৬ জন দফাদার।

পুনর্ভবা নদী এই থানাকে সুজলা-সুফলা করে তুলেছে। এখানকার উৎপাদিত ফসল ধান, পাট এবং ইক্ষুক। আখের গুড়ের জন্য একসময় এই থানার খ্যাতি ছিল বাংলা জুড়ে। উত্তরে দুই কিলোমিটার দূরে পুনর্ভবা নদীর পূর্বতীরে বাণনগর বা বাণগড়ের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এই বাণগড়ই একদা কোটিবর্ষের অধীনে প্রাচীন কোটিকপুর বা দেবকোট নগরীতে রূপান্তর ঘটেছিল। কোটিকপুরে মহামুনি জম্বুস্বামীর সমাধি ছিল। এখানকার রাজপুরোহিত ছিলেন সোমশর্মা। তাঁর পুত্র ভদ্রবাহু জৈনদের ছয়জন শ্রুত কেবলীর শেষ শ্রুতকেবলী এবং মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন। এই মাটি পুণ্যভূমি

এ কারণেই যে এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভদ্রবাহু এবং দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রগিরি পর্বতে তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন। আচার্য অদ্বয়ব্রজ, উধিলিপা, ভিক্ষুণী মেখলার মত পণ্ডিতেরা দেবকোট মহাবিহারে অধ্যাপনা করেন। শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর এখানেই লেখাপড়া করেন এবং এখানকার জ্ঞানকে তিনি তিব্বতে নিয়ে গিয়ে প্রসারিত করেছিলেন। বাংলায় মাদ্রাসা শিক্ষার প্রথম প্রচলন হয় এই দেবকোট বা দেওকোট থেকে।

কথিত যে, বাণগড়ে অসুররাজ বাণের একটি দুর্গ ছিল। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ ও বাণের কন্যা উষাকে নিয়ে এই অঞ্চলের স্থানীয় কবি উষাহরণ পালা রচনা করে অনিরুদ্ধ ও উষার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন।

"সখি কি উপ দেখিনু মুই নিন্দের ভেতর
ধরিমু কেমনে পান কুন্‌ঠি সে নাগর।
কি করিমু কুন্‌ঠি যামু মন হল আউল
কি যোক পেরেম ফান্দে এ জীউ ঝাউল।
পাষাণ নিঠুর বিধি কি দশা করিল
স্বপনৎ পানুপতি কিষ্ণের সে নাতি
রষাবণে রণিউদ্ধ পামু কি সে পতি।
চিত্ত ন্যাখা সখি তুই মায়ের গোড়ৎ যাও,
প্রাণপতি আনে দিয়ে এ জীউ বাঁচাও।

*   *   *

হাসোচেন কেন সখি ছাড়ো এ্যালবাসি
ডাঙ্গার জীউ মনু ডুবে 'পানপতি' পাসি।
এ্যাদ্দিনে বুঝিনু মুই বৈরীরে সভাই,
পিরীতি সায়রে সেম কি করিমু হায়।
সই যখন পর হইল পর জগোৎবাসী
পুন্নভবাৎ সাঁধে মুই আত্মাদিব ভাসি।
পানপতি পানসখা বদন তুলে চাও
পাশে আসি পানসখা এ জীউ বাঁচাও।
স্বপনৎ পানুপতি কিষ্ণের সেনাতি।
রুষাবনে রণিউদ্ধ পামু কি সে পতি।

*   *   *

তুমি কিষ্ণো গোয়ালার আখাট সন্তান
ভাগ্য গুণে লভিয়াছ আজার সম্মান।
তুমি বৃষ্ণু সেবে মিছা দর্ভ কর বৃথা,
মুই শিব শম্ভু স্যাবো জগতেরি পিতা।
তুমার বশ্যতা আমি দিমু অঙ্গিকারী
ইহ নহে গোপী গোপ না আছে চাতুরী।
জরা সিন্ধু মিতা মোর মুই এক হও,
তুমারে ছেচিয়া মুই সদ্যব বানাও

তুমি যদি হও ছাঁচা মরদ সুহিত
ধরো বজ্র কর অন মোহের সহিত।
না হলে না সাধ্য হবে তুমার বাসনা
মো গোচর যুদি পাও ছিড়িব অসনা।
মুই হই আজা বাণ জগতের তাতা
শিবের সেবক মুই তুমার বিধাতা।"

বঙ্গ বিজয়ী তুর্কি বীর বখ্‌তিয়ার খিলজী এখানেই রাজধানী স্থাপন করেন। তবে এটা তার প্রথম নয় দ্বিতীয় রাজধানী। সুরক্ষিত এই দেবকোট নগরেই তিনি স্থাপন করেছিলেন সেনা নিবাস (দমদমা)। এখানেই রয়েছে সাধক মৌলানা আতা শাহর দরগা। নিকটেই ইতিহাস খ্যাত ধলদিঘি ও কালদিঘি। দীঘি দুটি জলের রঙের উপর নির্ভর করে নামকরণ করা হয়েছে। ধলদিঘি পূর্ব পশ্চিমে এবং কালদিঘি উত্তর দক্ষিণে লম্বা। ধলদিঘি দৈর্ঘ্যে পূর্ব-পশ্চিমে ৪০৮০ ফুট এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থে ৮৭০ ফুট। কালদিঘি উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ৩৯৬০ ফুট এবং প্রস্থে পূর্ব-পশ্চিমে ৯৬০ ফুট। কথিত যে, বাণরাজা তাঁর দুই রানিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে রানিদের অনুরোধেই কালদিঘি ও ধলদিঘি খনন করিয়েছিলেন। মৌলানা আতা শাহর দরগার সামনেই ধলদিঘির উত্তর পাড়ে রয়েছে একটি সুড়ঙ্গপথ। লোকবিশ্বাস, বাণগড়ের রাজপ্রাসাদ থেকে সুড়ঙ্গপথ ধরে ধলদিঘির পাড়ে এসে দুই রানি ও তাদের সহচরীরা প্রতিদিন ঠান্ডা জলে স্নান করতেন এবং সুড়ঙ্গ পথেই ফিরে যেতেন প্রাসাদে।

দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের অভিবাসন ঘটে এই জনপদটিতে। ক্রমে ক্রমে অঞ্চলটি ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানকার তাঁতবস্ত্র, নৌ-নির্মাণ শিল্প এবং মৎস্যচাষ গ্রামীণ অর্থনীতিতে সাড়া জাগিয়ে চলেছে। সোলা ও কাঠের মোখা শিল্পের জন্য এই থানা সুনাম অর্জন করেছে। গঙ্গারামপুর স্থান নামটিতে খুঁজে পাওয়া যায় একটি কৌতুকী অর্থ। কথিত যে, গঙ্গারাম নামে একজন আনাড়ি পালোয়ান এই অঞ্চলে বাস করতেন। গঙ্গারাম নামে ওই আনাড়ি পালোয়ানের পুর বা ভবন ছিল বলে স্থানটির নাম গঙ্গারামপুর হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এদেশে বর্গীর হাঙ্গামার সময় বাংলার সাধারণ মানুষ মহারাষ্ট্রের নাম জানতে পারে। এক সময় দীর্ঘকাল জুড়ে বাংলার জাগ্রত বিভীষিকা হয়ে দেখা দিয়েছিল বর্গীর হাঙ্গামা। গঙ্গারাম রচিত *মহারাষ্ট্র পুরাণ* নামক পুঁথিখানি থেকে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দের বর্গীদের শেষ হাঙ্গামার অকথ্য অত্যাচারের কাহিনি ও সেই সঙ্গে কৌশলে ভাস্কর পণ্ডিতের জীবনাবসান ঘটানোর রোমাঞ্চকর কাহিনি আমরা জানতে পারি। সেই কাহিনি কি বাংলার মানুষকে আলোড়িত করেছিল? ইতিহাস থেকে জানা যায়, দিনাজপুরের রাজা বর্গীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দীর দরবারে আবেদন করেছিল। *মহারাষ্ট্র পুরাণ* পুঁথির রচয়িতা গঙ্গারামকে স্মরণ করে রাখতেই কি গঙ্গারামপুর স্থান নামের প্রবর্তন হয়েছিল? ব্যবসা-বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলটি একদা বাণপুর, কোটিবর্ষ ও দেবীকোট নামে, পরিচিত ছিল। প্রাচীন বাংলার বিলুপ্ত নগর দেবকোট একসময় গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্বাহী নদী পুনর্ভবার পূর্ব তীরে গড়ে উঠেছিল। লামা তারানাথের বিবরণে জানা

যায় যে, বাণরাজার নামেই স্থানটির নাম হয় বাণগড়। ইতিহাসের বাণগড় স্তূপ এমন একটি ঐতিহাসিক পোড়োভূমি ও প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষেত্রভূমি যে যাকে বাদ দিয়ে দিনাজপুরের কোনও প্রাচীন ঐতিহাসিক সূত্র টানা সম্ভব নয়। কালের মহিমায় বাণগড়ের প্রত্ন ভূমি আজ লোপাট হচ্ছে মানুষের ক্ষুধায়।

ঘোড়াঘাট থানা

ঘোড়াঘাট থানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের লোক গণনার রিপোর্টে এই থানার পরিধি ছিল মোট ৫৭ বর্গমাইল, গ্রামের সংখ্যা ১৪৯ এবং মোট জনসংখ্যা ছিল ১৬ হাজার ৯ শত ২৫ জন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্টেও এই থানার মোট এলাকা ছিল ৫৭ বর্গমাইল এবং মোট জনসংখ্যা ছিল ২৬ হাজার ৬ শত ৭৮ জন।

বাংলার উত্তর অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ ঘোড়াঘাট। সুলতানি আমলের পরবর্তীকালে ইংরেজ অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দেড়'শ বছর এই জনপদটি শাসন করেন মোগলেরা। বাংলা সুবায় ২৪টি ভাগের একটি অন্যতম অংশ ছিল সরকার ঘোড়াঘাট। আয়তন, জনশক্তি, আকার ও ধনসমৃদ্ধিতে ঘোড়াঘাট ছিল সমকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠতম ও বৃহৎতম সরকার। *আইন-ই আকবরী* মতে, ঘোড়াঘাট সরকারের বার্ষিক আদায়ী রাজস্ব ছিল ২০ লাখ ২০ হাজার ৭ শত ৭০ তংকা। সামরিক শক্তিশালী ৯ শত অশ্বারোহী, ৫০টি রণহস্তী এবং প্রচুর পদাতিক। এর প্রশাসনিক দায়িত্বে শেষ ফৌজদার ছিলেন করম আলী খাঁ। *মুজাফ্‌ফরনামা* ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করে তিনি সেকালে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে ঘোড়াঘাট গুরুত্বপূর্ণ সরকার (জেলা) গড়ে ওঠার দরুণ এখানকার ফৌজদাররা দেশের শ্রেষ্ঠতম ফৌজদার রূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঘোড়াঘাটে ইসলাম প্রচারের পথ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বহু পীর আউলিয়ার আগমনে এখানে নির্মিত হয়েছিল প্রচুর মসজিদ, মিনার, মাদ্রাসা, খানকাহ্, তোরণ ইত্যাদি। গড়ে ওঠে আবাসিক ভবন, মুসাফির খানা, গোসলখানা, হাট বাজার ও সড়ক সেতু। বুকাননের বিবরণে জানা যায়, সমৃদ্ধির শীর্ষকালে ঘোড়াঘাট নগর ছিল ১০ মাইল লম্বা ও ২ মাইল চওড়া। ৫১টি পট্টি ও ৫২টি গলির শহর ছিল ঘোড়াঘাট। গৌরবময় যুগে সামরিক সমাবেশ সহ দুর্গটির আয়তাকার ছিল আধমাইল এবং লম্বায় এক মাইল। সতেরো শতকের শেষের দিকে রাজা প্রাণনাথ (১৭৬২-১৭৭২ খ্রিঃ) দিনাজপুর জমিদারির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নবাব মুর্শিদকুলীর নতুন রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থায় দিনাজপুরের জমিদার প্রাণনাথ আকবর নগর বা ঘোড়াঘাটের চাকলাদার নিযুক্ত হন। দিনাজপুরের জমিদার বংশ মোগলদের পৃষ্ঠপোষকতায় সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা পায়। রাজা রামনাথের শাসন আমলে ঘোড়াঘাট গৌরবের শীর্ষে উঠে।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতির দ্বারা ঘোড়াঘাট বিজিত হবার পর থেকে পরিত্যক্ত দুর্গটির অবনতি শুরু হয়। দুর্গের সব নাগরিক ও সামরিক কীর্তি নষ্ট হয়ে যায়। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে বুকানন সাহেব যখন ঘোড়াঘাট দুর্গ পরিদর্শন করতে যান তখন তিনি অতীতের আলোকজ্জ্বলে দুর্গটির ধ্বংসপ্রাপ্ত চেহারা দেখে লিখেছিলেন, 'The fort

seems to have always been a sorry place'। বর্তমানে এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ (১৯৯৭ সনে দেখা) প্রায় সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছে। মুসলমান ফৌজদার মীর করম আলী ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি কৌটিল্যের দ্বারা পরাজিত ও বিতাড়িত হওয়ার পর থেকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে দিনাজপুর জমিদারি ব্রিটিশ শাসনে এলে দিনাজপুর রাজবংশ এক সাধারণ জমিদার বংশে পরিণত হয়। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ-এর আমলে দিনাজপুর ২২টি ভাগে বিভক্ত হলে ঘোড়াঘাট অন্যতম একটি বিভাগে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে দিনাজপুর জেলা গঠনের পর ঘোড়াঘাট দিনাজপুর জেলার একটি অন্যতম থানায় পরিণত হয়। দেশভাগের পর ঘোড়াঘাট পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়, বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধীনে ঘোড়াঘাট উপজেলায় পরিণত হয়। বাংলার সুলতানি আমল থেকেই এই জনপদটিতে ইসলামের প্রসার ঘটলেও হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ছিল গভীর সম্প্রীতি ও সদ্ভাব। উভয় ধর্মের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণও অনেকখানি ঘটেছিল। মুসলিম বিজেতাদের আমলে এখানে সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও উপজাতিদের বসবাস ছিল অধিকতর। তারাও তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে মূলস্রোতে পরিচালিত হয়ে সংহতির মিলন সেতু রচনা করেছেন। ঘোড়ঘাটের আরও একটি নাম ছিল চৌখন্ডি, এ নামও খুব সম্ভব প্রাক্-মুসলিম যুগের।

দিনাজপুর সদর থানা

দিনাজপুর সদর থানাটি খুব প্রাচীন নয়। প্রাক্-মোগল পর্বে এই শহরের বিশেষ কোনও প্রাধান্য ছিল না। মোগল আমলের শেষ দিকে দিনাজপুরের জমিদার বেশ বড় ধরনের শহর জাতীয় একটি জনপদ এখানে গড়ে তুলেছিলেন। মৌর্যযুগ থেকে শুরু করে পাল-সেন রাজত্ব কাল পর্যন্ত দিনাজপুর সদর অঞ্চলটি ছোটবড় অনেকগুলি জলাশয় এবং কিছু কিছু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দিয়ে ঘেরা ছিল। তুর্কি-আফগান আধিপত্যের সূচনাকালে এখানে পীর-ফকির-দরবেশদের আগমন শুরু হয়। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মেজর শেরউইল তার রিপোর্টে ২০টি মসজিদের কথা উল্লেখ করেছেন। দিনাজপুর সদর বিভাগের অধীনে চেহেল গাজী নামে বেশ প্রাচীন একটি জায়গা আছে। এক সময় এখানে যে হিন্দু অথবা বৌদ্ধযুগে আরও একটি নগরী এবং প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল তা এই অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনেই প্রমাণ পাওয়া যায়।

পার্শি ভাষায় চেহেল শব্দের অর্থ চল্লিশ, গাজী মূলত আরবি শব্দ। অর্থ, ধর্মযোদ্ধা। চল্লিশজন ধর্মযোদ্ধার মাজারকেই 'চেহেল গাজী' নামে অভিহিত করা হয়। খ্রিস্ট্রীয় চতুর্দশ শতকে পশ্চিম এশিয়াবাসী এই ৪০ জন ইসলাম প্রচারক দিনাজপুর সদরে এসেছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, চেহেল গাজী নামে মুজাহিদরা ছিলেন প্রথম পর্যায়ের ধর্মের বার্তা বাহক। দলের নেতা শেখ জৈনুদ্দীন বাগদাদী ছিলেন অসাধারণ আলেম ও অস্ত্রধারী পুরুষ। তিনিই সদলবলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে এসে এখানে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং ধর্মযুদ্ধে শহীদ হন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই মহান বীরদের গাজীত্বের সম্মান দেন এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই ধর্মযোদ্ধারা বীরের সম্মান পেয়ে আসছেন। চল্লিশ গাজীর যিনি অধিনায়ক, লোক বিশ্বাসে

তিনিই মহান চেহেল গাজী নামে পরিচিত হয়েছেন।

দিনাজপুর সদর থেকে প্রায় ১১ মাইল উত্তরে ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত বাংলার অনুপম শিল্পকলা সমৃদ্ধ পরিখা বেষ্টিত এক দুর্গ নগরীর পরিচয় পাওয়া যায়, যার নাম কান্তনগর। গর্ভেশ্বরী, ঢেপা ও পুনর্ভবা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত এই দুর্গ নগরীর মাটির দেয়ালের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতিনিয়ত এই অঞ্চলে বিভিন্ন ফার্ম ও কলকারখানা তৈরির জন্য চলছে বুলডোজার ও ট্রাকটরের কর্ষণ। ফলে, ঐতিহ্যমন্ডিত সমস্তই প্রাচীন কীর্তি সমতল ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। এখানেই রয়ে গেছে অতুলনীয় স্থাপত্য শিল্পের কলাকৃতি কান্তজীর মন্দির, যা অতীত যশোগীতির নিরব সাক্ষী। দিনাজপুর সদর থানা থেকে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে রয়েছে শ্রীচন্দ্রপুর নামে অতি প্রাচীন একটি গ্রাম। এই গ্রামে বৃহৎ চন্দ্রহারদিঘি এবং তার আশে পাশে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়ানো ছিটানো প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় একসময় এখানে প্রাচীন কোটিবর্ষ নগরীর মত একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল।

১৮৭২ খিস্টাব্দে হান্টারের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায়, দিনাজপুর সদর থানা এলাকা ছিল মোট ৬ বর্গ মাইল। গ্রামের সংখ্যা ২৩, বাড়ির সংখ্যা ৩ হাজার ৪ শত ৩২টি এবং মোট জনসংখ্যা ১৫ হাজার ৬ শত ৪৭ জন। বিভিন্ন সেন্সাস রিপোর্ট সূত্রে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুর সদর থানার লোকসংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

সারণি ১

সাল	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৮৭২-১৯৩১
লোকসংখ্যা	১৫, ৬৪৭	১২,৫৬০	১২.২০৪	১৩,৪৩০	১৫,৯৪৫	১৮,০২৫	১৯,১৫৬	+ ৩,৫০৯

উল্লেখ্য,.১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুর সদর থানার লোকসংখ্যার অনুপাত অপরিবর্তিত থাকে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টের ব্যাখ্যা থেকে দিনাজপুর সদর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কোনও নতুন বসতি গড়ে ওঠেনি কেন এখানে তার কিছুটা সন্ধান পাওয়া যায় ঃ "Part of it may be due to the opening of the railway faciliting as it has communication between distant places, and making it possible for people to return to their native villages, who otherwise would have settled as the head-quarters for purposes of trade, service or other reasons."

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুর জেলার ৯৯ শতাংশ লোকই গ্রামে বসবাস করত। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে শেরউইল দিনাজপুর সদর অঞ্চল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ "There are no European shops. Supplies are brought from Calcutta either by rail as far as Rajmehal or by boat up the Poonarabhaba River as far as the station, during six months of the year, and to within 14 miles of it during the other six. Handicraftsmen

and artizans are not procurable all furniture etc. comes from Calcutta except such articles as the ingenuity of the European Jailor is able to manufacture with prison labor." *

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর শহর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হান্টার লিখেছেন ঃ "Dinajpur is a purely agricultural District; and no tendency is perceptible on the part of the people to collect themselves together into towns. Indeed, the Census Report of 1872 returns only a single town as containing upwords of five thousand souls, namely, Dinajpur, the Headquarters of the District; population, 13,042. The smaller towns or large villages are of importance only as means or outlets for the agricultural produce of the District." **

রাজারামপুর থানা

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এই থানাটি ৩৯২ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ছিল। ৭ শত ৫৮টি গ্রাম, বাড়ির সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার ৮ শত ৮০টি, জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ১ শত ৬ জন। গর্ভেশ্বরী বা গাবুড়া নদীর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অঞ্চলটি বিস্তৃত ছিল। দিনাজপুর রাজবংশের রাজা রামনাথ রায়ের (১৭১৯-১৭৬১) নাম অনুসারে থানাটির নামকরণ হয়েছিল বলে কথিত। রাজা রামনাথ এখানে মুর্শিদাবাদ থেকে বেশ কিছু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ শ্রেণির হিন্দুদের নিয়ে এসে বসতি স্থাপন করে দিয়েছিলেন। শিক্ষায় উন্নত এই স্থানটিতে রাজা গোবিন্দনাথ (১৮১৭-১৮৪১) সংস্কৃত শিক্ষার একটি টোল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে মহেশ চন্দ্র তর্ক চূড়ামণি এই টোল থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে 'কাব্য' উপাধি লাভ করেন। শাসন কাজের সুবিধার জন্য পরবর্তীতে (১৮৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দ) রাজারামপুর থানার বেশ কিছু অংশ দিনাজপুর সদর কোতয়ালী থানার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং বাকী অংশ নিয়ে ফুলবাড়ি নামে একটি নতুন থানা গঠিত হয়। সেই সঙ্গে রাজারামপুর থানাটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

ক্ষেতলাল থানা

দিনাজপুর জেলার সাবেক ২২টি থানার একটি অন্যতম থানা ক্ষেতলাল। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে বগুড়া জেলা গঠনের সময় দিনাজপুর জেলা থেকে ক্ষেতলাল থানাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বগুড়া জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। প্রাচীন ক্ষেতলাল থানার গ্রামের সংখ্যা ছিল ২৮০টি, আয়তন ৭৬ হাজার ১২২ একর (১১৮.৯৪ বর্গমাইল)। মোট ৯টি পরগণা এই থানার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এগুলি পোলাদশী, সগুনা, ফতেজঙ্গপুর, তপ্পেহিন্দা

* Source : Major James Lind Sherwill, *Geographical and Statistical Report of the Dinagepore District, 1863* (Calcutta: Bengal Central Press 1865).

** Source : *A Statistical Account of Bengal* by W. W. Hunter, Volume VII. District of Maldah, Rangpur and Dinajpur.

(পংছিন্দাবাজু), শেলবর্ষ, শিবপুর, আপইল, খাট্টা ও ক্ষেতলাল। পরগণাগুলি কোনটি ঘোড়াঘাট, পিঞ্জরা, বারবাকাবাদ ও বাজুহা সরকারের অধীনে ছিল।[২২]

১৯১১-১৯২১ খ্রিস্টাব্দের একটি পরিসংখ্যান থেকে ক্ষেতলাল থানার লোকসংখ্যা ৬৬ হাজার ৭ শত ৫ জন ছিল বলে জানা যায়। তখন এই থানা ১০টি ইউনিয়ন বোর্ডে বিভক্ত ছিল। হীরামতী নামে একটি উপনদী এই অঞ্চলের শস্য শ্যামল প্রান্তরকে সুজলা-সুফলা করে তুলেছে। উপনদীটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানস নামে আরও একটি উপনদী। উপনদী দুটি যেখানে মিলিত হয়েছে তার নিচেই তুলসী গঙ্গার কাটাহারী শাখা নদীটি পূর্বদিকে গিয়ে নাগর নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পুরানো পৌণ্ড্রবর্ধন নগরী বা মহাস্থান গড়ের সঙ্গে এই সব নদী পথেই মানুষেরা যোগাযোগ করত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে নদীপথে করধার্য্য আইনে কলকাতার প্রসন্নকুমার ঠাকুর এইসব নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাত্রী চলাচলের কর আদায়ের সনদ পেয়েছিলেন।

ক্ষেতলাল থানার দক্ষিণ প্রান্তে 'রাজবাড়ির চড়া' নামে স্থানটি প্রচুর ভগ্ন ইটে ছড়ানো ছিটানো। এখানে একদা অনন্ত রাম রায় নামে একজন নৃপতি বসবাস করতেন বলে কথিত। রাজবাড়ীটির পূর্বদিকে রয়েছে 'মহলপুকুর'। মহল পুকুরের দক্ষিণে রাজার প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বিগ্রহের মন্দির। নিকটেই সনকা ও মেনকা নামে দুটি জলাশয় রয়েছে। প্রকৃতির প্রতিশোধে বর্তমানে জীর্ণপ্রায়। প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত এই স্থান থেকে মূল্যবান বেশ কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। এইসব মূর্তির মধ্যে বোধিসত্ত্ব লোকনাথ (পদ্মপানি), জননী ও শিশু, অর্ধশায়িতা জননী ও শিশুমূর্তি, যমমূর্তি, চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি, হরগৌরী মূর্তি ইত্যাদি। তাছাড়া, বেশকিছু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখানে দেখা যায়। এই থানার সাড়ে সাত কিলোমিটার দূরে পোলাদশী পরগণার অধীনে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত অতীত ইতিহাসের স্মৃতিধন্য বলিগ্রাম নামে একটি গ্রাম আছে। মহাভারত খ্যাত বলি রাজার রাজধানী ও প্রাসাদ এখানেই ছিল বলে লোকশ্রুতি। এখানকার মাথরাই, শিলিমপুর গ্রাম দুটিতে এখনও পুরানো ইটের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। এখান থেকে বেশ কয়েকটি পাথরের স্তম্ভ পাওয়া গেছে, স্তম্ভগুলি বর্তমানে রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সেন্টারে রয়েছে। স্তম্ভগুলোর উপরিভাগে বাংলা হরফে 'আদেশ বিপণ্ঠিক শ্রী প্রহাসিত শর্ম্মা' এরকম লেখা খোদাই করা আছে। শিলিমপুরে প্রাপ্ত একটি শিলালেখে জানা যায়, বলিগ্রাম ও শিলিমপুর প্রাচীনকালে যথাক্রমে বলিগ্রাম ও শীয়ম্বপুর নামে পরিচিত ছিল। পুন্ড্রবর্দ্ধন জনপদের অধীনে একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল বলি গ্রাম, এক সময় বরেন্দ্রের অলংকার রূপে গ্রামটির পরিচিতি ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র এবং বিদ্যান মানুষদের বসতি ছিল এই গ্রামে। এই থানার অধীনে আরও দুটি উন্নত গ্রামে হাতীওড় এবং ছত্রগ্রাম।[২৩] হাতীওড় গ্রামের ধ্বংসস্তূপ থেকে রাজা চন্দ্র দত্তের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। রাজা চন্দ্র দত্ত ছিলেন আদিত্য দত্তের পৌত্র ধর্ম্মদিত্তের পুত্র। শিলালিপিটি রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সেন্টারে রয়েছে।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের দিক থেকে উন্নত ক্ষেতলাল থানাটি তাঁতবস্ত্র উৎপাদনে একদা সুনাম অর্জন করেছিল। এখানকার তাঁত শিল্পীদের তৈরি গঙ্গাবেলে নামে এক রকমের কাপড় সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। এই থানার অদূরে আদম-

দিঘি থানার অধীনে কুন্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পণ্ডিত নিত্যানন্দ আচার্য। স্বয়ং রঘুপতি (রামচন্দ্র) তাঁকে রামায়ণ রচনা করার জন্য স্বপ্নাদেশ করেন। তিনি রামায়ণ রচনা করে 'অদ্ভুতাচার্য্য' উপাধি লাভ করেন। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ কীর্তিবাসী রামায়ণ হতে অনেক বড়। অবাক করার মত ছিল তাঁর কবিত্বশক্তি, তাই লোকে তাঁকে অদ্ভুতাচার্য্য আখ্যা দিয়েছিলেন। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণে আত্রাই নদীর মহিমাকীর্ত্তন ঃ

"আত্রাইর তীর সেহি কুরুক্ষেত্র সমান।
মহাপুণ্যস্থান সেই পুরাণে ব্যাখান॥
করতোয়া পশ্চিমভাগে জাহ্নবীর সীমা।
হেনপুণ্য স্থান সেহি নাহিক উপমা॥
করতোয়ার পশ্চিমে আত্রাইর উত্তর কূলে।
মহাপুণ্য স্থান সেই পুরাণেত বোলে।।"[২৪]

এই অঞ্চলেরই কবি জীবন মৈত্র। তিনি *বিষহরি পদ্মাপুরাণ* কাব্য রচনা করে কীর্তি স্থাপন করেছেন। বণিক খন্ডে চাঁদ সওদাগরের বৃত্তান্তে এই অঞ্চলের পাটের সুতোর নেত ও চটজাত বস্ত্রের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

"সুকুতা বদলে মুকুতা লয় পাট বদলে নেত।
চট বদলে কম্বল লয় শণের বদলে শ্বেত।।"

এই অঞ্চলে একসময় যোগীর গান বা যুগী গানের প্রচলন ছিল অধিকতর। কৈবর্ত, মাহিষ্য, নমশূদ্র, মালো, রাজবংশী, কপালী, সাহা, সুবর্ণবণিক এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বেহারা, জোলা, নিকারী, পাঠান, সৈয়দ ও শেখ সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল অধিক। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যোগাযোগের জন্য ছিল এখানে জলপথ। এখানে জলপথে ছিল নৌকা বা স্টীমার সার্ভিস। সড়ক পথ বলতে ছিল বগুড়া-দিনাজপুর পর্যন্ত প্রায় ৪৪ মাইল দৈর্ঘ্য রাস্তা ১২ মাইল পর্যন্ত এসে নাগর নদী, ২৬ মাইল পর্যন্ত এসে হীরামতী এবং ২৭ মাইল পর্যন্ত এসে তুলসীগঙ্গা নদী পার হয়ে বগুড়া, শিবগঞ্জ, অথবা পাঁচ - বিবি হয়ে দিনাজপুর অথবা বগুড়া শহরে যেতে হতো। পলিমাটি আশ্রিত ক্ষেতলাল থানা রবিশস্য উৎপাদনে খ্যাতি লাভ করেছিল। সেই সময় এখানকার মটর, খেসারি, অরহড়, সোনামুগ, বুট বা ছোলা, তিষি, রাই, এই সব উৎপাদিত শস্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানি করা হত। একসময় এখানে নীলের চাষ হত এবং প্রায় ৭/৮টি নীল কুঠির ধ্বংসাবশেষ এবং নীল ভেজানোর চৌবাচ্চা এখনও কালের মহিমায় টিকে আছে। এই থানার হাড়ুঞ্জা গ্রামের হজরৎ মসউদ গাজি সাহেবের দরগা পুরানো স্মৃতিকে এখনও ধরে রেখেছে। বহু পুণ্যার্থী মানুষ বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে গাজি সাহেবের উরস উপলক্ষে সমবেত হন এবং শ্রদ্ধা জানান। এই থানার অদূরে পুনট্ট মেলা উপলক্ষে বহু গরু, ঘোড়া, দুম্বা ও উট আমদানী হয়।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়ার ফলে সমস্ত জেলাগুলিতে সংস্কারের কাজ শুরু হয়। ওই সময় আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং চুরি ডাকাতির জন্য বড় বড় জেলাগুলিকে শাসন করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। পরিণামে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলা ভেঙ্গে মালদহ জেলার সৃষ্টি হয়। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে বগুড়া জেলা গঠিত হয়।

রাজশাহী জেলা থেকে আদমদিঘি, সেরপুর, নওয়াখিলা ও বগুড়া থানা এবং রংপুর জেলা হতে দেওয়ানগঞ্জ ও গোবিন্দগঞ্জ থানা এবং দিনাজপুর জেলা থেকে লালবাজার, ক্ষেতলাল, বদলগাছি, মোট ৯টি থানা নিয়ে বগুড়া জেলা গঠিত হয়। ওই একই সালে পাবনা জেলারও সৃষ্টি হয়। প্রাচীন ক্ষেতলাল থানার ভেতর দিয়েই সুলতানি আমলে গৌড় নগরে যাবার একটি প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হয়েছিল।

লালবাজার থানা

প্রাচীন এই থানাটি মোট ৯টি ইউনিয়ন বোর্ডে বিভক্ত ছিল। এগুলি হ'ল, হিলি, ধরঞ্জী, আয়মারসুলপুর, বালিঘাটা, আটাপুর, মামুদপুর, কুসম্বা, আওলাই ও পাঁচবিবি। এই থানাটি সাবেক কানজুরী, সগুনা, ঘোড়াঘাট ও পোলাদশী পরগণাভুক্ত এবং বেশিরভাগ জায়গাই সরকার পিঞ্জরা-র অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৫৫৭টি গ্রাম এবং ১ লাখ ৩০ হাজার ৩ শত ২৭ একর অর্থাৎ ২০৩.৬৩ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ছিল।[২৫] ওই সময় এই থানার লোকসংখ্যা ছিল ৫৮ হাজার ৪ শত ১৯ জন। করতোয়া হতে উৎসারিত হয়ে যমুনা নদী এই থানার হিলির নিকটে প্রবাহিত হয়ে পাঁচবিবি ও বেল আমলার কাছ দিয়ে আরও দক্ষিণে খঞ্জনপুরের পূর্বদিকে এসে দুটি শাখায় বিভাজিত হয়েছে। এই থানার অদূরে আক্কেলপুরের কাছ থেকে তুলসী গঙ্গা নামে একটি উপনদী লালবাজার থানা ও বদলগাছি থানা হতে ক্ষেতলাল থানাকে পৃথক করেছে।

সাবেক এই থানা অঞ্চলে ভরদ্বাজ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের বসতির জন্য এই স্থানের সুখ্যাতি ছিল। রাইগ্রাম, মহিপুর, আটাপুর, কসবা-উচাই গ্রামগুলিতে প্রাচীন বড় বড় নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়। নিমাই পীরের দরগা নামে একটি ছোট মসজিদ সৈয়দ নাসির উদ্দিন আবুল মুজঃফর নসরৎ শাহের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। অজস্র পাথরের ভগ্নমূর্তি এই অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। এইসব মূর্তির মধ্যে অতিকায় বোধিসত্ব লোকনাথের একটি বড় মাথা এবং ধাতু নির্মিত নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তি দুটি রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সেন্টারে রয়েছে। ধান ও চালের জন্য খ্যাত ছিল এই থানা। এখানে কুরী সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু জমিদার, বারেন্দ্র কায়স্থ জাতীয় ধর বংশীয় জমিদার, মাহিষ্য জাতীয় প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী রমানাথ সাহা, এই অঞ্চলের প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ রাধা-গোবিন্দ রায় সাহেবের একটি কাছারি ঘর ছিল এখানে। কালের কপোলতলে এখনও সেই সাবেক স্মৃতি রয়ে গেছে।

পুরাকালে এখানে লোধ্র (লোধ) গাছের ছাল থেকে লাল রঙ তৈরি হত। এই লোধগুড়া সময় সময় আবীরের কাজ করত। এই অঞ্চলে অজস্র শেফালিকা ফুল পাওয়া যেত। ওই ফুলের পরাগে গুড়া চূর্ণ মিশিয়ে পরিষ্কার লাল রঙ তৈরি হত। পলাশ গাছ এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। রক্সবার্গ সাহেবের মতে, গরমকালে, এই গাছের ত্বকে ফুটো করে দিলে সেখান থেকে অতি সুন্দর লাল রস বের হত। এই রস তাড়াতাড়ি জমে লাল রঙের আঠায় পরিণত হত। রেশম কাপড় রঙের জন্য এই রঙের ব্যবহার হত অধিক মাত্রায়। বঙ্গদেশে এক সময় লাল রঙ বিক্রির সবচেয়ে বড় একটি বাজার

বসত এখানে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা এই রঙ সওদা করতে আসতেন। এই জন্যই থানাটি লালবাজার নামে পরিচিতি লাভ করে।

নবাবি আমল থেকে লালবাজার দিনাজপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে বুকানন সাহেবের সমীক্ষার ভিত্তিতে আদমদিঘি, সেরপুর, নওয়াখিলা, বগুড়া, লালবাজার, ক্ষেতলাল ও শিবগঞ্জ, এই অঞ্চলগুলি নিয়ে শিবগঞ্জে একটি পুলিশ ফাঁড়ি তৈরি হয়। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য পুরো লালবাজার থানা পাঁচবিবিতে স্থানান্তরিত হয়। তখন থানাটির নাম লালবাজার পাল্টে পাঁচবিধি থানারূপে পরিচিতি লাভ করে। পাঁচবিবি নবগঠিত বগুড়া জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। লালবাজার আজ অভিশপ্ত জনপদের কঠিন বিদ্রুপ যেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের লোক গণনায় দিনাজপুর জেলার ১৭টি থানার মধ্যে এই থানাটির কোনও উল্লেখ ছিল না।

বদলগাছি থানা

২২টি থানার অন্যতম একটি থানা। সান্তাহার রেলওয়ে জংশন থেকে চারমাইল পশ্চিমে অবস্থিত নওগাঁ নামক স্থান, এরই নিকটে প্রাচীন বদলগাছি থানা অবস্থিত। এই থানার অধীনে দুর্বলহাটি নামক গ্রামে জগৎরাম রায় নামে একজন জমিদার বাস করতেন। নবাবি আমলে এই জমিদারের বাৎসরিক খাজনা ছিল ২২ কাহন কইমাছ। ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত ভীম সাগরদিঘি ও ভীমের জাঙ্গাল এই থানার পশ্চিম অংশে অবস্থিত। প্রসিদ্ধ জননায়ক মহাবীর দিব্যের ভাইয়ের ছেলে ভীমের কীর্তিস্বরূপ নিদর্শনটি এখনও লুপ্ত হয়ে যায় নি। এই থানার অধীনে মহাদেবপুর নামক স্থানটি একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উপজেলা রূপে পরিচিত। তিলকপুর, ভান্ডারগাঁ, রায়কালী, কলিঞ্জ গ্রাম এই থানার অধীনে গ্রামগুলি ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনে পরিপূর্ণ। *তারা রহস্য* প্রণেতা সাধক ব্রহ্মানন্দ কলিঞ্জেশ্বরীর আরাধনা করে এখানেই সিদ্ধ হয়েছিলেন বলে কথিত।[২৬] দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজানাথ রায় আজ থেকে দেড়শো বছর আগে কলিঞ্জেশ্বরী দেবীর মন্দির ও দেবী মন্দিরের নিকটে জলাশয়টি সংস্কার করেছিলেন।

বদলগাছি থানা গাঁজা চাষের জন্য খ্যাত ছিল। এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা ঢাকা ও কলকাতায় রপ্তানী হত। বদলগাছি বর্তমানে বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের নওগাঁ জেলার অধীনে একটি উপজেলা।

জগদ্দল থানা

বরেন্দ্রভূমির বিখ্যাত জগদ্দল বৌদ্ধ বিহারের স্মৃতি এখানকার ধূলিতে মিশে আছে আজও কিংবদন্তি আকারে। প্রাচীন দিনাজপুরের ২২টি থানার একটি অন্যতম থানা জগদ্দল। অতীতের জগদ্দল বৌদ্ধ মহাবিহার কোথায়, কোন থানায় অবস্থিত ছিল তা নিয়ে বির্তক আছে। দিনাজপুর জেলার সাবেক এই থানাটি জগদ্দল নামে চিহ্নিত হয়েছিল হয়ত বিখ্যাত জগদ্দল বৌদ্ধ বিহারের স্মৃতিমাখা সৌরভ নিয়ে। ইতিহাসের সেই জগদ্দল এই জেলাতেই মাটির নীচে কালের অভিশাপে হয়ত কোথাও চাপা পড়ে আছে। পুর্ণর্ভবা

ও টাঙ্গন নদী এই থানাকে আমূল ফলরসে পুষ্ট করে তুলেছে। জগদ্দল থানার অধীনে বরাবর বিশাল উঁচু এবং বিশাল চওড়া, পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একটি প্রাচীন রাস্তা দেখা যায়। রাস্তাটি শুরু হয়েছে ঘোড়াঘাট থেকে। ঘোড়াঘাট হয়ে সোজা পশ্চিমমুখে হিলি, বালুরঘাটের দক্ষিণ দিক দিয়ে এসে মালদহ জেলায় প্রবেশ করেছে। সড়কটি পাল আমলের নির্মিত বলে কেউ কেউ মনে করেন। ধর্মপালের সময়কার এই সড়কটির কথাই খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রলিপিতে উল্লেখিত হয়েছে বলেও কেউ কেউ মনে করেন। খালিমপুর তাম্রলিপিতে আছে 'দেবট কৃত্যালি' কথাটি। রাজপুত্রের নামে স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত এই আল বা রাস্তা।

জগদ্দল থানাটি ছিল লালাগোলা আর পাকুয়ার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। পুনর্ভবা নদীর পশ্চিমপাড়ে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে মালদহ ও জগদ্দল থানা দুটি মালদহ জেলার অন্তর্গত হয়। জগদ্দল থানা দিনাজপুর থেকে মালদহ জেলায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে পুনর্ভবা নদীর গুরুত্ব কমে যায়। থানাটি টাঙ্গন নদীর তীরে বামনগোলায় থানা হেডকোয়ার্টার রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় জগদ্দল থানার নাম পরিবর্তন করে বামনগোলা রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে বামনগোলা থানা ভাগ হয়ে দক্ষিণ অংশ হবিবপুর থানা নামে গঠিত হয় এবং উত্তর অংশ বামনগোলা থানায় থেকে যায়।

চিন্তামন থানা

অসংখ্য প্রাচীন জলাশয় এ থানার বিশেষত্ব। জলাশয়গুলি কোনটিই বড় নয়, কোনটিরই আয়তন ২০ একরের বেশি নয়। এই থানার অধীনে পুকুরী নামে স্থানটিতে একসময় ৩৬০টি পুকুর ছিল, বর্তমানে ১০০টি পুকুর রয়েছে। প্রায় ৪ বর্গমাইল স্থান জুড়ে মৃৎপাত্রের ভগ্নস্তূপ ও প্রাচীন ইটের ধ্বংসাবশেষ এখানে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। এখানে পাওয়া গেছে ব্রহ্মা, গণেশ ও ব্রোঞ্জ নির্মিত সপ্তবাসুকি পরিবেষ্টিত ছোট কৃষ্ণমূর্তি। সাবেককালে এক বা একাধিক রাজবংশের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল এই থানার অধীনে।[২১] কালের মহিমায় এই স্থানটি একদা পরিত্যক্ত ও বসতিহীন হয়ে পড়ে এবং এখানকার ইতিহাস প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে শেরউইলের মানচিত্রে স্থানটি পুকুরী নামেই পরিচিত ছিল।

চিন্তামন থানায় রানিনগর, করই, নন্দীগ্রাম, পুকুরী, মঙ্গলপুর, মইচান্দা, পুইনন্দা, বিনাইল, ধনশা, করমপুর, নরসিংহবাটি, পাথট কল্যাণপুর, চাকোল, অচিন্ত্যপুর, শ্রীরামপুর, ধলপড়া, এই সব বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলিতে প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন যেখানে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়। এর ফলে ধারণা হয় যে, এককালে এই থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সুবিশাল ও সমৃদ্ধশালী জনপদ গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে ডাঙ্গাদিঘি ও সাগরদিঘি সেই স্মৃতি কিছুটা ধরে রেখেছে। ডাঙ্গাদিঘির উত্তর ও পূর্ব দিক দিয়ে কালিকার বিল নামে একটি জলাভূমি আছে। একদা যমুনা নদীর প্রবাহ ছিল এই বিলে। নদী মরে গিয়ে বর্তমানে বিলে পরিণত হয়েছে। এই বিলের পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত মোহনপুর, চাপড়া প্রভৃতি গ্রামগুলিতে আছে প্রাচীন কীর্তির বিশাল ধ্বংসাবশেষ।

১৮২১ খ্রিস্টাব্দের পর প্রশাসনিক সুবিধার জন্য চিন্তামন থানাটি ভেঙ্গে নতুনভাবে

গঠিত হয় ফুলবাড়ি থানা এবং কুমারগঞ্জ থানা।[২৮] দিনাজপুর হ'তে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সমজিয়া ও চিন্তামন[২৯] পার হয়ে হিলির কাছে একটি প্রাচীন সড়ক বগুড়া পর্যন্ত ছিল।

হাবরা থানা

প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতিচিহ্নে ঘেরা এই থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল গৌরিক মাটিময়। কোনও না কোনও প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব এই থানার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। স্থানীয় মানুষের সাক্ষাৎকারে জানা যায়, দশ বছর আগেও এখানে একটি বড় ঢিবি ছিল, যার কিছু চিহ্ন এখনও দেখা যায়। ১৪ ফুট বিশিষ্ট একটি পাকা দেয়ালের অস্তিত্ব ওই সময় ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা অস্তিত্বহীন। আমবাড়ি, বৈগ্রাম, হিলির কাছে অবস্থিত বৈগ্রাম নয়, রাজাবাসর বিভিন্ন গ্রামগুলিতে এখনও প্রত্ন ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখান থেকে দশম-একাদশ শতাব্দীর কালো পাথরের একটি নন্দীমূর্তি পাওয়া গেছে (সত্তরের দশকে), যা বর্তমানে দিনাজপুর (বাংলাদেশ রাষ্ট্র) মিউজিয়ামে রয়েছে।

এই থানার অদূরে রঘুনাথপুর গ্রামে রয়েছে প্রাচীন বাংলার একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। কথিত, এই দুর্গেই বিরাট রাজার সেনাপতি ও শ্যালক কীচক বসবাস করতেন। এই থানা ক্ষৌণীনায়ক ভীমের স্মৃতি প্লুতময়। লোকশ্রুতি, এখানে একটি প্রাচীন বট গাছের নীচে একটি পাথরের লাঙ্গল ও কৃষিকাজের উপযোগী পাথরের আরও কিছু জিনিস ছিল। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এগুলি কীচকের নিধনকর্তা মধ্যম পান্ডব ভীমের পরিত্যক্ত জিনিস। এই বিষয়ে নানা লোককাহিনি এখানকার মানুষের মুখে এখনও শোনা যায়। উল্লেখ যে, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলা গঠিত হয়। তখন এ জেলার আয়তন ছিল বিশাল। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ২২টি থানার মধ্যে হাবরা থানাটিও ছিল রংপুর জেলার অধীনে। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে করতোয়া নদীকে জেলার পশ্চিম সীমানা নির্দ্ধারণ করা হয়। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে হাবরা[৩০] থানাকে দিনাজপুর জেলায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এই থানার সীমানা ছিল ১৭২ বর্গমাইল, গ্রামের সংখ্যা ছিল ২০২টি, বাড়ির সংখ্যা ১০ হাজার ৬ শত ২০টি এবং লোক সংখ্যা ছিল ৬২ হাজার ৯ শত ৭ জন।[৩১]

নওয়াবগঞ্জ থানা

নবাবি আমল থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। নওয়াবগঞ্জ[৩২] থানাটি করতোয়া নদীর পরিত্যক্ত খাতের ওপর অবস্থিত। এই থানার কাছেই করতোয়া নদীর ডান তীরে রয়েছে তর্পণঘাট নামে করতোয়ার একটি ঘাট। কথিত, এই ঘাটে রামায়ণ প্রণেতা বাল্মীকি স্নান ও তর্পণ করতেন এবং এর কাছেই কোনও একটি জায়গায় তাঁর আশ্রম ছিল।[৩৩] তর্পণঘাট থেকে শুরু করে পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণে প্রায় ১ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছিল প্রায় ৫০টির বেশি ঢিবি। বর্তমানে তার ধ্বংসস্তূপ প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ। এই ঢিবিগুলি একসময় বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। করতোয়া নদীর ডান তীরবর্তী অঞ্চলে এরকমই একটি ঢিবি খনন করতে গিয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান পাওয়া যায়। যা সীতাকোট বৌদ্ধ বিহার নামে পরিচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, আকারে অতি

ছোট কিন্তু বয়সে অতি প্রাচীন এই বৌদ্ধ বিহারটি। বাংলাদেশের মাটিতে এ যাবত যত বিহার আবিস্কৃত হয়েছে, সীতাকোট বিহার সর্বাধিক প্রাচীন। এর মূল কারণ হিসাবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পাহাড়পুর, ময়নামতি, নালন্দা, এইসব মঠের পরিকল্পনায় যেমন বিহার চত্বরের ঠিক মাঝখানে প্রধান মন্দির বা কেন্দ্রীয় মঠ থাকার নিয়ম, সীতাকোট বিহারে তা নেই। সীতাকোট বিহার এমন একটি বিহার যা বিহার চত্বরে কেন্দ্রীয় মঠ নির্মাণে রীতি প্রবর্তিত হওয়ার বহু আগেই নির্মিত হয়েছিল।[৩৪] পাকিস্তান আমলে এই স্থানটি খননের পর লোকেশ্বর পদ্মপানি ও মঞ্জুশ্রী মূর্তি পাওয়া যায়। তাছাড়া, টেরাকোটা ইট, বাঘের পা চিহ্ন ইট, পাথরের খিলান, লৌহ বলয়, মাটির জালা, মাছের নকশা বিশিষ্ট ইট ইত্যাদি পাওয়া যায়। খননকালে মৌর্য যুগের অজস্র মৃৎপাত্র খুব মসৃণ ও ঘোর কালো রঙের দেখতে, যার কিছু নিদর্শন দিনাজপুর মিউজিয়ামে রয়েছে। এই থানার মোট এলাকা ছিল ১৮০ বর্গমাইল (১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায়) এবং লোকসংখ্যা ৮২ হাজার ৫ শত ৪২ জন। দেশভাগ কালে থানাটি পূর্ব পাকিস্তানের অধীনে পূর্ব দিনাজপুরের অধীনভুক্ত হয়।

পুরুষ বা পোর্শা থানা

পুরুষ বা পোর্শা[৩৫] দিনাজপুর জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ থানা। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী জেলার সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনে এই থানা আদমদিঘি থানায় পরিণত হয়। আবার ১৮৯৬ সালেই আদমদিঘি থানাকে রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই থানা আবার নবগঠিত বগুড়া জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য পুরাতন পোর্শা থানার বেশ কিছু অংশ আদমদিঘি থানা থেকে নিয়ে পুনরায় পুরুষ বা পোর্শা থানা গঠিত হয় এবং বাকী অংশ আদমদিঘি থানার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বালুরঘাট মহকুমা গঠিত হলে এই থানা বালুরঘাট মহকুমার সঙ্গে যুক্ত হয়। বিখ্যাত ওয়াহাবি আন্দোলনের তীর্থপীঠ ছিল এই থানা। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় এই থানার মোট এলাকা ছিল ১৪৯ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ৭১ হাজার ২ শত ৮৯ জন।

মালদহ থানা

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে রাজশাহী জেলার রেহানপুর ও চাপাই থানা, পূর্ণিয়া জেলার কয়েকটি থানা ও দিনাজপুর জেলার বামনগোলা ও মালদহ, এই দুটি থানা বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে মালদহ জেলা গঠিত হয়। জেলা হিসাবে মালদহ জেলা প্রায় দু'শো বছরের হলেও সাবেক দিনাজপুরের এই থানাটির বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে সুখ্যাতি ছিল। *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে মালদহকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিদেশী পর্যটক তাভার্নিয়ের ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে মালদহে এসেছিলেন। হ্যামিলটন সাহেব লিখেছেন ঃ "Malda was a large town, well inhabited and frequented by merchants of the different nations." রেনেল লিখেছেন, "Malda is a pretty neatcity. This as well as Cossimbazar is a place of trade."

গঙ্গা-মহানন্দা-কালিন্দী নদী এই জেলার ব্যবসা-বাণিজ্যের এবং ফসলের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে এসেছে। নৌ ও সড়ক যোগাযোগের দিক থেকে মালদহ বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। মালদহ একদা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার রূপে গণ্য হয়েছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম যুগের অজস্র চিরত্ন সামগ্রির স্মৃতি দিয়ে ঘেরা গৌড়-পাণ্ডুয়া ও পুরাতন মালদহের ধ্বংসাবশেষগুলি আজও অতীতের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। বাংলায় তুর্কি-আফগান আধিপত্যের সূচনা থেকে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তর পর্যন্ত গৌড় লক্ষণাবতী ছিল মুসলিম অধিকারের কেন্দ্রবিন্দু। প্রাচীন এই থানায় বাংলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এর একটি হল, গৌড়ের নিকটবর্তী খালিমপুর গ্রামে প্রাপ্ত ধর্মপালদেবের তাম্রশাসন। অপর দুটি, গাজোল থানার জাজিল পাড়া গ্রামে প্রাপ্ত দ্বিতীয় গোপালদেবের তাম্রশাসন এবং অতি সম্প্রতি জগজ্জীবনপুরে প্রাপ্ত মহেন্দ্রপালদেবের তাম্রশাসন। মুসলিম অধিকার কালে দীর্ঘসময় মালদহ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাজের প্রধান কেন্দ্র হওয়ার দরুন এখানে স্বর্ণ এবং রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে বলে জানা যায়।

পাঁচবিবি থানা

দিনাজপুর জেলার সাবেক লালবাজার থানা প্রশাসনিক সুবিধার্থে পাঁচবিবি থানায় রূপান্তরিত হয়। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের আগে পাঁচবিবি দিনাজপুর জেলার থানারূপেই যুক্ত ছিল। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাঁচবিবি থানা নবগঠিত বগুড়া জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই থানাটি পূর্বে কাঙ্গুরী পরগনার কিছু অংশ, পিঞ্জরা এবং কিছু অংশ ঘোড়াঘাট সরকারের সীমানা নিয়ে গঠিত হয়েছিল। তখন এই থানার আয়তন ছিল ১ লাখ ৩০ হাজার ৩ শত ২৭ একর এবং গ্রামের সংখ্যা ছিল ৫৫৭টি। বিলাতি, ভেল্লামুখী, নরি এবং অষ্টমুখী, এই চাররকমের আখ চাষের জন্য এই থানার সুনাম ছিল।

মহিপুর, আটাপুর এবং কসবা-উচাই গ্রামগুলি এই থানার প্রত্নস্মৃতি বিজড়িত। সামান্য মাটি খুঁড়লেই ছড়ানো-ছিটানো ইট ও পাথরের টুকরো এখনও দেখা যায়। পাঁচবিবি থানার পশ্চিমপ্রান্তে রয়েছে বিখ্যাত নিমাইপীরের দরগা। গৌড় সুলতান সৈয়দ নাসির উদ্দিন আবুল মুজঃফর নসরৎ শাহের রাজত্বকালের একটি খোদাইলিপি এখান থেকে পাওয়া যায়। পাঁচবিবি বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জয়পুরহাট জেলার একটি উপজেলা।

জয়পুরহাট থানা

দিনাজপুর জেলার সাবেক একটি গুরুত্বপূর্ণ থানা। ১৮০৮-১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে বুকাননের রিপোর্টের পর এই থানা দিনাজপুর জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে নবগঠিত বগুড়া জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই থানার দেড় মাইল দক্ষিণে 'বেল আমলা' নামে এলাকাটিতে গন্ধবনিক সম্প্রদায়ের রাজীব লোচন মণ্ডল নামে জৈনক ব্যক্তি মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ ধনী জগৎ শেঠের মত ধনশালী বলে জানা যায়।[৩৬] বেল আমলার দ্বাদশ শিবালয় মন্দির তাঁর অতুলনীয় কীর্তি।

কাহারুল থানা

সাবেক এই থানার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বেলোয়া নামক গ্রামটি হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের একটি সমৃদ্ধ জনপদ। এখানকার বড় বড় জলাশয়গুলি ছামদলে আচ্ছন্ন হয়ে এখন মজে গেছে। সেকেলে বড় বড় অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন ইট, মৃৎপাত্র ইত্যাদি এখানে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়। দেখলেই মনে হয় পুরাকালে এখানে গুরুত্বপূর্ণ জনপদ ছিল। এই থানার অধীনেই বর্তমানে রয়েছে রাজা প্রাণনাথের নির্মিত কান্তনগরে কান্তজীর মন্দির। নানান পৌরাণিক কীর্তিকাহিনি এখানকার মাটির সঙ্গে মিশে আছে। কথিত, মহাভারতে বর্ণিত বিরাট রাজার রাজধানী ছিল এই অঞ্চলে। কান্তনগরে ছিল বিরাট রাজার উত্তর গো-গৃহ, দক্ষিণ গো-গৃহ ছিল বানগড়ে। বিরাট রাজার ঘোড়াশালা ছিল ঘোড়াঘাটে। ঘোড়াগুলি করতোয়া ঘাটে জল খেতে যেতো, তাই তার নাম রাখা হয় ঘোড়াঘাট। এই অঞ্চলে কীচকগড়, করদহ, সীতাকোট, তপর্ণঘাট, করতোয়া নদী, শমীবৃক্ষ, জীয়ৎকুণ্ড মরণকুণ্ড, উষাহরণ ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে অজস্র কাহিনী ও কিংবদন্তি ছড়িয়ে আছে। এখানকার গড়ন্দরপুর গ্রাম থেকে প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন স্বরূপ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর বিষ্ণুমূর্তি, উমা-মহেশ্বর, ও মনসামূর্তি পাওয়া গেছে। এই থানার উত্তর পশ্চিমে পুর্ণর্ভবা নদীর ডানতীরে বেলোয়া গ্রামের কথা আমাদের লোককবি জগজ্জীবন ঘোষালের *মনসামঙ্গল* কাব্যে পাওয়া যায়। এখানে ২০ একরের বেশি দীর্ঘ সাবেক বেহুলার দিঘি এখন বেলোয়াদিঘি নামে পরিচিত। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে এই থানার আয়তন ছিল ৭৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩৯ হাজার ১ শত ৪৭ জন।

খানসামা থানা

ঐতিহাসিক নানান নির্দশনে ভরপুর এই থানা। ভাবকি নামে প্রাচীন গ্রামটি একদা যে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল তা এই অঞ্চলের অনেকগুলি জলাশয়, যেখানে-সেখানে ছড়ানো ছিটানো ভাঙা ইট, ভাঙা মৃৎশিল্প ইত্যাদি দেখলে মনে হয়। এখান থেকে ক্ষুদ্র পাদ লিপি-যুক্ত দশম-একাদশ শতাব্দীর বিষ্ণুমূর্তি, দিগম্বর পার্শ্বনাথ, ঋষভনাথ ইত্যাদি জৈনমূর্তি পাওয়া গেছে। একসময় এই থানায় জৈন সম্প্রদায়ের কিছু ধনাঢ্য ব্যক্তি বসবাস করতেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে এই খানসামা থানার সীমানা ছিল মোট ৬৯ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ছিল ৪৯ হাজার ২ শত ৫৪ জন।

বিরল থানা

ধান, পাট, কলাই ও সরিষার জন্য খ্যাত ছিল এই থানা। প্রাক্-স্বাধীনতা কালে এই থানার সীমানা ছিল ১৩৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল ৬৭ হাজার ৬ শত ১২ জন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর-কাটিহার রেল যোগাযোগ চালু হলে বিরল একটি গুরুত্বপূর্ণ থানায় পরিণত হয়। রেলযোগে প্রচুর ধান, পাট, কলাই এই স্টেশন মারফৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে রপ্তানী করা হত। ঐতিহাসিক দিক থেকেও এই থানার গুরুত্ব অতুলনীয়। এখানকার চণ্ডীপুর, বিশ্বনাথপুর, ধর্মপুর প্রভৃতি অঞ্চলগুলি সাবেক কালে এক একটি সমৃদ্ধ জনপদ

ছিল বলে মনে হয়। এইসব গ্রাম থেকে বিষ্ণু, দুর্গা, চামুণ্ডা, উমা মহেশ্বর, সূর্য, গণেশ বিভিন্ন মূর্তিপাওয়া যায়। এখান থেকে একটি দুঃস্প্রাপ্য ভদ্র মন্দির যার চূড়ায় প্রতিকৃতি, প্রত্নবস্তুটি পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে এই ধরনের প্রত্ন নির্দশন দ্বিতীয় আর পাওয়া গেছে বলে আমার জানা নেই। এই পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনটি বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দিনাজপুর মিউজিয়ামে রয়েছে।

চিরিরবন্দর থানা

প্রাচীন আমলে এখানে একটি জনকল্লোলমুখর জনপদ যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় স্থানটির ভৌগোলিক পরিকাঠামো ও প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনে। ফেরুসানগর, রানির মন্দির, জেটমহলপুর, বারুণী, এইসব অঞ্চলে হিন্দু-বৌদ্ধ আমলে যে সমৃদ্ধশালী মানুষজনের বসতি ছিল তা ওইসব জায়গার প্রাচীন জলাশয়, ইটের টুকরো, মৃৎপাত্র বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনে প্রমাণ পাওয়া যায়। ফেরুসানগর গ্রাম থেকে পাওয়া গেছে বিষ্ণু ও নবগ্রহ মূর্তি। এই থানার অধীনে বারুণির মেলাভূমি নামে একটি সাবেক গ্রাম রয়েছে। আত্রাই নদীর একটি শাখা এই জায়গার উত্তর পাশ দিয়ে একসময় বয়ে যেতো। সে নদী মরে গেলেও নদীর খাতটি এখনও দেখা যায়। বারুণির স্নান উপলক্ষে এখানে মেলা বসে। ১২১ বর্গমাইল এই থানার মোট সীমানায় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় মোট লোক সংখ্যা ছিল ৮৯ হাজার ৬ শত ৬৭ জন।

পার্ব্বতীপুর থানা

এই থানার সীমানা ১৬৭ বর্গমাইল। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মোট জনসংখ্যা ছিল ১ লাখ ১১ হাজার ৫ শত ৯৬ জন। শ্রীচন্দ্রপুর এই থানার একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে ১ বর্গমাইল এলাকাজুড়ে পরিখাবেষ্টিত একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ সহজেই চোখে পড়ে। এখানে রয়েছে চন্দ্রাহার নামে একটি দিঘি এবং আশপাশ জুড়ে রয়েছে প্রাচীন অনেকগুলি জলাশয়। এর কাছেই আরও একটি প্রাচীন গ্রাম দেউলবাড়ি। এখানে ১০ ফুট চওড়া কয়েকটি ইটের দেয়ালের অস্তিত্ব এখনও দেখা যায়। এই অঞ্চল থেকে কয়েকটি গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভ পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। সাবেক কোটিবর্ষ নগরী বা বাণগড় এই থানা থেকে ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। দেউলবাড়ির ১ মাইল পূর্বদিকে মাটির প্রাচীর বেষ্টিত মাঝারি আকারের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। দুর্গটি যে বেশ পুরনো তা দেখলেই বোঝা যায়।

পার্ব্বতীপুর থানা হেডকোয়ার্টার থেকে বেলাইচাণ্ডী রেলস্টেশনের ধারেই আরও একটি দুর্গ নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কথিত যে, মহাভারতের বিরাট রাজার বাড়ি ছিল এখানে। বিরাট রাজার কীর্তিকেস্মরণীয় করে রাখতে আরও একটি প্রাচীন গ্রামের সন্ধান পাওয়া যায়, নাম বিরাট পাঠক বা বীর পাঠক। এই থানার খোলাহাটি, রঘুনাথপুর, খামার জগন্নাথপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি প্রত্নবস্তুতে ভরপুর। খোলাহাটি রেলস্টেশন থেকে প্রায় আধ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্গাকারে নির্মিত এবং প্রায় ৫ শত গজ বাহু বিশিষ্ট একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। লোকবিশ্বাস যে, মহাভারতে

উল্লেখিত বিরাট রাজার শ্যালক কীচক ওই দুর্গটিতে বসবাস করতেন। এখানকার কাটাহার দিঘি ঐ অতীত ঐতিহ্যরই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এই থানার পূর্ব-দক্ষিণে প্রাচীন করতোয়া নদীর ডানতীরে পাঁচ পুকুরিয়া ও ৫টি স্তূপের স্মৃতি এখনও কালের মহিমায় টিকে আছে। পাঁচটি পুকুরের জন্য অঞ্চলটি পাঁচপুকুরিয়া আর পাঁচটি ঢিবি আছে বলে স্থানটি বর্তমানে পাঁচপুকুরিয়া রাজবাড়ি নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এর কাছেই লোহানী পাড়া (বর্তমান রংপুর জেলা) নামক প্রাচীন গ্রামটিতে বড় বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। বর্ধন উপাধিধারী এক রাজবংশের নৃপতি অংশুবর্ধন কর্তৃক ওই বিহার নির্মিত হয়েছিল বলে শিলালিপি থেকে জানা যায়।

ফুলবাড়ি থানা

১৯৪১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী এই থানার সীমানা মোট ১৩৪ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল ৭৬ হাজার ৬ শত ৫০ জন। সাবেক কালে গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলার উত্তরাঞ্চলের অধিপতি রাজা শ্রীগুপ্তকে সপ্তম শতাব্দীর চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ বাংলার অধিপতি বলে উল্লেখ করে গেছেন। হিউয়েন সাঙ্-এর এই অভিমত সত্য বলে ধরে নিলে বাংলায় গুপ্তদের অস্তিত্ব খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময় থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সমুদ্রগুপ্ত বা তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কোনও লিপি দিনাজপুর জেলায় পাওয়া যায়নি ঠিকই, কিন্তু এ জেলা যে তাদের রাজ্যভুক্ত ছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের দুটি তাম্রলিপি (৪৪৩ ও ৪৪৭খ্রিঃ), একটি ফুলবাড়ি থানার দামোদরপুর নামে সাবেক গ্রাম, অপরটি হিলির কাছে বৈগ্রাম নামে একটি প্রাচীন গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব লিপি থেকে দিনাজপুর জেলার কোটিবর্ষ, শিলবর্ষ ও পঞ্চনগরী নামে তিনটি বিষয় (বর্তমান জেলা) সম্পর্কে জানা যায়।

উল্লেখ্য যে, মগধে রাজত্বকারী পরবর্তী গুপ্তরাজাদের অধিকারে বেশ কিছুকাল উত্তরবঙ্গ ছিল বলেও মনে হয়। কারণ, এদের মধ্যে দামোদরগুপ্ত এবং তাঁর পুত্র মহাসেন-গুপ্ত দিনাজপুর অঞ্চলে তাঁদের অবদানের অনেক চিহ্নই রেখে গেছে। দিনাজপুর জেলায় দামোদরগুপ্তের নামে দুটি প্রাচীন নগরী ছিল বলে মনে হয়। একটি ফুলবাড়ি থানার অধীনে দামোদরপুর গ্রাম, অপরটি, বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঘোড়াঘাট উপজেলার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দামোদরপুর নামক গ্রাম। ফুলবাড়ি থানার বামনগড়, কাঁটাবাড়ি, এলুবাড়ি, শুজাগড় অঞ্চলগুলি প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের বিভিন্ন স্মৃতিকে আজও ধরে রেখেছে। কাঁটাবাড়ি অঞ্চলে গড়গোবিন্দ নামে একটি পুরনো দুর্গের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে কানাহার নামে একটি বড় দিঘি এবং বেশ কয়েকটি সাবেক জলাশয়ের অস্তিত্ব এখনও রয়েছে। এই অঞ্চলটি গুপ্ত আমলে দামোদরপুরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বলে মনে হয়। এই থানার পূর্ব-দক্ষিণ দিকে মৃত করতোয়া নদীর খাত এবং ফুলবাড়ি থানার অধীনে লালপুর মৌজা থেকে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণে

মির্জাপুর পর্যন্ত রয়েছে যমুনা নদী। এই দুই নদীর ডান ও বাম তীরবর্তী অঞ্চলে অসংখ্য প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

কুশমণ্ডি থানা

মুখ্যত রাজস্ববৃদ্ধি ঘটানোর উদ্দেশ্যে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কুশমণ্ডি নামে নতুন থানাটি প্রতিষ্ঠিত করে। এই থানা গঠনের অপর আরো একটি কারণ হল, খরা ও বাণ-বন্যার জন্য এই অঞ্চলে মাঝে মাঝেই উৎপাদিত ফসল মার খেতো। তাছাড়া, প্রজাদের কাছে সামন্ত প্রভুদের খাজনার জুলুম চলত চড়া হারে। রাজস্ব আদায়ে প্রজাদের উপর চলতো ব্রিটিশ সরকারের অমানুষিক অত্যাচার। এ সব কারণে এই অঞ্চলের প্রজারা ব্রিটিশ শাসনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ক্রমে এই অঞ্চলে ব্রিটিশ-বিরোধী তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং এর মোকাবিলার জন্যও থানাটির প্রতিষ্ঠা হয়।

১২০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে সৃষ্ট এই থানাটিতে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের লোক গণনার রিপোর্টে মোট জনসংখ্যা ছিল ৫৩ হাজার ১ শত ৯০ জন। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে এ থানায় ছিল ২ জন সাব ইন্সপেক্টর, ২ জন সহকারী সাব ইন্সপেক্টর, ১৪ জন কনস্টেবল। ৮টি ইউনিয়ন বোর্ডে মোট চৌকিদারের সংখ্যা ছিল ৯৭ জন, দফাদার ১৬ জন। ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তা ছিল খগইল (Khagail) থেকে মহিপাল পর্যন্ত। দুটি মেলা সাবেক এই থানাটির গ্রামীন অর্থনীতিতে সাড়া জাগাত। এর একটি হত এপ্রিল-মে মাসে বার্নিস্নান উপলক্ষে সরলা নামে (জে. এল. নং ৫৪) প্রাচীন গ্রামটিতে, অপরটি ধকরই (Dhokrai) গ্রামে ওই একই সময়ে পীরের উরস উৎসব উপলক্ষে, ১০ দিন চলত এই মেলা।[৩৭] বর্তমানে লুপ্ত প্রায়।

ইতিহাস খ্যাত মহিপালদিঘি এই থানারই অধীনে। বংশীহারী দিনাজপুর রোডের ১০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত মহিপালদিঘি পালরাজা প্রথম মহিপালদেবের স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত স্থান। ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক কিলহর্ণ মহিপালের বাণগড় লিপির পাঠোদ্ধার করেন। তার থেকেই জানা যায় যে, সুবৃহৎ মহিপালদিঘি রাজা মহিপালদেবের কীর্তি বহন করেছে। ৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে দিঘিটির খননকাজ শুরু হয়।

দিনাজপুর জেলার বিবরণে বুকানন হ্যামিলটন মহিপালদিঘি সম্পর্কে লিখেছেন, দিঘিটি দৈর্ঘ্যে ১৩৪০ গজ ও প্রস্থে ৩৭০ গজ। এই দিঘির খনন কাজ হয় ৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে। আজও এই অঞ্চলে একটি প্রবাদ ছড়িয়ে আছে, 'ধান ভানতে মহিপালের গীত'। এই গান এখনও ভোররাত্রিতে এই অঞ্চলের বিশেষ করে মুসলিম পরিবারের মেয়েরা ধান ভানতে ভানতে গেয়ে থাকে।[৩৮] এই দিঘির দক্ষিণ ধারে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক পণ্ডিত গোলকনাথ শর্মা এবং কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় বসবাস করতেন। তাঁরা সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারে এখানে একটি চতুষ্পাঠী খুলেছিলেন। বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ উইলিয়াম কেরী গোলকনাথের ভাই কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে সংস্কৃত এবং এই দেশের ধর্মশাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে মহিপালদিঘি নীলকুঠির দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছিলেন মিশনারী জন টমাস। বঙ্গদেশে প্রথম ইউরোপীয় দাতব্য চিকিৎসালয় তিনি এখানে খুলেছিলেন। জন টমাসের বন্ধু উইলিয়াম কেরী মদনাবতী

নীলকুঠি থেকে (বর্তমান মালদা জেলা) মাঝে মাঝেই মহিপালদিঘি নীলকুঠিতে আসতেন। এই দিঘির ধারেই দিনাজপুর জেলার প্রথম সতীদাহ হয়েছিল। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে গোলকনাথ শর্মা মারা গেলে তার স্ত্রী স্বামীর চিতায় একত্রে প্রাণ দেন।[৩৯] মহিপালদিঘির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় দুই মাইল দূরে পঞ্চনগর (জে.এল. ২১৭) নামে একটি সমৃদ্ধ হিন্দু জনপদ ছিল। প্রাচীন বিলুপ্ত এই জনপদটির অস্তিত্ব এখনও এখানকার গৌরিক মাটি, প্রাচীন ইট, মৃৎপাত্র ও ভগ্নমূর্তি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই থানার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রয়েছে ইতিহাসের আরও একটি গৌরবোজ্জ্বল প্রত্নস্মৃতি চিহ্ন- একডালা বৈরাট্টা (জে. এল ৩৯)। আরও একটি ঐতিহাসিক গ্রাম করণজী। কংসব্রতের মেলার জন্য স্থানটি বিখ্যাত। এই অঞ্চলটিকে অনেকে ধর্মপালের রাজধানী করঞ্জা বলে অনুমান করেন। এখানে ত্রিশ ফুট উঁচু মাটির ঢিপি দেখা যায় যা ভীমদেউল বা হাটখোলা নামে পরিচিত। ত্রয়োদশ শতকের নির্মিত ত্রিবিক্রমের মূর্তি এখানে পাওয়া যায়। মূর্তিটির পাশে খোদিত লিপি থেকে অনেকের ধারণা যে, মূর্তিটি এই অঞ্চলের আদত বাসিন্দা 'পালদের দেবতা'। এখানে একটি অর্ধভগ্ন মন্দির আছে যা শচীদেবীর থান বা কংস রাজার থান নামে পরিচিত। সুলতান আমলে নিরব-বিপ্লবের মাধ্যমে একজন হিন্দুরাজা গৌড়ে রাজত্ব করেছিলেন, সেই হিন্দুরাজা গণেশের বাড়ি এখানে ছিল বলে লোকশ্রুতি। এই অঞ্চলে রয়েছে চিরত্ন সামগ্রীর নানান আলোকিত দিক, যার খনন কাজ খুবই জরুরী।

ধান, পাট ও লঙ্কার জন্য সাবেক কাল থেকেই এই থানা অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এখানকার লঙ্কা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে রপ্তানী করা হতো। শিল্প বলতে পাটের লাছির সাহায্যে সুতো তৈরি করে এখানে ধোকড়া বোনা হত। রাজবংশী সমাজের মহিলারা এই শিল্পকলাটির সঙ্গে যুক্ত ছিল। আর ছিল কাঠের তৈরি মুখোস শিল্প। চৈত্র-বৈশাখ মাসে গমীরা পুজা এখানকার অন্যতম উৎসব। এই উৎসবে অনুষ্ঠিত হত মোখা নাচ, যা বাংলার লোক সংস্কৃতির অন্যতম কলাকৃতি। টাঙ্গন নদী এই থানার প্রাণ প্রাচুর্যকে লাবণ্য দিয়েছে। এই নদীর ধারেই শিউহল নামে প্রাচীন আমলের বন্দরটিতে ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রে ইউরোপের বিভিন্ন বণিকেরাও এসেছিলেন। জগজ্জীবন ঘোষালের *মনসামঙ্গল* কাব্যে এবং মানিকদত্তের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে এই বন্দরের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কুশমন্ডি কুশ অর্থ কুশ তৃণের আচ্ছাদিত গৃহ। মুন্ডি অর্থ মুণ্ডনকারী বা ক্ষৌরকার, যাদের দ্বারা নাড়ামুন্ডি অর্থাৎ নেড়ামুড়া করতে হয়। পৌণ্ড্র দেশের মানুষেরা এখানে নেড়ামুড়া করে কুশতৃণকে মাটিতে বিছিয়ে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধক্রিয়াদি সম্পন্ন করতেন বলে স্থানের নাম কুশমন্ডি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

ইটাহার থানা

লর্ড রিপন-এর আমলে (১৮৮০ - ৮৪ খ্রিঃ) বৃটিশ শাসন ও শোষণকে আরো সাফল্যের পর্যায়ে নিয়ে যেতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দিনাজপুর জেলার ক্ষুদ্রতর শাসনতান্ত্রিক এলাকা সম্প্রসারণের কথা গভীর ভাবে বিবেচনা করে বড় বড় থানাগুলিকে ভেঙ্গে নতুন নতুন থানা বা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র গঠনের উদ্যোগ নেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে

সাবেক হেমতাবাদ থানাকে ভেঙ্গে নতুন করে গঠিত হয় রায়গঞ্জ ও ইটাহার নামে দুটি থানা। মহানন্দা নদী এই থানাকে সুজলা সুফলা করে তুলেছে। ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত অতীত রামাবতী নগরী এবং জগদ্দল-মহাবিহারের অস্তিত্ব এই থানার মাটির তলে রয়েছে বলে আধুনিক ইতিহাসবিদ্‌দের কারো কারো অভিমত। এখানকার বাণিজ্য বন্দর চুড়ামণ (জে এল. নং. ১৬৪) ছিল এই থানারই অধীনে। ইটাহার থানার সুবর্ণপুর, অমৃতখণ্ড, রুদ্রখণ্ড, ব্রহ্মখণ্ড ছিল একদা বড় বড় জনপদ, যা বর্তমানে বিলুপ্ত। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে এই থানার সীমানা ছিল ১৬৫ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল ৭৩ হাজার ২৩১ জন।

এই থানার প্রাচীন গ্রাম ভদ্রশীলা, যোগীপাড়া, সুরোহর। এই সব গ্রামে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের নানান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। চিরামতি নদীর তীরে সুরোহর গ্রামটি ছিল একদা জৈনধর্মের পীঠস্থান। এই গ্রামেই জন্মেছিলেন শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর। তাঁর শিক্ষক জেতারি বা জেতকর্ণ ছিলেন এই গ্রামেরই অধিবাসী। শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর বিক্রমপুরের লোক নন, ইটাহার থানার সুরোহর গ্রামের সন্তান। এখান থেকেই তিনি দেবকোট মহাবিহারে লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিলেন। দেবকোট থেকে জ্ঞান লাভ করে সেই জ্ঞানকে তিনি তিব্বতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।[৪০] দুই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত পদ্মপ্রভা ও কল্যাণশ্রী আচার্য জেতারি-র কাছে এই গ্রামেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। এই থানার অধীনে জগদলা গ্রাম, ঐতিহাসিকদের মতে, বাঙলার, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় জগদ্দল-মহাবিহার এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একদা প্রসিদ্ধ মনীষী আচার্যরা বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, মোক্ষাকর গুপ্ত, শুভাকর গুপ্ত, ধর্মাকর, এই মহাবিহারের অধিবাসী ছিলেন।

এই অঞ্চল যে উন্নত ছিল তা এখানকার প্রত্ন নিদর্শনগুলি প্রমাণ করে। ওই থানার পশ্চিমদিকে চামুর নদী এবং কুলিক নদীর মধ্যবর্তী স্থানে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ধুলোহার গ্রাম। ধুলপত রাজার রাজধানী নামে কথিত। এখানকার একটি মূল্যবান সূর্যমূর্তি বর্তমানে খামারোয়া কালীমন্দিরে রয়েছে। এই অঞ্চলের জগদলা, যোগীপাড়া, সুরোহর, গম্ভীরা-তলা থেকে পাওয়া গেছে প্রচুর পাথরের মূর্তি ও উৎকীর্ণ স্তম্ভ। সদাশিব, বিষ্ণু, অবলোকিতেশ্বর, গণেশ, মহাসরস্বতী, এইসব মূর্তির বেশিরভাগই রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সেন্টার এবং বালুরঘাট কলেজ মিউজিয়ামে রয়েছে। পালযুগে এখানে ভাস্কর্য শিল্পকলার শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এখান থেকেই একটি দূর্লভ কালো পাথরের বেদি পাওয়া গেছে, যে বেদির গায়ে খোদিত রয়েছে সপ্তরথ, গরুড়, সাপ, পদ্ম, চক্র এবং বীণাবাদন-রত সরস্বতী। দ্বাদশ শতাব্দীর তৈরি এই মূল্যবান চিরত্ন সামগ্রীটি বর্তমানে কলকাতার জাতীয় সংগ্রহশালায় রয়েছে। এর কাছেই ভদ্রশীলা গ্রাম। ভগ্নশ্রী অঘোর রুদ্রের মূর্তি এই গ্রামের পুরাচিহ্নের এক অনন্য নিদর্শন। মূর্তিটিকে মহিষমর্দিনী নামে গ্রামবাসীরা এখনও পূজা করেন।

প্রাক্-স্বাধীনতাকালে ইটাহার থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫০টি। ৪টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ডাক বিভাগ ছিল ২টি, একটি মারনাই অপরটি ইটাহারে। যোগাযোগের জন্য গ্রামীণ রাস্তা ছিল ইটাহার থেকে চুড়ামণ ও খামরোয়া পর্যন্ত। কোনও

উচ্চবিদ্যালয় ছিল না। ইটাহার থানায় ছিল ১ জন সাব ইন্সপেক্টর, ১ জন এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর, ৮ জন কনস্টেবল। ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা তখন এই থানায় ছিল ৯টি। ৯টি ইউনিয়নে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ছিল মোট ৯৪ জন চৌকিদার এবং ১৮ জন দফাদার। এখানকার উৎপাদিত ফসল ধান, পাট, কলাই, সরিষা। শিল্প ছিল তাঁত ও রেশম শিল্প। দেশি ও পলি সম্প্রদায়ভূক্ত মহিলারা পাটের লাছির সাহায্যে সুতো তৈরি করে লয়েল লুমের মাধ্যমে এক ধরনের শিল্প সামগ্রী তৈরি করত যা ধোকড়া নামে খ্যাত ছিল। এই সমাজের মেয়েরা পাট দিয়ে আরও এক ধরনের শিল্প সামগ্রী তৈরি করত যা তিব্বতীয়ান কার্পেট নামে পরিচিত। ধোকড়া ও তিব্বতীয়ান কার্পেট সবচেয়ে বেশি রপ্তানী হত পাহাড়ের দেশগুলিতে। আজ থেকে একশো বছর আগে প্রশাসন, ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গ্রামীণ শিল্পের ভিত্তিতে ব্রিটিশ রাজ ও স্থানীয় জমিদারপুষ্ট ইটাহার একটি মফস্বল থানা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল এবং ধীরে ধীরে কালের কৃপায় সে বিবর্তিত হতে থাকে। একুশ শতকের গোড়ায় আজ যদি থানাটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তাহলে দেখা যায়, এখানে যেমন আধুনিক প্রশাসন, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও গণচেতনার বিকাশ ঘটছে তেমনি ভাবে আধুনিক নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও ঘটেছে সুসমন্বয়। আর এভাবেই ইটাহার তার মধ্যযুগীয় জীবনের আজ অবসান ঘটিয়েছে।

এই থানার স্থান-নামটিও মাধুর্যমণ্ডিত। এই অঞ্চলের সর্বত্র প্রচুর পুরাতন ইট এবং ইটের কারুকাজ লক্ষ্য করা যায়। মনে হয়, বাংলার রাজ-রাজড়াদের প্রাসাদ নির্মাণের ইট এই অঞ্চল থেকেই বিভিন্ন প্রান্তে যেত। এখানে, যেখানে সেখানে একটু মাটি খুঁড়লেই বেরিয়ে আছে ইট। 'হার' অন্তশব্দ দেবপালের সময়কার বীরদেবের প্রশস্তি থেকে জানা যায়। হার, যা মানুষের মনোহরণ করে, কণ্ঠ হতে লম্বিত বক্ষোভূষণ। ইটের লম্বিত হার যা বসুধীর মধ্যে সৌন্দর্য বোধের পরিচায়ক। তার থেকেই ইটাহার স্থান নাম হবার সম্ভাবনাই বেশী।

বালুরঘাট থানা

বালুরঘাট থানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী এই থানার মোট এলাকা ছিল ১৮১ বর্গমাইল এবং মোট জনসংখ্যা ৯২ হাজার ১৬ জন। ওই সময় এই থানায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪২টি। উচ্চ বিদ্যালয় ছিল ২টি। একটি পতিরামে অপরটি বালুরঘাটে। পতিরামে উচ্চবিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৯৪৪ সালে, ১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারি বিদ্যালয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। এই বিদ্যালয়ে তখন ৬টি শ্রেণি ছিল এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৫৮ জন। শিক্ষক ছিলেন ৮ জন, ৩ জন গ্র্যাজুয়েট, ১ জন ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট বালুরঘাট উচ্চবিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। সেইসময় মোট শ্রেণিসংখ্যা ছিল ১৮টি, ছাত্রসংখ্যা ৬ শত ১৩ জন। ২৬ জন শিক্ষক ছিলেন, এঁদের মধ্যে ১৫ জন গ্র্যাজুয়েট, ৬ জন ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট। বালুরঘাট থানায় ওই সময় ছিলেন ৪ জন এস. আই., ১০

জন এ. এস. আই., ৫০ জন কনস্টেবল। তাছাড়া, ৯টি ইউনিয়ন বোর্ড ছিল। ওই ৯টি ইউনিয়ন বোর্ডে ৯৫জন চৌকিদার এবং ১৮ জন দফাদার ছিল। মহকুমা সদর হিসাবে ছিল ১ জন এস. পি., ৩ জন ডি. এস. পি., এবং ১ জন ইন্সপেক্টর। তাছাড়া, ১ জন কোর্ট ইন্সপেক্টর, এস. আই. ৩ জন, এ.এস. আই. ৫ জন, এইচ. সি. ১ জন এবং ১৫ জন কনস্টেবল ছিল। আর রিজার্ভ এস. আই. ১ জন, রিজার্ভ এ.এস.আই. ২ জন। ডি. আই. বি. ইন্সপেক্টর ১ জন, ৪ জন এস. আই., এ.আস.আই. ৫ জন, এইচ. সি. ১ জন এবং কনস্টেবল ২৮ জন, স্পেশাল আর্মড ফোর্সে ছিল ১ জন ইন্সপেক্টর, ৩ জন এস. আই., ১৯ জন এ. এস. আই., ১৯ জন নায়েক এবং ২৬৭ জন কনস্টেবল।

আত্রাই নদী এই থানার প্রাণ প্রাচুর্যকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। এই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলই ছিল পালরাজাদের পিতৃভূমি। পাল নৃপতি দ্বিতীয় মহিপালের রাজত্বকালে কৈবর্ত নেতা দিব্যোকের নেতৃত্বে প্রজা বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় মহিপাল ওই প্রজা বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে প্রাণ হারান। এর ফলে বরেন্দ্রভূমিতে দিব্যোকের কৈবর্তরাজ কায়েম হয়। দিব্যোকের পর তার ভাই রুদোক এবং ভাইয়ের ছেলে ভীম উত্তরবঙ্গ শাসন করেছিলেন। দ্বিতীয় মহিপালের ছোটভাই রামপাল পরবর্তীকালে হারোনো রাজ্য আবার পুনরুদ্ধার করেন এবং কৈবর্তরাজ ভীমকে রামপাল বন্দী করেন। এ সব ঘটনা ঘটেছিল আত্রাই নদীর অদূরে, যা বালুরঘাট শহর থেকে ২৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে মৌড়াদিবর গ্রামে। যার স্মৃতি আজও দিবরদিঘি নামে এক জলাশয়ের মধ্যে ৪১ ফুট উঁচু ও ১০ ফুট ব্যাস নিয়ে অষ্টকোণ প্রস্তরখণ্ডে কীর্তিত। এই জয়স্তম্ভ মহারাজ দিব্যোকের জয়স্তম্ভ। মধ্যযুগে রাজা প্রতাপাদিত্যের সময়ে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব আত্রাইয়ের নিম্ন প্রবাহে এক গৌরবোজ্জ্বল পর্ব রচনা করেছিল। মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসকদের কাছে এই অঞ্চলই ছিল বরিন্দ্ নামে পরিচিত। পাঠান রাজত্বের শেষভাগে বীরশ্রেষ্ঠ রাজা কাশীনাথ রায় পাঠানপক্ষ ত্যাগ করে মোগল সম্রাট আকবরকে সহায়তা করেন এবং রাজা সমর সিং উপাধিতে ভূষিত হন। তারপর তিনি আত্রাইয়ের তীরে দুর্গ ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদেই রাজা টোডরমল মোগলের পক্ষে বঙ্গ বিজয়ের ঘোষণা করেছিলেন বলে কথিত।[৪১]

এই নদীর তীরেই ছিল তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান। বহু তন্ত্রসাধক এই পবিত্র ভূমিতে পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করে আত্রাইয়ের দুই তীর পুণ্যভূমিতে পরিণত করে গেছেন। ডাকরায় এক তন্ত্রসাধক শ্রী শ্রী চণ্ডীকা দেবীর মূর্তি স্থাপন করে এই অঞ্চলে প্রথম চণ্ডীপূজার সূচনা করে গিয়েছিলেন। কোম্পানির আমল থেকে বাংলার নবজাগরণ ও স্বাধীনতার পূর্বকাল পর্যন্ত আত্রাই তট ভূমি ছিল সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। কোম্পানি আমলে বালুরঘাট বলে কোনও গ্রাম ছিল না। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে চকভবানী এলাকায় সরকার একটি মুনসেফ চৌকি স্থাপন করেন এবং তারপরেই ইংরেজের কাগজপত্রে বালুরঘাট নামটি পাওয়া যায়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা হিসাবে বালুরঘাট মহকুমার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

স্বদেশী ও নানা গণমুখী আন্দোলনের জন্য এই থানার খ্যাতি বঙ্গদেশ জুড়েই রয়ে

গেছে। দেশপ্রেমিক দেবেন্দ্রগতি রায়, যদুপতি রায়, সুশীল রঞ্জন চ্যাটার্জী, সুরেন বাগচী, সুরেশ রঞ্জন চ্যাটার্জী, রমাকান্ত সমাজদার, সরোজরঞ্জন চ্যাটার্জী, ধীরেন্দ্র কুমার ব্যানার্জী, পূর্ণচন্দ্র দে, আমিরুদ্দিন চৌধুরী, কৃষ্ণদাস মহন্ত, কালী সরকার, নলিনীকান্ত অধিকারী, এই থানারই অধিবাসী। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বালুরঘাটে কংগ্রেস কার্যালয়ের দপ্তরটি উদ্বোধন করেছিলেন দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু। '৪২ সালের 'ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের স্রষ্টা মেদিনীপুরের পরেই বালুরঘাট দেশ বিদেশের সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছিল। ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী, রামপ্রাণ গুপ্ত একসময় বালুরঘাটে ছিলেন। বাংলা একাংক নাটকের স্রষ্টা মন্মথ রায় এই শহরেই তাঁর কৈশোর ও তরুণ বয়স অতিবাহিত করেছিলেন।

এই থানার আত্রাই নদী তীরে একটি উন্নত বাণিজ্যবন্দর গড়ে ওঠে। এখানকার সুগন্ধী চাল ভারত ও ভারতবর্ষের বাইরে চালান যেত। তাছাড়া, এখানকার উর্বরা জমিতে পাঠ ও আখের চাষ ভাল হত। আত্রাই নদীর ঘাট এবং বালুর আধিক্য থেকেই বালুরঘাট নামটি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আত্রাই তীরে আধুনিক বালুরঘাট অঞ্চল যে একসময় কান্তনগর নামে পরিচিত ছিল সেই চিত্র মানুল্লামণ্ডল তাঁর *কান্তনামা* পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আজকের বালুরঘাট ছিল অতীতের 'বলহরঘট্ট' নামে একটি গ্রাম। খাল, বিল, নদী, নালা, খাড়ির সঙ্গে বনজঙ্গলে ঢাকা ছিল এই গ্রাম। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* কাব্যে রামাবতীর কিছুদূরে 'বিপুলাতটা' বলে একটি স্থানের উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে এই অঞ্চলটি আত্রাই নদীতীরে অবস্থিত এবং এই বিপুল তটার তীরে একটি প্রাচীন জলপথ ছিল। বিস্তীর্ণ বালুকাময় তীরে ওই জলপথের পরিবর্তিত নামই বালুরঘাট নামে পরিচিত বলে অনেকে মনে করেন।

কুমারগঞ্জ থানা

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে থানাটির সৃষ্টি হয়। এই থানার মোট এলাকা ১১১ বর্গমাইল। ১৯৪১ সালের লোকগণনায় মোট লোকসংখ্যা ছিল ৪৬ হাজার ৩৩ জন। মোট গ্রামের সংখ্যা ২১৮টি। তখন ৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১টি হাই ইংলিশ ইস্কুল ছিল। কুমারগঞ্জ থানা হেডকোয়ার্টারে ছিল১টি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ১টি ডাক বিভাগ। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি এই থানার অধীনে নিওনা (Neona) গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অঞ্জনা বরাট উচ্চবিদ্যালয়টি (Angina Borait H.E.shcool)। ১৯৫০ সালে বিদ্যালয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। তখন বিদ্যালয়ে ৬টি শ্রেণি ছিল, ছাত্রসংখ্যা মোট ১১৫ জন, ৯ জন শিক্ষক, এঁদের মধ্যে ৩ জন গ্র্যাজুয়েট।

স্বাধীনতার আগে কুমারগঞ্জ থানায় ছিল ২ জন সাব ইন্সপেক্টর, ৫ জন এ. এস. আই. এবং ৩২ জন কনস্টেবল। থানাটি মোট ৮টি ইউনিয়ন বোর্ডে বিভক্ত ছিল, এই ৮টি ইউনিয়নে চৌকিদারের সংখ্যা ছিল ৭৩ জন, দফাদার ১৬ জন। আত্রাই নদী এখানকার সভ্যতা সংস্কৃতির মূল সম্পদ। প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলের বিশ্বনাথপুর (জে. এল. ১৪৬) গ্রামে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর পঞ্চরত্ন এবং নবরত্ন ধরনের টেরাকোটা ইটের সমন্বয়ে একটি ভগ্নমন্দির আছে। মন্দির সংলগ্ন দোলমঞ্চের

অস্তিত্ব সম্পন্নভাবেই লুপ্ত আজ। এই অঞ্চলটি দেবগ্রাম নামে পরিচিত। এই স্থানের চারদিকে প্রচুর জলাশয় রয়েছে। এইসব দেখে মনে হয় সাবেক যুগে এখানে একটি উন্নত জনপদ ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসাবে কুমারগঞ্জের খ্যাতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। আত্রাই নদীতীরে মূলত এই বাণিজ্যবন্দর গড়ে ওঠে। কথিত যে, দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত (৪৪৩-৪৪৭ খ্রিঃ) আত্রাই নদীতীরে কুমারগঞ্জে বসতি গড়েছিলেন। হিলির বৈগ্রাম ও ফুলবাড়ির দামোদরপুর তাম্রলিপি দুটি দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের শাসন আমলের। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিপতি দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের নামেই কুমারগঞ্জ নাম হতে পারে। তবে, কুমার শব্দের অর্থ খাঁটি সোনা। প্রাচীন কালে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন বা সওদাপত্র বিনিময় হত কুমার মুদ্রার সাহায্যে অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রার মাধ্যমে। সে কারণেই থানাটির নাম কুমারগঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহে এই থানা অঞ্চলে আত্রাই নদী ধরে ভবানীপাঠক ও দেবীচৌধুরাণির দলবল অবাধে বিচরণ করত। ফকির মজনু শাহ এই থানার অধীনে ফকিরগঞ্জে বড়বাসার কাছে এক দরগায় বেশ কিছুদিন আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই থানা হয়ে প্রথমে তিনি দিনাজপুর এবং পরে বগুড়ায় গিয়েছিলেন। এখানকার মাটি পুণ্যভূমিতে পরিণত করে গেছেন এই থানার ভূমিজ সন্তান *রামচরিত* কাব্যের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী। পুণ্ড্রবর্ধন পুরের নিকটে বৃহদবটু গ্রাম, যে গ্রাম বর্তমানে কুমারগঞ্জ থানার মাদারগঞ্জ হাটের বটুন মৌজার অধীনে। এই গ্রামের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর রচিত কাব্যে বরেন্দ্রীকে পাল রাজাদের জনকভূ বলে উল্লেখ করেছেন। ওই গ্রন্থে তিনি বরেন্দ্রভূমির শস্যসমৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। এই শস্য সমৃদ্ধি মূলত আত্রাই-করতোয়া সমভূমি অঞ্চলের। স্বদেশী যুগে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে হিলি রেল স্টেশনে দার্জিলিং মেল ট্রেন লুঠ করে বিপ্লবীরা সমজিয়া খেয়াঘাটে আত্রাই নদী পার হওয়ার সময় জমিদার, পাইক ও বরকন্দাজদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করে ধরা পড়েন এবং কালাপানি যাত্রা করেন। এই থানার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল চক আমুলিয়া গ্রাম। জিতিয়াদেবীর পুজা উপলক্ষে এখানে মেলা ও উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। তাছাড়া, বটুনগ্রামের চামুণ্ডা ও কুমারগঞ্জের মকেশ্বরী মেলা লোকসংস্কৃতির এক অনন্য দিক।

তপন থানা

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য তপন থানা গঠন করেন, মোট ১৭০বর্গমাইল এলাকা জুড়ে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের লোকগণনা অনুযায়ী এই থানার লোকসংখ্যা ছিল ৬০ হাজার ৩ শত ৭৫ জন। গ্রামের সংখ্যা ২৭৯টি। তখন শিক্ষার জন্য সরকারি রেকর্ডে কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। ছিল কেবলমাত্র দুটি দাতব্যচিকিৎসালয় এবং ডাক বিভাগ। একটি মনহলে (জে. এ. ল নং ৫০) এবং অপরটি তপনে (জে. এল. নং ৬৩), আর একটি হাই ইংলিশ স্কুল। ইস্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কশবা গ্রামে (জে. এল. নং ৬৪) ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। এই বিদ্যালয়ে তখন ১০টি শ্রেণি ছিল.

ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৪৯ জন, শিক্ষকের সংখ্যা ১১ জন, গ্র্যাজুয়েট টিচার ছিল ৩ জন, ১ জন বি টি ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক ছিলেন।

পুনর্ভবা নদী এই থানা বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে রসসিক্ত করে তুলেছে। ইতিহাসখ্যাত তর্পণদিঘি এই থানার অধীনে। এখান থেকে বালুরঘাটের দূরত্ব প্রায় ১৪ মাইল। বালুরঘাট তপন রাস্তার পশ্চিমধারে দিঘিটি অবস্থিত। দিনাজপুর জেলার বড় দিঘিগুলির মধ্যে অন্যতম এই দিঘিটি দৈর্ঘ্যে ৪ হাজার ১ শত ফুট উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং প্রস্থে ১ হাজার ১ শত ৫০ ফুট পূর্ব থেকে পশ্চিমে। এই দিঘির মোট এলাকা ৪ হাজার ৭ শত ফিট থেকে ১ হাজার ৭ শত ৫০ ফিট। জলে নাম্যর জন্য এই দিঘির পূর্ব এবং পশ্চিমদিকে তিনটি ইট বাঁধানো পাকা ঘাট আছে। দিঘির দক্ষিণ তীরেও রয়েছে আরও দুটি ইট বাঁধানো পাকা ঘাট এবং উত্তর তীরে ১টি। উত্তর তীরের ঘাটটির কাছে একটি ভগ্নস্তূপ রয়েছে। এখানে একটি মন্দির ছিল বলে অনেকের ধারণা। কথিত যে, বাণরাজা তাঁর রানির আদেশে এই দিঘিটি খনন করেন। রাজা এই দিঘির তীরে তর্পণ করতেন বলে দিঘির নাম তর্পণদিঘি (বর্তমানে তপনদিঘি)।

তর্পণদিঘির ১ কিলোমিটার দূরে রয়েছে 'পাথরপুঞ্জ' নামে একটি (জে. এল. নং ৬৮) গ্রাম। এখানে অনেকগুলি মজে যাওয়া জলাশয়ের চিহ্ন এখনও রয়ে গেছে। এই অঞ্চলের চারপাশে ছড়ানো ছিটানো ভগ্নস্তূপ দেখে মনে হয় যে প্রাচীনকালে এখানে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। দাউদপুর (জে. এল. নং ৭০) নামে গ্রামটি এই থানার তপন-করদহ রোডের প্রায় ১ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে সাবেক যুগের একটি অর্ধচন্দ্র আকারের সেতু (Arched Bridge) ভগ্ন অবস্থায় কালের কৃপায় এখনও টিকে আছে। এই থানার প্রায় ৬ মাইল দূরত্বে রয়েছে ইতিহাসের কিংবদন্তি জড়ানো করদহ (জে. এল. নং ৭০) গ্রাম। এর কাছেই স্রোতবহা পূনর্ভবা নদী। করদহে রয়েছে দিনাজপুর রাজের ১৮ শতকের তৈরি একটি ভগ্নমন্দির। মনহলি, তপন থানার আরও একটি সাবেক গ্রাম। এখানে ব্রাহ্মণ বংশীয় বর্ধিষ্ণু একজন জমিদারের বাসভূমি রয়েছে। আনুমনিক ১১৮১ খ্রিস্টাব্দের লক্ষ্মণসেনের উৎকীর্ণ একটি তাম্রলেখ এখান থেকেই পাওয়া যায় তা মনহলি তাম্রশাসন নামে ইতিহাস খ্যাত।

ভিখাহার, গ্রামটি করদহ থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে। এখানে বিন্দুবাসিনী দেবীর মন্দির আছে। প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও পাথর নির্মিত বিভিন্ন দেবদেবী ও ভগ্ন জীবজন্তুর মূর্তি পাওয়া যায়। নিদারুণ আঘাত মন্দিরটির সর্বাঙ্গে, কোনও রক্ষণাবেক্ষণ নেই। এই মন্দিরের টেরাকোটা ইট যেমন, ধনুকধারী পুরুষ, পাগড়ি পড়া সৈনিক, নৃত্যরত নারী পুরুষ, যুদ্ধরত সৈনিক, হরিণ, ফুল ইত্যাদি, কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এখনও মন্দির গাত্রে এইসব নিদর্শনের কিছু কিছু চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। ভিখাহার থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় দেড়মাইল দূরে অবস্থিত ভাইওর গ্রাম। এখান থেকে কালো পাথরের একটি ১৬ হাত দশভূজার মূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিটিকে স্থানীয় মানুষেরা এখনও পুজা করেন। মাসাহালি এই থানার আরও একটি প্রত্নসমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে রাজা মদনপালের একটি তাম্রপত্র পাওয়া গেছে, যার

সময়কাল নির্ণিত হয়েছে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক। দ্বীপখণ্ড (জে. এল. নং ১৪০) এই থানা থেকে প্রায় দেড়মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত। এই গ্রামটির বিস্তীর্ণ এলাকায় অনেকগুলি উঁচু টিপি রয়েছে এবং চারপাশে রয়েছে ছড়ানো-ছিটানো ভগ্ন ইট, পাথর ইত্যাদি। তপন থানার সোলা শিল্প সাবেক কাল থেকেই সুনাম অর্জন করেছে। সোলার বিষহরি পট, মনসার চৌদোলা, সোলার চামুণ্ডা, বুড়াবুড়ি ইত্যাদি থানার লোকশিল্পের অন্যতম দিক।

হেমতাবাদ থানা

যে কোনও স্থানের ধর্ম, শিক্ষা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, রাজনীতি, কৃষি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ, অর্থনীতি অর্থাৎ মানব সভ্যতার যে ধারাবাহিক বিবর্তন তা ইতিহাসেই প্রতিফলিত হয়। পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাস পেতে হলে তার আগে তাই আঞ্চলিক ইতিহাস জানা প্রয়োজন। নিজ অঞ্চলকে না জানলে বাঙালির গড়ে ওঠার ধারাকেও জানা সম্ভব নয়। আঞ্চলিক ইতিহাসেই রয়ে গেছে শেকড়ের সন্ধান ও গুরুত্ব। সন্ধানী মানুষ কখনোই অতীতের অজানা কোনও অন্ধকারকেই মানতে রাজী নয়। আবিষ্কারের সাধনায় আত্মনিয়োগ করাই সভ্য মানুষের ধর্ম।

বহু শতাব্দী প্রাচীন তাজপুর উপনিবেশের অধীনে হেমতাবাদ ছিল সেনাবাহিনীর প্রধান কার্যালয়। হিন্দু আমলে ও মুসলিম যুগে এই জনস্থানটি নানা দিক থেকে তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। দিনাজপুরের রাজা রামনাথ রায়ের শাসন আমলে (১৭২২ - ১৭৬০) তাজপুর গৌরবের শীর্ষে ওঠে। তাজপুর রাজস্ব বিভাগের অদূরেই হিন্দু ও মুসলিম, এই দুই আমলের সামরিক বাহিনীর সেনানিবাস রূপে হেমতাবাদ অঞ্চলের প্রতিপত্তি বেড়ে উঠেছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের বহু কীর্তির নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় এখানে। কাশতারাই (জে. এল. নং ৪৬), দেহচি (জে. এল. নং ৭৭), মহিপুর (জে. এল. নং ৮৮), চিরত্নমণ্ডিত স্থানগুলিতে হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিদর্শন প্রাচীন ইট, বুদ্ধমূর্তি, টেরাকোটা শিল্পকলা পাওয়া গেছে। হিন্দুযুগে তাজপুর জনপদের অধীনে কমলাবাড়ি অঞ্চলে মহেশনামে একজন হিন্দু রাজা রাজত্ব করতেন। এই অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমে বালিয়াদিঘি নামক গ্রামে বাস করতেন রাজা বালিয়া নামে আরও একজন হিন্দু সামন্ত। এঁদের নানা কীর্তি এই অঞ্চলে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। এঁদের সম্পর্কে নানা কাহিনি ও কিংবদন্তি এখানকার ধুলোয় মিশে আছে।

এখানে মুসলিম সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল মোগল শাসন থেকে পলাতক আফগান বিদ্রোহীদের বসতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে। এই সময় হেমতাবাদ অঞ্চলে মোগল শাসন থেকে পলাতক প্রচুর আফগান বিদ্রোহীদের অভিভাসন ঘটেছিল। গৌড়ে আফগান অধিকার কালে তাজপুর জনপদের ফৌজদার ছিলেন তাহির ইমাম। হুমায়ুনের নেতৃত্বে মোগলবাহিনী তাজপুর দখল করতে এলে হেমতাবাদ অঞ্চলে তাহির ইমামের সঙ্গে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহির ইমাম প্রাণ হারান এবং প্রচুর সেনার মৃত্যু হয়। গত শতকের সত্তরের দশকে বর্তমানে যেখানে হেমতাবাদ থানা, তার অদূরে কবরখানায় মাটি খুঁড়তে গিয়ে এদের নরকঙ্কালের কিছু অংশ পাওয়া যায়। বাংলার

সুলতানি আমলে এখানে সুফি প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে গৌড় সুলতান হুসেন শাহ্ পীর ধোকরপোষের সঙ্গে তার কন্যার বিবাহ দেন বলে কথিত। বুকাননের বিবরণে জানা যায়, বাজেরুদ্দিন ও ধোকরপোষ নামে দুইজন পীর হিন্দুরাজা মহেশকে এই স্থান হতে উচ্ছেদ করেন।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হেমতাবাদ থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই সময় তাজপুরের আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার দায়িত্বভার ন্যস্ত হয় হেমতাবাদ থানার উপর। কোম্পানির শাসন কাজের সুবিধার্থে জেলার সীমানা, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের এলাকা নির্ণয় এবং জেলার ক্ষুদ্রতর শাসনতান্ত্রিক এলাকা সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। এর মূলে ছিল রাজস্ব আদায়ের নিশ্চয়তা সৃষ্টি। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে এর-জন্য গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্টো হ্যামিল্টন বুকাননকে সারভেয়র নিযুক্ত করে দিনাজপুর জেলায় পাঠান। তিনি হেমতাবাদ থানায় সার্ভে করে মোট তিনশো তেত্রিশটি গ্রাম নিয়ে হেমতাবাদ ভাগ বা থানা গঠিত হয় বলে রিপোর্ট দেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষের শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতছাড়া হয়ে ব্রিটিশ সরকার অধিগ্রহণ করে। উইলিয়াম উইলসন হাণ্টারকে এই সময় দিনাজপুর জেলার পরিসংখ্যান, আয়তন ইত্যাদি বিষয়ে সমীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। তিনি প্রশাসনিক সুধার জন্য জেলার ২২টি ভাগ বা থানাকে সংকুচিত করে ১৭টি ভাগ বা থানায় পরিণত করেন। এই ১৭টি ভাগের মধ্যে হেমতাবাদ ভাগ বা থানা অটুট থেকে যায়। উল্লেখ্য যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে প্রথম Regular থানা পুলিশ প্রবর্ত্তন হয়। প্রথম পুলিশ শাসন সূচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চৌকিদারী ও পঞ্চায়েত প্রথাও চালু করে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ। মহারানি ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের আগে কোনও নিয়মিত পুলিশ প্রশাসন ছিল না। ইংরাজি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মহারানি ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে বাংলাদেশে প্রথম পুলিশ প্রশাসন চালু হয়।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে উইলসন হাণ্টারের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ওই সমীক্ষায় হেমতাবাদ থানার মোট এলাকা ছিল ২৪৪ বর্গ কিলোমিটার। গ্রামের সংখ্যা ছিল ৩৫৮টি, মোট বাড়ির সংখ্যা ১৪ হাজার ৫শত ৬০টি। লোকসংখ্যা ৮৭ হাজার ৮৯ জন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে নবগঠিত রায়গঞ্জ থানা গঠনের পরে হেমতাবাদ থানার পরিস্থিতি দাঁড়ায়, পূর্বের ২৪৪ বর্গমাইল এলাকার পরিবর্তে মোট ৭৪ বর্গমাইল এলাকা, মোট জনসংখ্যা ২৮ হাজার ৭ শত ৪৭জন, মোট গ্রামের সংখ্যা ১১৬, বাড়ির সংখ্যা ৬ হাজার ৯ শত ৭৩টি। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে হেমতাবাদ থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৮টি। ১টি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ১টি ডাকঘর ছিল। তখন কোনও উচ্চবিদ্যালয় ছিল না। হেমতাবাদ থানায় সেইসময় ছিল ২ জন এস. আই. এবং এ. এস. আই. ২ জন. কনস্টেবল ছিল ১৪ জন। ৫টি ইউনিয়ন বোর্ডে থানাটি বিভক্ত ছিল। ৫টি ইউনিয়নে চৌকিদারের সংখ্যা ছিল ৬০ জন, দফাদার ছিল ১০ জন।

যে কোনও ঔপনিবেশই একদিনে গড়ে উঠেনি। যে কোনও জনপদ সৃষ্টির অন্তরালে থাকে তার স্থান নামের লাবণ্য। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন, 'একটা কিছু

অর্থ ছাড়া গ্রামের নাম হয় না। কালে লোকমুখে শুদ্ধ নাম বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন নামের অর্থ পাওয়া দুষ্কর হয়, নাম একটা সংকেত মাত্র।' যে কোনও জায়গারই স্থান নাম নির্ণয় করা খুবই দুরুহ কাজ। পাহাড়, পর্বত, নদীনালা, মাটি, খালবিল, খাদ্যশস্য, দেবনাম, রাজ-রাজড়ার নাম ইত্যাদি বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ নামের সঙ্গে স্থান নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে। ভূমি বা মাটিকে কেন্দ্র করেই হেমতাবাদ নামকরণ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

হেমতাবাট, বাট অর্থ ভূমিখণ্ড বা Plot of Land । এই অঞ্চলের মাটি এতই উর্বর ছিল যে সোনার মত ফসল ফলত। হেম, অর্থ সোনা, তা, অর্থ তারও চেয়ে অধিক। অর্থাৎ সোনার চেয়েও অধিক মূল্যবান যে জমি তারই নাম হেমতাবাট। এই অঞ্চলের কোচ-কামরূপী-উপভাষায় আদ্যস্বরে 'ট' এর পরিবর্তে 'ত' এর ব্যবহার হয় বেশি। 'ত'-এর ব্যবহার দিনাজপুর অঞ্চলে ভাবার্থে একটি বিশিষ্ট তদ্ধিত প্রত্যয়। বাট >' বাত। আবার আদ্যস্বরে 'ত'-এর পরিবর্তে 'দ'-এর ব্যবহার হয় বেশি। 'দ', ভাবার্থে একটি বিশিষ্ট তদ্ধিত প্রত্যয়। বাত > বাদ। এইভাবে বাট > বাত > বাদ হয়ে হেমতাবাট পরবর্তীতে হেমতাবাদ রূপে স্থাননামে পরিচিতি লাভ করে।

রায়গঞ্জ থানা

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে হেমতাবাদ থানার ২৪৪ বর্গমাইল এলাকা থেকে ১৭১ বর্গমাইল এলাকা কেটে নিয়ে রায়গঞ্জ থানা গঠিত হয়। এই থানার তখন গ্রামের সংখ্যা ছিল ২৪২টি। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে রায়গঞ্জ থানার মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৫ হাজার ৫ শত ৫৩ জন। প্রাক্-স্বাধীনতা কালে এই থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৭টি। তখন মোট ৪টি ডাক বিভাগ ছিল, এগুলি ছিল বিন্দোল, বাইন, ভূপালপুর এবং রায়গঞ্জে। দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল বাহিনে ১টি এবং ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল রায়গঞ্জে। রায়গঞ্জ সদরে ১টি হাই ইংলিশ স্কুল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। নাম, রায়গঞ্জ করোনেশন হাই ইংলিশ স্কুল। এই স্কুলে, ১৭টি শ্রেণি এবং ৪৯৩ জন ছাত্র ছিল। তখন ২০ জন শিক্ষক ছিলেন, তারমধ্যে ১৪ জন গ্র্যাজুয়েট এবং ৩ জন ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর বিদ্যালয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করেছিল। এই থানায় তখন পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিল ১ জন, ৩ জন সাব ইন্সপেক্টর, ৬ জন এ. এস . আই. এবং ২৬ জন কনস্টেবল। মোট ১৩টি ইউনিয়ন বোর্ডে চৌকিদারের সংখ্যা ছিল ১৪৪ জন এবং দফাদার ২৬ জন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই রায়গঞ্জ মহকুমা গঠিত হয়। রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, বংশীহারী, কুশমণ্ডি, কালিয়াগঞ্জ এবং ইটাহার থানা নিয়ে রায়গঞ্জ মহকুমা সদর গঠিত হয়।

নগর ও কুলিক নদী থানাটিকে সুজলা-সুফলা করে তুলেছে। নদী দুটি যখন প্রবল দাপটে প্রবাহিত হত তখন এই অঞ্চল বরেন্দ্রভূমি নামে সুবিখ্যাত ছিল। দশম শতক থেকে 'বরেন্দ্র' নামটি জনপ্রিয় হতে শুরু করে। কথিত যে, ইন্দ্র-দেবতার আশীর্বাদ-ধন্য এই অঞ্চল। বাংলার ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ পাল ও সেন বংশের সঙ্গে এই অঞ্চলের স্মৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কথিত যে, এই নদী দুটির উপর তিন রাত উপবাস করে

কাটালে অশ্বমেধের ফল পাওয়া যায়। হর পার্বতীর বিয়ের অনুষ্ঠানে শিবের হাতে জল ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। ওই জল অজস্র ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। তারই দুটি ধারার একটি ধারা কুলিক অপরটি নাগর বলে কথিত। শিব ও পার্ব্বতী পুরাণের এই দুই দেবতার মহিমা মিশ্রিত এই অপগা। লোককথা, পুরাণ রচয়িতা ঋষিরা এই দুই নদীকে অতিক্রম করে পৌণ্ড্রদেশে আর্য সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে এসেছিল। লোকবিশ্বাস, যতদিন ইন্দ্র আছেন ততদিন এই নদী তাদের স্বর্গলোকের দ্বারপথ। তাই, একটুকরো অস্থি কুলিক ও নাগরের জল স্পর্শ করলে মৃতের নরক যন্ত্রণা মুক্তি পায়।

তেরো শতকের শুরুর একটি উল্লেখ নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে। বিতর্কটি হল ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার কোন্ বেগবতী নদীতীর বরাবর অগ্রসর হয়ে তিব্বত আক্রমণের চেষ্টা করেছিলেন? বাংলায় তুর্কি-আফগান আধিপত্যের স্রষ্টা বীর বখ্‌তিয়ার কোন্ কোন্ নদী ধরে দেবকোটে গিয়েছিলেন? খরস্রোতা কুলিক ও নাগর নদী পার হয়ে কি? যদিও ইতিহাসে এসব কথা লেখা নেই, কিন্তু এই অঞ্চলের প্রাচীন ছড়ায় পাওয়া যায় ঃ

বখ্‌তিয়ার আইলো রে
সোনার জমি দখল হইলোরে
হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ পলাই লো রে
হিন্দু ধ্বংস হইয়া যবনে ভরিয়া গেলো রে।

১৬০৮ থেকে ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোগল সম্রাট বাংলার স্বাধীন বার ভুঁইয়াদের দমন করার জন্য এই নদী দুটি ব্যবহার করেছিলেন বলে কথিত। বর্ষাকালে নৌবহরে চলাচল কষ্ট হতো। তখন কুলিকের বন্দর ঘাটে নেমে ঘোড়াঘাট যাবার প্রাচীন সড়ক ছিল। ওই পথ ধরে সম্রাটের সেনা ও অস্ত্রশস্ত্র স্থল-সড়ক হয়ে ঘোড়াঘাটে যাতায়াত করত। লোককবির কবিতায় সেই চিত্র ধরা পড়ে।

সেনাপতি থামিলো এসে কুলিকের বন্দর ঘাটে
যাহা হৈতে ঘোড়াঘাটে রওনা হৈলো সড়ক পথে॥

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে রায়গঞ্জ মুন্সেফি আদালত গঠিত হয়। আজ যেখানে বন্দর সেখানেই প্রথম মুন্সেফি আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে তা মোহনবাটি এলাকায় উঠে আসে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পার্ব্বতীপুর কাটিহার রেললাইন পাতার কাজ শুরু হয়। রেললাইন পাতার কাজ শেষ হয় ও যাত্রী চলাচল শুরু হয় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে। নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ের অধীনে রাধিকাপুর থেকে রায়গঞ্জ পর্যন্ত ৫টি স্টেশন তৈরী করা হয় মোট ২৬ মাইল রেলওয়ে এলাকায়। স্টেশনগুলি হল রায়গঞ্জ থেকে বাঙ্গালবাড়ি ৬ মাইল, বাঙ্গালবাড়ি থেকে কালিয়াগঞ্জ ৬ মাইল, কালিয়াগঞ্জ থেকে ডালিম গাঁ ৪ মাইল, ডালিম গাঁ থেকে রাধিকাপুর ৪ মাইল। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্টেশনগুলি অস্থায়ীভাবে গড়ে উঠে। ইংরেজরা ১৯২৭ সালে রায়গঞ্জ সহ বিভিন্ন স্টেশনগুলি পাকা করে, প্লাটফর্ম ও যাত্রীআবাস তৈরী করে। রায়গঞ্জ থেকে রাধিকাপুর পর্যন্ত রেলওয়ে ব্রীজগুলি ১৯২৭ সালে কংক্রীটের গাথুনি দিয়ে পাকা করে নির্মিত হয়।

দিনাজপুরের রাজা রামনাথের আমল থেকেই রায়গঞ্জে রাজস্ব আদায় সূত্রে একটি কাছারি ঘর নির্মিত হয়। ওই কাছারি সংলগ্ন জায়গাতেই থানা হেডকোয়ার্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। থানা সংলগ্ন রেল স্টেশন, মুন্সেফি-আদালত, তার পাশ জুড়ে তাই একটি বাজারও বসে। ওই বাজারটি বর্তমানে মোহনবাটি বাজার নামে পরিচিত। ব্যবসা-বাণিজ্য, রেলদপ্তরে চাকরি সূত্র, ওকালতি, মোক্তারি, শিক্ষকতা, এইসব সূত্রে পূর্ববঙ্গ ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ যেমন, বিহার, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান ইত্যাদি জায়গা থেকে এখানে অভিবাসন ঘটতে শুরু করে। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এই থানার গুরুত্ব ছিল সুদূর অতীত কাল থেকেই। এখানকার ধান, পাট ও সুগন্ধী তুলাইপাঞ্জি চাল, ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানী হত। চটের ধোকড়ার জন্য রায়গঞ্জের খ্যাতি ছিল সুদূর চীন দেশ পর্যন্ত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দলিল থেকে জানা যায় যে, এখানকার পাটের তৈরী ধোকড়া চীনের বাজারে রপ্তানী করা হত। এখানে পাট কেনার জন্য রেলী ব্রাদার্স ব্রিটিশ আমলের সূচনা থেকেই ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী যুদ্ধের পর থেকেই রায়গঞ্জ সদরের বন্দর অঞ্চলটি দিনাজপুর জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। ওই সময় প্রাচীন রায়গঞ্জ থানাটিকে ভৌগোলিক, ব্যবসায়িক ও নিবাসিকগত ভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়।

বন্দর ও কুলিকঘাট ঃ এই এলাকা শহরটির মূল বা কেন্দ্রস্থানীয় এলাকা। প্রধানত বাজার বিপণী এবং বণিক ব্যাবসায়ীদের লগ্নী ব্যবসা ও বান্ধাই মজুত ব্যবসার কেন্দ্রীভূত স্থান। স্থানটির বৈশিষ্ট্য কুলিক নদী ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। অবস্থাশালী লোকেরা বাড়িঘর ও বাসাবাগান এর চারপাশ জুড়েই গড়ে তোলেন।

কর্ণঝুরা (জোড়া) ঃ শহরের উত্তর অঞ্চলীয় এলাকা। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের রেকর্ডে এখানকার লোকসংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৮ শত ৯৭ জন। কোম্পানি আমলে এখানে চটজাত বস্ত্রের বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। চটের ধোকড়া, পাট ও সুতোর তৈরি ঝালং ইত্যাদির বড় হাট লাগার দরুণ আর্মেনিয়ান বণিকরা এখান থেকে চটজাত সামগ্রী কিনে বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানী করত। এই অঞ্চলে শতাব্দী প্রাচীন একটি ছড়ায় আছে ঃ

সত্য যুগে আইলো এ দ্যাশে দাতা কর্ণবীর
সগায় পূজি তারে হামরা জিনি পৃথিবী
এই ভূমে আইসে কর্ণ
কাঁদি মাতা লাগি
কর্ণ ঝুরায় মাতা কুন্তী
কর্ণবীর লভি।

কথিত যে, দানবীর কর্ণ এই অঞ্চলে এসে মায়ের চিন্তায় ঝর ঝর করে কেঁদে উঠেছিলেন।

বিন্দোল ঃ শহরের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলীয় এলাকা। স্ট্রং সাহেবের সময় স্থানটিতে অবস্থাশালী উচ্চশ্রেনির লোকেরা বসবাস করতেন। এখানে দিনাজপুর রাজের একটি

কুঠিবাড়ি ছিল। দিনাজপুর রাজ রামনাথ নির্মিত বিন্দোলের মার্তন্ড ভৈরবের মন্দির জাকজমক পূর্ণ ধর্মীয় উৎসবে একদা সাড়া ফেলে দিয়েছিল। পৌরাণিক পবিত্র এই স্থানটির পুরাকথা থেকে জানা যায় যে, মন্দিরের সামনে কিছু জায়গায় ছিল তমাল বৃক্ষ। ঘনকৃষ্ণ ডালপালা সাজানো এই তমাল পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাতেন গোপিনীদের উদ্দেশ্যে। তাই, এই মন্দির অঙ্গন পৌরাণিক পবিত্রস্থান। এখানে প্রতিবছর রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে একমাস ধরে মেলা বসত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা তাদের দোকান পশরা নিয়ে এখানে আসত। গ্রামীন অর্থনীতিতে এই মেলা সাড়া ফেলত।

কোন স্থানের নামকরণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পৌরাণিক নানা কীর্তি কাহিনির লীলাভূমি রায়গঞ্জ। মহাভারতের যুগে এই অঞ্চলের পৌরাণিক কালের ঐতিহ্য ও স্মৃতিমাখানো মাধুর্য ফুটে ওঠে মোহনবাটি, পশ্চিম গোবিন্দপুর (জে. এল. নং ২১), কৃষ্ণপুর (জে. এল.নং ৪৮), কৃষ্ণমুরি (জে. এল. নং ৬৯), কানাইপুর (জে. এল. নং ২১৯) ইত্যাদি গ্রাম নামে। গৌড়ের রামকেলি পূণ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে রাধাকৃষ্ণ আশ্রিত মরমী প্রভু শ্রীচৈতন্যের পাদস্পর্শে। বাঙালির প্রথম রেনেশা আন্দোলনের পথিকৃৎ শ্রী চৈতন্যের আগমনে এই ভূমির মানুষেরা তাঁকে দর্শনের জন্য ছুটে গিয়েছিলেন সেই গুপ্ত বৃন্দাবন গৌড়ের রামকেলি ধামে। তাঁকে সযত্নে পুজা করে তাঁর সফলবাণী মর্মে গেঁথে নিয়ে এসেছিল এই অঞ্চলের অগণিত দেশি পলি জনগোষ্ঠীর নরনারী। তাঁর মহিমাকে অম্লান করে রাখতে এই অঞ্চলে 'তুলসিবিহার' উৎসবে তারা মেতে উঠত। জ্যৈষ্ঠ মাসে এই উৎসব প্রাচীন রায়গঞ্জের অধিবাসীদের অনন্য উৎসব। একটি তুলসি গাছকে শ্রীজ্ঞানে পুজা করে এই অঞ্চলের অগণিত নারীরা তারই সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন। জপ তপে ধ্যানে স্বামীরূপে শ্রীকৃষ্ণকেই তারা ভজনা করতেন 'রাই' বেশে। তার নিদর্শন এখনও খুঁজে পাওয়া যায় তুলসি বিহার উৎসবে। এই অঞ্চলের অনূঢা মেয়েরা এখনও শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে বাকি জীবন তাঁরই ধ্যানে গানে অতিবাহিত করে। 'রাই' অর্থ 'রাধিকা'। রাধার অপর নাম 'রাই'। শ্রীকৃষ্ণকে জীবন চর্যায় অম্লান করে রাখতে তাই 'রাই' বেশে এই অঞ্চলের নারীরা তাঁকে দীপ্ত করে স্থানটি 'রাইগঞ্জ' নামে চিহ্নিত করে রেখেছে। পরবর্তীতে রাইগঞ্জ রায়গঞ্জ নামে পরিচিতি লাভ করে।

কালিয়াগঞ্জ থানা

কোনও নগরীই একদিনে গড়ে উঠেনি যেমন, ঢাকা ও কলকাতা নগরী, তাই যে কোনও জনপদ সৃষ্টির অন্তরালে থাকে তার অতীত ঐতিহ্য ও ইতিহাস। আজকের উত্তর দিনাজপুর জেলার অধীনে কালিয়াগঞ্জ থানারও ইতিহাস বিচ্ছিন্ন নয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন এই থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল আকবরের রাজত্বকালে রাজা গণেশের রক্ত সম্বন্ধীয় কাশী নামে এক ব্রহ্মচারীর অধীনে ছিল। পরবর্তী সময়ে এই ভূখণ্ডের প্রথম সম্পত্তির অধিকারী হন শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরীর কন্যার পুত্র শুকদেব রায়।

ইতিহাসের প্রাচীন এই ভূমি ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি গ্রহণের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণভুক্ত হয়। মহাম্মদ রেজা খাঁ হন এই অঞ্চলের প্রথম নায়েব। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে আইন অনুসারে মফস্বল দেওয়ানি আদালত তাজপুরে গঠিত হয় এবং কালিয়াগঞ্জ ভূখন্ড এই আদালতের অধীনে মাহিনগর পরগণার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলা হিসাবে ঘোষিত হলে এই ভূখণ্ড দিনাজপুর জেলার অধীনে আসে।

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্টো ড. ফ্রান্সিস্ বুকানন হ্যামিলটন সাহেবকে সার্ভেয়র নিযুক্ত করে দিনাজপুরের আর্থ-সামাজিক -ভৌগোলিক ইত্যাদির বিশদ বিবরণের জন্য দিনাজপুর জেলায় পাঠালেন। বুকাননের বিবরণে জানা যায়, ওই সময় এই জেলা ২২টি ভাগে বিভক্ত ছিল। কালিয়াগঞ্জ ছিল ওই ২২টি ভাগের অন্যতম একটি বিভাগ। বুকানন ওই সময় প্রত্নতাত্ত্বিক নিরীক্ষণে কালিয়াগঞ্জে এসে যা দেখেছিলেন তা তিনি *An Account of the District of Dinajpur in 1808-9* রিপোর্টে বর্ণনা করে গেছেন, "The only remains of antiquity that I saw or heard of is at Boroganj, in the southern part of the division. These are several mounds, consisting of bricks, covered in a measure with sail and extending about 30 yards in diameter, near them are many small tanks, like there of a Bengal town....."। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে মোট ১২টি থানা নিয়ে দিনাজপুর সদর মহকুমা গঠিত হয়। ওই সময় কালিয়াগঞ্জ থানা দিনাজপুর সদর মহকুমার অধীনভুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বেঙ্গল পার্টিশনের ফলে দিনাজপুর জেলা বিভক্ত হয়। মোট ১০টি থানা নিয়ে বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ মহকুমা ভারতভুক্তকরণ হয়। ভারত সরকারের Notification no. 2139 GA, Dated 14.7.48 আদেশ অনুযায়ী রায়গঞ্জ মহকুমা সদর গঠিত হলে কালিয়াগঞ্জ থানা রায়গঞ্জ মহকুমার অধীনভুক্ত হয়।

পলিমাটি দিয়ে আবৃত সুজলা এই ভূমি, প্রচুর খাল বিল নদী খাড়ি দিয়ে পুষ্ট। এখানকার সুফলা ফসল ধান, পাট, কলাই ও লঙ্কা। ছিরামতী নদী এই থানার পূর্ব প্রান্ত দিয়ে নক্সী লতার মত একে বেকে কুশমণ্ডি ও ইটাহার থানা দুটির সীমান্তে এবং পরে হরিরামপুর ও ইটাহার থানা দুটির সীমান্ত বরাবর বহে গিয়ে মালদা জেলায় মহানন্দা নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই নদীর পারে কুশমণ্ডি থানার অধীনে একটি উঁচু ভূখণ্ড ইতিহাসের সেই স্মরণীয় একডালা দুর্গ, যে দুর্গে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সঙ্গে মোগল সম্রাট ফিরোজ শাহের যুদ্ধ হয়েছিল। বীণা, রুহিতা, কুমড়ি, টাঙ্গন, গামারী, এই নদীগুলিও এই থানাকে স্পর্শ করেছে। আমাদের লোককবি মানিকদত্তের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে যে কটি নদীর নাম পাওয়া যায় তারমধ্যে টাঙ্গন নদীর নামও আছে। খ্রিস্টীয় নবম শতকের জগজ্জীবনপুর তাম্রলেখ-এ এই নদীর নাম জানা যায় 'টঙ্গিল নদী'। ১৭৭৯-৮১ খ্রিস্টাব্দে রেনেলের নদী জরীপ মানচিত্রে ছিরামতী নদী হেমতাবাদ থানা থেকে এসে এই থানার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের নিম্ন জলাভূমি থেকে আরও জল সংগ্রহ করে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। তখন এই অঞ্চলের নাম কালিয়াগঞ্জ বলে কোনও উল্লেখ

নেই, রেনেলের নদী জরীপ মানচিত্রে অঞ্চলটির নাম রয়েছে 'আকবর নগর'। এই আকবর নগরীই পরবর্তীতে আখা নগরে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টটিয়ার রেলওয়ের অধীনে পার্ব্বতীপুর থেকে মণিহারী পর্যন্ত রেল লাইনের জরিপ হয় এবং ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর কাটিহার রেললাইনে যাত্রী চলাচল শুরু হয়। এখানকার প্রধান অর্থনীতি ফসল লঙ্কা, পেঁয়াজ, কলাই, ধান ও পাট। ব্যবসায়ী কেন্দ্রস্থলরূপে ইংরেজরা ওই সালেই কালিয়াগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন প্রতিষ্ঠিত করেন। কালিয়াগঞ্জের অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র রূপে একদা এই স্টেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এখানকার পাটজাত দ্রব্য, ধোকড়া, তিব্বতিয়ান কার্পেট, কাঠের মোখা, ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরেও রপ্তানী হত।

লোকসংস্কৃতিতে এই থানা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। কুনোর, মহেশপুর, টুইংগেল বিলপাড়া, পুরগ্রাম প্রভৃতি গ্রামের জলাইশোরী গান, লক্ষ্মীয়ালা, কুয়ালী, জিতুয়া, বিষহরা, চণ্ডীয়ালা, খজাগর, চকচুন্নী, কল্মী, সৈতপীর, ঢাড়িয়া, সাধুআলি, বিরহআলা, লোকানি, হালুয়া-হালুয়ালী, বুলোসরী, ঢাকোশ্বরী প্রভৃতি খনগান, পুরগ্রাম ও মহেশপুরের কবিগান, বালাসের পুতুলনাচ, মহেন্দ্রগঞ্জের যাত্রা ইত্যাদি একানকার মানব সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন। তাছাড়া রয়েছে বাউলগান, কৃষ্ণযাত্রা, কানিবিষহরি, গমীরা ইত্যাদি লোকনাট্য পালা। গ্রামঠাকুর, বসন্ত ঠাকুরণ, করম , বাহা, মহরম, ইদুজোহা প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে লোকমেলা অনুষ্ঠিত হয়। যা লোকায়ত সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

এখানকার চিরত্ন নির্দশনের উজ্জ্বলতম নজীর একশো বছর আগে তৈরী কালিয়াগঞ্জ সদরে গুদরী বাজারের কাছে মোগল স্থাপত্য নির্মাণকলায় প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদ, নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর কুঠি কাছারিতে চণ্ডীমণ্ডপের (বর্তমান থানার পেছনে) দেয়ালে দেশজ কালি দিয়ে লেখা অতি প্রাচীন একটি খরোষ্ঠী লিপির লেখমালা, রাতনের রাজভিটা, আর্নায়ন বৈদুনের রাজবাড়ি, গৌরীপুর ভাবকে প্রায় পাঁচশো বছর আগেকার কাজীর আবাস ও আদালত ভবন, যা বর্তমানে ধ্বংসপ্রায়। ডালিমগাঁর নারায়ণ মন্দিরে রক্ষিত বিষ্ণুমূর্তি, কুনোরের অদূরে পাতাল সিঁড়ি, যেখানে একটি সুড়ঙ্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, বয়রা কালীমন্দির, গুদরী-বাজারে প্রাচীন মনসা মন্দির প্রভৃতি এই অঞ্চলের চিরত্ন নিদর্শনের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। এখানকার কাঠমাদিঘি ও সুকানদিঘি দিনাজপুরের রাজা রামনাথের জনকল্যাণকর কাজের স্মৃতিকে এখনও ধরে রেখেছে। মহিনগরে জজ উডিনির আমলের দুটি নীল ভেজানোর চৌবাচ্চা কালের স্থূলহস্তাবলেপে ক্ষুণ্ণ হলেও এখনও তার ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। ফতেপুর ও দাসিয়ার অদূরে শ্রীমতী নদীর তীরে বনাঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। শীত এলে অজানা অচেনা পাখির কলকাকলি ক্ষণিকের জন্য মন অনাবিল আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাসে কালিয়াগঞ্জ থানার মোট এলাকা ছিল ২৯৭ বর্গকিলোমিটার, গ্রামের সংখ্যা ৫৪০, বাড়ির সংখ্যা ১৬ হাজার ৭ শত ৪৫ এবং জনসংখ্যা ছিল ৯৪ হাজার ৭ শত ২৮ জন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে রাস্তাঘাট তৈরী,

সেতু, ফেরী ব্যবস্থা, ডাকবাংলো তৈরী ইত্যাদি উন্নয়নমূলক দায়িত্ব ন্যস্ত করেন জেলাবোর্ডের উপর। ১৯৩০ সালে এরই পরিপ্রেক্ষিতে কালিয়াগঞ্জ থানাকে ৮টি ইউনিয়নে বিভাজন করা হয়। কালিয়াগঞ্জে ওই সময় একটি সার্কেল অফিস ছিল। বংশীহারী ও কুশমণ্ডি, এই দুটি থানা কালিয়াগঞ্জ সার্কেল অফিসের অধীনে ছিল। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কালিয়াগঞ্জ থানার সীমানা কমে গিয়ে ১৩৬ বর্গকিলোমিটার হয়। তখন মোট জনসংখ্যা ছিল ৬১ হাজার ৪ শত ২৫ জন। গ্রামের সংখ্যা ছিল ১৯৫টি এবং গৃহের সংখ্যা ১৩ হাজার ২ শত ৯৪টি। এই থানায় তখন ১৩৩টি ছিল ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা। এরমধ্যে ননটেক্সটাইল শিল্প ১১৯টি, টেক্সাইল ১৪টি এবং হ্যান্ডলুম টেক্সটাইল ছিল ৪৩টি। পার্ব্বতীসুন্দরী বিদ্যালয় ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪১ সালে বিদ্যালয়টি উচ্চবিদ্যালয়ে অনুমোদন লাভ করে। বিদ্যালয়ে তখন ৯টি বিভাগ ছিল, বি.এ পাশ শিক্ষক ছিলেন ৬ জন, ১ জন মেট্রিক এবং অন্যান্য মোট শিক্ষক ছিলেন ১৫ জন। সেই সময় এখানে ১টি পল্লী পাঠাগার এবং ১টি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১ জন এল. এম. এফ. ডাক্তার থাকতেন। কালিয়াগঞ্জ থানায় ছিল ৩ জন এস. আই., এ. এস. আই. ৪ জন, সিপাহী ২২ জন, মোট ২৯ জন স্টাফ ছিল। ৮ টি ইউনিয়নে চৌকিদারের সংখ্যা ছিল ১০৬ জন, দফাদার ছিল ১৬ জন।

নানা কারণে এই থানা অতুলনীয়। এখানকার একটি উল্লেখযোগ্য মেলা ছিল কুকড়ামণির মেলা। একমাস ধরে মেলাটি চলত।

যে কোনও জায়গারই নামকরণের একটা ইতিহাস থাকে। এই ভূখণ্ড ছিরামতী (বর্তমানে শ্রীমতী) নদীর তীরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও নদীটি ইংরেজদের কাছে কোনও গুরুত্বও পায়নি। কথিত যে, পুরাণ প্রসিদ্ধ কালিয় নামে একটি বিশেষ সাপ এই অঞ্চলে বাস করত। সাপটির গায়ের রঙ ছিল কালিময় কৃষ্ণবর্ণ। ওই মহাবল সর্প নদী গর্ভস্থ গভীর গর্তে বাস করত। কালিয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ওই বলশালী নাগকে দমন করে মস্তকে ধারণ করেছিল। পুরাণে যা কালিয় নামক নাগের দমন অর্থাৎ কালিয়দমন নামে উল্লেখিত। কালিয়াজীর শক্তি ও বুদ্ধি কৌশলে কালিয় সর্প দমিত হয়েছিল, 'কালিয়া' ওই স্মৃতিকে ধরে রাখতে কালিয়াগঞ্জ নামটির সৃষ্টি হতে পারে। দ্বিতীয়ত, দিনাজপুর ভূখণ্ডের অধিকারী ছিলেন রাজা গণেশের রক্ত সম্বন্ধীয় কাশী নামে এক ব্রহ্মচারী। তাঁর দুটি বিগ্রহ ছিল, একটি কালী অপরটি কালিয়াজী । কালিয়াজীর সেবার উদ্দেশ্যে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি তিনি রেখে যান। দিনাজপুরের রাজাদের বিভিন্ন জায়গায় যে জমিদারি ছিল তার অর্ধেকই ছিল কালিয়াজীর নামে। রাজা প্রাণনাথ রায় কালিয়াজীর বিগ্রহকে মন্দির গড়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কান্তনগরে। এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জমি ছিল কালিয়াজীর নামে, এই নাম থেকেই 'কালিয়াজীর গঞ্জ' যা পরবর্তীতে কালিয়াগঞ্জ নামে পরিচিতি লাভ করার সম্ভাবনাই বেশি।

২. জমিদারকুল ও সামাজিক উন্নয়ন

১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুরের কিছু কিছু জমিদারদের অবদানে সামাজিক উন্নয়নের ঢেউ উঠেছিল। দিনাজপুর শহর ও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সংস্কার হয়েছিল কিছু কিছু পথ ঘাট, নির্মিত হয়েছিল শিক্ষাকেন্দ্র, ধর্মীয় উপাসনালয়,

সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নয়ন, খেলাধূলার প্রসার, দিঘি-জলাশয় সংস্কার ইত্যাদি। দিনাজপুর রাজ এস্টেটের রাজা রাধানাথের বিধবাপত্নী প্রাণসুন্দরী দেবী, তাঁর পুত্র রাজা গোবিন্দনাথ রায় এবং রাজা তারকনাথ এই কাজে উল্লেখযোগ্য কীর্তি স্থাপন করেছেন। তাছাড়া, দিনাজপুরের রায়সাহেব এস্টেটের জমিদার এবং হরিপুর এস্টেটের জমিদার-বর্গ বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন।

রানি প্রাণসুন্দরী, দেবী চৌধুরানি, রাজা রামনাথ খনিত টাঙ্গন ও পুনর্ভবা নদীর মধ্যে সংযোগকারী রামদাঁড়া খাল এবং ঠাকুর গাঁয়ের গোবিন্দ মন্দির সংস্কার করেছিলেন। দিনাজপুর রাজ জমিদারির অবস্থা এ সময় ছিল ভগ্নপ্রায়। রাজা গোবিন্দনাথের উদ্যোগে চক্ বাজার, রেলবাজার ও রাজবাড়ি হাট-বাজার এ সময় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দিনাজপুর শহরের পশ্চিমপ্রান্তে পুনর্ভবা নদী সংলগ্ন স্থানটি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে পরিচিতি লাভ করে ও নদীপথে যাতায়াতে খুবই উপযোগী হয়ে উঠে। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দনাথের মৃত্যুর পর রাজা তারকনাথ রাজ-জমিদারি লাভ করেন। তারকনাথের শাসনকাল সুখের ছিল না। সারাদেশব্যাপী সিপাহী বিদ্রোহ ও নীলবিদ্রোহের তখন উত্তাল তরঙ্গ। যদিও এ সব কাজকর্মের সঙ্গে তারকনাথের প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অথবা অন্তরালে কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু সে সব আন্দোলনের ভয়ানক আঁচ দিনাজপুর জেলার জনমানসে এক বৈপ্লবিক চেতনার জন্ম দিতে সাহায্য করেছিল। তারকনাথের দানে দিনাজপুরে ইংরেজি ইস্কুল, ভার্ণাকুলার ইস্কুল, নর্মাল ও গুরু ট্রেনিং ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। দিনাজপুর জিলা ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রথম ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের কাজ সূচিত হয়। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে গড়ে উঠে মিডল ভার্ণাকুলার ইস্কুল এবং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় দিনাজপুর নর্মাল ও গুরু ট্রেনিং ইস্কুল। রাজা রামপুর চূড়ামণি টোলের উন্নয়ন এবং শিক্ষা প্রদানের জন্য যশস্বী সংস্কৃতজ্ঞ ঈশানচন্দ্র তর্করত্ন ও গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবাগীশকে ওই টোলের গুরুমশাই নিযুক্ত করেছিলেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে রাজা তারকনাথের সহাযতায় দিনাজপুর জেলার হিতশ্রী ফিরে পেতে শুরু করে। দিনাজপুরে নবজাগরণের সূত্রপাত তারকনাথের হাত ধরেই সূচিত হয়। তিনিই ছিলেন আধুনিক দিনাজপুরের প্রধান রূপকার।[৪২] দিনাজপুর জেলার রায়সাহেব জমিদার কুল[৪৩] ও হরিপুরের জমিদার বংশ[৪৪] সে সময় জেলার গণউন্নয়ণমুখী কাজে বিশেষ করে শিক্ষা, চিকিৎসা ও খেলাধূলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন।

৩. কৃষিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক

১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুর জেলায় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল মূলত গ্রামীণ অর্থনীতির সংগঠন ও উৎপাদন সম্পর্কের উপর। এই সাংগঠনিক কাঠামো ও উৎপাদন সম্পর্ক রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়নি। নানান্ রাজনৈতিক শক্তি যখন একই অঞ্চলের ওপর বিভিন্ন সময়ে নিয়ন্ত্রণ চালু রাখে তখন উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অংশ যে ভূমি রাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত হয় সেই ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়। কৃষি নির্ভর দিনাজপুর জেলার অর্থনৈতিক

উন্নয়ন ও ক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে ধানই ছিল প্রধান অর্থকরী ফসল। চাষাবাদযোগ্য মোট জমির বিরাশি ভাগ জমিতে ধানের চাষ করা হত। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ভূমির প্রকৃতি অনুযায়ী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে অবস্থিত দিনাজপুর। পলি মাটি দিয়ে গড়া হলেও প্রাকৃতিক কারণে কোনও কোনও অংশে ভূমি প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। বৃহত্তর দিনাজপুরের দক্ষিণ অংশের মাটি ক্ষার প্রকৃতির এবং উত্তর অংশের বেশির ভাগ অঞ্চলের মাটি পলি শ্রেণীর। তাছাড়া জেলায় এক ধরণের মিশ্র মাটি আছে যার মধ্যে বালুর ভাগই বেশি। এই মাটিও পলি নামে পরিচিত। আবার, প্রাচীন পাললিক স্তরের মাটিতে কাদার ভাগ বেশি থাকায় দিনাজপুর অঞ্চলে এ মাটি ক্ষিয়ার বা ক্ষার নামে পরিচিত। মাটির এই শ্রেণী বিভাগ দিনাজপুরের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিতে মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করেছে এবং আর্থ-সামাজিক সম্পর্কেও পার্থক্য ঘটিয়েছে।

চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের ফলে এ সময় দিনাজপুর রাজ-এস্টেটের পুরোপুরি বিলুপ্তি ঘটে। নতুন ভূমি ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে বণিক, মহাজন, গোমস্তা, বেনিয়ান, ও দালাল এবং পরবর্তীতে উকিল, ব্যরিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, লেখক, সাহিত্যিক এসব মধ্যস্বত্ব ভোগী দিনাজপুর রাজ এস্টেটের নিলামি জমি পত্তনি নিয়ে খণ্ডে খণ্ডে ভূমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানের পথ প্রশস্ত করে দেয়। এর ফলে ভূমির উপর হতে কৃষকের সমষ্টিগত অধিকার নিশ্চিহ্ন করে জমিদার ও নতুন রাজন্য বর্গের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। মূলস্বত্বভোগী জমিদারগোষ্ঠী শাসকদের সম্মতি নিয়ে পরবর্তীতে মূলস্বত্ব ভোগীদের সহকারী রূপে 'তালুকদার', 'জোতদার' প্রভৃতি নামধারী উপস্বত্ব ভোগীদের আরও একটি বিরাট শ্রেণি সৃষ্টি করে। এরকম পরিস্থিতিতে দিনাজপুরে কৃষিযোগ্য জমির তুলনায় আবাদের পরিমাণ কম এবং আবাদি জমির চেয়ে কৃষকের সংখ্যা আরও কমে যায়। রাজন্যকূল নানা সুযোগ সুবিধা দিয়ে কৃষককে নিজ নিজ জমিতে উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত করত। ওইসব কৃষকের দলপতিকে ভূস্বামীরা খুশি করার চেষ্টা করত। প্রভাবশালী কৃষক দলপতিরা এই সুযোগ নিয়ে রাজস্ব আদায়কারী ইজারাদারদের সঙ্গে নিজের সুবিধা মত শর্তাদি ও খাজনার হার নিয়ে দর কষাকষি করত। সে সময় এ রকম প্রভাবশালী কৃষক দলপতিরাই ছিল কৃষি-অর্থনীতির মূলস্তম্ভ।[৪৫]

জমিতে মধ্যশ্রেণীর এই রূপান্তরের ফলে কৃষির ক্ষেত্রে এক বিষম সমস্যা দেখা দিতে থাকে। দিনাজপুর রাজের বিশাল জমিদারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ হয়ে নিলামের ফলে নব্য জমিদারদের বেশির ভাগ জমিদারির প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ নায়েব, গোমস্তা ও খাজনা আদায়ের জন্য ইজারাদারদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। বস্তুত তারাই হয়ে ওঠে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। নতুন রাজন্যকূল হয়ে ওঠে অনুপস্থিত ভূস্বামী। এর ফলে কৃষি ও সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনে এক ভীষণ সংকট সৃষ্টি করে। প্রজা নিপীড়ন, অত্যধিক হারে খাজনা আদায়, উৎপীড়ন, অত্যাচার ও অন্যায় কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়। তাছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সে সময় করতোয়া-পুনর্ভবা-আত্রাই নদীগুলির জলবহন ও পলিবহন ক্ষমতা কমতে থাকে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এখানকার স্বাস্থ্য নষ্ট হতে থাকে। ক্রমশ

জমির অনুর্বরতা ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এখানকার স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হওয়ার ফলে কৃষিতে অবনতি দেখা দেয়।

দিনাজপুর জেলায় সে সময় কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, চাল, তেল, সরিষা, চিনি, আদা, পান, নীল ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ধানই ছিল প্রধান, বিশেষ করে আউশ বা ভাদই এবং আমন বা হৈমন্তী। দিনাজপুরের উত্তর অংশে পলি অঞ্চলের বালু মিশ্রিত মাটিতে আর্দ্রতার ফলে বৎসরব্যাপী ফসল ফলত। ফসল ফলানোর সুবিধার দরুণ এ অঞ্চলের ভূমি মালিকের হালের বলদ, কৃষি মজুর, মজুত শস্য ভাণ্ডার এই উৎপাদন কেন্দ্রের চলতি পুঁজি হিসাবে ব্যায় হত। এ অঞ্চলের কৃষিজীবী সমস্ত ঋতুতেই কৃষিকাজে যুক্ত থাকত। দিনাজপুরের দক্ষিণ অংশে ক্ষিয়ার অঞ্চলে কেবলমাত্র হৈমন্তীক ধানই উৎপন্ন হত। বছরের অন্যান্য সময় কৃষিজীবীরা এখানে গরু বলদ শস্য বহনের কাজে এবং কৃষি শ্রমিকেরা পণ্য বহনের কাজে নিয়োজিত থাকত। এই অঞ্চলে কৃষিজীবীরা উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রয় করত, কৃষি শ্রমিকেরা খোরাকির ধানও বিক্রয়ের জন্য ব্যবহার করত। এই সুযোগে দিনাজপুরের দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষিজীবীদের অনেকেই কৃষিপণ্যের পাইকারী কারবারী হয়ে দাড়াত। জমিদারগোষ্ঠীর মত কৃষিপণ্যের পাইকারী কারবারীরা কালক্রমে কৃষিক্ষেত থেকে বহুদূরে সরে গিয়ে কৃষক শোষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পথ খুঁজে নেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর দিনাজপুরের জমিদাররা সময়মত ভূমিকর আদায় করতে ও সরকারি রাজস্ব জমা দিতে পারত না। দিনাজপুরের রাজন্যবর্গের প্রশাসনিক কাঠামো ছিল ঢিলেঢালা। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে সরকারি রাজস্ব সংগ্রহ বা জমা দেওয়ার মানসিকতা তাদের ছিল না। ফলে সময়মত রাজস্ব পরিশোধের ব্যাপারে জমিদাররা মহাসমস্যায় পড়ে। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে সপ্তম এবং ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে সরকারি পঞ্চম আইনের আশ্রয় নিয়ে রায়তের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে ভূমিকর আদায়ে কোম্প্যানি কর্তারা কড়া ব্যবস্থা নেন। পত্তনি আইনের বলে তালুক বা পত্তনি জমি বিক্রী করে সরকারি রাজস্ব আদায় করে নেবার হিড়িক সূচিত হয় (In case of default by any sharer, the whole zamindari was not put up for sale but only the share of the defaulter)। এইভাবে কৃষিজমির উপর উপস্বত্ব ভোগীর সৃষ্টি হয় এবং জমিদারি বা মধ্যস্বত্ব ক্রয় পুরোদমে শুরু হয়।

দিনাজপুরে ভূমি রাজস্বের হার নির্দ্ধারিত হত মূলত আবাদী জমিতে কোন্ কোন্ ফসল বোনা হয়, জমির উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপন্ন ফসলের সম্ভাব্য দামের উপর। মহল হিসাবে এই খাজনার মোট পরিমাণ হিসাব করে ওই মহলের এক বা একাধিক দলপতি কৃষকের উপর তার ভার দেওয়া হতো। এদের কেউ কেউ 'হুজুরী জোতদার' নামে পরিচিত। এরা সরাসরি সদরে খাজনা জমা দেবার অধিকার পেত। আবার ইজারা প্রথায় রাজস্ব সংগ্রহ করা হত এবং কাটকিনদার বা দর ইজারাদার নামে এদের পরিচয় ছিল। তাছাড়া, সে সময় জমির পরিমাণ ভিত্তিক নির্দিষ্ট হারে খাজনা ও উৎপাদিত ফসলের মাধ্যমেও খাজনা দেওয়ার সুযোগ ছিল। জমির মোট আয়তন অনুযায়ী খাজনার পরিমাণ স্থির করারও ব্যবস্থা ছিল যা 'তহুদি ব্যবস্থা' নামে পরিচিত ছিল।

এ ব্যবস্থায় ভূস্বামী আবাদ বাড়িয়ে খাজনার দায় মেটাতে পারত। ভূস্বামীরা কেউ কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অল্প জমি চাষের জন্য খাস রাখত। বাকি জমি ভাগচাষে বণ্টন করত। ওই সময় দিনাজপুর জেলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় ভূস্বামীরাই ছিল সামাজিক মর্যাদায় বড়। এঁরাই ছিল সাবেক বনেদী জমিদারবর্গের উত্তরপুরুষ থেকে নব্যবাবু সম্প্রদায়। এই উঠতি সামন্তদের তড়িঘড়ি করে জমিদার হওয়াটা রায়ত কৃষকের কাছে পছন্দের ছিল না বরং বলা হয় কৃষকেরা এদের তাচ্ছিল্যের চোখে দেখত। এঁদের নায়েব গোমস্তারা আবার কৃষকের কাছে ছিল কেউ কেউ ত্রাস দেবতা, কেউ কেউ দেবতা। এদের ক্ষমতা অসীম। এঁরাই ছিল দিনাজপুরের ভদ্রলোকগোষ্ঠী ও তথাকথিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। দিনাজপুরের সব কটি জমিদারি কাছারির আমলারা ছিল হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং স্থানীয় আদত বাসিন্দা। হিন্দু-মুসলমান সমাজ থেকে এরা দূরত্ব বজায় রেখে চলত।[৪৬]

আউশ বা ভাদই ধানই ছিল কৃষিজীবী ও কৃষি মজুরের খোরাকির ধান। আমন ধান উদ্বৃত্ত পণ্য হিসাবে বিক্রয় হত। বিছানা ও শরীর পোশাকের কাজে প্রায় সমস্ত কৃষিজীবী ও কৃষিশ্রমিক চট ব্যবহার করত।[৪৭] কৃষি মজুরের শীতের পোশাকই ছিল চট। কৃষকের উপর ভূস্বামী ও ভূমি রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের শোষণ সদাই লেগে থাকত। ভূমি রাজস্বের হার কত পরিমাণে দিতে হবে তার উপরেই কৃষকের আর্থিক বিচারে পারিশ্রমিক নির্ভর করত। ভূমি রাজস্বের হার সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল না বলে অন্ধবিশ্বাসী কৃষককূল এই শোষণের চাপকে নির্বিবাদে বহন করে যেত। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে বুকানন হ্যামিল্টনের জরিপ অনুযায়ী ওই সময় দিনাজপুর জেলার আয়তন ছিল ৫৩৭৪ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ছিল তিন লাখেরও বেশি। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলার সীমানা বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হওয়ায় জেলার আয়তন ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী সময়ে (১৮৯৭-৯৮) জেলার আয়তন ও লোকসংখ্যার চাপ আরও বেড়ে যায়। এখানে বিকল্প কোনও কর্মসংস্থান না থাকায় ওই সময় বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ কৃষির উপর পড়ে। শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত অস্বচ্ছল। কৃষিকাজ লাভজনক না হওয়ায় নগদ অর্থ কৃষি শ্রমিকের হাতে থাকত না বললেই চলে। কিছু কিছু কৃষকের অল্পসল্প জমি থাকলেও চাষের উপকরণাদি যেমন হাল, লাঙ্গল, পশুশক্তি, কৃষিকাজের অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদির অভাবে চাষ-আবাদ ঠিকমত করতে পারত না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকত, তখন কৃষককে আরও চরম দুর্ভোগ পোহাতে হত। কৃষি শ্রমিকের আর্থিক দুরবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হত। সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল অধিকতর। বিভিন্ন পূজাপার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যয়ের মাত্রা বেড়ে গিয়ে কৃষককে আবার ঋণগ্রস্ত হতে হত। এ ঋণ ধনী কৃষক ও মহাজনের কাছ থেকে গ্রহণ করত নগদ অর্থে অথবা পণ্য দ্রব্যের মাধ্যমে। এ সবের জন্য কৃষককে চড়া সুদ দিতে হত, এবং তা দিতে না পারলে তাকে ঘটি-বাটি বিক্রি অথবা ভিটে ছাড়া হতে হত এমন কি কৃষকের ঋণের দায় বহন করতে হত বংশ পরম্পরায়। ওই

সময় কৃষিজাত পণ্য দ্রব্যের মূল্যে উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। এর মূল কারণ ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যোগযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার। সে সময় প্রতি টাকায় উন্নত মানের চাল ছিল ৩৬ সের, মাঝারি ৪৮ হতে ৫৫ সের এবং সাধারণ ৬৪ সের। ধান প্রতি টাকায় ছিল ৩ মণ, গুড় প্রতি মণ ১ টাকা ৮ আনা, সরিষা বীজ প্রতি মণ ১২ আনা হতে ১৪ আনা। সাধারণ শ্রেণির একজোড়া হালের বলদ ৬ টাকা, একটি গাই গরুর মূল্য ছিল ৩ টাকা। এ সময় কৃষিজাত পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে অনাবাদী ও জঙ্গলা জমিতেও চাষবাস শুরু হয়। কৃষিকাজে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এবং লাভজনক হওয়ায় কৃষি শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।[৪৮] ১৮২০-২১ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরে এস্টেটের সংখ্যা ছিল চারশোটি (৪০০টি), মোট প্রদেয় রাজস্ব ছিল ১ লাখ ৭৫ হাজার ৬ শত ৩৭ পাউণ্ড ৭ শিলিং ১০ পেনি।[৪৯] মেজর শেরউইলের বিবরণে জানা যায় ১৮২০ - ২১ সাল নাগাদ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অংশে জমির দাম ভিন্ন হলেও ৮৭ হাতের এক বিঘা পরিমাণ জমির (উদ্ধারকৃত জমি Reclaimed lost) খাজনা ছিল ৪ আনা, সাধারণ ধানিজমি ১২ আনা, বোরো ধানিজমি ৬ আনা হতে ১২ আনা, ভাল ধানিজমি ১ টাকা হতে দেড় টাকা। সে সময় ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে সরকারি আয়ে দিনাজপুর জেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. *দিনাজপুর ঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, সম্পাদনা শরীফ উদ্দিন আহমেদ, সুনীতিকুমার কানুনগো, 'দিনাজপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস-প্রাচীনযুগ', পৃ. ৫৩।

২. ঐ, আবুল কালাম মোঃ যাকারিয়া, 'দিনাজপুরের প্রশাসনিক ইতিহাস ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ', পৃ. ১৪৪।

৩. ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলা হিসাবে চিহ্নিত হয়। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তত্ত্বাবধায়ক মিষ্টার এইচ. কটরেলকে দিনাজপুর শাসন ক্ষমতার ভার দেওয়া হয়। এ বছর থেকেই বলা যায় দিনাজপুর শহর তথা জেলায় ইংরেজ শাসনের প্রথম গোড়াপত্তন শুরু হয়। দিনাজপুর জেলা সদর হিসাবে দিনাজপুর শহরের যাত্রা শুরু হয় ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কালেক্টর জজ হ্যাচের আবির্ভাবের পর থেকেই।

৪. Rai Monmohan Chakraborti Bahadur, *A Summary of the Changes in the Jurisdictions of District in Begal, 1757-1916,* Calcutta 1918, The Bengal Secretariat Press, pp. 10-11.

৫. মাহবুবর রহমান, 'ব্রিটিশ আমলে রাজশাহী বিভাগের জেলাগুলির সীমানা পরিবর্তন', *ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ*, পৃ. ৩৯৬।

৬. 'দু'শো বছর আগের দিনাজপুর জেলার প্রশাসনিক কড়চা', অসিত দাশগুপ্ত, *প্রতিলিপি*, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা, ১৩৮৮, অমলবসু সম্পাদিত, বালুরঘাট পশ্চিম দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত।

৭. বৃহত্তর দিনাজপুরের চূড়ান্ত জেলা সীমার জন্য প্রামাণ্য গ্রন্থ ঃ Monmohan Chakraborty,

op.cit., Calcutta, 1918.

৮. জগদ্দল, মালদহ, লালবাজার, কেতলাল, ও বদলগাছি থানার বিস্তৃত পরিচয় অংশে প্রকৃত কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। রচনাকার।

৯. মতান্তরে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল।

১০. মতান্তরে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে।

১১. ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে মালদহ ও ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে বগুড়া জেলা গঠনের পর থেকেই জেলার প্রত্যন্ত অংশে ব্রিটিশ শাসকদের আইন ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে বিভিন্ন সময়ে এক একটি থানাকে ভেঙ্গে নতুন নতুন থানা বা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র গঠন করা হয়। এইভাবেই একদা দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় পাঁচবিবি, জয়পুরহাট, ধামইরহাট, আদমদিঘি ইত্যাদি থানাগুলি।

১২. ব্রিটিশ আমলে রাজশাহী বিভাগের জেলাগুলির সীমানা পরিবর্তন, *ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ*, পৃ. ৪০৩, ৪০৪।

১৩. অমলবসু, 'দিনাজপুর থেকে পশ্চিম দিনাজাপুর', *প্রতিলিপি*, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা ১৩৮৮, পৃ. ১০৯, ১১০।

১৪. W. W. Hunter, 'Police Circle (Thana) in Dinajpur District–1872', *Statistical Account of the District of Dinajpur*, p. 371.

১৫. *ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ*, পৃ. ৪০৬; *প্রতিলিপি*, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা, পৃ. ১০৯, ১১০, ১১১।

১৬. ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে হান্টারের রিপোর্টে পাওয়া যায় এই থানার মোট এলাকা ৪৫৭ বর্গমাইল, গ্রামের সংখ্যা ৬৪৯ টি, বাড়ির সংখ্যা ২০ হাজার ৪ শত ৫৯টি এবং লোকসংখ্যা ১ লাখ ২২ হাজার ৭ শত জন।

১৭. The Bengal Boundary Commission and the Radcliffe Award 1947, in *Bangladesh Historical Studies*, Dhaka, Vol. VII. 1983.

১৮. ডব্লু. ডব্লু হান্টারের বিবরণে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরগ্রাম থানার মোট এলাকা ছিল ৪৩৭ বর্গমাইল, গ্রামের সংখ্যা ৩৩৬, বাড়ির সংখ্যা ৩৪ হাজার ৫৯টি এবং লোকসংখ্যা ২ লাখ ১৯ হাজার ৮ শত ৬৫।

১৯. গানটি মদনাবতী গ্রামে ৮৯ বছরের বৃদ্ধ ফকির কর্মকার মহাশয়ের কাছ থেকে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে সংগ্রহ করেছিলাম। রচনাকার।

২০. ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট।

২১. আবুল কালাম মোহম্মদ যাকারিয়া, *দিনাজপুর মিউজিয়াম*, পৃ. ১১।

২২. প্রভাস চন্দ্র সেন, *বগুড়ার ইতিহাস*, বগুড়া ইতিহাস গবেষণা পরিষদ, পুনর্মুদ্রন, পৃ. ৪।

২৩. প্রত্ন প্রাচুর্যে ভরপুর গ্রাম দু'খানি ১৯৯০ খিস্টাব্দে ক্ষেত্র সমীক্ষা কালে দেখা। রচনাকার।

২৪. রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ হ'তে প্রকাশিত অদ্ভুতাচার্য্যের *রামায়ণ*, পৃ. ২-৩।

২৫. *Census Report*, Dinajpur District 1921.

২৬. *বাংলায় ভ্রমণ*, ১ম ও ২য় খণ্ড, শৈব্যা সংস্করণ ১৯৯৭।

২৭. আবুল কালাম মোহম্মদ যাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫,১৬।

২৮. কারো কারো মতে, পতিরাম থানা ভেঙ্গে গঠিত হয় কুমারগঞ্জ থানা।

২৯. ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের জণগণনায় এই চিন্তামন থানার মোট এলাকা ছিল ১৬৫ বর্গ মাইল,

গ্রামের সংখ্যা ৩৯৮, মোট বাড়ির সংখ্যা ৯১টি এবং লোকসংখ্যা ৫০ হাজার ৯ শত ৬২ জন।

৩০. আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার কারণে পরবর্তীতে হাবরা থানাটি পাব্বর্তীপুর থানায় রূপান্তরিত হয়। যোগাযোগের সুব্যবস্থার দরুণ পাব্বর্তীপুর গুরুত্বপূর্ণ থানায় পরিণত হয়।

৩১. W. W. Hunter, 'Police Circle (Thana) in Dinajpur District-1872', *Statistical Account of the District of Dinajpur*, p. 371.

৩২. নওয়াবগঞ্জ ঃ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এই থানার মোট এলাকা ছিল ১৭৮ বর্গমাইল, গ্রামের সংখ্যা ৩৩৯টি, বাড়ির সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ২ শত, ২২ এবং লোক সংখ্যা ৪৬ হাজার ৭ শত ৫৩ জন। দ্রষ্টব্য : *Statistical Account of the District of Dinajpur-1872*, by W. W. Hunter.

৩৩. বাংলায় ভ্রমণ, শৈব্যা সংস্করণ, পৃ. ৮৬, ৮৭।

৩৪. ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দিনাজপুর জেলা বিবরণে ওয়েস্টমেকট শহর এবং ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত স্ট্রং সাহেবের দিনাজপুর জেলা বিবরণ, 'সীতাকোট ধ্বংস্তুপ প্রসঙ্গ।'

৩৫. ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে হান্টারের রিপোর্টে এই থানার মোট এলাকা ছিল ২১৩ বর্গমাইল, মোট গ্রামের সংখ্যা ৩১১, মোট বাড়ির সংখ্যা ছিল ৭ হাজার ৯ শত ৮৯টি এবং লোকসংখ্যা ৪৮ হাজার ৮ শত ৩ জন।

৩৬. প্রভাস চন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

৩৭. A. Mitra, *District Hand Book, West Dinajpur 1951*, p. XXXVI.

৩৮. ধনঞ্জয় রায়, 'উত্তরবঙ্গে মহিপালের গান', *মধুপর্ণী*, শারদীয় ১৩৯৪, পৃ.৩৪।

৩৯. ধনঞ্জয় রায়, *দিনাজপুর-মালদহের মিশনারী যুগ*, বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষদ, মালদহ, পৃ. ৩৯-৫১।

৪০. *দৈনিক বসুমতী* (শিলিগুড়ি সংস্করণ), ১৪জানুয়ারী ১৯৯৪, 'বাঙালি বৌদ্ধ পণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর ও উত্তরবঙ্গ', পৃ. ৪।

৪১. আত্রাই নদী ঃ ধনঞ্জয় রায়, 'উত্তরাধিকার বালুরঘাট', *দধীচি* ত্রৈমাসিক বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, মৃণাল চক্রবর্তী সম্পাদিত, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৯,১০।

৪২. দিনাজপুর রাজ জমিদারির পতনের সঙ্গে সঙ্গে দিনাজপুর শহর ও সংলগ্ন- অঞ্চলগুলিতে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে চরম অবনতি ঘটেছিল। রাজ জমিদারির বড় ধরনের পতনের পর দিনাজপুরের সামাজিক পুনরুত্থান ধীরগতিতে চলছিল। রাজা তারকনাথের সময় তিতুমীর পরিচালিত বারাসাতের ওয়াহাবি বিদ্রোহ বঙ্গদেশের কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশেষ ঘটনা। মূলত জমিদার ও নীলকরগোষ্ঠীর শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ছিল কৃষক জনসাধারণের সশস্ত্র অভ্যুত্থান। বঙ্গদেশের সর্বত্র পরিব্যপ্ত এ বিদ্রোহের মূল আদর্শ ছিল, সমগ্র মুসলিম জগতের মুসলমানদের ধর্ম ও রীতিনীতির মধ্যে বহু প্রকারের কুসংস্কার প্রবেশ করেছিল। এ সব কুসংস্কার দূর করে মুসলমান ধর্মকে নতুনভাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই আবদুল ওয়াহাব এ আন্দোলনের প্রবর্তন করেছিলেন। (সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, পৃ. ২১৬, ২১৭)। আত্মগোপনকারী, ওয়াহাবি নেতা করম আলী শাহ তাঁর দলবল নিয়ে কোম্পানি বিরোধী খবর ও ইস্তাহার

বিলি করে দিনাজপুরে সে সময় সাধারণ মানুষের মনে অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের ছটা দিনাজপুরকেও আলোড়িত করেছিল। ওই সালের ৫ই ডিসেম্বর দিনাজপুর সংলগ্ন জলপাইগুড়ি জেলার অশ্বারোহী সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সে খবর দিনাজপুরেও ছড়িয়ে পড়ে। দিনাজপুরে বসবাসরত ইউরোপীয় পরিবার বর্গ এ-সংবাদ পাওয়ায় কর্তৃপক্ষ তাঁদের রাজশাহী অঞ্চলে নিরাপদে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। রাজশাহী থেকে প্রেরিত এক সংবাদে জানা যায়, বিদ্রোহীদের একটি দল দিনাজপুর ধনাগার লুণ্ঠনের জন্য এগিয়ে আসছে। বিদ্রোহীদের দমনের জন্য সহকারী কালেক্টর মিস্টার জে. ব্রাউনকে রংপুরে পাঠানো হয় নৌবাহিনী প্রেরণের জন্য। ১০ই ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন ব্রায়ারের নেতৃত্বে কোম্পানির নৌসেনা দিনাজপুরে এসে পৌঁছায়। দিনাজপুর রাজের সবগুলি কামান বিদ্রোহীদের হাতে পড়ার আগেই কোম্পানি কর্তারা সেগুলি সংগ্রহ করে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করেন। এর মধ্যে দিনাজপুর অভিমুখে অগ্রগামী ১১ নং অনিয়মিত বিদ্রোহী অশ্বারোহী সিপাহীরা পথের মধ্যে গ্রামবাসীদের কাছে দিনাজপুরে নৌবাহিনীর উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে এবং মালদহের দিকে রওনা হয় (*Dinajpur Gazetteer*, 1912, p.29)। সিপাহী বিদ্রোহের অনেক খবর তখন গুজবে পরিণত হয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা শহরে মধ্যশ্রেণি ও গ্রাম্য মধ্যশ্রেণির মনে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজের পরাজয় হবে এ রকম কল্পনাও তাদের কিছুমাত্র ছিল না, বরং তারা ইংরেজ শাসকের জয় কামনাই করেছিল। দিনাজপুরের কৃষকের এ বিদ্রোহে কোনও ভূমিকা ছিল না। তারা সে সময় নিরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে খণ্ড খণ্ড স্থানীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক মহাসংগ্রামের প্রস্তুতিতে।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর ভারত শাসনের নীতি ও পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। কোম্পানি আমলে ইংরেজ শাসকদের লক্ষ্য ছিল ছলে বলে কি করে রাজন্যবর্গের রাজ্য অধিকার করে তার সীমা বাড়ানো যায় ও অর্থনৈতিক শোষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা যায়। মহাবিদ্রোহের পূর্বপর্যন্ত এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছিল। মহাবিদ্রেহের পর ইংরেজ শাসকরা উপলব্ধি করেছিল যে ভারতের গণশক্তির ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক সংগ্রামশক্তি সামরিক শক্তির সাহায্যে সাময়িক ভাবে পরাজিত করা সম্ভব হলেও এ শক্তিকে চিরদিনের মত পদানত করে রাখা বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর সাধ্যাতীত। নতুন নীতির সাহায্যে তাঁরা সেই নবজাগ্রত গণশক্তির সঙ্গে ·বোঝাপড়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহারানি ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করলেন, 'ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ হতে বিরত থাকবার।' ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। এরফলে, জেলা শহরগুলির প্রাণে গতির সঞ্চার করে। সরকারি উদ্যোগে শুরু হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার ও স্বায়ত্ব শাসন, যোগাযোগ এবং শিল্পের বিকাশ ঘটানোর উদ্যোগ। রাজা তারকনাথের শাসন আমলে দিনাজপুর জেলা শহর এবং জেলার বিভিন্ন প্রান্তে উন্নয়নের কর্মতৎপরতা ও শ্রীবৃদ্ধি সূচিত হয়। এ সময় নগর জীবনের নানা ধরনের উপকরণ সংযোজন হতে থাকার দরুন দিনাজপুর শহর ও সংলগ্ন গ্রামগুলির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে জেলার মানুষের কাছে প্রথম আধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্রের দ্বার উন্মোচন হয় 'দিনাজপুর ডিস্পেনসারি' নামে। নবজাগরণের এই যুগসন্ধিক্ষণে

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে তারকনাথ মারা যান। তাঁর অবর্তমানে দিনাজপুর জমিদারির ভার নেন তারকনাথের মা শ্যামমোহিনী দেবী। ১৩ বছর পর্য্যন্ত তিনি জমিদারি পরিচালনা করেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে জেলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের জন্য এক লক্ষ টাকা প্রজাদের প্রাণ রক্ষার জন্য সরকারের তহবিলে দান করেন। দুর্ভিক্ষে আর্ত মানবতার প্রতি উদার সেবাকাজের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'মহারানি' উপাধি দিয়ে ভূষিত করেন। "In 1875, the year of the great famine, the Rani earned the gratitude of Government by her generous contribution towards the relief of distress and received the title of Maharani in recognition of service. (F. W. Strong, *Dinajpur Gazetteer,* p. 21)" নারীশিক্ষার জন্য দিনাজপুর গার্লস স্কুল (১৮৬৯), রাইগঞ্জ দাতব্য চিকিৎসালয় (১৮৬৯) এবং দিনাজপুর শহরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জন্য শ্যামমোহিনী দেবী জমি ও অর্থ দান করেন। মহর্ষি ভুবন মোহন কর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্রটির চিকিৎসক ছিলেন। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ঘাঘরা নদীর গতি কাঁকড়া নদীর সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্য 'ঘাঘরা কমিশন' রানি শ্যামমোহিনীর উদ্যোগে গঠিত হয়। শহরকে দূষণমুক্ত, ঘাঘরা নদী সংস্কার ও দূষিত জল নিষ্কাশনই ছিল এর মূল লক্ষ্য। দিনাজপুর সদরে প্রথম বিছানো ইটের উপর চুনসুরকী মিশ্রিত খোয়া পিটে একটি পাকা রাস্তা শ্যামমোহিনীর দানে নির্মিত হয়। যুবকদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যায়ামাগার ও কুস্তির আখড়া তাঁর উদ্যোগে গড়ে উঠে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে মহারানি শ্যামমোহিনী কাশীতে মারা যান।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা গিরিজানাথ রায় দিনাজপুর জমিদারির দায়িত্বভার লাভ করেন। তিনি ছিলেন রানি শ্যামমোহিনীর দত্তক পুত্র। জনহিতকর কাজে কিংবদন্তি পুরুষ। সংগীত-সাহিত্য-নাটক ইত্যাদি চর্চা তাঁর সময়েই প্রাধান্য লাভ করে। ডায়মন্ড জুবিলী থিয়েটার কোম্পানী (১৮৮৫), দিনাজপুর সদর হাসপাতাল (১৮৯৬), জুবিলী হাইস্কুল (১৮৮৭), মহারাজা গিরিজানাথ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় (১৯১৩), জেলা স্কুলের ছাত্রাবাস লীয়ন হোস্টেল (১৯১৪), দিনাজপুর নাট্যসমিতি (১৯১৪) ইত্যাদি গিরিজানাথের পৃষ্ঠপোষকতা ও দানে গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নির্মাণফান্ডে ২৫ হাজার টাকা, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি রক্ষার্থে ১০ হাজার টাকা, রংপুর কারমাইকেল কলেজ নির্মাণে ২০ হাজার টাকা, গভর্ণর স্যার ল্যাম্পপোষ্ট হেয়ারের মূর্তি নির্মাণে ৫ হাজার টাকা, ঘাঘরা খাল সংস্কারে ৭৫ হাজার টাকা, রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুল (১৯১১) নির্মাণে ১০ বিঘা জমি ইত্যাদি গিরিজানাথের জনকল্যাণমুখী কাজ। 'পঞ্চরত্ন' নামে তিনি একটি সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে সভার প্রধান পরিচালক ছিলেন পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি। দরবারী সংগীত চর্চার একটি বিশিষ্ট ধারা দিনাজপুরে গড়ে উঠেছিল। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, নাটোর, বর্দ্ধমান, পুটিয়া, বিষ্ণুপুর বিভিন্ন জায়গার নামী শাস্ত্রীয় সংগীত বিশারদবৃন্দ গিরিজানাথের রাজসভাকে সংগীতমুখর করে তুলেছিল। যাত্রা, কবিগান, পাঁচালীগান, বিষহরা, নটুয়া ইত্যাদি দেশজ গানের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর অভ্যর্থনা কমিটির তিনি ছিলেন সভাপতি। মহারাজা গিরিজানাথের আমলেই গড়ে উঠে দিনাজপুর পৌরসভা (১৮৬৯, ১লা এপ্রিল)। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর পৌরসভার তিনি ছিলেন নির্বাচিত প্রতিনিধি। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে নর্দান বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে পার্বতীপুর

তৃতীয় অধ্যায়

মধ্যশ্রেণি ও রাজনীতি : ১৮৫৭ - ১৯০৫

১. স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী উৎস

১৮৫৭ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ, বাঙালি মানসে নিঃসন্দেহে এক বিস্ময়কর যুগ। এই সময় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষায় ও নতুন চিন্তায় বহন করে এনেছিল মানুষের অধিকারের ধারণা ও রাজনৈতিক জ্ঞান। ইউরোপের রেনেশাঁ আন্দোলনে মানুষ যে মুক্তির জয়গান শুরু করেছিল শিক্ষিত বাঙালি মানসে তার প্রভাব পড়ে। শিক্ষিত বাঙালি পরিচিত হয় ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন, রিফরমেশন, শিল্পবিপ্লব ও বাঙালি রেনেশাঁসের সঙ্গে। এ সময় রামমোহন রায় ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার রক্ষা, রাজনৈতিক ও নাগরিক স্বাধীনতা ভোগ এবং বাক্ স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করেন। এদেশে কোম্পানির কর্মচারীদের নিয়ে আইনসভা গঠিত হলে কোম্পানির কর্মচারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রাধান্য পাবে, এ মর্মে আইনসভা গঠনের তিনি ঘোরতর বিরোধিতা করেন। তাছাড়া, প্রেস অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে (১৮২৩), বৈষম্যমূলক জুরি আইনের বিরুদ্ধে (১৮২৭) তীব্র প্রতিবাদ জানান। রামমোহন আশা করেছিলেন ব্রিটিশের শাসনে এ দেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসার ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটবে। রামমোহনের অখণ্ড মানবসত্তা, গণতন্ত্রপ্রিয়তা ও উদার নীতিবোধের উত্তরসূরিরা ছিলেন 'ইয়ং বেঙ্গল' দল। হিন্দু কলেজের এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষক ডিরোজিওর নেতৃত্বে এই গোষ্ঠী কলকাতার মনুমেন্টের ওপর বিপ্লবী পতাকা তুলে দেন (১৮৩০)। এঁদের সংস্থার নাম 'এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন' (১৮২৮) এবং 'সোসাইটি ফর দ্য একুইজিশন অব জেনারেল নলেজ' (১৮৪৩)। এঁরা ছিলেন আধুনিক ইউরোপের যুক্তিবাদ, নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, মানব অধিকারের পূজারী। সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা-ভাবনার বিকাশই ছিল মূল লক্ষ্য। তাছাড়া, অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'জমিদারি এ্যাসোসিয়েশন', পরবর্তীতে যার নাম 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি', (১৮৩৭), 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' (১৮৩৬), 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি' (১৮৪৩), 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯), 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫১) ইত্যাদি বাঙালির রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রসারে, জাতীয় চেতনার উন্মেষে এবং দেশপ্রেমে ছিল অনলস। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতীয়দের অধিকারের দাবি ছিল প্রত্যেকের মূল উদ্দেশ্য।[১]

বাঙালি রেনেশাঁসের নতুন জাগরণ ইংরেজ শাসককূলের বুঝতে বাকি ছিল না। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর ইংরেজ শাসকেরা ভারত শাসনের নীতি ও পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছিল। শাসকগণ ক্রমবর্ধমান গণশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সমাবেশের জন্য এবার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। প্রাচীন রাজন্যবর্গই যে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রধান স্তম্ভ ইংরেজ কর্তারা তা উপলব্ধি করতে বিলম্ব করেনি। সামাজিক সংস্কার সাধনের নীতি এই সময় পরিত্যক্ত হয় এবং তার পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার সুরক্ষিত করার নীতি গৃহীত হয়। ১৮৬০ - ৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ সবের প্রেক্ষাপটে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ একদিকে যেমন ব্রিটিশ শাসনকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে অপর দিকে তেমনি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তকে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা থেকে সরে আসার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের সমস্ত শক্তির মূল উৎস ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ঐক্য। ইংরেজ শাসকরা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ঐক্যের এই মূল উৎসটিকে চিরতরে রুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করে। তখন থেকেই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বীজ বপনের আয়োজন চলতে থাকে। শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু পশ্চিমী ও ব্রিটিশ শাসনের সুফল পাবার ফলে মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসনের পুনপ্রতিষ্ঠা চাননি। ইংরেজি শিক্ষার ফলে তাঁদের মধ্যে এ ধারণা গড়ে উঠেছিল যে মধ্যযুগের মুসলিম শাসন ছিল অত্যাচারী। পলাশীর যুদ্ধ হতে সিপাহী যুদ্ধ এই একশো বছরের শাসনকালে মুসলমান সাধারণ ইংরেজ শাসক শক্তির সঙ্গে বিরেধিতার পথ অবলম্বন করেছিল। ওয়াহাবি বিদ্রোহ প্রভৃতি বিভিন্ন গণ-বিদ্রোহে মুসলমান জনসাধারণই বৈদেশিক শাসক শক্তির উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রধান শক্তিরূপে নেতৃত্ব দিয়েছিল। ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকে হিন্দু সম্প্রদায় ছিল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রধান সহযোগী এবং ভারতে ইংরেজ শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রধান অবলম্বন ।

১৮৬৪ - ৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে শিক্ষিত মানুষেরা পরস্পরের সঙ্গে ও বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ লাভ করে। ইংরেজরা রেলপথ, ডাক ও তার ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে সহজ যোগাযোগ সম্ভব করে দেয়। মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র প্রকাশ শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সহায়ক হয়ে উঠে। এর ফলে আঞ্চলিকতার অচলায়তন ভেঙে পড়তে থাকে এবং বাংলায় আধুনিক চিন্তা-ভাবনা দ্রুত প্রসার লাভ করে। এ সব নানা কারণে ব্রিটিশ শাসন দেশবাসীর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে এবং জনগণের সীমাহীন দারিদ্র্যের জন্য শাসকশ্রেণিকে দায়ী করা হয়। এভাবে বাংলায় একটি গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় দেশমাতা, দেশপ্রেম, দেশের জন্য আত্মত্যাগ, দেশবাসীর প্রতি অসীম সহানুভূতি ইত্যাদি একে একে অনন্যতা দান করেছিল। ইণ্ডিয়ান লীগ (১৮৭৫), ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৭৬) ইত্যাদির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের স্বেচ্ছাচারী নীতির বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করা হয়। ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট ও আর্মস এ্যাক্ট। (১৮৭৬ - ১৮৮০), ইলবার্ট বিল

(১৮৮২ - ৮৩) ইত্যাদি বিতর্ক ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে এবং রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করে।[২]

এই ঢেউ এসে পড়েছিল দিনাজপুর জেলাতেও। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সরসরি শাসনভার গ্রহণ করার পর দিনাজপুরে আধুনিক চিন্তা-ভাবনা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ সময় ব্রিটিশ প্রবর্তিত রেলপথ, ডাক ও তার ব্যবস্থা, মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র প্রকাশ এবং মোগল আমলে দিনাজপুর শহরের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে বড় বড় রাস্তাগুলি তৈরি করা হয়েছিল সেগুলির সংস্কার শুরু হয়। এর ফলে সহজ যোগাযোগ ও শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সহায়ক হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নয়ণ, শিল্পের বিকাশ ঘটানো ইত্যাদির কারণে দিনাজপুর জেলায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আগমন ঘটে এবং জনসমাগম বেড়ে যায়। তাছাড়া কাছারি, আদালত, সরকারি দপ্তর, ইউরোপীয় কর্মকতা ও অফিসারদের বাংলো রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কারণে শিক্ষিত পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির আগমন অব্যহত থাকে। শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তরা এই সময় (১৮৬৮) অফিস, আদালত, রাস্তাঘাটে জাতি হিসাবে বাঙালি ব্রিটিশ রাজপুরুষদের ঔদ্ধত্য ও জাত্যাভিমানের পরিচয় পেত। ইউরোপের রাজনৈতিক ঘটনাবলী মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী এই দুটি স্তরের আন্দোলন সূচিত হয়। প্রথম ধারায় ছিলেন গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরমেশ্বর দাঁ, রাখালদাস সেন, ত্রৈলোক্যনাথ বড়াল, হরিচরণ সেন, কুলদাকান্ত ঘোষ, সারদাকান্ত রায় ও যোগেন্দ্র চন্দ্র কর। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর নেতারা ছিলেন যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, শরদিন্দু নারায়ণ রায়, ললিত চন্দ্র সেন, মধুসূদন রায়, যতীন্দ্রমোহন সেন, হরিমোহন সিংহ, প্রসন্নকুমার নিয়োগী ও রমন চন্দ্র গুপ্ত। প্রথম গোষ্ঠীর দাবি জাতীয়তাবাদী সম্প্রসারণ, দ্বিতীয় দলের জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার। ইলবার্ট বিল বিতর্ক (১৮৮২-৮৩) এবং ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদালত অবমাননার দায়ে কারাবাস, এ-দুটি ঘটনা শাসক শাসিতের সম্পর্ক তিক্ত করে তুলেছিল। ব্রিটিশ শাসকরা এ দুটি ঘটনায় কুৎসিত ভাষায় ভারতীয়দের আক্রমণ করে। ইংরেজদের অন্যায় দাবির কাছে লর্ড রিপন শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলন থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালি যে শিক্ষাগুলি লাভ করেছিল তা হল সংগঠিত গণআন্দোলনের মাধ্যমে নতি স্বীকারে শাসক গোষ্ঠীকে বাধ্য করা যায় এবং ভারতীয়দের দাবিগুলিকে সম্মিলিতভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হলে ব্রিটিশ শাসক সেগুলি মানতে বাধ্য হবেন। ভারতবর্ষের মানুষকে এক রাজনৈতিক ঐক্যসূত্রে বাঁধার জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নেতারা একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে উদ্যোগ নেন। এর আঁচ এসে লেগেছিল দিনাজপুরের জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী দুটি গোষ্ঠীরই উপর । ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে মালদহ মামলার রায়ে ওয়াহাবি নেতা রফিক মণ্ডলের পুত্র আমির উদ্দিনকে আন্দামান দ্বীপে যাবজ্জীবন নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয় এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ওই একই সালে

রাজমহল মামলার রায়ে ওয়াহাবি নেতা ইব্রাহিম মণ্ডলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হয় ও তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। আমির উদ্দিন ও রফিক মণ্ডল সে সময় মালদহ, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর এবং দিনাজপুরে আন্দোলন সংগঠিত করা ও তহবিল সংগ্রহ করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। রফিক মণ্ডলের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারার দরুণ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড লিটন তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। এরা ঘোরতর ব্রিটিশ-বিরোধী ও উৎসর্গীকৃত প্রাণ সংগ্রামশীল দলরূপে সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এঁদের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করে দার-উল-হার্ব এর পরিবর্তে ভারতকে দার-উল-ইসলাম রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাওয়া। সরকারি কাগজপত্রে তাই এদের আবার কখনও কখনও 'হিন্দুস্থানের ধর্মোন্মাদ' রূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৩] দিনাজপুর জেলায় ওয়াহাবি আন্দোলনে সাধারণ ভাবে আপামর হিন্দু জনগণ অংশগ্রহণ না করলেও এই আন্দোলনে তারা সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সমর্থন ও সহানুভূতি যে সংশয়াতীত ছিল তা ওয়াহাবি বিপ্লবীদের সম্পর্কে প্রাতস্মরণীয় বিপ্লবী ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সশ্রদ্ধ অভিমত, "বিপ্লবী ওয়াহাবি ভ্রাতৃবৃন্দ আমাদের অনমণীয় দৃঢ়তা ও অদম্য সংকল্পের বিষয়ে বাস্তবানুগ শিক্ষা দেন এবং তাদের ভুলগুলি থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে উপদেশ দেন।"[৪]

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির এই নবজাগরণ কালে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের কাউন্সিল এ্যাক্টের কাঠামোর মধ্যে এক শ্রেণির ইংরেজ প্রশাসক অভিজাত মুসলমানদের স্বার্থে এবং ব্যবহারিক রাজনীতির খাতিরে প্রশাসনিক কাজে সুযোগ দান এবং রাজনৈতিক মর্যাদা দানের সূচনা করেন। এ সময় উইলিয়ম হাণ্টার তাঁর বিখ্যাত *ভারতীয় মুসলমান* গ্রন্থটি রচনা করেন। আবদুল লতিফ কলকাতায় সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৫৯), স্যার সৈয়দ আহমেদ আলিগড়ে 'অ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজ' স্থাপন করেন (১৮৭৬)। সৈয়দ আমির আলির লেখা *The Spirit of Islam, The History of Saracen* গ্রন্থ দু'খানি শিক্ষিত মুসলমানদের মনে তাদের অতীত ঐতিহ্য সর্ম্পকে নতুন বিশ্বাস গড়ে তোলে। স্যার সৈয়দ আহমেদ, আবদুল লতিফ এবং সৈয়দ আমীর আলি পাশ্চাত্য শিক্ষার যে দ্বার উন্মোচন করেন ইংরেজ শাসকরা তার ঢেউয়ে মুসলমানদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে।[৫] এ সময় দিনাজপুর জেলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মুন্সী মোহাম্মদ আলী খাঁ, মোহম্মদ ওয়াহেদ হোসেন, মোহম্মদ একিনুদ্দিন আহমেদ এঁরাই ছিলেন আধুনিক ও ঐতিহ্যবাদী এবং ব্রিটিশভক্ত। রাজনৈতিক মতাদর্শ-গত সংগ্রামের বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতা না থাকায় 'ইসলাম অবিনশ্বর' এই গোঁড়ামি থেকে সে সময় (১৮৬১-১৮৮৪) তাঁরা মুক্ত হতে পারেন নি।

২. জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ও রাজনীতির নানা প্রভাব

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইতে (বর্তমানে মুম্বাই) জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ১৮ বছর আগে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু ও ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে স্থাপিত হয় হিন্দুমেলা। দেশের দুঃখ দুর্দশা

প্রতিকারকল্পে শিক্ষিত বাঙালি স্বচেষ্টায় স্বদেশের উন্নতি বিধান, স্বাতন্ত্র্যবোধ রক্ষা ও স্বাবলম্বনের আদর্শকে গ্রহণ করে। 'হিন্দুমেলা' ছিল এই পুনরুজ্জীবনবাদী সংগঠন প্রচেষ্টার রূপায়ণ। হিন্দু মেলার মাধ্যমেই বাংলায় জাতীয়তাবাদের নবরূপের জন্ম হয়েছিল। এই নবরূপ ছিল সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ, চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ অথবা নতুন ধারা। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু ছিলেন এর রূপকার। স্বদেশবোধ অর্থাৎ দেশমাতৃকার চরণে ভক্তি ও অনুরাগের অঞ্জলি প্রদান হিন্দুমেলা থেকেই আরম্ভ হয়। এ সময়ের স্বদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা ছিল 'বন্দেমাতরম্' গান (১৮৭৪)। স্বদেশরূপ *আনন্দমঠ*-এ বঙ্কিমচন্দ্র জন্মভূমিরূপ দেবীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন, সন্তানেরা এই দেবীরই স্তুতি করেছে 'বন্দেমাতরম্' গান মন্ত্র দিয়ে। এই পর্বে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির ফলে হিন্দু জাতীয়তাবাদ পরিপুষ্ট লাভ করে। 'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি'র আদর্শ হিন্দু জাতীয়তাবাদের কল্পনাকে পুষ্ট করতে সহায়তা করে। প্রবল স্বদেশানুরাগের মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাংখা স্বদেশী স্বরাজ ও স্বধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আগ্রহের ফলে (১৮৭৫) সাম্প্রদায়িক বিভেদের সূচনা করে।[৬]

পরাধীনতার বেদনাবোধযুক্ত দেশপ্রীতি প্রবাহের সঙ্গে দেশবাসীর সংঘবদ্ধ স্বদেশব্রতের ও ঐক্যের আদর্শযুক্ত হয়ে ভারতবন্ধু এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। এই সময় (১৮৮৩) সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কলকাতায় সর্বভারতীয় 'ন্যাশনাল কনফারেন্সের' অধিবেশন বসে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠিতে তিনি তাদের দেশপ্রেম ও ত্যাগস্বীকারে উদ্বুদ্ধ করেন। একটা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। অক্টোভিয়ান হিউম তার নাম দিয়েছিলেন Indian National Union। হিউম এ ব্যাপারে নরমপন্থী নেতাদের[৭] পরামর্শ নিয়ে পরে তার নাম বদলে Indian National Congress নাম করেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও তার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৮]

ভারতের জাতীয়তাবোধের বিবর্তন ধারায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কোনও আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এর আগেই জাতীয়তাবোধের সঙ্গে রাজনৈতিক অধিকারবোধ ও ভারতবর্ষের শাসনের ক্ষেত্রে ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকারের দাবিকে কেন্দ্র করে সর্ব ভারতীয় রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অনেকখানি সফল হয়েছিল (১৮৭৬)। ছাত্রসমাজ দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে এ সময় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলে দেশব্যাপী উত্তপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। এর ফলেই সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা এ সময় অনুভূত হয় এবং ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বীজ থেকে জাতীয় কংগ্রেস কাণ্ডে-পত্রে সুশোভিত বিশাল মহীরূহের আকার ধারণ করে।

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই দিনাজপুরে হিন্দুমেলা ও ভারত সভার (ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন) প্রভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা প্রগতিশীল আন্দোলন

শুরু হয়। বাঙালি তথা ভারতবাসীর নবজাগরণে ও রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারে বিবেকানন্দের অবদান অনস্বীকার্য। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিবেকানন্দ নৈতিক চরিত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। দিনাজপুরের শিক্ষিত বাঙালি ও মধ্যবিত্ত তরুণেরা তাঁর নৈতিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ভিত্তিক ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলন সারা বাংলার অন্যান্য জায়গার মত দিনাজপুরকেও নাড়া দেয়। ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য সংস্কারকগণ দিনাজপুরে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত ভুবনমোহন কর-এর উদ্যোগে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। একই সঙ্গে বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, স্ত্রী জাতিকে সামগ্রিক স্বাধীনতা দান প্রভৃতি সংস্কার কাজেও তাঁরা এগিয়ে আসেন।[৯] ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় দিনাজপুর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়। পণ্ডিত অমরনাথ ভট্টাচার্য স্মৃতি সাংখ্যতীর্থ ও গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তীর নেতৃত্বে 'নিত্য ধর্মবোধিনী সভা' (১৮৬০) প্রতিষ্ঠিত হয়। দিনাজপুরের রাজা গিরিজানাথ রায় ও জমিদার রাধাগোবিন্দ রায় এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'নিত্য ধর্মবোধিনী সভা'র উদ্যোগে রাজারামপুর-বাসী দিনাজপুরের খ্যাতনামা পণ্ডিত ও রাজপুরোহিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণির পিতা ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে *সুহৃদ* নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত রামচরণ ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় *মিত্র* নামে আরও একটি হাতে লেখা পত্রিকা 'নিত্য ধর্মবোধিনীসভা' থেকে প্রকাশিত হয়।[১০] সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শ ও শিক্ষার বাহকরূপে পত্রিকা দুটি আত্মপ্রকাশ করে। দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজানাথ রায় 'পঞ্চরত্ন' নামে একটি রাজসভা (১৭৭৮) এই সময় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুরে স্থাপিত হয় ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারে ইংরেজি স্কুল, গার্লস স্কুল ও ট্রেনিং স্কুল। দিনাজপুরে মিউনিসিপ্যালিটি (১৮৬৯), লোকাল সেল্‌ফ গবর্ণমেন্ট, (১৮৮২), রেলওয়ে যোগাযোগের উদ্যোগ (১৮৮৪), ডাক ও তার বিভাগ (১৮৬৯) ইত্যাদি স্থাপিত হয়। ইংরেজ সিবিলিয়ানরা পদাধিকার বলে পৌরসভা, জেলাবোর্ড ও গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির দায়িত্বে থাকতেন। কিছু কিছু রাজন্যকুল এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি সেখানে সদস্য পদ পেলেও স্ব'য়ত্ত শাসিত সংস্থাগুলি পুরোপুরি সরকার শাসিত সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। ফলে তহবিল তশ্রুফ, অপব্যবহার, খেয়ালখুশি মাফিক কাজ যেমন সদস্যপদ থেকে অপসারণ ইত্যাদি চলত। এ সব গুরুতর অপরাধের জন্য এবং স্বেচ্ছাচারিতামূলক কাজের জন্য সাহেব শাসকদের বিরুদ্ধে তীব্রপ্রতিবাদের মাধ্যমে দিনাজপুরের তরুণ মনে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ বা সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উন্মাদনার জন্ম হয়। তাঁরা দিনাজপুরের সামাজিক রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নির্ভর নব জাতীয়তাবোধের পক্ষে প্রচার চালান।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর কংগ্রেসের পতাকাতলে সকল শ্রেণির মানুষ সমবেত হওয়ায় জাতীয় ঐক্য-চিন্তা আরো দৃঢ়তা লাভ করে। কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতারা ক্রমাগত (১৮৮৫ - ১৯০৫) দাবি করে ভারতীয়দের চাকরি, আইন-সভার সংস্কার, ব্যক্তিগত অধিকার, প্রশাসনিক সংস্কার ও আর্থিক নিষ্ক্রমনের অবসান ইত্যাদি। শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তের মধ্যে এঁদের দাবি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অশিক্ষিত

মানুষ নিয়ে গণআন্দোলন-ভাবনা এঁদের না থাকার দরুণ মধ্যবিত্তের সৌখিন রাজনীতিক রূপে এঁরা পরিচয় লাভ করেন। বাল গঙ্গাধর তিলক ঘোষণা করেন, 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার; আমাকে তা অর্জন করতে হবে।' তিলকের এই ধারণার মূলে প্রথম আঘাত হানেন অরবিন্দ। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ও সম্প্রীতির কথা স্পষ্ট প্রকাশ পেল স্বদেশ প্রেমের চিন্তায়। কংগ্রেসের পতাকাতলে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সমবেত হওয়ায় সে সময় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা ভিন্ন জাতির প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা কমে গিয়েছিল। স্বদেশ মাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সেন প্রেস থেকে মাসিক *দিনাজপুর পত্রিকা* আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ব্রজেশ্বর সিংহ। সংবাদ ও সাহিত্য ছাড়াও পত্রিকাটি সমাজ সংস্কার, শিক্ষার প্রসার, রাজনীতি, অর্থনীতি, খেলাধূলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নতুন চিন্তার খোরাক জোগায়। এই পত্রিকার মাধ্যমে শহর কেন্দ্রিক রাজনীতি সূচিত হয়। বিদেশী শোষক ও উৎপীড়ক সরকারের বিভিন্ন ক্রটির দিকগুলি প্রকাশিত হয়। দিনাজপুরে শিল্প, সংস্কৃতি, প্রেস, পত্রিকা, থিয়েটার, সাহিত্য চর্চা, ইতিহাস চর্চা, স্টেশন ক্লাব (১৮৮৫) ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা প্রগতিশীল আন্দোলনের নতুন ধারা তরঙ্গ তোলে। জেলায় ঠাকুর গাঁ মহকুমা (১৮৮৬) ও বালুরঘাট মহকুমা (১৯০৪) গঠিত হয়।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে কলকাতায় এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সদলে যোগ দেন ওই সম্মেলনে। ওই সভা থেকে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ দাবি করা হয়, বিশেষ করে আইনসভায় নির্বাচনের ব্যবস্থা, সরকারি কাজকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার দাবি, ভারতীয় প্রশাসন পর্যালোচনার জন্য কমিশন গঠনের দাবি, সামরিক ব্যায় হ্রাস ইত্যাদি।[১১] ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস রাজস্বের উচ্চহার, ত্রিশালা বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায়ের কঠোর পদ্ধতির প্রতিবাদ জানায়। দিনাজপুর জেলায় এসব ঘটনায় জনমত সৃষ্টি হয়। দিনাজপুরের বাঙালি বুদ্ধিজীবী আক্রোশে ফেটে পড়ে। রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হয়। এরই পরিণামে রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনার জন্য মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরমেশ্বর দাঁ, রাখালদাস সেন প্রমুখরা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'দিনাজপুর সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। 'ভারতসভা'র কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সভা পরিচালিত হয়। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের পর হতে 'দিনাজপুর সভা'র সদস্যরা কংগ্রেসের প্রচার শুরু করেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বালুরঘাটে মুন্সেফি চৌকি চালু হয়। মহাদেবপুর, পোর্শা, পত্নীতলা, পতিরাম ও গঙ্গারামপুর থানাগুলি নিয়ে গড়ে ওঠে এই মুন্সেফি আদালত। এর ফলে বালুরঘাটে জনসমাগম বেড়ে যায়। শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের নতুন আশা ও উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে। অম্বিকাচরণ বসু, তারিণী সেন, গোপাল চক্রবর্তী, মহেশ বাগচী, যদুনাথ রায়, গোপাল চ্যাটার্জী, নলিনীকান্ত অধিকারী, চন্দ্রকান্ত চ্যাটার্জী, বরদামুখুটি, যদুপতি রায়, মদনমোহন চক্রবর্তী, নলিনীকান্ত চক্রবর্তী, দেবেন্দ্রগতি রায়, এইসব শিক্ষিত মানুষের উপলব্ধি ও চিন্তায় জাতীয় ঐক্য-চিন্তা দৃঢ়তা লাভ করে। কংগ্রেসের

প্রতিষ্ঠার যুগে এঁরাই বালুরঘাটের অসংখ্য মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনা ছাড়িয়ে দেন।[১২] ওই সময় (১৮৮৫-১৮৮৬) রায়গঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকায় কুলদাকান্ত ঘোষ কংগ্রেসের ভাবাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দেশপ্রীতির সঞ্চার করেন।[১৩]

ভারতের স্বদেশপ্রেমের ধারায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগের ভাবোন্মাদনার স্রোতে 'দিনাজপুর সভা'র সদস্যরা কংগ্রেসের উদার ও মানবিক আর্দশে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠন করেন। দিনাজপুরসভার নেতারা, ব্রিটিশের শাসনাধীনে এ দেশের রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারিত হবে ও বিকাশ ঘটবে রাজনৈতিক চেতনার, এই লক্ষ্য রেখে জমিদার ত্রৈলোক্যনাথ বড়ালের বাড়িতে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশন ও কলকাতা অধিবেশনের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আলোচনা করেন। এই সভায় জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীদ্বয় বিপুল উৎসাহে জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসারে সভাস্থলে মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত করে অস্থায়ীভাবে কংগ্রেস কমিটি গঠন করেন। প্রথম জেলা কংগ্রেস কমিটিতে সদস্যরূপে ছিলেন রাখাল-দাস সেন, যদুনাথ রায়, রামচন্দ্র সেন, কুলদাকান্ত ঘোষ, যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, হরিচরণ সেন ও নলিনীকান্ত অধিকারী।[১৪] ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ শহরে এ. ওয়েবের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের দশম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস কমিটি থেকে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য একটি রাজনৈতিক সভার অধিবেশন হয়। মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হরিচরণ সেন মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগদানের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে পঞ্চদশ কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চদশ কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের জন্য দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে রামচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশনে যোগদানের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হন কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায়, ললিতচন্দ্র সেন, হরিচরণ সেন, মধুসূদন রায়, রাখালদাস সেন, যদুনাথ রায়, সারদাকান্ত রায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র কর, এই আট জনের একটি দল।[১৫]

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ফলে ওই সময় প্রবল জাতীয় জাগৃতির জোয়ার সমগ্র ভারতে প্রবাহিত হয়েছিল। বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃসংঘ (১৮৯৭) আর্তের সেবায় নিয়োজিত হয়। মানুষ ও ঈশ্বরের অভিন্নতার যে উপলব্ধি ছিল বেদান্ত দর্শনে, মিশন প্রতিষ্ঠা করে তাকে তিনি নামিয়ে আনলেন ধরাছোঁয়ার জগতে। তার প্রবল ধাক্কায় দিনাজপুর জেলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি শিক্ষক, ছাত্র ও জনমানসে এক অপ্রতিরোধ্য প্রেরণার সঞ্চার হয়। ওই সময় (১৮৯৭) 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা' শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী দুর্ভিক্ষ সেবার মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ করে। স্বামী অখন্ডানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দুর্ভিক্ষ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দিনাজপুর জেলার বিরল গ্রামে একটি সেবাকেন্দ্র খুলে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের মধ্যে ওই সময় (১৮৯৭) সেবাকাজে নিয়োজিত হন। বাঙালি তথা ভারতবাসীর নবজাগরণে, রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারে বিবেকানন্দের অবদান প্রবল উন্মাদনার সৃষ্টি করে।

দিনাজপুরের জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল আন্দোলনের যুবকদের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন আদর্শস্বরূপ। ফনীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুখচাঁদদাস মজুমদার, কেদারনাথ সেন, দ্বারিকানাথ দাসগুপ্ত, হেমচন্দ্র সিংহ, সারদাকান্ত রায়, শরদিন্দু নারায়ণ রায়, রাধিকারমণ ভট্টাচার্য, সুধীরচন্দ্র খাসনবিশ, বীরেন্দ্র নাথ মুখার্জী, রমণীমোহন কুন্ডু, দিনাজপুরের এসব তরুণেরা বিবেকানন্দের নৈতিকতার আদর্শকে জাতি - ধর্ম- বর্ণ- নির্বিশেষে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন।[১৬]

কংগ্রেসের প্রথমযুগের দেশাত্মবোধের ক্ষেত্রে যে জন জাগরণ ঘটে তা দেশবাসীর কাছে এক চরম পরীক্ষা বয়ে নিয়ে এল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব বাঙালির কাছ দেশপ্রেমের পরীক্ষারূপে ধরা দিল। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে মে মাসের ৮ তারিখ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে পুলিশের গুপ্তচর গণেশ শঙ্কর দ্রাবিড় ও রামচন্দ্র দ্রাবিড়কে হত্যার অভিযোগে বাসুদেব চাপেকার ও বিনায়ক রাণাডের ফাঁসি, র‍্যান্ড ও আর্য়স্টিকে হত্যার অভিযোগে বালকৃষ্ণ চাপেকারের ফাঁসি, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সৈন্যদের হাতে বীরসা মুণ্ডা গ্রেফতার ও রাঁচি জেলে বীরসা মুণ্ডার মৃত্যু, ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা, ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে কলকাতায় বিপ্লবী দল 'অনুশীলন সমিতি'র প্রতিষ্ঠা, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রদের পরিচালনায় 'স্বদেশী ভাণ্ডার' গঠন, বালগঙ্গাধর তিলকের আহ্বানে পুণায় ছাত্রদের সভায় ব্রিটিশদের উৎপাদিত পণ্য বয়কট ইত্যাদি।[১৭] এ সময় থেকেই (১৯০৩) ভারতের জনচিত্তে কংগ্রেসের আন্দোলন শিথিল হয়ে আসছিল। কংগ্রেসের বাৎসরিক সভায় উপস্থিতির হার ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। আমেদাবাদ কংগ্রেস সম্মেলনে সদস্য সংখ্যা হয়েছিল ৪৭১ জন (১৯০২)। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের অমরাবতী অধিবেশন শেষে অশ্বিনী দত্ত কংগ্রেসকে 'তিনদিনের তামাশা' আখ্যা দিয়েছিলেন।[১৮] ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে লালমোহন ঘোষের সভাপতিত্বে মাদ্রাজে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উনিশতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওই অধিবেশনে দিনাজপুর থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন শরদিন্দু নারায়ণ রায়, ললিতচন্দ্র সেন, মধুসূদন রায় ও যতীন্দ্র মোহন সেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বোম্বাই শহরে। কংগ্রেসের ২০তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্যার হেনরি কটন। ওই সম্মেলনে দিনাজপুর থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন রায়গঞ্জের কুলদাকান্ত ঘোষ।[১৯] এই সময় (১৯০৪) দিনাজপুরে স্বদেশ চেতনা ও জাতীয় ভাবনা গড়ে তোলার জন্য ডায়মণ্ড জুবিলী হলে মহারাজা গিরিজানাথ রায়ের সভাপতিত্বে, 'শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি বিধায়ণী' সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় বিপিণচন্দ্র পাল ও এ. কে. ঘোষ কলকাতা থেকে আসেন এবং শিল্প ও বিজ্ঞান উন্নতি বিধায়ণী সভার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন।[২০]

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জনের প্রস্তাবের বিরোধিতায় দেশব্যাপী যে আলোড়ন চলেছিল তা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনামাত্রই নয়,

ভারতের জাতীয়তাবোধের বিকাশ এবং জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। স্বদেশপ্রেম এই পর্বে এক নতুন দিগন্তকে স্পর্শ করেছিল। অপরদিকে (১৯০৩) লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে কলকাতার বিপজ্জনক প্রভাব থেকে পূর্ববঙ্গ মুক্ত হবে ও মুসলিম অধিবাসীদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা সম্ভব হবে, এই দুটি কারণ সাম্প্রদায়িকতার সুর ছড়ানোরও সুযোগ করে দিয়েছিল।

৩. চরমপন্থী আন্দোলনের সূচনা

বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* ও বিবেকানন্দের নব বেদান্তবাদ চরমপন্থী জাতীয়তাবোধের মানসিক পটভূমিকা তৈরি করে দিয়েছিল। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে *ইন্দু প্রকাশ,* পত্রিকায় অরবিন্দর 'নিউল্যাম্পস ফর ওল্ড' নামে প্রবন্ধগুলিতে নতুন চিন্তার খোরাক জোগায়। অরবিন্দর আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে কংগ্রেসের সৌখিন শহরঘেষা রাজনীতি। এই রাজনীতির উদ্দেশ্য চাকরি আদায় ও আইনসভার সদস্যপদ লাভ। তিনি প্রোলেতারিয়েট বিপ্লবের ডাক দেন। বিদেশী শোষক এবং উৎপীড়ক সরকারের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। নরমপন্থী নেতারা মনে করতেন এ দেশের অশিক্ষিত মানুষ নিয়ে কখনই গণআন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়, এঁদের বিশ্বাস ছিল শহর কেন্দ্রিক সৌখিন রাজনীতি। এই ধারণার মূলে অরবিন্দ প্রথম আঘাত হানেন। অরবিন্দের এ চিন্তার সঙ্গে যোগ দেন লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিন চন্দ্র পাল ও অন্যান্যরা। দেশ ও ঐতিহ্যকে ধরে রেখে এঁরা নতুন ধারার পত্তন করলেন। শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্ত আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজের দাবি আদায়ের জন্য বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে এই ছিল এঁদের নবজাতীয়তাবাদের মন্ত্র। চরমপন্থীদের মূলকথা ছিল দেশবাসী ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না কারণ তারা শোষণ করে, তাদের শাসন উৎপীড়নমূলক। অরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলায় গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার আয়োজন করেন। চরমপন্থীদের চোখে স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা ছিল গৌণ, মুখ্য ছিল স্বরাজ। এই সময় (১৮৯৩ - ১৯০৫) গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় অনুশীলন সমিতি (১৯০২, ২৪ মার্চ)। দিনাজপুর জেলায় এই গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেন উচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণি। সে সময় বাঙালি ভদ্রলোকের জমি ও মধ্যস্বত্ব থেকে আয় কমে গিয়েছিল এবং ভারতে বাঙালি কর্মসংস্থানও সমস্যার মুখে পড়েছিল। চরমপন্থীদের মধ্যে একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে ইংরেজ শাসন এদেশে মধ্যবিত্তের বাঁচার উপযোগী প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন গড়ে তুলবে না। তাঁদের মনে হয়েছিল বিপ্লবের পথেই এদেশ থেকে ইংরেজ শক্তির উচ্ছেদ ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ণ ঘটানো সম্ভব। দিনাজপুরে সে সময় গুপ্ত বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নেন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বামনদাস ভট্টাচার্য, দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রফুল্ল নিয়োগী, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ।[২১] ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর ঢাকাকে রাজধানী করে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সরকারিভাবে কার্যে পরিণত হয়। শুরু হয় বাঙালির অগ্নিপরীক্ষা। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ফলে এই প্রথম স্বদেশপ্রেম রাজনৈতিক চেতনার অপেক্ষাকৃত কঠিন ভূমির উপর আশ্রয় গ্রহণ করে। জাতির চৈতন্য বঙ্গভঙ্গ

প্রস্তাবে সবেগে নাড়া খেয়ে জেগে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সরকারিভাবে কার্যকর করার আগেই দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০৪)। তাঁর নেতৃত্বে দিনাজপুরের মানুষ বৈদেশিক শাসন, শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামীমুখী হয়ে উঠে।[২২] বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে এই সময় (১৯০৫) বাঙালি অরবিন্দের নেতৃত্বে জাতির আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল, ঘোচাতে চেয়েছিল তার কাপুরুষতা, দুর্বলতা। অদূরদর্শী লর্ড কার্জন বুঝতেও পারলেন না তিনি কি মারাত্মক অস্ত্র চরমপন্থীদের হাতে দিলেন। বঙ্গভঙ্গের সরকারি প্রস্তাব প্রকাশিত হবার আগেই বিদেশী বর্জনের ডাক দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বুক চিরে কার্জনের সেই আঁকা দাগ (১৬ অক্টোবর) পাঁকা হয়ে গেল।[২৩] বঙ্গভঙ্গকে অবলম্বন করে স্বদেশপ্রীতি নিছক ভাবানুভূতির সংকীর্ণ পরিমণ্ডল ছাপিয়ে তখন কর্মে রূপায়িত হয়ে উঠল।

৪. বঙ্গভঙ্গ ও দিনাজপুরের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই জুলাই সিমলা থেকে সরকারি ভাবে 'বঙ্গভঙ্গ' আদেশনামায় প্রথম যখন বঙ্গবাসী জানতে পারেন যে ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে দু'ভাগ করে শাসনকার্য চালাবেন, দার্জিলিং বাদে উত্তরবঙ্গ সহ ঢাকা ও চট্টগ্রাম ডিভিশনের সব জেলা আসামের সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেন্ট হবে, তখন বাংলার সব জেলাগুলির মতই দিনাজপুর জেলাতেও এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঝড় ওঠে। এর প্রতিবাদে অনেক সভা ও মিছিল হয়। ১৯০৫ সালে দিনাজপুরে বিপ্লবী গুপ্ত দল অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও বামনদাস ভট্টাচার্যের উদ্যোগে দিনাজপুর শহরে বাসুনিয়া পট্টিতে 'মজুমদার ফ্রেন্ডস' নামে একটি সাইকেলের দোকান অনুশীলন সমিতির পক্ষ থেকে খোলা হয়। বিপ্লবী গুপ্ত দলের সদস্যরা গোপনে সমিতির কাজ করার জন্য এই দোকানটিকে সমিতির মূল দপ্তর করে। দক্ষিণারঞ্জন বসু এর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশের সঙ্গে দিনাজপুরেও এই ঘোষণার বিরোধিতা করে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। শাসক বিদ্বেষের সঙ্গে বিদেশি বর্জন ও স্বদেশী জিনিসের প্রতি অনুরাগ বাড়ে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম সূচনা হয়েছিল খুলনার বাগেরহাট এবং দিনাজপুর জেলা থেকে। ঐতিহাসিক ঘটনা এই যে, দিনাজপুরের অনুসরণে কলকাতায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে প্রথম সভা সমিতি হতে থাকে পরবর্তী তা বঙ্গদেশ তথা ভারতব্যাপী প্রসারিত হয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২১শে জুলাই দিনাজপুর মহারাজা গিরিজানাথ রায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গভঙ্গ করার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দিনাজপুর শহরে একটি বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বরদাকান্ত রায় (উকিল), দিনাজপুর রাজ দরবারের পঞ্চরত্ন সভার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ রায়, *দিনাজপুর পত্রিকা*-র সম্পাদক ও দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির মূল পরিচালক যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। লালমোহন ঘোষ তাঁর ভাষণে বাঙালিকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা থেকে বিরত হতে উপদেশ দেন। ওই সভার সভাপতি মহারাজা গিরিজানাথ রায় স্বয়ং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে সকল অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটদের জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যাল

বোর্ড, পঞ্চায়েত সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করার অনুরোধ করেন।[২৪]

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সরকারিভাবে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাগে হয়ে যায়। দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ অনেক আবেদন-নিবেদন, প্রতিবাদ নিন্দা করেছিল সবকিছুই অগ্রাহ্য করে সরকারি পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। বঙ্গভঙ্গ সরকারিভাবে ঘোষিত হলেও তা স্বীকার করে নিতেই হবে, এমন আনুগত্য দেখাতে দেশের মানুষ রাজী হলেন না। কাজেই বঙ্গভঙ্গের Settled fact-কে Unsettle করার চেষ্টা শুরু হয় সংঘবদ্ধভাবে দেশের সর্বত্র। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সরকারিভাবে ঘোষণার খবর তার যোগে দিনাজপুরে পৌঁছে যায়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর দিনাজপুর ডায়মন্ড জুবিলী হল-এ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে একটি জনসভা হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন হরিমোহন সিংহ। সভায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের প্রত্যেকেই স্বদেশী বস্ত্র পড়ে আসেন। এই সভার মাধ্যমে ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করার আহ্বান জানানো হয়। বঙ্গভঙ্গের আলোড়নের এই পটভূমিকায় জন্ম নেয় অসংখ্য দেশপ্রেমের গান। রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, মুকুন্দদাস, এঁদের রচিত গান তখন পথে ঘাটে, সভাসমিতি-সর্বত্রে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলার মানুষদের আহ্বান করেন 'রাখিবন্ধন' ও 'অরন্ধন' পালন করতে। দিনাজপুর জেলায় (১৬ অক্টোবর ১৯০৫) অরন্ধন ও সম্পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। বালুরঘাটে যদুনাথ রায়, অধিকারীর উদ্যোগে এবং ডাক্তার চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিরুদ্ধে সভা হয়। সেখানে বঙ্গভঙ্গ রদ ও বিলাতি জিনিস বর্জনের প্রস্তাব নেওয়া হয়। নলিনীকান্ত চক্রবর্তী ও দেবেন্দ্রগতি রায়ের উদ্যোগে স্বদেশী ভান্ডার খোলার ব্যবস্থা করা হয়।[২৫] দিনাজপুর শহরে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন রাখালচন্দ্র সেন, মধুসূদন রায়, সতীশ রায়, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ললিতচন্দ্র সেন, গোপাল চন্দ্র গাঙ্গুলী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দিনাজপুর জেলার মানুষদের পারাস্পরিক মিলনসূত্রে আবদ্ধ হবার জন্য রাখিবন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একটি জনসভা আহ্বান করা হয় দিনাজপুর ডায়মন্ড জুবিলী হল-এ। সেদিনও (১৯০৫, ১৭ অক্টোবর) দিনাজপুরে হরতাল ও অনেক পরিবারে অরন্ধন এমন কি রাত্রিতে আলো জ্বালানো হয়নি, ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন শরদিন্দু নারায়ণ রায়। রাখিবন্ধন উৎসবে ডায়মণ্ড জুবিলী হল-এ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ খালি পায়ে সমবেত হয়। মেয়েরা শাঁক বাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে স্বদেশী গান গাইতে গাইতে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে।[২৬]

> ' বাংলার মাটি, বাংলার জল
> বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
> পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।"

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের প্রথম নিযুক্ত

গভর্ণর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার দিনাজপুর পরিদর্শনে আসেন। গভর্ণরকে অভিনন্দন জানানোর বিষয়কে কেন্দ্র করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাধে। দিনাজপুরের যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী গভর্ণর ফুলারকে অভিনন্দন না জানানোর আহ্বান জানান এবং তাঁকে বয়কট করতে বলেন। এর ফলে কংগ্রেসপন্থী নেতাদের মধ্যে দুটি দলের সৃষ্টি হয়। একটি দল বঙ্গভঙ্গ নীতির ঘোর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও গভর্ণরকে অভিনন্দন দানের পক্ষে ছিলেন, অপর গোষ্ঠী ছিলেন ঘোর বিরোধী। দিনাজপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সে সময় ছিলেন কিরণচন্দ্র দে। পদাধিকার বলে তিনিই ছিলেন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। তিনিও গভর্নর ফুলারকে নাগরিকদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন দানের বিষয়টি দুটি দলের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হওয়ায় কোনও সুরাহা করতে পারলেন না। এই বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজানাথ রায় এবং একিনুদ্দিন আহমেদ ব্যামফিল্ড ফুলারকে অভিনন্দিত করার ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। একিনুদ্দিন আহমেদ ছিলেন দিনাজপুর 'মুসলমান সভার' (১৯০৪) অন্যতম পুরোধা। দিনাজপুর মুসলমান সভার পক্ষ থেকে ফুলারকে অভিনন্দন জানানোর কাজকর্মে স্বদেশ প্রেমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ শুরু হয়। *দিনাজপুর পত্রিকা*-য় প্রকাশিত হয়, 'মুসলমান সভা' নামে একটি ভুঁইফোঁড় সভা হইতে লাট বাহাদুরকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া সাব্যস্থ হইয়াছিল। তথাপি ৮০ জন লোকের বেশী হয় নাই। তন্মধ্যে কতক কতক অভিনন্দনের ব্যাপারে কিছুই জানে না। তৎপর কয়েকজন স্বাধীনচেতা ভদ্রলোক অভিনন্দন ব্যাপারে আপত্তি করিয়াছিল। এইরূপ স্থলে লাট বাহাদুর অভিনন্দন গ্রহণ করিবেন কিনা তদ্বিষয়ে উপরে লেখালেখি হইলে অভিনন্দন গ্রহণ করাই সাব্যস্ত হয়।[২৭]

৫. হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

১৮৫৭ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত সময়কাল ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষের যুগ। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭, শতাব্দী ব্যাপী মুসলমান সম্প্রদায়ের তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধি সংগ্রাম চলেছিল ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিল অ্যাক্টের কাঠামোর মধ্যে মুসলমানদের স্বার্থে প্রশাসনিক কাজে সুযোগ দান এবং রাজনৈতিক মর্যাদা দানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ সময় *ভারতীয় মুসলমান* পুস্তকটি রচনা করেন উইলিয়ম হান্টার, স্যার সৈয়দ আহমেদ আলিগড়ে স্থাপন করেন 'অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' (১৮৭৬) প্রশাসকদের চেষ্টায় শুরু হয় ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস লেখা। এ সময় কালেই রামমোহন, ডিরোজিও, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জাতীয়তাবাদের মূল প্রবাহকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করার চেষ্টা করেন। এ সময়েই দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন এবং হিন্দুদের পুনর্জাগরণে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাকে সংহত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ভগ্নি নিবেদিতা প্রমুখ বিকাশমান জাতীয়তাবাদের নতুন অর্থ ও পথের নির্দেশ দেন। শিশিরকুমার ঘোষের প্রতিষ্ঠিত *অমৃতবাজার পত্রিকা* এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখের সহযোগিতায় 'ভারতসভা' (১৮৭৬) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইংরেজদের শাসনতান্ত্রিক বিরোধীতার আন্দোলনে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্মের পুর্নজাগরণের ডঙ্কা বাজে। ভারতের আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠে।

ব্রিটিশভক্ত মুসলমান নেতাদের মধ্যে আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আহমেদ, আমীর আলি পাশ্চাত্য শিক্ষায় মুসলমানদের শিক্ষিত করার আগ্রহ দেখান। ফার্সির বদলে তাঁরা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি জোরালো যুক্তি দেখান। পাশ্চাত্য শিক্ষার যে দ্বার তাঁরা উন্মোচন করেন ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় মুসলমান সমাজকে তার দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে এক মুসলমান বুদ্ধিজীবীর উদ্ভব হয়। এই বুদ্ধিজীবীর দল ব্রিটিশের মিত্র হিসাবে নব মন্ত্রের উদীয়মান জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক উত্থাপিত দাবিগুলির বিরোধীতা করতে শুরু করেন।[২৮] মুসলমান সমাজে এই সময় দুটি গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয় (১৯০১)।

একদল, যাঁরা ছিলেন ব্রিটিশের চরম বিরোধী তাঁরা ক্রমে হয়ে উঠলেন ব্রিটিশের চরম মিত্র। অন্যদল, যাঁরা ব্রিটিশের মিত্র ছিলেন তাঁরা হয়ে উঠলেন ঘোর ব্রিটিশ বিরোধী। মুসলমান সম্প্রদায়ের পুনর্জাগরণ কেবলমাত্র ইংরেজি শিক্ষাটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। রাজনৈতিক মতদর্শগত সংগ্রামের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতা থেকে তাঁদের বেশিরভাগই মুক্ত হতে পারেন নি। আবার আধুনিক মুসলমানদের কেউ কেউ ভিন্নতর চেতনা সম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা নিজ সম্প্রদায়ের সকল গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতা ঝেড়ে ফেলে সাম্প্রদায়িক লাভ লোকসানের উর্ধ্বে ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের স্বার্থে দৃষ্টিকে প্রসারিত করেন।

এই রকম প্রেক্ষাপটে দিনাজপুর জেলার মুসলমান সমাজে সে সময় (১৮৫৭ - ১৯০৫) কোনও শীর্ষ নেতা ছিলেন না। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের আগে দিনাজপুরে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একজনই মাত্র পার্শিজানা উকিল ছিলেন তিনি হলেন, মুন্সী মোহাম্মদ আলী খাঁ। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংগ্রামের বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতার ছাপ না থাকায় ইসলাম অবিনশ্বর এই গোঁড়ামি থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরে 'মুসলমান সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একিনুদ্দিন আহমেদ। 'দিনাজপুর সভা' গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের স্বার্থে প্রশাসনিক কাজে সরকারি সুযোগদানের সমর্থন এবং মুসলমান সমাজের উন্নয়ণ। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার দিনাজপুরে আসেন এবং মুসলমান সভা থেকে তাঁকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। তার মধ্যে অনেকগুলি দাবি ছিল। বক্তৃতা দান কালে ব্যামফিল্ড ফুলার ওই সব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান সম্প্রদায়কে শিক্ষাক্ষেত্রে মনোযোগী হবার কথা বলেন। নন-ম্যাট্রিক মুসলমানদের সরকারি চাকরি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন। দিনাজপুর জিলা স্কুলে মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করার জন্য আর্থিক সাহায্য দান করবেন বলে আশ্বাস দেন। 'মুসলমান সভা' দিনাজপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার বিষয়ে সে সময় (১৯০৫) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁরা নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েও নতুন পথ ও উপায় অবলম্বনে সচেষ্ট ছিলেন। অতীতের 'ফারাজি খিলাফত' আন্দোলনের বৈপ্লবিক চেতনাকে ধরে রাখার জন্য তাঁরা চেষ্টা করেন। নিজেদের গুটিয়ে

নেননি এবং কোন হটকারী পন্থা গ্রহণ করেন নি। কংগ্রেসের প্রতি তাঁদের সমর্থন ছিল।

বঙ্গভঙ্গ রদ ও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বিভিন্ন সভাসমিতিতে অংশগ্রহণ করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য (১৯০৫) অনেক মুসলমান জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করেছেন। দিনাজপুরে মুসলমান সমাজের এই সব ব্যক্তিরা হলেন মুন্সী ফকিরুল্লাহ, মুন্সী সোলোমান এবং একিনুদ্দিন আহমদ। এঁরা তিনজনই ছিলেন আইন ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় অধিবাসী।[২৯]

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙালী মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক*, পৃ. ৬০, ৬১, ৬২ এবং বিনয়কুমার সরকার, *নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন (প্রথম খণ্ড)*, পৃ. ১৪০, ২৩১।
২. শান্তিময় রায়, *ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলিম অবদান*, পৃ. ৪, ১৭।
৩. ঐ, পৃ. ২০।
৪. Cantwal Smith, *Moderm Islam in India*, p. 190.
৫. গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা স্বদেশী গান*, পৃ.২৩।
৬. অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫ - ১৯৪৭)*, পৃ. ৩৭, ৩৮ এবং নরমপন্থীনেতা বিশেষত দাদাভাই নৌরজি, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বালগঙ্গাধর তিলক, রমেশ দত্ত প্রমুখ।
৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯০৯, পৃ. ২৩৬।
৮. শহরে মুদ্রণ প্রেস না থাকায় পত্রিকা দুটি হাতের লেখায় প্রকাশিত হত।
৯. অমলেশ ত্রিপাঠী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
১০. উত্তরাধিকার বালুরঘাট, *দধীচি*, পৃ. ২৮।
১১. সত্যরঞ্জন দাস, *দিনাজপুরের গৌরব গাথা*, পৃ. ৪৫।
১২. ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস কমিটি প্রথম গঠিত হয়েছিল। এ বিষয়ে ১৮৮৫ থেকে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দিনাজপুর পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ব্রজেশ্বর সিংহ ও বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত দিনাজপুর পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যাগুলি পড়লে এ তথ্যের সঠিক হদিশ পাওয়া যাবে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুর পত্রিকার সব কটি সংখ্যা অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থায় কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় এখনও রয়েছে। মতান্তরে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর *দিনাজপুর জেলার রাজনৈতিক ইতিহাস* গ্রন্থে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জিলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়েছিল বলে বলা হয়েছে। এ তথ্যের সঠিক হদিশ পাওয়া যায়নি। *দিনাজপুরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস* গ্রন্থের লেখক মেহরাব আলী লিখেছেন, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে কলকাতা হতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিনাজপুরে আসেন এবং ত্রৈলোক্যনাথ বড়ালের বাড়িতে সুরেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে 'দিনাজপুর জিলা কংগ্রেস কমিটি' গঠিত হয় এতথ্য সঠিক নয়। কারণ ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সুরেন্দ্রনাথ সে সময় ভারতীয় প্রতিনিধি মূলক সরকার গঠনের জন্য বিলাতে গিয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য, *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*, পৃ. ৫৭০।

১৩. মাসিক দিনাজপুর পত্রিকা, ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৬।
১৪. দিনাজপুর রামকৃষ্ণ মিশনের (বাংলাদেশ) হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, পৃষ্ঠা. ১৫, ১২৬, ১২৮
১৫. পশ্চিমবঙ্গ, *স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা* ১৪০৪, পৃ. ১২৮, ১২৯।
১৬. অমলেশ ত্রিপাঠী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
১৭. *দৈনিক বসুমতী,* শিলিগুড়ি সংস্করণ, ছুটির পাতা, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৯৮, অগ্নিযুগের উত্তরবঙ্গ, পৃ. ৩।
১৮. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।
১৯. যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পা.), *মাসিক দিনাজপুর পত্রিকা,* ১৩১৫, আষাঢ়, পৃ. ২৬-৪৫।
২০. ঐ, ১৩১২, আশ্বিন, পৃ. ১১১।
২১. শান্তিময় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
২২. যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, ১৩১৫, আষাঢ়, পৃ. ৩৯, ৪০, ৪৫।
২৩. অমলেশ ত্রিপাঠী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭ এবং ডঃ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত. পৃ. ৬৭।
২৪. *দৈনিক বসুমতী,* শিলিগুড়ি সংস্করণ, ছুটিরপাতা, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৯৮, 'অগ্নিযুগের উত্তরবঙ্গ'।
২৫. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।
২৬. যোগীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, ১৩১৫, আষাঢ়, পৃ. ২৬-৪৫।
২৭. ঐ, ১৩১২, আশ্বিন, পৃ. ১১১।
২৮. শান্তিময় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
২৯. যোগীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, ১৩১৫, আষাঢ়, পৃ. ৩৯, ৪০, ৪৫।

চতুর্থ অধ্যায়

বিপ্লবী কাজকর্ম ও মহাত্মা গান্ধির আন্দোলন ঃ ১৯০৫ - ১৯৪২

১. দিনাজপুরে স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গের প্রচণ্ড আঘাতে দেশজুড়ে প্রবল উত্তেজনা ও আবেগ ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী জিনিসের প্রতি অনুরাগ বেড়ে যাওয়ায় শাসক-বিদ্বেষ তীব্র আকার ধারণ করে। দেশবাসী শাসকবর্গের হৃদয়হীন সিদ্ধান্ত প্রয়োগের ক্ষমতার পরিচয় পান। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ মহিমা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে ইংরেজের প্রতি চরম বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব গড়ে ওঠে। শাসকবর্গের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে গিয়ে তীব্র ইংরেজ বিদ্বেষ জন্ম নেওয়ায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মূলস্রোতে সেই বিদ্বেষকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং ইংরেজ নিধন সূচনা করে। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা থেকে শুরু করে বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত বাতিল হওয়া পর্যন্ত (১৯০৩-১৯১১) দেশবাসীর স্বতস্ফূর্ত স্বদেশানুভূতিকে বিদেশী শাসকেরা যখন পদদলিত করেছে তখন স্বদেশীযুগের কর্মীদের জাতীয় উদ্দীপনা শুধু অভিনব নয় একতার আদর্শে মাথা উচু করে দাড়ানোর সংকল্প নিয়েছে। এই সময় ছাত্র-দমননীতির প্রয়োগের বিরুদ্ধে কলকাতায় 'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা (১৯০৫, ৪ নভেম্বর), ছাত্রদের 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ করে সার্কুলার প্রকাশ, রংপুরে 'জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন' (১৯০৫, ৮ নভেম্বর), জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন (১৯০৬), বিপ্লবীদের সাপ্তাহিক মুখপত্র *যুগান্তর* প্রকাশনা (১৯০৬, ১৮ মার্চ), বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে পুলিশের তাণ্ডব (১৯০৬, ১৪-১৫ এপ্রিল), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু (১৯০৬, ১৪ আগস্ট), বয়কট, স্বদেশি ও জাতীয় শিক্ষার সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ (১৯০৬, ২৬-২৯ ডিসেম্বর), বোমার মামলার আসামী হিসাবে বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, সত্যেন বসু, কানাইলাল দত্ত প্রমুখ বিপ্লবী মুরারী পুকুরে ধৃত (১৯০৮), অরবিন্দ ঘোষের গ্রেপ্তার (২ মে, ১৯০৮), ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি (১৯০৮, ১১ আগস্ট) ইত্যাদি আরো অসংখ্য ঘটনা। শত শত শহীদের রক্ত স্নানের মধ্য দিয়ে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এগিয়ে চলে।[১] এই আন্দোলনে বাংলার মুসলিম সমাজ অনেক দূরে সরে যান। হিন্দু ধর্মের আচার-আচরণ, ধর্মীয় উন্মাদনা ও আদর্শের উপর প্রবল আস্থার ফলে মুসলমান সমাজের সাহস, দেশপ্রেম স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে সংগঠিত করা সম্ভব হয়নি। বলা যায়, বাংলার সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালির আন্দোলন।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় দিনাজপুর জেলায় আসেন। যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর আহ্বানে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আসেন ডাক্তার আবদুল গফুর এবং কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। দিনাজপুরে এঁদের আসার উদ্দেশ্য বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের পক্ষে প্রতিবাদ করা। দিনাজপুর রেলস্টেশনে সুরেন্দ্রনাথকে বরণ করার জন্য হাজার হাজার লোক আসে, ঠাকুরগাঁ, বালুরঘাট, ও রংপুর থেকে। রেলস্টেশনে সুরেন্দ্রনাথ নামার পর স্থানীয় ছাত্ররা ঘোড়া-গাড়ীর ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরাই টেনে নিয়ে মিছিল সহকারে তাঁকে সভাস্থলে নিয়ে যান। বিশাল জনসভায় তিনি ভাষণে বলেন, ''উই শ্যাল 'আনসেটেল' লর্ড কার্জনের ,'দি সেটেলড্ ফ্যাক্ট'।'' ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দিনাজপুরের ডায়মণ্ড জুবিলী হলে অপর একটি স্বদেশী সভায় আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন ডাক্তার আবদুল গফুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বরদাপ্রসন্ন রায়চোধুরী, ললিতচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং মুকুন্দ নারায়ণ চক্রবর্তী। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জমিদার বিশ্বম্ভর দাস বড়াল। সভার মূললক্ষ্য ছিল বয়কট আন্দোলন ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী জিনিসের উৎপাদন বাড়ানো।[২] ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বিপিন চন্দ্র পাল দিনাজপুর জেলায় আসেন। তিনি রংপুর হতে দিনাজপুরে এসে একটি জনভায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বক্তৃতা দেন। তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য লাঠিধারী একটি ভলান্টিয়ার বাহিনী রেলস্টেশনে যায়। প্রস্তাবিত জাতীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তিনি ভাযণ দেন, ''আমি আসিয়াছি সুপ্ত ব্যাঘ্রকে জাগ্রত করিতে.....।'' সভায় বহু সংখ্যক মহিলাও যোগদান করেন। রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের পর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরেন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। (১৯০৬, ১১ মার্চ)। ওই একই সময়ে দিনাজপুর শহরে ইংরেজি স্কুল বয়কট করে ন্যাশনাল স্কুল স্থাপিত হয়। দিনাজপুর জেলা স্কুলের ১৩ জন ছাত্র স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় ডব্লিউ. কার্লাইলের সার্কুলার অনুযায়ী তাদের বিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া হয়। ওই ১৩ জন ছাত্র নিয়ে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় খোলা হয়। স্কুলের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন জমিদার শরদিন্দু নারায়ণ রায়। পরে বিদ্যালয়টিতে প্রচুর ছাত্র হয়। বিদ্যালয়টিতে প্রথম প্রধান শিক্ষক হন বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক তারকেশ্বর চক্রবর্তীর ভ্রাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। এই বিদ্যালয়ের অপর একজন শিক্ষক ছিলেন রংপুরের অতুল গুপ্ত। যিনি পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী রূপে সুনাম অর্জন করেন এবং সুসাহিত্যিক রূপেও পরিচিত হন। শরদিন্দু নারায়ণ রায় দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্রদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেন এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ সভায় সভাপতিত্ব করেন।[৩]

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের (২৬-২৯ ডিসেম্বর) ডিসেম্বর মাসে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে বাইশতম কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে প্রথম ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়। দিনাজপুর জেলা থেকে বহু সংখ্যক প্রতিনিধি ওই অধিবেশনে যোগদান করেন। পরবর্তী সুরাটে ২৩ তম কংগ্রেস অধিবেশনেও (১৯০৭, ২৬-২৭ ডিসেম্বর) দিনাজপুর থেকে প্রতিনিধি রূপে যোগদান করেন যতীন্দ্র মোহন সেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের ২২ তম সম্মেলনে 'স্বরাজ' বা স্বায়ত্তশাসনকে

আন্দোলনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয় এবং অধিবেশনে বয়কট, বিলাতী দ্রব্য বর্জন, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষার সমর্থনে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। দিনাজপুর জেলাতেও বিলাতী দ্রব্য বর্জন, বয়কট আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় অল ইণ্ডিয়া মসলিম লীগের সূচনা করেন সালিমুল্লা। স্বদেশীযুগে বিচ্ছিন্নতার বীজ উপ্ত হয় এসময়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দিনাজপুর জেলায় রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, ঠাকুরগাঁ বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে বিলাতীদ্রব্য বর্জন প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দিনাজপুর শহরে এইসভায় সভাপতিত্ব করেন পরমেশ্বর দাঁ। দিনাজপুরে বঙ্গচ্ছেদ নীতির প্রতিবাদ সভার অপর একটি উৎসব ওই বছরই উদ্‌যাপিত হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন শরদিন্দু নারায়ণ রায়।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও বামনদাস ভট্টাচার্যের উদ্যোগে গুপ্ত বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী কাজকর্ম (১৯০৮) দিনাজপুর জেলায় প্রবল জোয়ার আনে। দেশপ্রেমিক তরুণেরা অকাতরে ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গাইছেন। মৃত্যুকে তাঁরা আলিঙ্গন করেছেন কখনও লোকচক্ষুর সামনে কখনও অজ্ঞাতে। অগণিত তরুণ দেশসেবায় প্রাণ উৎসর্গ করে বিপদসঙ্কুল বিপ্লবের পথে যাত্রা শুরু করেছেন। এমনিই একটি সময়ে গুপ্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য দিনাজপুরে আসেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রংপুর থেকে আসেন বিপ্লবী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গোপনে এঁরা সমিতির কাজকর্মের সূচনা করেন। এই সময়েই দিনাজপুর শহরে বিখ্যাত 'ল্যাজারাস ব্রাদার্স অ্যাসল্ট কেস'-এর সূচনা হয় (১৯০৮)। দিনাজপুরে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতার জন্য বরিশাল থেকে অশ্বিনীকুমার দত্তকে আনা হয়, তিনি ছিলেন অনুশীলন সমিতির সভ্য এবং দিনাজপুরে সমিতির কাজকর্ম তিনিই পরিচালনা করতেন। স্কুল বন্ধের পর বাড়ি যাওয়ার জন্য দিনাজপুর রেলস্টেশনে ছাত্ররা তাঁদের প্রিয় শিক্ষক অশ্বিনীকুমার দত্তকে ট্রেনে তুলে দিতে আসেন। খুব ভিড় ছিল ট্রেনে, ফলে ছাত্ররা বাধ্য হয়ে তাঁদের শিক্ষককে একটি প্রথম শ্রেণির কামরায় তুলে দেন। তখনকার দিনে ট্রেনে কিছু প্রথম শ্রেণির কামরায় লেখা থাকত 'ফর ইউরোপীয়ানস্ ওনলি।' শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের জন্য। ওই কামরায় ছিল মাত্র দু'জন যাত্রী। দু'জনই ফিরিঙ্গি দুই সহোদর চশমা-ব্যবসায়ী 'ল্যাজারাস ব্রাদার্স'। এরা আপত্তি করেন ও ছাত্রদের সনির্বন্ধ অনুরোধ কর্ণপাত না করে অশ্বিনীকুমার দত্তের সমস্ত জিনিসপত্র লাথি দিয়ে গাড়ী থেকে প্ল্যাটফরমে ফেলে দেন। ন্যাশনাল স্কুলের ছাত্ররা শিক্ষকের এই অপমানে উত্তেজিত হয়ে 'ল্যাজারাস ব্রাদার্স' দুই ভাইকে তাদের জিনিসপত্র সহ প্ল্যাটফরমে নামিয়ে প্রচণ্ড প্রহার করে ও সমস্ত চশমা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। ট্রেন স্টেশন থেকে ছাড়তে দেরী হতে থাকে। অশ্বিনীকুমার দত্তের যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, তিনি আস্তানায় ফিরে আসেন। স্টেশনে দুই সাহেব প্রহৃত হয়েছে এই খবর মুহূর্তের মধ্যে শহরে ছড়িয়ে পড়ে এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি ঘটে সন্ধ্যার কিছু আগে। সঙ্গে সঙ্গে থানা থেকে পুলিস এসে রেলওয়ে প্লাটফরম ও সন্নিহিত এলাকা ঘিরে ফেলে এবং তল্লাসী চালিয়ে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন অশ্বিনীকুমার দত্ত গ্রেপ্তার হন। এই মামলায় অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী যুবকদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার এবং অনুশীলন সমিতির স্রষ্টা প্রমথনাথ মিত্র। বিচারে কিছু যুবক মুক্তি পান ও কয়েকজনের দেড় বছর পর্যন্ত জেল হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন তারাদাস ঘটক, দক্ষিণারঞ্জন বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত ও প্রফুল্ল নিয়োগী।[৭] সাহেব 'পিটুনি'র এ ঘটনা দিনাজপুর জেলার তরুণদের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। এই সময় (১৯০৮) ছাত্র অবস্থায়, পরবর্তীকালের বিখ্যাত নেতা নিশীথনাথ কুণ্ডু অনুশীলন সমিতিতে দীক্ষিত হন।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে 'দিনাজপুর সভা'র বার্ষিক অধিবেশন হয়। সে সময় ভারতের রাজনৈতিক গগন উত্তপ্তময়। বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহের অনুশীলন সমিতি, ব্রতীসমিতি ও সুহৃদ সমিতিকে সরকার বে-আইনি ঘোষণা করে এবং ওই সালেই (১৯০৯, ১২ অক্টোবর) অনুশীলন সমিতিকে সরকার বে-আইনি বলে ঘোষণা করে। বিপ্লবী মদনলাল ধিংড়ার ফাঁসী হয় (১৯০৯, ১৭ আগস্ট) এবং আলিপুর বোমা মামলার রায়ে বারীন্দ্র ঘোষ ও উল্লাস কর দত্তের ফাঁসীর আদেশ হয়। এ রকম রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শরদিন্দু নারায়ণ রায়ের সভাপতিত্বে 'দিনাজপুর সভা'র তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন বসে এবং সেখানে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন, বয়কট ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের কথা বলা হয়। ডাক্তার নিশিকান্ত বসু ও সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা থেকে দিনাজপুরে আসেন এবং সভায় বক্তৃতা করেন। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করে বাংলা আবার অখণ্ড হবে বলে সরকারি ঘোষণা করা হয়। এর সঙ্গে জানানো হয় কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ২৭তম অধিবেশনে (১৯১১, ২৬-২৮ ডিসেম্বর) প্রথম গাওয়া হয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে বাংলার ছোট লাট স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার উত্যক্ত হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। দিনাজপুর জেলার জাতীয় বিদ্যালয় মাঠে ব্যামফিল্ড ফুলার-এর পদত্যাগ উপলক্ষে একটি আনন্দসভা অনুষ্ঠিত হয়। হরিচরণ সেন সভায় সভাপতিত্ব করেন।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরে গুপ্ত বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির নেতৃত্ব দেন কালু রায়। শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস দিনাজপুর জেলা স্কুলের উচ্চ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন (১৯১৪)। ছাত্র থাকাকালীন অনুশীলন সমিতির সভ্য হন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুর জেলায় অনুশীলন সমিতির পরিচালনায় বিপ্লবপন্থী গুপ্ত সমিতির কাজ সক্রিয় থাকে।[৮]

২. স্বদেশী ডাকাতি

বিপ্লবী আন্দোলনের উত্তাল প্রেক্ষাপটে বিবেকানন্দের সহোদর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় শুরু হয় *যুগান্তর* প্রকাশনা (১৯০৬, ১৮মার্চ)। এই পত্রিকাকে ঘিরে একদল তরুণ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গঠনে সচেষ্ট হয়ে উঠেন। পরবর্তী সময়ে 'যুগান্তর' দলভুক্ত বিপ্লবী হিসাবে এঁরা পরিচিত হন। এ সময় বিপ্লবের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক, সরকারি

তোষাখানা ও বিলাসী ধনীদের লুণ্ঠন করে অর্থ সংগ্রহের সূচনা হয়। বাংলায় প্রথম বৈপ্লবিক হত্যার ছক কষা হয় দিনাজপুর সংলগ্ন রংপুরে। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার জন্য বিপ্লবী বারীন ঘোষ ও হেমচন্দ্র কানুনগো ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে প্রথমে শিলং যান। গুয়াহাটিতে তাঁরা শোনেন যে ব্যামফিল্ড ফুলার গুয়াহাটি থেকে রংপুরে যাচ্ছেন। রংপুরের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করে বারীন ঘোষ ফুলার বধের পরিকল্পনা নেন। শেষপর্যন্ত বিপ্লবীদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ব্যামফিল্ড ফুলার রংপুরে না গিয়ে জলপথে গোয়ালন্দ রওনা হন। রংপুরে ফুলার বধের জন্য বিপ্লবীদের কাছে যা টাকা ছিল তা ফুরিয়ে যায়। কলকাতার গুপ্ত সমিতি তখন ডাকাতি করে তাঁদের টাকা সংগ্রহ করে নেবার নির্দেশ দেন।[৬] রংপুর থেকে বার-তের মাইল দূরে এক বিধবার বাড়িতে বৈপ্লবিক ডাকাতি হয়। এই ডাকাতির মূল পরিকল্পনা করেন বিপ্লবী বারীন ঘোষ। এই ডাকাতিই বাংলায় স্বদেশী ডাকাতির প্রথম চেষ্টা (দ্রষ্টব্য ঃ *রাওলাট কমিশন রিপোর্ট*)। অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতির বিপ্লবী কার্যক্রম সচল রাখার জন্য দিনাজপুরে হাল ধরেন প্রমথনাথ মিত্র, ইন্দ্রভূষণ রায়, শচীন্দ্রকুমার সেন, মনোরঞ্জন গুপ্ত, সত্যবাসু, নলিনীগুপ্ত প্রমুখ। রংপুরে গুপ্ত সমিতি এঁদের নির্দেশেই চলত। বিশেষত দিনাজপুরে তরুণ সমাজের এক অংশের মনে দুর্ধর্ষ বিদেশী শাসনের ভয়ভীতি কাটিয়ে জঙ্গি মনোভাব গড়ে ওঠে এঁদের চেষ্টাতেই। দিনাজপুর জেলায় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কালীতলার জ্যোতিষ সেনের বাড়িতে প্রথম যুগান্তর সমিতি গঠিত হয়। যুগান্তর সমিতি গঠন পর্বে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন পরেশ দত্ত, দীনেশ রায়, করালী বিশ্বাস, মৃণাল ঘোষ চৌধুরী, শিবনাথ সমাজদার ও নরেন ঘোষ।[৭] পরবর্তীতে এই দলে যোগ দেন কালীতলার দীনেশ দাস। দিনাজপুর শহরে বিভিন্ন ক্লাব গঠিত হয় রেনুসংঘ (১৯২৭), কালীতলা ইয়ং মেনস এসোশিয়েশন (১৯২৭) ও দিনাজপুর ইয়ং মেনস এসোসিয়েশন (১৯২৯)। বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যরা যুগান্তর অথবা অনুশীলন সমিতির সভ্য হন। এসব ক্লাবের বাছাই কর্মীদের নিয়ে গোপনে ছোরা, রাইফেল ও পিস্তল চালানো এবং গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শেখানোর ট্রেনিং। দিনাজপুর শহরে রাজবাড়ির উত্তর-পশ্চিমে গভীর জঙ্গলে সে সব ট্রেনিং নিতেন নরেন ঘোষ ও দীনেশ দাস। কাঠের নকল ছোরা বানিয়ে ট্রেনিং দিতেন কালীতলার ডাক্তার মনি মৈত্র। এর সঙ্গে রাজনৈতিক ক্লাস নিতেন বরদা চক্রবর্তী, দীনেশ দাস, শরদিন্দু মজুমদার, ঋষিকেশ ভট্টাচার্য, শচীন্দ্র চক্রবর্তী, রাখাল চ্যাটার্জী। এসব রাজনৈতিক ক্লাস বসত কালীতলায় দীনেশ দাস, বড় বন্দরে ঋষিকেশ ভট্টাচার্য, বালুবাড়িতে বরদা চক্রবর্তী এবং রাজবাড়ী পল্লীতে শরদিন্দু মজুমদারের বাড়িতে। টাকা সংগ্রহ, অস্ত্র সংগ্রহ, পার্টির জরুরী কাগজপত্র আনা-নেওয়া গোপনে এসব পরিকল্পনাও চলতে থাকে। বস্তুতপক্ষে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ ও সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পর বিপ্লবী সংগঠনগুলির কাজ হয়ে ওঠে নানাভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ। দিনাজপুরের অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী কর্মী জীতেন মজুমদার, তারাপদ ধর এবং আরও কয়েকজন দিনাজপুর জেলার বিন্নাকুড়িতে স্বদেশী ডাকাতি করেন। দিনাজপুর জেলায় প্রথম স্বদেশী ডাকাতির সূচনা হয়। এই ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত জীতেন মজুমদার ও তারাপদ ধরকে পুলিশ গ্রেপ্তার

করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গঠন করতে না পেরে পুলিশ বি. সি. এল. এ-তে দীর্ঘকালের জন্য আটক রাখেন। যুগান্তর দলের নেতা দীনেশ দাশকে এ সময় পুলিশ ধরেন। কোর্টে হাজিরার দিন তিনি অদ্ভুতভাবে চাবি দিয়ে হাতকড়া খুলে পালিয়ে যান এবং বহুদিন আত্মগোপন করে দলের কাজ করেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর ও বালুরঘাট থেকে ভারত রক্ষা আইনে আটক করে রাজবন্দী অথবা বিভিন্ন স্থানে অন্তরীণ করে রাখা হয় মৃণালকান্তি ঘোষ, করালীকান্ত বিশ্বাস, বিভূতি গুহ, মনোরঞ্জন সেন, সুবোধ সেন, ক্ষেমেশরঞ্জন চ্যাটার্জী, রাজেন চ্যাটার্জী, মন্টু চ্যাটার্জী, প্রতুল সেন, কালীদাস নিয়োগী, বিশ্বরঞ্জন বসু, অমর ঘোষ, শিবু সমাজদার, দীনেশ রায়, নন্দ ঘোষ, গোপালী চ্যাটার্জী, মটর পাঠক, শচীন্দু চক্রবর্তী, অনিল রায়, সুচারু রায়, অমিয় ভট্টাচায্য, পরেশ দত্ত প্রভৃতি বহু বিপ্লবী। এই সময় দিনাজপুর ফৌজদারি কোর্টে এক জোতদার মামলা করে ফেরার সময় কালীতলার পরেই তার বন্দুকটি ছিনতাই হয়। এই কেসে পুলিশ নন্দ ঘোষ ও তাঁর পিতা সত্তরবছর বয়স্ক বসন্ত ঘোষকে আটক করেন। পুলিশ বন্দুকটি না পাওয়ায় এবং কোনও স্বীকারোক্তি না পাওয়ায় মামলা হয় না। নন্দ ঘোষ শেষে বি. সি. এল. এ-তে আটক হন। বালুরঘাটে গ্রেপ্তার হন নৃপতি চ্যাটার্জী, ধীরেন ব্যানার্জী, ফটিক ব্যানার্জী, ফাল্গুনী মিত্র সহ অনেকেই। কিছুদিনের জন্য বিনা বিচারে আটক হন কমলেন্দু চক্রবর্তী, সুরেশরঞ্জন চ্যাটার্জী, সরোজরঞ্জন চ্যাটার্জী ও নলিনী অধিকারী। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য ডাক্তার সুশীলরঞ্জন চ্যাটার্জী, রমাকান্ত সমাজদার, সুরেন বাগচী, মেদিনী সরকার ও হরেন দে সরকার গ্রেপ্তার হন।[৮]

এ রকম প্রেক্ষাপটে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ও ২৮ অক্টোবর দিনাজপুর জেলার অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী সদস্যরা হিলি রেল স্টেশনে দার্জিলিং মেল ট্রেনের মেলব্যাগ ডাকাতি করেন। বিপ্লবী দলের পক্ষে কাজকর্ম পরিচালনা ও বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় বিশাল পরিমাণ অর্থের। আর্থিক প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ করার জন্য দিনাজপুর জেলার বিপ্লবীদের নিতে হয় একাধিক ডাকাতি করার পরিকল্পনা। দিনাজপুর জেলার অনুশীলন সমিতির সে সময় পরিচালক ছিলেন (১৯৩৩) প্রফুল্ল নারায়ণ সান্যাল এবং দিনাজপুর শহরের দায়িত্বে ছিলেন সরোজ কুমার বসু। এই দলে সে সময় সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, সত্যব্রত চক্রবর্তী, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, হরিপদ বসু, কালীপদ সরকার, অশোকরঞ্জন ঘোষ, শশধর সরকার, লালু পানডে এবং আরও অনেকে। এইসব বিপ্লবীরা কলকাতা অনুশীলন সমিতির অধীনে দিনাজপুর বিপ্লবী শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হিলি স্টেশনে মেলব্যাগ ডাকাতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, সত্যব্রত চক্রবর্তী, সরোজকুমার বসু, অশোকরঞ্জন ঘোষ, হরিপদ বসু, প্রফুল্ল নারায়ণ সান্যাল, শশধর সরকার, কালীপদ সরকার, লালু পানডে, ডাক্তার আবদুল কাদের চৌধুরী, কিরণচন্দ্র দে, রামকৃষ্ণ সরকার (মণ্ডল), বিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও সুবোধ দত্ত। ১৫ জন বিপ্লবীর মধ্যে ১৩ জন গ্রেপ্তার হন। অভিযুক্ত আসামীর মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও সুবোধ দত্তকে পুলিশ ধরতে পারেনি। অভিযুক্ত ১৩ জন আসামীর মধ্যে অশোকরঞ্জন ঘোষ, লালু পাণ্ডে, শশধর সরকার ধরা পড়ার পরেই পুলিশের কাছে অনেক তথ্য ফাঁস করে

দেয় এবং দিনাজপুর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি করেন (১৯৩৩, ৫ নভেম্বর) এবং রাজসাক্ষী হন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের ঘোষিত প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, সত্যব্রত চক্রবর্তী, সরোজ কুমার বসু, হরিপদ বসু, প্রফুল্ল নারায়ণ সান্যাল, কালীপদ সরকার ও রামকৃষ্ণ সরকারকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৬ এবং ৩৯৫/১২০ বি ধারায় দোষী সাব্যস্ত হন। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, সত্যব্রত চক্রবর্তী, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য এবং সরোজকুমার বসুর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। কালীপদ সরকার, রামকৃষ্ণ সরকার এবং হরিপদ বসুকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। প্রফুল্ল নারায়ণ সান্যাল, আবদুল কাদের চৌধুরী এবং কিরণ দেকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি/৩৯৬ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। রাজসাক্ষী তিন জন ভারতীয় পেনাল কোডের ১২০বি/ ৩৯৫ / ৩৯৬ ধারামতে দোষী সাব্যস্ত হয় এবং স্পেশাল ট্রাইবুনাল তাঁদের তিন জনকেই দুই কিস্তিতে ৫ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। চারজন অভিযুক্ত আসামীর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়ার পর স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল সেই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হাইকোর্টে অনুমোদনের জন্য মামলার নথিপত্র এবং রায়ের নকল সমেত সবকিছু কলকাতা হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেন। চারজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী সহ ১০ জন দণ্ডিত আসামীই স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আপীল দায়ের করেন। হাইকোর্টের আপীলে মৃত্যুদণ্ডের আসামীদের ফাঁসীর হুকুম মুকুব হয়। চারজন ফাঁসীর আসামীর মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্যের যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং সত্যব্রত চক্রবর্তী ও সরোজ বসুর দশবছর করে জেল হয়। তাঁদের সবাইকে আন্দামান সেলুলার জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজসাক্ষী তিনজন এবং কালীপদ সরকার আটক থাকেন বহরমপুর ও অন্যান্য কারাগারে।

এই কেসে অভিযুক্তদের বিচার করবার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল সরকারের এক আদেশবলে গঠিত হয়। বিচারকদের মধ্যে ছিলেন রাজশাহীর জেলা ও সেসন জজ মিষ্টার ই. এস. সিম্পসন, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও সেসন জজ মিষ্টার বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায় এবং বগুড়ার সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী ইমদাদ আলি। কলকাতা হাইকোর্টে তিন জন বিচারপতিকে নিয়ে যে স্পেশাল বেঞ্চ গঠন করা হয়, সেই স্পেশাল বেঞ্চের বিচারপতিদের মধ্যে ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জী, জাস্টিস প্যাটারসন এবং জাস্টিস মন্মথ গুহ। আসামী পক্ষের মামলা পরিচালনা করেন যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ও নিশীথনাথ কুণ্ডু। অন্যান্য যে সব আইনজীবী এই মামলায় সাহায্য করেন তাঁরা হলেন যোগেশ দত্ত, আশু গুহ, বিজয় মিত্র ও জিবীত দাস। স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচার চলার সময় অভিযুক্তদের আদালতে এনে দুটি লোহার খাঁচায় রাখা হত। একটিতে রাখা হত তিনজন রাজসাক্ষীকে অপরটিতে বাকী দশজনকে। এই মামলায় যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী এবং নিশীথনাথ কুণ্ডু অন্য কোনও কোর্টে তিনমাস কাল কোন মামলা করতে পারেন নাই। কারণ দশটায় স্পেশাল কোর্ট বসত, বেলা পাঁচটায় শেষ হত। প্রতিদিন তাঁরা সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে এই মামলা পরিচালনা করতেন।[৯]

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর হিলি স্টেশনে মেলব্যাগ ডাকাতির উদ্দেশ্যে

বিপ্লবী দলের ডাকাতিতে সেদিনের কমান্ডার প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং সহ কমাণ্ডার হৃষিকেশ ভট্টাচার্য হিলি রেল স্টেশনে উপস্থিত হন, ২৮শে অক্টোবর শীতের রাত। রাত ২টো ১৭ মিনিটে আপ দার্জিলিং মেল স্টেশনে ডাকবিভাগের মেল ব্যাগগুলি নামিয়ে দিয়ে ও যাত্রী নিয়ে নির্দ্দিষ্ট সময় ছেড়ে যায়। ডাকবিভগের কর্মীরা সেগুলি স্টেশন ঘরের বারান্দায় রক্ষিত তালাবন্ধ বড় কাঠের বাক্সে ভরে তালা দিয়ে দেয়। কালীচরণ মাহালী ও জিতেন্দ্রকুমার দে নামে দু'জন ডাকপিওনের উপর বাক্সটি পাহারার দায়িত্ব ছিল। মেলপিওন কালীচরণ ও জীতেন্দ্র ঘুমিয়ে পড়লে বন্দুকধারীরা গুলি ছুঁড়ে সঙ্কেত দেওয়া মাত্রই অভিযান-দল আক্রমণ চালান। কয়েকজন অভিযানকারী মেলচেষ্টের সামনে গিয়ে কালীচরণকে ঘুম থেকে টেনে তোলে এবং তার কাছে মেলচেষ্টের চাবি চাওয়া হয়। কালীচরণ চাবি দিতে অস্বীকার করে এবং তার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়। কোনক্রমে আক্রমণকারীদের হাত ছাড়িয়ে কালীচরণ বাইরের গেট লক্ষ্য করে চিৎকার করতে করতে দৌড়তে থাকে। তার গলা থেকে চীৎকারের আওয়াজে ভেসে আসে — মহারানি ভিক্টোরিয়ার টাকা লুঠ হচ্ছে, শহরবাসী জাগো। প্লাটফরমের প্রবেশপথে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দাড়িয়ে পাহারা দেয় ডাকালদলের একজন বিপ্লবী সদস্য। কালীচরণকে চীৎকার করে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখে স্টেশনের প্রবেশপথের সামনে তাকে গুলিবিদ্ধ করে। গুলি লাগা অপবস্থায় দৌড়াবার চেষ্টা করতেই ফুট চল্লিশেক দূরে গিয়ে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়।

অন্যদিকে মেলচেষ্টের উপর ঘুমিয়ে থাকা কালীচরণের সহকর্মী জিতেন্দ্রকে ঘুম থেকে তুলে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী তার বুকে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে চাবি দিয়ে বাক্স খুলতে বলে। জীতেন্দ্রও চাবি দিতে অস্বীকার করায় তাকে মারধর করে লাথি মেরে স্টেশন মাষ্টারের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। মেলচেষ্টের চাবি কেড়ে নেওয়া হয় জীতেন্দ্রর কাছ থেকে। সতীশ সেখ নামে অপর একজন কুলিকে ঘুম থেকে তুলে লোহার রড দিয়ে আক্রমণ করা হয়। লোহার রডের আঘাতে আহত হয়ে সতীশ পড়ে থাকে যাত্রী ছাউনিতে। আক্রমণকারীরা সরে যেতে সতীশ পালিয়ে যেতে চেষ্টা করায় তাকে লক্ষ্যকরে গুলি করে।পায়ে গুলি লাগায় সে মাটিতে পড়ে যায়। পাঁচু বিশ্বাস নামে অপর একজন কুলিকে বেদম মার দিয়ে যাত্রী ছাউনির তলায় ফেলে রাখে প্ল্যাটফরমের উপর। এসময় হারিজুদ্দিন মণ্ডল ও ইসমাইল সেখ দু'জন কুলিও আহত হয়। যদু বংশী সিং নামে এক রেলওয়ে মেকানিক গুলির একটি টুকরো চোখে লেগে আঘাত পান। হিলিতে স্টেশন মাস্টার ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বসু। সহকারী স্টেশন মাস্টার ছিলেন দু'জন, সুধন্য কুমার চক্রবর্তী ও সতীশচন্দ্র দে। ঘটনার সময় স্টেশনে কর্তব্যরত ছিলেন সতীশচন্দ্র দে। সহকারী স্টেশন মাস্টার সতীশচন্দ্র দে অপারেশন শুরু হওয়ামাত্র পালিয়ে একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন। স্টেশন মাস্টারকে রাতের প্রহরী স্টেশনে ডাকাতির খবর দেয়। তিনি বাইরে এসে দেখেন স্টেশনে হৈ চৈ ও ইলেকট্রিক টর্চের আলো পড়ছে। স্টেশন মাস্টার অবস্থা অনুমান করে নিজের বন্দুকটি সঙ্গে নিয়ে স্টেশনের দিকে যান। তিনি স্টেশনের কাছে পৌছেই আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করে নিজের বন্দুক থেকে তিন রাউন্ড গুলি ছোঁড়েন। প্রত্যুত্তরে চার-পাঁচটি গুলি প্ল্যাটফর্মের দিক থেকে স্টেশন মাস্টারকে

লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়। ভাগ্যক্রমে স্টেশন মাস্টারের দেহে গুলির আঘাত না লেগে গুলি ছিটকে পড়ে সহকারী স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারের দেয়ালে।

আক্রমণকারী বিপ্লবী ডাকাতরা ইতিমধ্যে মেলচেষ্ট ভেঙে ফেলে। মেলব্যাগ ও অন্যান্য জিনিসপত্র বার করে ফেলে মেলচেষ্ট থেকে। স্টেশনের টিকিট ঘরের ও অফিস ঘরের আলমারীগুলিও ভেঙে ফেলা হয়। টাকা-পয়সা ভর্ত্তি লোহার সিন্দুকটি সারিয়ে ফেলা হয়। রেলস্টেশন থেকে অন্যান্য স্টেশনের যে সব যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল তাও তছনছ করে দেওয়া হয়। নগদ ৪ হাজার ৬ শো ২৪ টাকা এবং মেলব্যাগের অন্যন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আক্রমণকারী বিপ্লবী ডাকাতরা হিলি স্টেশন ত্যাগ করেন এবং চড়কাইয়ের দিকে যাত্রা শুরু করেন। অভিযানকারী স্বদেশী ডাকাতরা স্টেশন ছেড়ে যাবার কিছু পরে স্টেশন মাস্টার সুরেন বসু ও সহকারী স্টেশন মাস্টার সুধন্য চক্রবর্তী স্টেশনে আসেন। আশপাশ থেকে ছুটে আসা কৌতুহলী জনতার ভিড় বাড়ে সেখানে। আহত অচেতন কালীচরণকে স্টেশনে আনা হয়। চিকিৎসার জন্য ডাক্তার গোঁসাইপদ কুণ্ডুকে আনলে তিনি তাকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠাতে বলেন। স্টেশন মাস্টারের টেলিফোনটি অকেজো না হওয়ায় সেই টেলিফোন মারফৎ পাক্‌সি কণ্ট্রোল অফিসে ঘটনা জানানো হয় এবং সে খবর সান্তাহার ও পার্ব্বতীপুর সরকারি রেল পুলিশ, পাঁচবিবি, জয়পুর হাট, চরকাই ও ফুলবাড়ি স্টেশন মাস্টার এবং পাঁচবিবি, জয়পুর হাট ও ফুলবাড়ি থানায় জানিয়ে দেয়। কালীচরণ সহ ঘটনার রাতে হিলি স্টেশন চত্বরে ৬ জন কুলি আহত হয় ডাকাতদের হাতে। ২৮শে অক্টোবর ভোরের দিকে আহতদের ট্রেনে করে পার্বতীপুর রেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পার্ব্বতীপুর থেকে রেলপুলিশের সাব ইন্সপেক্টর ইমাদ হোসেন সকালে হিলি পৌঁছায়। অন্যদিকে ভোর ৪টায় ফুলবাড়ি থানায় হিলি স্টেশনে ডাকাতির খবর পাওয়ার পর রামসিংহাসন সিং ও ঠাকুর সিং নামে ওই থানায় দুই কনস্টেবল কয়েকটি গ্রাম অনুসন্ধান করে ডাকাত দলের সন্ধান না পেয়ে ঘণ্টা তিনেক পরই আবার ফুলবাড়ি স্টেশনে ফিরে আসে। ফুলবাড়ি স্টেশনে একটি মালগাড়ি দাড়িয়েছিল। মাল গাড়িটি চরকাই থেকে হিলির দিকে যাবে। সঙ্গে একটি সাইকেল সহ রামসিংহাসন ও ঠাকুর সিং দু'জনই গার্ডের কামরায় উঠে পড়ে। মালগাড়ি চরকাই স্টেশনে থামলে গার্ড সহকারী স্টেশন মাস্টারের ঘরে গিয়ে শোনেন সন্দেহভাজন একদল লোক বিরামপুর ঘাটের দিকে গিয়েছে। রামসিংহাসন গার্ডের মুখে সন্দেহভাজন দলের কথা শুনে গাড়ি থামিয়ে সাইকেল সহ নেমে পড়ে এবং পুলিশের পোষাক বদলে সাধারণ পোষাক পরে সাইকেলে রওনা হয় বিরামপুর ঘাটের দিকে। বিপ্লবী দল ইতিমধ্যে বিরামপুর ঘাট পার হয়ে চিন্তামন জমিদার বাড়ি পেরিয়ে একটি মহিষের গাড়ি ভাড়া করে চৌকিয়া পাড়া পর্যন্ত গিয়ে গাড়োয়ান আর যেতে রাজী হয় না। ফলে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে সেখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁরা বিশ্রাম করেন। রামসিংহাসন তাঁদের খোঁজ করতে গিয়ে ওই স্কুলে দেখতে পায়। গুলমহম্মদ ও যদুয়া একজন দফাদার ও চৌকিদ্দার পথে তার সঙ্গী হয়। ওই প্রাইমারী স্কুলের কাছে কামুয়া নামে অপর এক চৌকিদ্দারের বাড়িতে রামসিংহাসন প্রবেশ করে সেখান থেকে দলটিকে দেখতে থাকে এবং তারা ডাকাত কিনা তা নিশ্চিত হবার জন্য

কামুয়া চৌকিদারকে স্কুলে পাঠায়। রামসিংহাসনের গতিবিধি ইতিমধ্যে দলনেতা প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর নজরে পড়ে যায় এবং পুলিশের লোক বলে তাকে সন্দেহ করে। দলনেতা প্রাণকৃষ্ণ তাকে মেরে ফেলার জন্য সহকর্মীদের আবেদন জানায়। বিপ্লবীরা তখন তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। রামসিংহাসন নিজেকে পাটের দালাল বলে পরিচয় দেন (মতান্তরে, চৌকিদার কামুয়ার কাছে দলনেতা প্রাণকৃষ্ণ রামসিংহাসনের পরিচয় জানতে চান। কামুয়া জানায় সে একজন পাটের ফড়িয়া)। ওই সময় দলের সহকর্মী অশোক ঘোষ বলেন, 'ও পুলিশের লোক নয়, ওকে মারার কোনও দরকার নেই।' বিপ্লবীরা পুনরায় সমজিয়ার পথে রওনা হয়। রামসিংহাসন যদুয়া চৌকিদারকে চিন্তামন কাছারির নায়েবের কাছে পাঠান যেন ফুলবাড়ি থানায় দ্রুত খবর দেন এবং দিনাজপুরে টেলিগ্রাম করে ডাকাত দল ধরার জন্য সমজিয়াতে সশস্ত্র পুলিশ পাঠান। এ ব্যবস্থা করে রামসিংহাসন সাইকেলে আগেই সমজিয়া পৌঁছে জমিদার ক্ষিতীশ চন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করে জানায় যে ৭ জনের একটি ডাকাত দল সমজিয়ার দিকে আসছে, তাদের আটক করার ব্যবস্থা নেবার কথা বলেন। জমিদার ক্ষিতীশ চন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ-ষাট জন লোক জোগাড় করে তাঁর কাছারিতে রেখে দেন। সমজিয়াতে ফেরী নৌকায় আত্রাই নদী পার হওয়ার সময় বিপ্লবীদের ধরার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ফেরী ঘাটের ইজারাদারকে আগে থেকেই নির্দেশ দেওয়া হয়। ঘাটে পৌঁছে বিপ্লবীদের কেউ কেউ নৌকায় উঠে পরে বাকীরা জিনিসপত্র তোলে। রামসিংহাসন ও রহমান চুড়িওয়ালা নামে স্বাস্থ্যবান এক ব্যক্তিও নৌকায় উঠে পড়ে। খেয়াপারের ইজারাদার নদী পারাপারের পয়সা নদীর পাড়ে মাচানে জমা দেওয়ার কথা বলে। দলের সহ নেতা হৃষিকেশ ভট্টাচার্য মাচানে পয়সা জমা দিতে গিয়ে সেখানে অনেক লোক দেখতে পেয়ে তাঁর সন্দেহ হয় এবং পয়সা ফেলে দিয়ে ছুটে এসে সবাইকে নৌকা থেকে নামতে বলেন। নৌকায় বসে থাকা স্বাস্থ্যবান সেই রহমান চুড়িওয়ালা দলনেতা প্রাণকৃষ্ণকে জাপটে ধরে, অপর একজন তাঁকে রশি দিয়ে বেধে ফেলার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ লড়াই করে প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির মধ্যে নিজেকে মুক্ত করে প্রাণকৃষ্ণ আত্রাই নদীতে ঝাপিয়ে পড়েন। তাঁকে ধরার জন্য কয়েক ব্যক্তি ছুটে গেলে ডুব সাঁতার দিয়ে তিনি বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হন। সেখানে অনেক লোক তাঁকে ঘিরে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে থাকে, তবু লড়াই চালিয়ে যান এবং শেষে প্রচণ্ড লাঠির আঘাতে গুরুতর জখম হয়ে মাটিতে পড়ে যান। সকলেই প্রচণ্ড লড়াই করে ধরা পড়ে। বন্দী ৭ জনকেই কাছারি বাড়িতে আটক করে রাখা হয় এবং অভিযানকারীদের সব অস্ত্রশস্ত্র ও লুণ্ঠিত জিনিসপত্র একটি বস্তায় পুরে কাছারি বাড়িতে এনে রাখা হয়।[১০]

হিলি স্টেশনে মেলব্যাগ ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবীরা ধরা পড়ার পর দিনাজপুর, বগুড়া ও রাজশাহী জেলার অনুশীলন সমিতির বহু সদস্য গ্রেপ্তার হন। পুলিশি অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলতে থাকে ভীষণভাবে। হিলি, বিরামপুর, পাঁচবিবি, চরকাই, বালুরঘাট এই জায়গাগুলি ছিল বিপ্লবীদের মূলঘাঁটি। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মাধবচন্দ্র রায়, কিরণচন্দ্র দে, গৌরমোহন পাল, রাখালচন্দ্র পাল, কালীপদ সাহা, ফাল্গুনী মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ কুমার রায়, অমিয় সান্যাল, পারুল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি

বিখ্যাত বিপ্লবীরা এই সব এলাকায় থাকতেন এবং এঁদের সহায়তায় বহু বিখ্যাত গুপ্ত বিপ্লবী আত্মগোপন করে সমিতির কাজ চালাতেন। পাঁচবিবিতে আবদুল কাদের চৌধুরী বিপ্লবীদের গোপন আস্তানার জন্য একটি ঘরভাড়া করেছিলেন। দিনাজপুর শহরে বিপ্লবী যুবকদের গোপন ডেরা ছিল এসব অঞ্চল। হিলি মেলব্যাগ ডাকাতির পর অন্যান্য যাঁরা ধরা পড়েন তাঁদের মধ্যে গৌরমোহন পাল, রাখালচন্দ্র পাল, কালীপদ সাহা, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মাধবচন্দ্র রায়, রঘুবর সাহা, কৃষ্ণচন্দ্র মৈত্র, কুলদাকান্ত চক্রবর্তী, মণীন্দ্রনাথ সরকার, ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন রায়চৌধুরী, অমিয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বরদাভূষণ চক্রবর্তী, সুশীলকুমার আচার্য, বিদ্যুৎকুমার রায়, কৃষ্ণসুন্দর গোস্বামী, তারকনাথ দাস, বীরেশ্বর গাঙ্গুলি, অজিত বসু, নির্মল চক্রবর্তী প্রভৃতি। এই ঘটনা সমগ্র বঙ্গদেশে চাঞ্চল্য ও আলোড়ন সৃষ্টি করে। একদিকে সরকার পক্ষ এ ঘটনাকে আন্তপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের অংশ ভেবে নিয়ে এই ডাকাতির পেছনে যে সংগঠন রয়েছে তার মূল ধরে টান দিতে সচেষ্ট হয়।

দিনাজপুরে এ রকম প্রেক্ষাপটে আরও অনেকগুলি বিপ্লবী ঘটনা ঘটে। দিনাজপুর শহরে সন্তোষকুমার চক্রবর্তীর বাড়ি তল্লাসি করে লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি বন্দুক পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে (১৯৩৪, ২ জানুয়ারি)। এই তল্লাসীতে দারোগা ছিলেন দিনাজপুর কোতয়ালী থানার দারোগা রাজেন বালো। দিনাজপুর শহরে থানার কাছেই মুকুন্দ কর্মকারের সোনারূপার দোকান ছিল। যুগান্তর দলের নেতা বিমল চ্যাটার্জী, শেখর গাঙ্গুলী ও আরও কয়েকজন সন্ধ্যায় মোখা পড়ে রিভলভার মুখে দেখিয়ে ডাকাতি করেন (১৯৩৪)। ডাকাতি করার সময় ভোলা ভট্টাচার্য ও আরও কয়েকজন পাহারায় ছিলেন। পুলিশ এ ঘটনায় কারও হদিশ করতে পারে নাই। এ সময় (১৯৩৪) দিনাজপুর রেলস্টেশনের কাছে ডিস্ট্রীক-বোর্ডের ইঞ্জিনীয়ার যামিনী সেনগুপ্তের বাড়ীর দোতালার ঘর থেকে রহস্যজনক ভাবে তাঁর একটি বন্দুক চুরি হয়। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও বন্দুকটি উদ্ধার করতে পারে নাই। এসময় আরও একটি বন্দুক চুরি হয়। এই বন্দুকটি চুরি হয় দারোগা জীতেন মুখার্জীর। পাহাড়পুরের (দিনাজপুর শহর) ক্ষেমেশরঞ্জন চ্যাটার্জীর বাড়ি থেকে এটি চুরি হয়। জীতেন মুখার্জী সম্পর্কে ছিলেন ক্ষেমেশরঞ্জনের ভগ্নিপতি। ভূপেন সেনগুপ্ত, রতন সেনগুপ্ত, শেখর গাঙ্গুলী, বিমল চ্যাটার্জী, এ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পুলিশ তাঁদের ধরতে পারে নাই। বিমলরঞ্জন চ্যাটার্জী শেষ পর্যন্ত দারোগা জীতেন মুখার্জীর রিভলবারটি বিপ্লবীদের কাছে যথাস্থানে রেখে দিয়ে আত্মগোপন করেন। অনেকদিন পর ধরা পড়েন এবং পুলিশ তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন করা সত্ত্বেও রিভলবারটির কোনও হদিশ পায়নি। এসব কাজ সংগঠিত হয় দিনাজপুর জেলার যুগান্তর সমিতির নেতা মনোরঞ্জন সেন এবং শিবু সমাজদারের নির্দেশ ও পরিকল্পনায়।[১১]

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে দিনাজপুর জেলায় ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে যুগান্তর সমিতির তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। যুগান্তর দলের নেতৃত্ব অর্থসংগ্রহ, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং জরুরী কাগজপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র আনা-নেওয়ার বিষয়ে দলকে তিনভাগে ভাগ করেন। অর্থসংগ্রহের জন্য দায়িত্বে ছিলেন বালুরঘাট মহকুমার যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা। সমর সরকার, ননীগোপল দাসমহন্ত, রমেন সমাজদার, অনাথবন্ধু সাহা, উপেন মণ্ডল, হরেন দাস,

হরেন বৈরাগী, গোবিন্দ ঘোষ, মুরারি আগরওয়ালা এবং দিনাজপুর সদরে ছিলেন দীনেশ দাস ও নরেন ঘোষ। দলের অর্থসংগ্রহের জন্য এঁদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য দিনাজপুর শহরের ক্ষেমেশ চ্যাটার্জী, নরেন ঘোষ ও দীনেশ দাস, এই তিন জনের উপর দায়িত্বভার দেওয়া হয়। জরুরী কাগজপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র আনা-নেওয়ার জন্য দায়িত্ব পড়ে শেখ গমীরউদ্দিন সরকার, অবনী সরকার, রণেন পোদ্দার-এর উপর। লুঙ্গী বা পাজামা পরা মুসলমান যুবকদের সে সময় পুলিশ বিশেষ সার্চ করত না। ফলে অস্ত্র আনা নেওয়ার বিষয়ে বেশির ভাগ দায়িত্বই ছিল শেখ গমীরউদ্দীন সরকারের উপর। সমিতির পরিচালনায় অর্থসংগ্রহের কাজটিই জোরদার হয়ে ওঠে। সরকারি তহবিল যেমন, ট্রেজারী লুঠ, মেল লুঠ, সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি। হিলি স্টেশনে মেলব্যাগ ডাকাতির পর এ সব বিষয়ের উপর কঠিন ও কঠোর ব্যবস্থা নেন। তখন যুগান্তর দলের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দলের বিরুদ্ধে কারা সক্রিয়? পুলিশের সঙ্গে কোন্ কোন্ জমিদার সহযোগিতা করছে? সে সব বাড়িতে ডাকাতির ব্যবস্থা করা। এ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেই যুগান্তর দলের সদস্যরা স্বদেশী ডাকাতি শুরু করেন। এরই ফলে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে নরেন ঘোষ, দীনেশ দাস, নিত্যরঞ্জন চৌধুরী; উপেন মণ্ডল, কুমুদিনী ঘোষ, রমেন সমাজদার ও রজনী সরকার, মোট ১২ থেকে ১৪ জনের একটি দল পোর্শা থানার তিলনী গ্রামে প্রেমচন্দ্র দাসের বাড়ীতে ডাকাতি করেন। দলনেতা ছিলেন নরেন ঘোষ। প্রেমচন্দ্র দাসের বাড়িতে ডাকাতি করে কিছু সোনার অলংকার পাওয়া যায়। ওই অলংকার বিক্রী করে সংগৃহীত টাকায় অস্ত্রশস্ত্র ও সমিতির বিভিন্ন কাজকর্ম চালানো সম্ভব নয় বলে আরও অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিপ্লবীরা আরও একটি বড় ধরনের পরিকল্পনা নেন। বালুরঘাট থানার অধীনে বোল্লা গ্রামে উমেশচন্দ্র কর্মকারের বাড়িতে প্রথমে ডাকাতির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বিপ্লবীদের মধ্যে একজন জানায় যে উমেশ কর্মকারের বাড়িতে বড়বড় যে লোহার সিন্দুক আছে, ওই সিন্দুকের লোহার জয়েন্ট গলানোর স্টোভ সঙ্গে নেই তখন উমেশচন্দ্র কর্মকারের বাড়িতে ডাকাতি না করে প্রাণবন্ধু চৌধুরীর বাড়িতে ডাকাতি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের শেষের দিকে হরেন দাস, হরেন বৈরাগী, ব্রজমোহন সরকার, ননীগোপাল দাসমহন্ত, অনাথবন্ধু সাহা, সমর সরকার এবং দলনেতা নরেন ঘোষের পরিচালনায় বোল্লা গ্রামে প্রাণবন্ধু চৌধুরীর বাড়িতে ডাকাতি হয়। ডাকাতির সময় প্রাণবন্ধুর বড় পুত্র প্রফুল্ল চৌধুরী ননীদাসকে চিনে ফেলে। কারণ, পতিরাম ইস্কুলে প্রায় প্রতিদিনই সে দেখতো। ননীগোপালদাস মহন্ত তখন পতিরাম স্কুলের ছাত্র ছিল। তাছাড়া, ডাকাতির সময় প্রাণবন্ধুর বড় ছেলে একজন বড় বড় চুলওয়ালা লম্বা স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিকেও দেখেছে। পুলিশ পতিরামে ননী দাসকে প্রথমে ধরে এবং পরে সবাই ধরা পড়ে যান। সমর সরকার, অনাথবন্ধু সাহা, শেখ গমীরউদ্দিন সরকার, গোবিন্দ ঘোষ, কেষ্টদাস মহন্ত, ব্রজমোহন সরকার, হরেন বৈরাগী, অনিল বিশ্বাস, অক্ষয় চৌধুরী, হরেন দাস, উপেন মণ্ডল। তিলনী ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবীদেরও পুলিশ এই সময় ধরে। এঁদের মধ্যে ছিলেন রমেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী, রজনীকান্ত সরকার, রামবল্লভ মজুমদার, নরেন দাস, কুমুদিনী ঘোষ ও

নিত্যরঞ্জন চৌধুরী। প্রত্যেকেরই ১০ বছর অথবা ৬ বছর করে জেল হয়। এঁদের মধ্যে আন্দামান বন্দী নিবাসে যান তিলনী স্বদেশী ডাকাতি কেসে রমেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী, রজনীকান্ত সরকার, রামবল্লভ মজুমদার, নরেন দাস, কুমুদিনী ঘোষ ও নিত্যরঞ্জন চৌধুরী। বোল্লা কেসে ধরা পড়ে আন্দামান বন্দী নিবাসে যান ননীদাস মহন্ত, শেখগমীর উদ্দিন সরকার, অনাথ বন্ধু সাহা, হরেন দাস, অক্ষয় চৌধুরী ও উপেন মণ্ডল। বোল্লা কেসে ধরা পড়ে নি অথচ ছিলেন, এঁরা হলেন দুইজন আদিবাসী যুবক মাতলা সরেন ও পারু হাঁসদা। বোল্লা কেসে প্রত্যেকেরই ১০ বছর করে জেল হয়। একমাত্র শেখ গমীরউদ্দিন সরকারের ৬ বছর জেল হয়। সমর সরকার রাজসাক্ষী হয়ে ঢাকা জেলে ৬ বছর থাকেন। গোবিন্দ ঘোষ ও মুরারি আগরওয়ালা এই দুই জনের বিরুদ্ধে কোনও কেস না থাকায় স্বদেশী হিসাবে এঁরা থানা ইনটারন ও হোম ইনটারনে বন্দী থাকেন। তিলনী কেসে নির্দ্দিষ্ট কোনও প্রমাণ না থাকায় বানেশ্বর বমর্ণ নামে পুলিশের এক দুর্ধষ কর্মী রাস্তা দিয়ে চলার সময় দু'জন নিরীহ ব্যক্তিকে জোর করে ধরে এনে সাক্ষীদাতা বানান। এরা হলেন দাড়ালের রামরঞ্জন ঘোষ ও ভিখাহারের গদাধর নাগ। এই কেসে নিত্যরঞ্জন চৌধুরী ও কুমুদিনী ঘোষের ১০ বছর এবং বাকী কয়েকজনের ৬ বছর করে জেল হয়। এই কেসে আসামী পক্ষের উকিল ছিলেন যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, নিশীথ কুণ্ড ও যোগেশ দত্ত।[১২] দিনাজপুর জেলায় যুগান্তর সমিতির গুপ্ত বিপ্লবীদের দ্বারা মোট ৬টি ডাকাতির ঘটনা ঘটে। দিনাজপুর শহরে তিনটি, রানিশংকৈলে একটি এবং বালুরঘাট থানার অধীনে দুইটি।

৩. অসহযোগ আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের রেশ কাটতে না কাটতেই ইউরোপের সর্বত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। ব্রিটিশ শাসকের স্বার্থে ভারতবাসী সে যুদ্ধে যোগান করে প্রচুর অর্থ ও অজস্র রক্ত দান করে। যুদ্ধের অবসানে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর পূর্ব প্রতিশ্রুতির কোন মর্যাদা না দিয়ে মাথায় খড়্গ ধরেন। রাওলাট বিলের প্রতিবাদে গান্ধিজি প্রথম সত্যাগ্রহ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন (১৯১৯, ৪ মার্চ)। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ রাওলাট বিলের প্রতিবাদে তিনি ২৪ ঘণ্টা অনশন করেন এবং গান্ধিজির আহ্বানে সারা দেশে হরতাল পালন করা হয় (৬ই এপ্রিল)। আমেদাবাদে রাওলাট বিলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ শুরু হয়। গান্ধিজির নেতৃত্বে বহু সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছায় কারাবাস বরণ করেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল অমৃতসর শহরের পূর্ব দিকে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামে এক বাগানে শাসকবর্গের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে প্রায় দশ হাজার লোক জমায়েত হয়। জেনারেল ও. ডায়ারের নির্দেশে সেনাবাহিনী দশমিনিট ধরে জমায়েতে নিরীহ জনতার উদ্দেশ্যে গুলি চালায়। এর ফলে ৩৭৯ জন নিহত হয় এবং ১২০০ লোক আহত হয় (সরকারি মতে)। জালিয়ানওয়ালাবাগের পাশবিক হত্যাকাণ্ড ভারতবর্ষের মানুষকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে তোলে। ব্রিটিশ শাসকের কোনও অনুতাপ নেই। গুজরানওয়ালা রেলওয়ে স্টেশন ও সরকারি অফিসে ক্ষুব্ধ জনতা আগুন লাগিয়ে দেয়। সারা দেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১লা আগস্ট ভাইসরয়কে গান্ধিজি তাঁর কাইজার-ই-হিন্দ পদক

ফিরিয়ে দেন এবং সেদিনই তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে (১৯২০, ৪-৯ সেপ্টেম্বর) অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। গান্ধিজির নেতৃত্বে সূচিত হয় অসহযোগ আন্দোলন, সরকারি সমস্ত খেতাব বর্জন, সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়া, সরকারি বিদ্যালয় ও আদালত থেকে সরে আসা, বিদেশি দ্রব্য বর্জন, স্বদেশী দ্রব্যের প্রসার, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, হিন্দু মুসলমান ঐক্য বিধান, মাদক দ্রব্য বর্জন ও আইন অমান্য আন্দোলন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের খবর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার জেলায় জেলায় সত্যাগ্রহীদের উপর ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতি নেমে আসে। উত্তেজনাপূর্ণ এ সময় বিপিন চন্দ্র পাল দিনাজপুরে স্বাধীনতার বাণী প্রচারে আসেন (১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ)। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি তৃতীয়বার বিলাত যাবার আগে দিনাজপুর ডায়মণ্ড জুবিলী মাঠে ললিত চন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় ভাষণে বলেন, "আমি আসিয়াছি বাংলার সুপ্ত সিংহকে জাগ্রত করিতে, কিন্তু এইবার আসিয়াছি জাগ্রত সিংহকে ক্ষিপ্ত করিতে।" বিপিন চন্দ্র পালের সঙ্গে আসেন মহারাষ্ট্রীয় নেতা শ্রীরাম বিনোন ললিতা। গঙ্গারাম থানার ডাক্তার মোহন তুল্লা মিঞা এই সভা থেকে কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ সেবক রূপে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতারূপে পরিচিত হন সারা জেলায়।আবদুর রহমান সৈয়দি গ্রামে গ্রামে ল্যান্টার্ণ-লেকচার দিয়ে কংগ্রেসের প্রচার শুরু করেন।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আগমন উপলক্ষে দিনাজপুর জেলায় কংগ্রেস আন্দোলন তরঙ্গশীর্ষে ওঠে। জেলা কংগ্রেসের এ সময় (১৯২১) প্রেসিডেন্ট ছিলেন খোলাহাটি চিরির বন্দরের আবদুল্লাহিল বাকী। ভাইস প্রেসিডেন্ট যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, সক্রেটারী কাশীশ্বর চক্রবর্তী এবং সহকারী সেক্রেটারী অবিনাশ ধর। কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে ছিলেন মাধব শিকদার, কালিবিলাস বাগচী, কাদের বক্স, লোকেন সেন, সতীশ রায়, যোগেশ দত্ত, আশু গুহ, নিশীথনাথ কুণ্ডু, কৃষ্ণকুমুদ সরস্বতী, বরদাকান্ত রায়, নলিনী ভট্টাচার্য, নর্মদা ব্যানার্জী, অনিল বিশ্বাস, ধরণী কুণ্ডু, ডাক্তার তারকেশ্বর চক্রবর্তী, ডাক্তার সারদাকান্ত রায়, ডাক্তার যামিনীকান্ত ঘোষ, অবিনাশ সেন, যতীন দত্ত, ডাক্তার উপেন সেন, আবদুল্লাহিল কাফি, সফিউদ্দিন, হাসান আলী, জিবীত দাস, ডাক্তার মোহনতুল্লা মিঞা, আবদুর রহমান সৈয়দ সহ আরও অনেকে। দেশবন্ধু দিনাজপুরে আসার আগে বিভাগীয় কমিশনার মিস্টার মার দিনাজপুর পরিদর্শনে আসেন। পৌরসভায় স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা কালে মিস্টার মার বলেন, গবর্ণমেন্টের নির্দেশ দিনাজপুরে দেশবন্ধুকে নিয়ে কোনও সভা করা যাবে না এবং তাঁকে অভিনন্দন জানানোও যাবে না। দিনাজপুর পৌরসভা কক্ষে এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার মিস্টার মারের সঙ্গে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের তর্ক-বিতর্ক হয়। এঘটনার একমাস আগে ব্রিটিশ শাসক দেশবন্ধুকে ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করতে দেয়নি, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারি করে চিত্তরঞ্জনকে ময়মনসিংহ ত্যাগের নির্দেশ দেন। সভায় সে বিষয়েও তর্কবিতর্ক হয়।

দিনাজপুরের জেলা শাসক মিস্টার নিখিলনাথ রায় এবং বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্ত চিত্তরঞ্জন দাসের জনসভা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন যেন দিনাজপুরে না হয়। দিনাজপুরের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গবর্ণমেণ্টের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে দেশবন্ধুকে অভিনন্দিত করার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। দিনাজপুরে দেশবন্ধুর সঙ্গে আসেন তাঁর স্ত্রী, বোন ও পালিতা মেয়ে। জাতীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে (কংগ্রেসের মাঠ) দেশবন্ধুর অভ্যর্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী। সভার শুরুতে কংগ্রেসের জাতীয় সংগীত 'বন্দেমাতরম' গানটি গাওয়া হয়। সভায় ভাষণকালে তিনি তিলকফাণ্ডে অর্থ সাহায্য করার জন্য আবেদন জানালে সভাস্থলেই বহু টাকা অনেকেই দান করেন এবং অনেক মহিলা হাত ও গলা থেকে সোনার মালা ও চুড়ি দেশবন্ধুর হাতে তুলে দেন। পরের দিন দেশবন্ধুকে নিয়ে অপর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তিনি স্বরাজ আন্দোলনই ভারতের স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পথ এবিষয়ের উপর আলোচনা করেন। নওঁগা থেকে আসা দুখিরাম মেথর ও দিনাজপুর পৌরসভার মেথর কুড়াই জমাদার সভাস্থলে দেশবন্ধুর গলায় মালা পরিয়ে দেয়। দেশবন্ধু তাঁদের বুকে জড়িয়ে ধরেন। তারা আর মদ ছোঁবে না এবং হরিজন সম্প্রদায় মদ খাওয়া থেকে যেন বিরত থাকে, তারা আন্দোলন করবার শপথ নেয়। দিনাজপুরে দেশবন্ধু দু'দিন থাকেন কালীতলায় সুরেন্দ্র কুমার সেনের বাড়িতে।[১৩] বালুরঘাটে এ সময় ব্রিটিশ বিরোধী প্রবাহ ছিল প্রকট। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, সতীশ রায়, কাশীশ্বর চক্রবর্তী সেখানে সভা করেন এবং বালুরঘাটে সুরেশরঞ্জন চ্যাটার্জী, আমিরুদ্দীন চৌধুরী, কালীনারায়ণ সান্যাল, অবিনাশ বোস, হৃষিকেশ বাগচী, নলিনীকান্ত অধিকারী, সুরেশচন্দ্র বাগচী, নগেন্দ্রনাথ অধিকারী, সুরেন্দ্রনাথ সেন, সত্যরঞ্জন দাস, প্রসন্নকুমার নিয়োগী, দীনেশ চন্দ্র রায়, দ্যুতিধর রায়, সুরেন্দ্রবালা রায় প্রমুখদের নিয়ে কংগ্রেস কমিটি গঠন করেন (১৯২১)। বিলাতিবস্ত্র বর্জন ও স্বদেশিভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য শহরবাসী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে উদ্দীপনা জোগান প্রসন্নকুমার নিয়োগী, চুনী নিয়োগী, প্রভাপ্রসন্ন নিয়োগী, যদুনাথ রায়, চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায়, সুরেন বাগচী, নলিনী বাগচী। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বালুরঘাট শহরে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, প্রফুল্ল নিয়োগী, চুনি নিয়োগী ও প্রভাপ্রসন্ন নিয়োগীর উদ্যোগে। সুরেশচন্দ্র নিয়োগীর বাড়িতে বিদ্যালয়টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিদ্যালয়টিতে শিক্ষকতার কাজ করেন সুধীর মুখোপাধ্যায়, রথীন রায়, ও আশু নিয়োগী। চার-পাঁচ মাসের মত বিদ্যালয়টি চলে। বালুরঘাটে প্রথম কংগ্রেসের অস্থায়ী শাখা কার্যালয় তৈরি হয় প্রফুল্লকুমার নিয়োগীর বাড়িতে। সভাপতি ছিলেন যদুনাথ রায় ও সম্পাদক প্রফুল্লকুমার নিয়োগী। এঁদের নেতৃত্বে বোল্লা, তিওড়, দাড়াল, মাদারগঞ্জ, মদনগঞ্জ, দক্ষিণ খাসপুর, ডাঙ্গিরহাট, আগ্রাদ্বিগুণ (পোর্শা থানা, বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্র) চাঁদপুর, নজিপুর, দক্ষিণকাটাবাড়ি (বর্তমান রাজশাহী জেলা), পতিরাম, নয়াবাজার প্রভৃতি জায়গায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবল আকার নেয়।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে স্পেশাল কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেখানে দিনাজপুর থেকে যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, ডাক্তার তারকেশ্বর চক্রবর্তী, কাশীশ্বর চক্রবর্তী, সতীশ

রায়, বরদাকান্ত গাঙ্গুলী যোগ দেন। ওই সালের নভেম্বর মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি দিল্লিতে এক সভায় আইন অমান্য আন্দোলন ও বিদেশি বস্ত্র বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর পরেই দিনাজপুর জেলাব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ঘরে ঘরে চরকা তক্‌লিতে সূতাকাটার প্রচলন, তাঁত বোনা, কাঠের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে কংগ্রেস কর্মীরা প্রচার করেন। বিলাতি কাপড় বর্জন, মাদক দ্রব্য বর্জন সহ আরও বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন হাটে হাটে মিটিং মিছিল করেন। গান্ধিজি কি জয়, স্বাধীন ভারত কি জয়, বন্দেমাতরম ইত্যাদি ধ্বনির মাধ্যমে প্রচারের কাজ শুরু হয়। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে কুমারগঞ্জ থানার সমজিয়া ও মহেশপুরে মাদক দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং করার জন্য প্রিয়নাথ দাস প্রথম গ্রেপ্তার হন। দিনাজপুর শহরে সুশীল খাসনবিশ, অনাদি চন্দ, বালুরঘাটে কালীনারায়ণ সান্যাল, অবিনাশ বসু, হৃষিকেশ বাগচী, হিলিতে প্রতাপ মজুমদার প্রমুখ। 'নাগপুর পতাকা সত্যাগ্রহে' দিনাজপুর জেলার হরিপুর গ্রামের একদল আদিবাসী সাঁওতাল, রামপদ সেন ও হরিমার্ডির নেতৃত্বে আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত হয় দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস সম্মেলন। দিনাজপুর শহরে এই সম্মেলন উপলক্ষে উপস্থিত হন ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও ভূপতি মজুমদার। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গণআইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। বয়কট আন্দোলন যখন তুঙ্গে সে সময় দিনাজপুরে আসেন গান্ধিজির পুত্র মণিলাল গান্ধি (১৯২৩)। দিনাজপুরে স্বরাজ দলের প্রার্থীরূপে বাংলা কাউন্সিলের নির্বাচনে (১৯২৩) প্রেমহরি বর্মনকে হারিয়ে যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী নির্বাচিত হন। স্বরাজদলের অপর প্রার্থী কাদের বক্স নির্বাচনে পরাজিত হন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হাকিম আজমল খাঁ নির্বাচনের প্রচার করতে সে সময় দিনাজপুরে আসেন (১৯২৩)। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের প্রচারে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন দিনাজপুরের কংগ্রেস মাঠে বক্তৃতা দেবার জন্য আসেন। জেলা কংগ্রেসের ওই সম্মেলনে প্রদর্শনী হয় এবং তিন রাত্রি ধরে মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা হয়। বিপ্লবী পূর্ণদাস কংগ্রেস মাঠে অন্য একটি সভায় কিছুক্ষণ বক্তৃতা দেবার পর গ্রেপ্তার হন (১৯২৪)।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের তিরোধানের কিছু আগে দিনাজপুর শহরে একদিনের জন্য আসেন মহাত্মা গান্ধি। তিনি যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে অবস্থান করেন। স্টেশন থেকে গান্ধিজিকে একটি খোলা ট্যাক্সিতে মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি কংগ্রেস ময়দানে একটি বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। ভাষণে দিনাজপুরবাসীর দেশপ্রেমের প্রশংসা করেন মহাত্মা গান্ধি। আদিবাসীদের জন্য একটি কালীমন্দিরের তিনি দ্বারোদঘাটন করেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জীবনাবসানের কিছু পরে দেশপ্রিয় জে. এম. সেনগুপ্ত দিনাজপুরে আসেন ও সভা করেন। এ সময় (১৯২৫) যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বালুরঘাটে জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন হয়। ওই সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আমিরুদ্দিন চৌধুরী ও সম্পাদক সুরেশরঞ্জন চ্যাটার্জী অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য জেলাবাসীকে অনুপ্রাণিত করেন।

সম্মেলনে নজরুলের কবিতা পাঠ ও গান আলোড়ন সৃষ্টি করে। একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয় এবং মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা হয়। কিরণ শঙ্কর রায়, সন্তোষ কুমারী গুপ্তা, শৈলেশ বিশী সম্মেলন উপলক্ষে যোগ দেন। সম্মেলন থেকে উদ্বৃত্ত ছ'শো টাকা খাদি ও তাঁত শিল্প প্রসারে ব্যয় করার জন্য ভবানী করকে দেওয়া হয়।

১৯২৬ সালে বাংলা কাউন্সিল নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী এ জেলার পীরগঞ্জ থানার অধীনে মালদুয়ার এস্টেটের জমিদার রাজা টঙ্কনাথ রায়কে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হন। অপর কংগ্রেস প্রার্থী আজিজ তৈমুর একিনুদ্দিন আহমদের কাছে পরাজিত হন। কংগ্রেসের প্রচারে এ সময় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় দিনাজপুরে আসেন (১৯২৬)। সরোজিনী নাইডুর আগমন উপলক্ষে কংগ্রেস মাঠে একটি বড় সভা হয় (১৯২৬)। তিনি দিনাজপুর শহরের বড় মাঠের কাছে মহারাজার জুলুম সাগর বাড়িতে অবস্থান করেন। সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ করে শোনান যোগেশ দত্ত। ১৯২৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের মাজু অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। ডক্টর সৈফুদ্দিন কিচলু সে সময় দিনাজপুর শহরে আসেন (১৯২৭)।

১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু দু'বারের জন্য আসেন দিনাজপুর জেলায়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মের প্রথমদিকে দিনাজপুর কংগ্রেস কমিটির আমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্র দিনাজপুর শহরে আসেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বসন্তকুমার চ্যাটার্জী এবং যুবসংগঠনের পক্ষ থেকে করালীকান্ত বিশ্বাস সহ অনেকে নেতাজীকে আনার জন্য পার্ব্বতীপুর গিয়ে দার্জিলিং মেলে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে দিনাজপুর রেল স্টেশনে নিয়ে আসেন। যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর বড়বন্দরস্থিত বাড়িতে আনা হয় তাঁকে এবং সেখানে কর্মী সভা হয়।[১৪] ওই সভায় অনিল বিশ্বাস, বসন্তকুমার চ্যাটার্জি, জীতেন্দ্রনাথ মজুমদার, করালী বিশ্বাস, জ্যোতিষ সেন, অবনী চক্রবর্তী, নির্মাল্য সেন, নৃপেন রায় সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সুভাষচন্দ্র ছাত্র ও যুব সংগঠনের সভায় ভাষণ দেন। দিনাজপুর পৌরসভায় সুভাষচন্দ্রকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। পৌরসভার সে সময় চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ও আশুতোষ চক্রবর্তী। বিকেলে নেতাজী কংগ্রেস মাঠে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন ও পরে কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হন। যোগীন্দ্রচন্দ্রের বাড়িতে বিশিষ্ট কিছু কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাত্রি ৯টার পর সুভাষচন্দ্র দু'ঘণ্টা আলোচনা করেন। কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে দিনটি কাটে। রাত্রি একটার ট্রেনে তিনি কলকাতায় রওনা হন।[১৫]

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলার ধামইরহাট ও পত্নীতলা থানায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং বহু লোক মারা যায়। এ ঘটনা জানা সত্ত্বেও সরকার ছিল নির্বিকার। সরকারি উদাসীনতার প্রতিবাদে মজিবর রহমানের *দি মুসলমান* ও সত্যরঞ্জন বক্সীর *ফরওয়ার্ড* পত্রিকায় এ বিষয়ে সরকারের কঠোর সমালোচনা করে জনমত গড়ে তোলা হয়। সরকারি বঞ্চনার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনায় গর্জে ওঠেন নাট্যকার ও সাংবাদিক মন্মথ রায়। ডাক্তার জে. এম দাশগুপ্ত ও সত্যেন মিত্র দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে ঘুরে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। দিনাজপুর শহরের কংগ্রেস নেতা অনিল বিশ্বাস পত্নীতলার

কংগ্রেস নেতা অবিনাশ বসুর সহযোগিতায় প্রায় পাঁচশ সত্যাগ্রহী নিয়ে বালুরঘাট ফৌজদারী মাঠে সরকারি উপেক্ষার প্রতিবাদে আমরণ গণঅনশন শুরু করেন। পত্নীতলা থেকে চৌকিদারের রিপোর্ট ছয় জনের অনাহার মৃত্যু কেটে সেখানে নানা জ্বরে মৃত্যু বলে থানা থেকে রিপোর্টি জমা দেওয়া হয়। চৌকিদারের রিপোর্ট সংগ্রহ করে তার প্রতিলিপি কাউন্সিল সদস্যদের হাতে তুলে দেন সতীন্দ্রনাথ বসু ও সুরেন বাগচী। স্যার আবদুর রহমান ও জজ নলিনীরঞ্জন সরকার সতীন্দ্রনাথ বসু ও সুরেন বাগচীর কাছ থেকে সমস্ত ঘটনার কথা শোনেন। এ ঘটনায় কাউন্সিলে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হলে সারা দেশ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠে। পরিস্থিতি ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় গভর্ণর জ্যাকসন দিনাজপুরের কংগ্রেস নেতা যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ও বালুরঘাটের নেতা নলিনীকান্ত অধিকারীকে ডেকে তাঁদের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শোনেন। সরকার দুর্ভিক্ষ অঞ্চল ঘোষণা না করলেও ওই অঞ্চলের জন্য ছ'লক্ষ টাকা খয়রাতি সাহায্য ও কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ঋণ মঞ্জুর করে। ফাদার লালেমলি অসহায় মানুষের পাশে এসে সাহায্য করেন। দুর্ভিক্ষের জন্য বিভিন্ন মুসলিম প্রতিষ্ঠান অর্থ সাহায্য করেন। দুর্ভিক্ষ শেষে দুর্ভিক্ষের জন্য আয়-ব্যয়ের হিসাব জন সাধারণের জানার জন্য প্রকাশ করা হয়। ওই বছরই অবিনাশ বসুর উদ্যোগে পত্নীতলায় অনুষ্ঠিত হয় দিনাজপুর জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ওই রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বালুরঘাটে আসেন। পত্নীতলায় রাজনৈতিক সম্মেলনে যাওয়ার আগে বালুরঘাটে (কংগ্রেস পাড়ায়) 'কংগ্রেস ভবন' উদ্বোধন করেন সুভাষচন্দ্র। পত্নীতলায় রাজনৈতিক সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন নিশীথনাথ কুণ্ডু। সুভাষচন্দ্র পত্নীতলায় সিংহন্দী গ্রামের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী ও শিক্ষক মুরারী ধর রায়ের বাড়িতে অবস্থান করেন। তিনি দেড়দিনের মত পত্নীতলায় থাকেন।[১৬]

১৯২৮ সালে দিনাজপুরের কংগ্রেস মাঠে একটি বড় জনসভায় আসেন শেঠ যমুনালাল বাজাজ ও রাজা গোপাল আচারিয়া। সভায় দোভাষী রূপে ছিলেন রমেশ নিয়োগী। প্রফেসর নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, আতাউল্লা বোখারী, জালালুদ্দিন হাসেমী প্রমুখ জননেতারা প্রচার ও সভা করতে এ সালেই (১৯২৮) দিনাজপুর আসেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে জেলা কংগ্রেস সম্মেলন হয় ঠাকুরগাঁতে। সভায় স্বেচ্ছা সেবকদের নেতৃত্ব দেন অনিল বিশ্বাস। সম্মেলন উপলক্ষে কবি নজরুল ইসলাম ও হেমন্ত সরকার আসেন। নজরুল ইসলামকে দিনাজপুরের গোলকুঠী মাঠে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। নজরুল তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করেন এবং স্বরচিত একটি গান করেন।[১৭]

১৯২০ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের আগমনে দিনাজপুরের মাটি পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে তপ্ত হয়ে ওঠে। ১৯৩০-৩২ সালে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন জেলায় তীব্র রূপ নেয়। দিনাজপুর শহরে যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সভা, মিছিল, মদ-গাঁজার দোকানে পিকেটিং শুরু হয়। দিনাজপুর জেলা ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দক্ষিণারঞ্জন দাসগুপ্ত ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের তাবেদার। জেলা ইস্কুলের ছাত্রাবাসে কিছু ছাত্রকে *অমৃত বাজার* ও *সার্ভেন্ট* পত্রিকা পড়তে দেখে তিনি ছাত্রদের কাছ থেকে পত্রিকাগুলি কেড়ে নিয়ে

ছিঁড়ে ফেলেন এবং ছাত্রদের রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগ না দেবার জন্য কড়া নির্দেশ দেন। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এর ফলে বিক্ষোভ প্রকাশ করে এবং 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। ১২ দিন একনাগাড়ে বিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট হয়। দিনাজপুর শহরে বস্ত্রব্যবসায়ী (মাড়োয়ারী সম্প্রদায়) কুন্দনমল শেঠের একটি বড় কাপড়ের দোকান ছিল। কুন্দনমল শেঠ তার দোকান থেকে সমস্ত বিদেশি কাপড় বের করে দিয়ে সদর রাস্তায় জমা করেন। কয়েক টিন কেরোসিন তেল ওই কাপড়ের উপর ছিটিয়ে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন দিনাজপুরের জননেতা যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিত হয়। আইন অমান্য করে ১৯৩০ সালে দিনাজপুরে গ্রেপ্তার হন নিশীথনাথ কুণ্ডু, লোকেন সেন, গুরুদাস তালুকদার, বসন্তকুমার চ্যাটার্জী, তারাপদ ধর, রবি লাহিড়ী, নির্মাল্য সেন, জীতেন্দ্রনাথ মজুমদার, ভুবনেশ্বর বাবু, পাঁচুকান্ত চক্রবর্তী, বিজলি কুণ্ডু, সুধীর কুণ্ডু, হরিদাস বিশ্বাস, ধীরেন বিশ্বাস, বীরেন গুহ, অবনী চক্রবর্তী, শ্যামাকান্ত চক্রবর্তী, বিমল চ্যাটার্জী, রাধিকাজীবন বোস, সিন্দুর মার্ডি, বড়কা টুডু, শশধর ভৌমিক, গোপীনাথ সাহা, অনিল বিশ্বাস, ডাক্তার মোহন তুল্লা, মুহম্মদ সফি, প্রমথ দাসগুপ্ত, ডাক্তার হেমচন্দ্র সিংহ, রামলাল প্রমুখ। মহিলাদের মধ্যে গ্রেপ্তার হন, আশালতা চক্রবর্তী, সুভাষিণী মুখার্জী, হেমন্তবালা সেনগুপ্তা, চারুবালা সেনগুপ্তা, ভগবতী সেন, স্নেহলতা গাঙ্গুলি ও আশালতা কুণ্ডু। চিরির বন্দরে গ্রেপ্তার হন আবদুল্লাহিল বাকী, আবদুল্লাহিল কাফি, বুধা চড়ে ও লোধে চড়ে। জনতার আহ্বানে ভগবতী আগরওয়ালা ও নারায়ণ সাহা নামে দু'জন ছাত্র স্কুল থেকে বেরিয়ে আসেন এবং জনতা ও ছাত্রদের মধ্যে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে চিরির বন্দর মুখরিত হয়ে উঠে। দিনাজপুর জজ কোর্টে পিকেটিং এর ফলে বেশির ভাগ বিচারকই কোর্টে যেতে পারেন নি। কুমার অধিক্রম মজুমদার নামে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শুয়ে থাকা পিকেটিংকারীদের ডিঙিয়ে কোর্টে যান। এ ঘটনায় চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে অনেকেই গ্রেপ্তার হন। এঁদের মধ্যে ঠাকুরগাঁর অরুণাংশু দে, হরিদাস গোস্বামী ও গৌরহরি মহন্ত ছিলেন।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে বালুরঘাটে সুরেশরঞ্জন চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে মাড়োয়ারী পট্টিতে তিন গাট বিলাতি কাপড় পোড়ানো হয়। শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্তের গাঁজা ও মদের দোকানে ২৪ঘণ্টা সত্যাগ্রহীরা পিকেটিং করেন। একদিন রাত্রিতে শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্তের গাঁজা ও মদের দোকান আগুন লেগে পুড়ে গেলে পুলিশ ৪০ থেকে ৫০ জনের মত সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করেন। এঁদের মধ্যে অজিত কুমার সাহা ছিলেন দলনেতা। ১৯৩০ সালে বালুরঘাটে আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন রসিকলাল গুহ, কালীনারায়ণ সান্যাল, কালীপদ বোস, মহারাজা বোস, ডাক্তার ধীরেন ব্যানার্জী, প্রভাস লাহা, ভোলানাথ দাস, অবিনাশ বসু, মুরারি ধর রায়, কেষ্ট মহন্ত, অনাথ বসু, রমাকান্ত সমাজদার, নৃপতি চ্যাটার্জী, সরোজরঞ্জন চ্যাটার্জী, জব্বার মিঞা প্রমুখ। বালুরঘাটের ফাল্গুনী মিত্র সহ আরো কয়েকজন সোদপুরে সে সময় লবণ আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। মহিলাদের মধ্যে আইন অমান্য করেন প্রভাবতী চ্যাটার্জী। বালুরঘাটে প্রত্যেক বাড়ি থেকে কেউ না কেউ গ্রেপ্তার হন। পতিরামে (১৯৩০) কনক মুখার্জীর মদ ও গাঁজার দোকানে পিকেটিং করে গ্রেপ্তার হন কেষ্ট দাস মহন্ত, শেখ

গমীরউদ্দীন সরকার, অবনী সরকার, অনাথ বন্ধু সাহা, নইমুদ্দীন, ননী সরকার, রনেন পোদ্দার, গোবিন্দ ঘোষ, ননী অধিকারী, রাধিকারঞ্জন রায়, ডাক্তার ধীরেন ব্যানার্জী, কমলেন্দু চক্রবর্তী, সুশীল সরকার, কুমদবিহারী সরকার, রমেন সমাজদার প্রমুখ। বালুরঘাট মহকুমার তপন থানায় আইন অমান্য (১৯৩০) আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। শম্ভু পাল (কুমোর), গোলক বোলাল (স্বর্ণকার), সখিয়া গোয়াল (হিন্দুস্থানী), জোড়াওয়ারমল কোঠারী (মাড়োয়ারী), সত্যেন্দ্রনাথ রায়, শশীভূষণ মোদক (হালুইকর), সত্যশী স্বর্ণকার ও গোপীবল্লভ মজুমদার, এঁদের নিয়ে সেখানে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। নয়াবাজার, গঙ্গারামপুর, ফুলবাড়ি প্রভৃতি হাটে বিলাতি কাপড় বর্জন, বিলাতি কাপড় পোড়ানো, মদ ও গাঁজার দোকানে পিকেটিং হয়। নয়া বাজারে কাশী সাহার মদ ও গাঁজার দোকানে ২৪ ঘণ্টা দফায় দফায় পিকেটিং হয়। কংগ্রেসের সুরেশরঞ্জন চ্যাটার্জী, সরোজরঞ্জন চ্যাটার্জী, সুরেন বাগচী, কানাই বাগচী, দিব্যেন্দু বাগচী, মহীউদ্দিন মোক্তার, প্রভাবতী চ্যাটার্জী প্রমুখ তপনে আসেন এবং আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে তোলেন। গঙ্গারামপুর থেকে এ সময় আন্দোলনে যোগ দেন আশারাম মুদ্রা ও মোহিনী সাহা। নয়াবাজার চৌরাস্তায় একটি জনসভায় কংগ্রেসের সরোজরঞ্জন চ্যাটার্জী বলেন, 'পুলিশের তরফ থেকে কঠিন আঘাত আসতে পারে আপনাদের ওপর। এই অত্যাচার সহ্য করতে যারা পারবেন তারা এগিয়ে আসুন কংগ্রেসের কাজে।' প্রায় এগারোশো কর্মী সঙ্গে সঙ্গে নাম তালিকাভুক্ত করেন। পরদিন জোড়াওয়ারমল কোঠারীর বাড়িতে কংগ্রেসের অস্থায়ী দপ্তর খোলা হয়। সেখানে আরও পাঁচশো জনের মত কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরূপে নাম তালিকাভুক্ত করেন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা ছিলেন মহীউদ্দিন ও অমর মহত ক্ষত্রিয়। ১৯৩০ সালে নয়াবাজারে গ্রেপ্তার হন জোড়াওয়ারমল কোঠারী, উমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মহত ক্ষত্রিয়। এঁদেরকে বালুরঘাট জেলে ধরে নিয়ে যায়। কিছুদিন পরে (১৯৩০) ধরা পড়েন মণীন্দ্র চক্রবর্তী, গোলক বোলাল, শম্ভু পাল, সখিয়া গোয়াল, সত্যশী স্বর্ণকার, ইন্দ্রদেব সাহা, মহীউদ্দিন প্রমুখ। এঁদেরকে গ্রেপ্তার করে গঙ্গারামপুর থানায় নিয়ে যায়। মোবাইল কোর্টে এস. ডি. ও. মিস্টার ফারক্কু এঁদের বিচার করেন। বিচারে প্রত্যেকের ৬ মাস করে জেল হয়। দুটি মিছিলে সারি করে বন্দীদের দিনাজপুর জেলে নিয়ে যায়।[১৮] ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ফুলবাড়িতে দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সম্মেলন হয়। সম্মেলনে যোগ দেন বিপ্লবী নেতা অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ও জে. এম. দাশগুপ্ত। ১৯৩২ সালের দ্বিতীয় দফা আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে বিভিন্ন এলাকা থেকে যাঁরা গ্রেপ্তার হন তাঁদের মধ্যে অনেকেই পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বালুরঘাটে কমলেন্দু চক্রবর্তী ও সন্তোষ চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক সম্মেলন হয়। এ সময় (১৯৩২) সভা সমিতিকে বানচাল করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। কোথাও কোন সভা করার উপায় ছিল না। দিনাজপুর বড়মাঠে ফুটবল খেলা শেষ হবার পর 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে বালুরঘাটের রাজলক্ষ্মী গুহকে সভাপতি করে দ্রুত একটি সভা হয়। পুলিশ আসার আগেই প্রত্যেকেই গা ঢাকা দেন।

৪. জাতি - উপজাতি বিক্ষোভ

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দিনাজপুর জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ক্রমশই খারাপ হতে থাকে। বিশেষ করে কৃষক ও সাধারণ বৃত্তিধারীদের উপর আঘাত আসে। চাষিদের ঋণের বোঝা বেড়ে যাওয়ায় ঋণজর্জর অর্থনীতি কৃষাণ সমাজকে পঙ্গু করে তোলে। এ সময় নিম্নবর্গের জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের ব্যয় অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় ক্রমশ ঋণগ্রস্ত হতে হতে স্বাধীনতা হারিয়ে তারা ক্রীতদাসে পরিণত হতে থাকে। এ সবের দরুণ দিনাজপুরে জাতি - উপজাতি সমাজে বিক্ষোভ দানা বাধে। জমিদার, জোতদার, সুদখোর, মহাজন ও ব্রিটিশ আমলাদের অত্যাচার, অবিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে তারা সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলায় ছত্রিশ জাতির সমন্বয়ে ব্যাপক গণআন্দোলন সৃষ্টি হয়। 'ছত্রিশা' আন্দোলন নামে তা পরিচিতি লাভ করে। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য জমিদার, জোতদার, সুদখোর মহাজন ও ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচার, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও দাবি আদায় করা। এর নেতৃত্ব দেন তপন থানার প্রতাপ মণ্ডল, মরা ডাঙ্গার ফুলচাঁদ মুর্মু, চামটা কুঁড়ির সর্বেশ্বর মণ্ডল, ডালমালঞ্চার গায়েশ্বর বর্মণ, পুণ্যেশ্বর বর্মণ, চৈতু বর্মণ, মল্লিকপুরের এতোঁয়া ওঁরাও, মৈন কুঁড়ির ক্ষীরোদ বর্মণ, হাটসাইলের হরিচরণ বর্মণ ও নস্করহাটের ধীরেন বর্মণ। জমিদার-জোতদার -সুদখোর মহাজন, সরকারি আমলাদের অত্যাচার, শোষণ বা জুলুমের সংবাদ পাওয়া মাত্রই নেতারা দলবল নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে তাদের দাবি আদায় করতে ছুটে যায়। বালুরঘাট মহকুমায় সৈয়দপুর, খাসপুর বয়ালদহ, কাটনা নলতাহার, কাশীপুর, দু'গাছি, রাজুনা প্রভৃতি এলাকায় আন্দোলন তীব্র রূপ নেয়। আন্দোলন চলাকালীন নেতাদের উপর অমানবিক পুলিশি নির্যাতন চলে। পুলিশ প্রথমে নেতা ও আন্দোলনকারীদের ধরে নিয়ে মারধোর করে এবং পরে স্বীকার করিয়ে নেয় এ কাজ যেন ভবিষ্যতে আর না করে। 'ছত্রিশা' আন্দোলনের সমর্থনে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে তপন থানার যদুনাথ রায়, পেয়ারী পাল, শম্ভু হাজরা ও বৈদ্যনাথ মাঝির ৭ দিন করে জেল হয়। ৭ দিন পরে বালুরঘাট জেল থেকে মুক্ত হয়ে এলে নয়াবাজারের জনসাধারণ তাদের মিছিল করে সম্মান জানান। বালুরঘাটের সুরেশরঞ্জন চ্যাটার্জী, সুরেন্দ্র বাগচী তাদের অভিনন্দন জানান। দিনাজপুর জেলার খিলাফত আন্দোলনের নেতারা এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। ওয়াহাবি নেতা আবদুল্লাহিল বাকী বিভিন্ন জাতি উপজাতিদের জমিদার - জোতদার-সুদখোর মহাজন ও ব্রিটিশ শাসনের শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন ও চৌকিদারি ট্যাক্স ধার্যের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রভাবিত করেন।[১৯] ১৯২৭ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন চলে ও পরে স্তিমিত হয়ে আসে।

১৯২৪ - ২৫ খ্রিস্টাব্দে 'প্রজার গাছ কাটা' আন্দোলন শুরু হয়। দিনাজপুর জেলায় কেদার ব্যানার্জীর নেতৃত্বে রাজবংশীরা এই আন্দোলন শুরু করে। কৃষকদের বসত বাড়িতে গাছ কাটতে হলে জমিদারদের অনুমতি নিতে হয়। জমিদারবাবু হুকুম দিলে তবেই গাছকাটা সম্ভব হয়। অনুমতি ছাড়া গাছ কাটতে গেলে জমিদারের অত্যাচারে

প্রজার জীবন যাবার উপক্রম হয়। বোচাগঞ্জ ও খানসামা থানাসংলগ্ন সুন্দরপুর গ্রামের জাল মহম্মদ নামে একজন মুসলমান ক্ষেতমজুর এ আন্দোলনে যোগ দেয়। দিনাজপুর জেলার সুন্দরপুরে প্রজার গাছকাটা আন্দোলন তীব্র রূপ নেয়। পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে সেখানে প্রজার সঙ্গে লড়াই হয় এবং কয়েকজন গরীব কৃষক আহত হয়। জেলে দু'জন কৃষককে ধরে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাদের মৃত্যু হয়।[২০] দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমার বীরগঞ্জ, কাহারোল, বোঁচাগঞ্জ ও খানসামা, এই চারটি থানায় জমিদারের নির্দেশ অমান্য করে গাছকাটা আন্দোলন তীব্র হয়।

১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলায় 'চৌদ্দ মৌজা প্রজা বিদ্রোহ'-র সূচনা হয়। প্রজারা এই বিদ্রোহ করে দিনাজপুর রাজের চড়া হারে কর জুলুমের বিরুদ্ধে। ১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলার কৃষকের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। উৎপন্ন ফসলের দাম অর্ধেকের নীচে নেমে আসায় জমিদারের খাজনা ও মহাজনের সুদ শোধ করা তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়। এ সময় দিনাজপুরের মহারাজা শহর সংলগ্ন মাসিমপুর ও চেরাডাঙ্গি এলাকার প্রজাদের খাজনার উপর 'বাজনা' কর চড়াহারে চাপিয়ে দেয়। জমিদারের আমলা কর্মচারীরা প্রজাদের উপর বর্দ্ধিত খাজনার চাপ দেয় এবং পুলিশ-পেয়াদা দিয়ে জুলুম ও অত্যাচার শুরু করে। দরিদ্র প্রজারা বর্দ্ধিত কর দিতে অস্বীকার করলে ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, মারধর করে এবং অনাদায়ি খাজনার জন্য কোর্টে মামলায় অভিযুক্ত করে। ত্রাস ও অসন্তোষ বেড়ে যায় এবং চৌদ্দ মৌজার বিভিন্ন জাতি-উপজাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে দিনাজপুর রাজের বিরুদ্ধে খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করে। এর নেতৃত্ব দেন বঙ্গীয় কৃষক প্রজা পার্টির দিনাজপুর জেলা শাখার সম্পাদক মৌঃ ফজলে হক। আন্দোলনের অসন্তোষ বেড়ে যাওয়ায় একবছর খাজনা দেওয়া বন্ধ থাকে। পরে মৌঃ ফজলে হকের কর্ম তৎপরতায় দিনাজপুর রাজের সঙ্গে প্রজাদের আপস হয়। মৌঃ ফজলে হক কৃষক প্রজা আন্দোলনের একটি বিপ্লবী কেন্দ্র গঠন করেন চেরাডাঙ্গি গ্রামে।[২১]

১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত দিনাজপুর জেলায় বিভিন্ন জাতি-উপজাতি চৌকিদারি ট্যাক্স-বন্ধ বিক্ষোভে অংশ নিয়ে ব্যাপক জঙ্গি আন্দোলনের সূচনা করে। দিনাজপুর জেলায় চৌকিদারী ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলন এত ব্যাপক, বিস্তৃত ও জঙ্গি ছিল যে সিপাহী বিদ্রোহের পর দরিদ্র মানুষের মধ্যে এত ব্যাপক আলোড়ন এই প্রথম দেখা যায়। শেষপর্যন্ত গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটনকে, আন্দোলনের জঙ্গি ও তাণ্ডব রূপ দেখে মালদায় এসে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের বিপক্ষে সভা করতে হয়। দরিদ্র প্রজার এ সময় দুরবস্থা চরমে ওঠে। আদালত থেকে জমি থেকে উচ্ছেদের নোটিশ, মামলায় জর্জরিত করে তোলা, জমি নিলাম করে দেওয়া, জালখত লিখে মামলায় জড়িয়ে দেওয়া, সাদা কাগজে টিপসহি নিয়ে জমি বিক্রয়ের কবলা তৈরি করা, ইত্যাদি হরেক রকমের জুয়াচুরি করে থানা পুলিশ, কোর্ট-কাছারির সাহায্যে নিম্নবর্গের মানুষের উপর চরম শোষণ ও জুলুম চলে চড়াসুঁদি মহাজন, জোতদার ও জমিদারদের। ফলে আন্দোলন তীব্র রূপ নেয় ইটাহার, বিরল, গঙ্গারামপুর ও তপন থানায়। ইটাহার থানার পতিরাজ

এলাকায় (১৯৩০) সাঁওতালরা চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করে। ইংরেজ শাসনকে অগ্রাহ্য করে পুলিশের সঙ্গে সাঁওতালদের সংঘর্ষ হয়। নেতৃস্থানীয় কয়েকজন এ ঘটনায় গ্রেপ্তার হয় ও কারাবরণ করে। বিরল থানা এলাকায় সাঁওতাল সর্দার পাডু হাঁসদার নেতৃত্বে রানিপুকুর অঞ্চলে চৌকিদারী ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলন জোরদার হয় (১৯৩০)। তীর ধনুক নিয়ে তারা ভূস্বামী ও ব্রিটিশের পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে ব্রিটিশের পুলিশ বাহিনীকে একেবারে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এ লড়াই দমনের জন্য প্রসাশন শেষপর্যন্ত লাট বাহাদুরের হস্তক্ষেপ কামনা করে। এরপরেই পাডু হাঁসদার উপর নেমে আসে অকথ্য অত্যাচার। বিদ্রোহীরা সকলে গ্রেপ্তার হয়। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সাঁওতালদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। আন্দোলনের মূল নেতা ছিলেন কাশীশ্বর চক্রবর্তী। গান্ধিজির আহ্বানে তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন (১৯২১)। সাঁওতালদের কাছে 'সন্ন্যাসীবাবা' এবং 'স্বদেশীবাবা' নামে পরিচিত হন। আদিবাসীদের মধ্যে 'সত্যম শিবম্ সুন্দরম্' নামে সনাতন ধর্মীয় এক মতবাদ তিনি প্রচার করেন। ১৯৩২ সালের জুন-জুলাই মাসে দিনাজপুর জেলার আকচা (কুশমণ্ডি থানা), পাটন, নারায়ণপুর, শুকদেবপুর বিভিন্ন অঞ্চলে রাজবংশী ও আদিবাসী জনজাতির নেতৃত্বে খাজনা বন্ধ আন্দোলনে বেশ কয়েকজন কৃষক মারা যান। জুলাই মাসের ১ তারিখে রাতের অন্ধকারে একদল পুলিশ আকচা আদিবাসীদের গ্রামে ধড়পাকড় শুরু করলে সাঁওতালরা তীর ধনুক নিয়ে আক্রমণ করে। আক্রমণের প্রতি উত্তরে পুলিশ গুলি চালায়। গুলি বর্ষণের ফলে দেবু মুর্মু, বেঙ্গা মার্ডি, কর্ণবানিয়া, জয়ধর রায়, খোবলা সিং, শ্রীদাম সরকার, সীতু রায় ও টেপু সরকার গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে থাকার কয়েকদিন পর মারা যায়।

তপন থানায় চৌকিদারী ট্যাক্স আদায়ের জন্য গরীব প্রজার উপর অত্যধিক জুলুম চলে। অভাবের জ্বালায় কোনও প্রজা যদি চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে না পারে তাহলে তার স্থাবর-অস্থাবর ক্রোক করে নিলামে চড়ানোর ব্যবস্থা করে। তপন থানার মনহলি গ্রামের ৮২ বছরের বৃদ্ধ মোহন রাজবংশী চৌকিদারী ট্যাক্স আদায়ের অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রজাদের একত্রিত করেন। জমিদারের নায়েব শৈলেশ ব্যানার্জী তপন হাটে ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেন কোন প্রজা চৌকিদারী ট্যাক্স না দিলে তার ঘটি বাটি, গরু-বাছুর, স্থাবর-অস্থাবর সমস্তই ঘরে ঢুকে হাটে প্রকাশ্য নিলামে চড়ানো হবে। সংবাদ পেয়ে মোহন রাজবংশী প্রজা জমায়েত করে 'দরিদ্র প্রজার কোনও চৌকিদারী ট্যাক্স নাই' এই মর্মে খাজনা বন্ধ রাখার আবেদন জানায়। মোহন রাজবংশীর আবেদনে প্রজারা চৌকিদারী ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

অবস্থা বেগতিক দেখে শৈলেশ ব্যানার্জী কিছু প্রজাকে বুঝিয়ে ট্যাক্স দেওয়ার কথা বলেন, এবং কিছু প্রজা ট্যাক্স দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রজারা চৌকিদারী ট্যাক্স দেবে খবর পেয়ে মোহন রাজবংশী হাতে একটা দা নিয়ে রাত্রি ১২টার সময় শৈলেশ ব্যানার্জীর বাড়িতে যায় এবং বলে, এখানকার কোনও প্রজাই কোনও অবস্থাতেই চৌকিদারী ট্যাক্স দেবে না। ট্যাক্স যদি দিতেই হয় এই বলে হাতের দা'টি দিয়ে তিনি

নিজের মাথায় কয়েকটি কোপ দিয়ে রক্ত বের করে ওই রক্ত মাখা হাতে বলেন 'এই নিন'। পরে রক্ত ঝরা অবস্থায় মনহলির জমিদার যোগেশ ব্যানার্জীকে চেঁচামেচি করে ডেকে তোলেন। যোগেশ বাবু গেটের বাইরে বেরিয়ে এসে বলেন, 'কি ব্যাপার'? মোহন রাজবংশী জানায়, আমরা ট্যাক্স দেবো না, রক্তমাখা হাত দুটি সামনে বাড়িয়ে বলেন, 'আপনাকে ট্যাক্সের বদলে এই রক্ত দিচ্ছি'। এ ঘটনায় সাময়িক ভাবে ট্যাক্স বন্ধ হয়ে যায়। বৃদ্ধ মোহন রাজবংশী ও ভোলা সরকার এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এর কিছুদিন পরে ট্যাক্স আদায়ের জন্য তপন থানায় পুলিশি অভিযান শুরু হয়। ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করলে নিরহ দরিদ্র গ্রামবাসীর উপর নির্যাতন নেমে আসে। তপন থানার যশুরাপাড়া, নস্করহাট, দোরগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামে রাজবংশী ও আদিবাসী প্রজার উপর নির্মম অত্যাচার শুরু হয়। তপন থানার দারোগার নির্দেশে ওই অঞ্চলের ১১টি ইউনিয়নের চৌকিদারদের জরুরী তলব করা হয়। দেড়'শ জন চৌকিদার থানায় উপস্থিত হয়। এর মধ্যে চার-পাঁচ জন ছিল গোর্খা চৌকিদার। থানার দারোগাবাবুর নেতৃত্বে ওই দেড়'শ জন চৌকিদার সহ আরো আট-দশ জন সশস্ত্র পুলিশ মাঝরাত থেকে ভোর রাত পর্যন্ত গ্রামগুলি ঘেরাও করে। পুলিশ ও চৌকিদাররা বাড়ি বাড়ি প্রবেশ করে চাল-ডাল-তেল-তরিতরকারী যার যা পায় সমস্তই বাড়ির বাইরে বের করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে। ঘরের বিছানা বালিশ প্রভৃতি কেটে তার তুলা বের করে ছুড়ে ফেলে দেয়। মেয়েদের ধরে এনে গাছতলায় রেখে দেয়। গোয়ালের গরু, মহিষ, ছাগল, হাঁস, মুরগী সব ছেড়ে দেয়। অত্যাচারের তাণ্ডবে পুরুষেরা যে যার মত গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। যারা ধরা পড়ে তাদের গাছে গাছে বেঁধে রাখে। পারিল্লাহাটে কিছু আদিবাসী পুলিশের ওই বিরাট দলটিকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়লে একজন পুলিশ তীরবিদ্ধ হয়। সরকারি নথিপত্রে এ সময় দিনাজপুরকে 'Troubled District' বলে উল্লেখ করা হয়।[২২]

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি গঙ্গারামপুর থানার নারায়ণপুর গ্রামে দরিদ্র প্রজারা ধর্মগোলা তৈরীর দাবি জানায়। অভাবে মহাজনের খপ্পরে না পড়ে কৃষকেরা ধান ওঠার সময় আধমণ-একমণ করে ধান ধর্মগোলায় রেখে অসময়ে সেখান থেকে ধান নিয়ে অভাব মোচন করবে এই দাবি করে কৃষক নেতাদের কাছে। ধর্মগোলা তৈরির জন্য দরকার হয় প্রচুর বাঁশের। স্থির হয় যে রসিক দেশী নামে এক গরীব প্রজার যে বাঁশ ঝাড় আছে সেখান থেকেই বাঁশ কাটা হবে। দীর্ঘদিন ধরে রসিক দেশী বাঁশ ঝাড়ের ওই জমির খাজনা দেওয়া বন্ধ রাখায় জমিদার আগে থেকেই ঢোল পিটিয়ে ওই জমি খাস করে রাখে। দরিদ্র প্রজারা জমিদারের খাস করা জমির বাঁশ কেটে ফেলে। ফলে জমিদারের কিছু লোক প্রথমে জমিদার ও পরে থানায় গিয়ে খবর দেয়। তারা এজাহার দেয় যে, "গ্রামে বিপ্লবীদলের আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে, এদের শায়েস্তা করতে না পারলে গ্রামে বসবাস করা মুস্কিল হয়ে পড়বে। আজ এরা জমিদারের বাঁশ কেটেছে কাল অন্যের বাঁশ কাটবে, তখন কিছু করার থাকবে না, এদের সংগঠন বড় মজবুত।" খবর পেয়ে মদন মণ্ডল নামে এক দারোগা কয়েকজন পুলিশ নিয়ে ঘটনা স্থলে যায়।

নারায়ণপুর প্রাইমারী ইস্কুলে পুলিশ, চৌকিদার ও কয়েকজন গ্রামবাসী নিয়ে দারোগাবাবু মিটিং করেন। পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠতে থাকায় দরিদ্র প্রজারা প্রতিজ্ঞা করে যে বাঁশ কোনও ক্রমেই দেওয়া হবে না। বিকেলের দিকে দারোগা পুলিশ ও চৌকিদার সহ নারায়ণ দেশী নামে একজন কৃষকের বাড়ি থেকে একখানি গরুর গাড়ি চেয়ে নিয়ে বাঁশ তুলতে আসে। কিছু বাঁশ চৌকিদাররা গাড়িতে তোলে। ওই সময় বাড়ির ভেতর থেকে মেধাবিনী, পূষণবালা, চেঁচিবালা ও পাতালীবালা দেশী নামে চারজন মহিলা হাতে ঝাঁটা নিয়ে দারোগাকে বলে, এই বাঁশ কিছুতেই দেবো না। দারোগা ও পুলিশের সঙ্গে তাদের কথা কাটাকাটির পর দারোগা বলেন, যে বাঁশগুলি গাড়িতে উঠেছে সেগুলি নিয়ে চলো। মহিলাদের মধ্যে মেধাবিনী বলে, গাড়িতে যে বাঁশগুলি আছে সেগুলিও দেবো না বলে এই মহিলারা বাঁশের গাড়িতে উঠে বসে। চৌকিদার ও পুলিশেরা তখন গাড়ি থেকে মহিলাদের ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিয়ে বাঁশগুলি জোর করে নিয়ে যেতে চায়। ওই সময় বাড়ির ভেতর থেকে বৃদ্ধ কষর দেশী বাইরে বেরিয়ে এসে বালক ইন্দ্রনাথকে বলে, একটা লাঠি নিয়ে আয়। ইন্দ্রনাথ একটা মোটা লাঠি এনে তার কাকা কষর দেশীর হাতে দেয়। কষর লাঠি নিয়ে পুলিশকে মারতে উদ্যত হয়। ইন্দ্রনাথ ওই সময় বাড়িতে প্রবেশ করে ঘণ্টা বাজাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে লাঠিধারী কৃষকেরা বেরিয়ে আসে। মেধাবিনী, পূষণবালা, পাতালীবালা এরা সবাই দারোগাকে মারধোর শুরু করে। এই অবস্থায় অন্যান্য কৃষকেরাও দারোগা, পুলিশ ও চৌকিদারকে মারবার জন্য ছুটে যায়। অবস্থা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। চারদিক থেকে প্রচুর লাঠিধারী দরিদ্র প্রজা জমায়েত হতে শুরু করছে দেখে দারোগা, পুলিশ ও চৌকিদার বাঁশের গাড়ি ফেলে উত্তরদিকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করে। মারমুখী প্রজারা তখন দারোগা, পুলিশ ও চৌকিদারের পিছু নেয়। এই সংকটপূর্ণ অবস্থায় দারোগা ও পুলিশের দল সুখদেবপুরে হরমোহন মণ্ডলের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এরপর প্রজারা গাড়ি থেকে বাঁশগুলিকে নামিয়ে গরুর গাড়ীটিকে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ঘটনার সাত-আটদিন পরে ভোরবেলায় হাতীতে চড়ে সদল বলে সশস্ত্র পুলিশের দল এসে উপস্থিত হয় গ্রামে। সেখানে কয়েকজন পুলিশ সজোরে বলেন, পুলিশের বড় সাহেব এসেছেন, তোমাদের যার যা বলার আছে বলে যাও। যখন কেউ আর পুলিশের কাছে আসে না তখন বাড়ি বাড়ি পুলিশি তল্লাসী চলে। পুলিশ তল্লাশী চালিয়েও কাউকে খুঁজে পায় না। শেষে একটি অন্ধকার ঘর থেকে ইন্দ্রনাথ দেশী ও পোহাতু দেশী নামে দুজন বালককে গ্রেপ্তার করে। এই দু'জনকে ধরে অন্যত্র নিয়ে যাবার সময় পেল্কু দেশী নামে একজন নিরীহ চাষিকে ধরে। পুলিশ রাস্তায় দেখে ওকে বলে যে, তুমি কোন্ পক্ষের লোক? পেল্কু থতমত খেয়ে যায়। পুলিশ তখন নাম জিজ্ঞেস করে। পেল্কু বলে যে বাপ-মা তার কি নাম রেখেছে জানে না। পুলিশ তখন পেল্কুকে চালাক ও দলের লোক অনুমান করে আটক করে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত প্রায় সারাদিন তল্লাসী চালিয়ে আর কারুকে পুলিশ ধরতে পারে নাই। শুধু ওই তিনজনকে গঙ্গারামপুর থানায় এনে প্রচণ্ড মার দেয়। ওইদিন রাত্রিতে গঙ্গারামপুরে ধর্মগোলা

আন্দোলনের নেতা স্বর্ণকমল মিত্র, ইন্দ্র পাঠক, অনিল ঘোষ ধরা পড়েন। প্রথমদিন ঘটনাস্থলে তল্লাসী চালান এস. পি. সহ প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন সশস্ত্র পুলিশ। দ্বিতীয় দিন সশস্ত্র পুলিশের দল পুনরায় গ্রামে তল্লাসী চালায়। নারায়ণপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে পুলিশের তাণ্ডব শুরু হয়। মারধোর, গ্রেপ্তার, মাটি খুঁড়ে বাড়ি তল্লাসী, হাতী নিয়ে ঘরবাড়ি ভেঙ্গে ফেলা ইত্যাদি চলতে থাকে। ওইদিনও গ্রামবাসী-পুরুষেরা জঙ্গলে পালিয়ে যায়। ধরা পড়ে মেধাবিনী, উমানীবালা, চেঁচিবালা ও পাতালীবালা দেশী। এর পাঁচ দিনের মধ্যে আরও ত্রিশ-চল্লিশজন কৃষক ধরা পড়ে। বহু কৃষকের নামে পুলিশ নানা ধরনের মিথ্যা মামলা সাজিয়ে হয়রানি, অত্যাচার ও ধরপাকড় শুরু করে। পুলিশি অত্যাচারে এবং গ্রামের গোয়েন্দাদের ষড়যন্ত্রে এদের সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করা হয়। প্রত্যেককেই দিনাজপুর জেলে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। জেলে বন্দী থাকার সময় সাঞ্জুলাল দেশীর মৃত্যু হয়।[২৩]

৫. সাম্প্রদায়িকতা

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক "দি বেঙ্গল লোকাল সেলফ গভর্ণমেন্ট অ্যাক্ট" ঘোষণার ফলে সরকারের প্রশাসনিক ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে এবং জনগণকে প্রশাসনে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তিন ধরণের স্থানীয় কমিটি গঠন করে। জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড এবং ইউনিয়ন কমিটি। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক স্বায়ত্ত শাসন প্রদান ঘোষণার ফলে ভারতবাসীর মনে রাজনৈতিক আকাঙ্খার জন্ম নেয়। উনিশ শতকের শেষের দিকে নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) ও জামালউদ্দিন আফগানীর কলকাতা সফর (১৯৮০-৮১) এবং তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলোচনার প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সূচনা হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে চিড় ধরে। ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারই ফলশ্রুতিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে সারা ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিতকরণের ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তিক্ত আকার ধারণ করে। এ সময় (১৯০৭ থেকে ১৯১৭) জাতীয় কংগ্রেসের অস্তিত্ব অপেক্ষা এর অস্তিত্বহীনতাই বেশি প্রকট হয়ে পড়ে। ১৯০৭-এ সুরাটে কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে পড়ায় কংগ্রেসের অস্তিত্ব প্রায় লুপ্ত হতে বসে। ১৯১৬-তে কংগ্রেস পুনর্জীবিত হয়, যখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ লক্ষ্ণৌতে সম্মিলিত হয়ে ভারতের জন্য স্বায়ত্ত শাসনের দাবি তোলে।

বিশ শতকের প্রথম দশক (১৯১০), দ্বিতীয় দশক (১৯২০) এবং তৃতীয় দশকে (১৯৩০) ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় ভারতীয়দের হাতে ক্রমে ক্রমে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষমতালাভের প্রতিযোগিতা প্রবলভাবে বেড়ে যায়। স্থানীয় সরকারেও এ প্রতিযোগিতা তীব্র আকার ধারণ করে। বুকাননের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে (১৮০৮) দিনাজপুর জেলায় অধিকাংশ ধনী কৃষকই মুসলমান। ১৮৮০ সালের 'ফেমিন রিপোর্ট'-এ প্রমাণিত হয় যে ওই সময় পাটের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাবার ফলে পূর্ববাংলায় পাটচাষিরা যথেষ্ট লাভবান হয়েছে।

সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমান কৃষকরা মহাজনদের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিজেরাই টাকা ধার দেওয়ার সামর্থ্য অর্জন করেএবং মহাজনদের কবল থেকে নিজেদের ঋণ মুক্ত রাখতে সমর্থ হয়। পূর্বের তুলনায় কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে মুসলমান কৃষক, জমির মালিক ও ব্যবসায়ীদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়। মুসলমান জোতদার কৃষকদের আর্থিক সচ্ছলতার দরুণ তাদের সন্তানদের স্কুল, কলেজে পড়ায়। স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শেষ করে তাদের সন্তানরা কেউ পারিবারিক ধানের ব্যবসা গ্রামের স্কুলের শিক্ষকতার পেশায় যোগ দেয়। ১৯১৮ সালের প্রথম দিকে ধান, চাল ও পাটের মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে কমে যায় এবং কাপড় ও অন্যান্য শিল্পজাত জিনিসের দাম বেড়ে যায়। বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে মহামন্দার কারণে উন্নত জীবন যাপনে অভ্যস্ত দিনাজপুরের স্বচ্ছল মুসলমান কৃষকের একটা বড় অংশ ধান ও পাট উৎপাদনে ব্যর্থ হয় পরিণামে আবার তারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শিক্ষাবিস্তারের ফলে অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় আর্থিক দূরবস্থায় হিমসিম খায় এবং অধিকার আদায়ে তারা রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়। সরকারি চাকুরি লাভের জন্য তারা সোচ্চার হয়, স্থানীয় সরকারের নির্বাচনেও বর্ণহিন্দু জমিদার-জোতদারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। মুসলমান ধনী কৃষকেরা, যাদের রায়ত মহাজন বলা হয় দিনাজপুরের কোনও কোনও অঞ্চলে তারা সামাজিক ভাবে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। দিনাজপুরের ইউনিয়ন বোর্ডের অধিকাংশ প্রেসিডেন্টই ছিল (১৯৩০-৪০) মুসলমান জোতদার। ৩০ একর থেকে ৩০০ একর পর্যন্ত তাদের জমি ছিল। জাতীয় রাজনীতির চেয়ে স্থানীয় উন্নয়ন ও সমস্যাবলী সমাধানে তারা বেশি সচেষ্ট ছিল। গ্রামে হিন্দু-মুসলমান গরীব কৃষকের কাছে এই রায়ত মহাজনরাই ছিল দেবতার মত। তারা ঋণ পরিশোধের জন্য মামলা ঠুকে দিতো না, ঋণ গ্রহীতাদের হেনস্থা করত না। দিনাজপুর জেলায় ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত জমিদার মহাজন সমর্থিত বর্ণহিন্দুদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থেকে ইউনিয়ন, লোকাল ও জেলাবোর্ডকে মুক্ত করে মুসলমান রায়ত মহাজনরা তাদের নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে শুরু করে। হিন্দু জমিদার, জোতদার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্টকারীদের বিরুদ্ধে তারা মুসলমান আলেম সমাজ, চাকুরি ও পেশাজীবীদেরও সক্রিয় সমর্থন লাভ করে। এই সময় (১৯২০ - ১৯৪০) থেকে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত সংস্কার কর্মসূচীর দিকে লক্ষ্য রেখে মুসলমানরা তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তারা যৌথ নির্বাচনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং সরকারের কাছে পৃথক নির্বাচনের দাবি জানায়। দিনাজপুর জেলায় কৃষকদের বেশির ভাগই ছিল মুসলমান আর মহাজন ও জমিদারদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। পুরো অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল হিন্দুদের হাতেই, ফলে স্থানীয় সরকারে তাদের প্রভাব ছিল প্রবল।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখানের পর মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে স্থানীয় সরকারে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের উর্ধ্বগতি বৃদ্ধি পায়। ১৯২৫ সাল থেকে ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড, এ সব

প্রতিষ্ঠানে হিন্দুদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ পাল্টে যায়। মুসলিম প্রতিনিধিত্বের কখনও ওঠা কখনও নেমে যাওয়ায় সুস্পষ্ট হয় যে সাম্প্রদায়িকতা তখনকার রাজনীতিতে ও সমাজে ছিল বাস্তব বিষয়। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে (১৯২০-১৯৪০) দিনাজপুর জেলার বেশির ভাগ অঞ্চলেই মুসলমান রায়ত মহাজনদের শক্তিশালী অবস্থানের ফলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সমাজ জীবনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। স্থানীয় সরকারে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির ফলে দিনাজপুরের মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা বেড়ে যায় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার চাহিদা ও আশা আকাঙ্খা বৃদ্ধি পায়। এই সাম্প্রদায়িক চেতনা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়কে দ্বিধাবিভক্ত করে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ড থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেবার ফলে দিনাজপুরের গ্রাম্য ব্যবসায়ী, মাঝারি কৃষক, ধনী কৃষকরা স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ লাভ করে। ফলে শহরের ভদ্রলোক শ্রেণি, উকিল, মোক্তার, কমিশনার, জেলাকর্মকর্তাদের দৌরাত্ম্য গ্রামবাসীদের প্রতি হ্রাস পেতে থাকে। এইসময় মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি ওঠে এবং মুসলমান ভোটাররা প্রকাশ্যে সম্প্রদায়গতভাবে ভোট প্রদান করার দাবি তোলে। মুসলমান নিয়ন্ত্রিত সংবাদ পত্রগুলিতে তখন দাবি উঠতে থাকে হিন্দু মুসলমান প্রার্থীদের ভোট পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রহণ করার। হিন্দু নিয়ন্ত্রিত স্থানীয় সরকারে মুসলমানদের চরম অবজ্ঞা এবং হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে মুসলমান নেতাদের ব্যর্থতা সাম্প্রদায়িক চেতনা আরও ঘনীভূত করে তোলে। এই সাম্প্রদায়িক চেতনা ভোটের কাজে, গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগণের অভাব অভিযোগে, কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণে ও দাঙ্গার উসকানিতে জাগ্রত হয়ে উঠে।[২৪]

১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত দিনাজপুর জেলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রবল আকারে রূপ নিলে সাম্প্রদায়িক বড় ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হয়, কিন্তু দাঙ্গা হয়নি। খিলাফত -আন্দোলন এখানকার জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করে। দিনাজপুরের মৌলবী-মৌলানা মাত্রই 'খেলাফত' নেতাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশের রাজনৈতিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে এখানকার মুসলমানরা সহজভাবেই গান্ধিজিকে নেতৃত্বপদে বরণ করে নিয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন এবং কারাবরণও করেছেন। তাছাড়া, এখানকার কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা তাঁদের কাজে, ভালবাসা ও মমতায় মুসলনমানদের মনকে জয় করেন এবং কৌশলে মুসলমানদের গণআন্দোলনকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ১৯শে জানুয়ারি গান্ধিজির নেতৃত্বে খিলাফৎ আন্দোলন সম্পর্কে ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনা এবং সারাদেশে তার আগে 'খিলাফত দিবস' পালন (১৯১৯, ১৭ অক্টোবর) এব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দিনাজপুর জেলাতেও তার প্রভাব পড়ে। দিনাজপুর নাট্যসমিতিতে খিলাফৎ নেতাদের ডাকা একটি সভায় হিন্দু-মুসলমান সমাজের প্রচুর লোক উপস্থিত হয়। সতীশচন্দ্র রায় ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন। দিনাজপুরে 'আহলে হাদিস সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালের ১৬ ও ১৭ই এপ্রিল। মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মৌঃ

হাছান আলী, মৌঃ আফতাবউদ্দিন চৌধুরী, মৌঃ আমিরউদ্দিন চৌধুরীর উদ্যোগে সম্মেলনে উপস্থিত হন মৌলানা আকরম খাঁ। ১৩২৭ সালে প্রকাশিত *মাসিক দিনাজপুর পত্রিকা* (বৈশাখ সংখ্যা, পৃ. ২১) লিখেছে "পর্ব উপলক্ষে গো-হত্যা অবশ্য করণীয় বলিয়া মুসলমান শাস্ত্রে নির্দেশ নাই বলিয়া এক অধিবেশনে এ বিষয়ে জনৈক বক্তা উর্দ্দুভাষায় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। শিক্ষানীতি, লীগ ও আহেলে হাদিস সকল সভা সমিতিতেই হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর মিলিয়া মিশিয়া দেশের কার্য করার চেষ্টা দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। যাহাতে হিন্দু মনে কোন আঘাত না লাগে সেই বিষয়ে মুসলমান বক্তা ও উদ্যোক্তাগণ বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। এইভাবে মিলিয়া মিশিয়া উভয়জাতি দেশের কল্যাণ এবং ভগবানের আর্শীবাদ লাভ করিতে থাকুক - ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।"

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর শহরের গোলকুঠি মাঠে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত উদ্যোগে বঙ্গীয় প্রদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও জালালুদ্দিন হাসেমী সম্মেলনে আসেন। সম্মেলনের প্রদর্শনীতে রায়গঞ্জ করোনেশন স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক যুগান্তর দলের সভ্য অরুণ ঘোষ তাঁর স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে শরীরচর্চা ও ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। ১৯৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু-মুসলমান তিক্ততা বেড়ে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার রাজনীতিতে পরিণত হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে প্রাদেশিক রাজ্যসভার নির্বাচনের আগে দিনাজপুর জেলায় 'কম্যুনাল এওয়ার্ড' সাম্প্রদায়িক দাবি এবং আইনসভার সদস্য পদের আসন ভাগ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠিত হয় (১৯৩৫)। হিন্দু-মুসলমান যৌথ উদ্যোগে মুসলমানদের পক্ষে জননেতা মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ও হিন্দুদের পক্ষে জননেতা যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর উপর এই সভায় আসনভাগের গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নেবার ভার পড়ে। সভায় উপস্থিত হন বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং দিনাজপুরের মহারাজা জগদীশ-নাথ রায়। বিষয়সূচী নিয়ে সম্মেলন শুরু হতে না হতেই সভায় তুমুল হৈ চৈ শুরু হয় এবং তর্কবিতর্ক ও উত্তেজনা দেখা দেয়। মুসলমান নেতাদের দাবি দিনাজপুর জেলায় মুসলমান সংখ্যাগুরু, নীতি অনুযায়ী মুসলমানদেরই আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের জন্য আসন সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত এবং হিন্দু নেতারা তা অস্বীকার করে ও দাবির যুক্তি খণ্ডন করে। পরে হিন্দু-মুসলমান নেতাদের মধ্যস্থতায় আইন সভায় আসনভাগের বিষয়টি আপস হয়। বিষয়টি আপস হলেও দিনাজপুরে হিন্দু-মুসলমান তিক্ততা তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৩৭ সালে এসেম্বলি ইলেকশনে কংগ্রেস প্রার্থী হন বালুরঘাটের কংগ্রেস নেতা নলিনীকান্ত অধিকারী। নিশীথনাথ কুণ্ডু কংগ্রেসে মনোনয়ন না পাওয়ায় স্বতন্ত্রপ্রার্থীরূপে কংগ্রেসের বিপক্ষে দাড়ান এবং চৌষট্টি ভোটে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে জয়লাভ করেন। কংগ্রেসের বিরোধিতা করায় নিশীথনাথ কুণ্ডু কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত হন।[২৫]

দিনাজপুর জেলার অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে প্রেমহরি বর্মণ ও রায়গঞ্জ থেকে শ্যামাপ্রসাদ বর্মণ জয়ী হয়ে এম. এল. এ নির্বাচিত হন। সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রবলভাবে

দানা বাধায় দিনাজপুরের কংগ্রেস নেতা আবদুল্লাহিল বাকী ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং দিনাজপুরে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ১৯৩৭ সালে দিনাজপুরে রাজনৈতিক বন্দিরা মুক্তি পাওয়ার পর এ সালেই গঠিত হয় কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি। গুণদা মজুমদারের নেতৃত্বে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার পর দিনাজপুরে বিভূতি গুহ, সুশীল সেন, গুরুদাস তালুকদার, বরদাকান্ত চক্রবর্তী, শচীন্দু চক্রবর্তী, দীনেশ রায় প্রমুখের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'কমিউনিস্ট পার্টি অব্ ইন্ডিয়া', সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে এবং মৃণাল ঘোষ, ক্ষেমেশরঞ্জন চ্যাটার্জী, নৃপেন রায়, তারাপদ ধর এবং অমর রাহার উদ্যোগে গঠিত হয় 'কমিউনিস্ট লীগ অব্ ইন্ডিয়া'। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত দিনাজপুরে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আসেন, মুসলিম লীগের সৈয়দ বদরুদ্দোজার (১৯৩৮), জমিয়ত-ই-ওলামায়ে-হিন্দের নেতা মওলানা আয়াদ সোবহানী (১৯৩৮), কমিউনিস্ট পার্টির মুজাফ্ফর আহমেদ, সোমনাথ লাহিড়ী, বঙ্কিম চ্যাটার্জী, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ও বিশ্বনাথ মুখার্জী (১৯৩৮)। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। দিনাজপুরে কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট লীগ অব্ ইণ্ডিয়া এ যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ঘোষণা করে যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার কার্য চালায় এবং এর ফলে কমিউনিস্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়া এবং কমিউনিস্ট লীগ অব্ ইণ্ডিয়ার দিনাজপুরে অনেক সদস্যই গ্রেপ্তার হন।

দিনাজপুর জেলায় সাম্প্রদায়িক বিষ-বাষ্প যখন তুঙ্গে সে সময় (১৯৩৯) জেলায় আসেন হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। দিনাজপুর শহরের কংগ্রেস ময়দান এবং রায়গঞ্জে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব দিনাজপুরে তখন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। কংগ্রেস নেতা নরেন্দ্র মোহন সেন ১৯৪১ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে সত্যাগ্রহ করে সারা জেলায় ঘুরে বেড়ান। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর জীবন অবসান হয়। বাংলার লীগ মন্ত্রিসভার সে সময় প্রবল দাপট। দিনাজপুরের প্রেমহরি বর্মণ ওই লীগ মন্ত্রিসভাতে কিছুদিনের জন্য আবগারি মন্ত্রী হন।

৬. ভারত ছাড়ো আন্দোলন

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় মৌলানা আজাদের সঙ্গে গান্ধিজির 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' নিয়ে আলোচনার সূচনা হয়। সাতশো শব্দ সম্বলিত ব্রিটিশ 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি প্রচার করেন। বোম্বাইতে কংগ্রেসের সভায় জওহরলাল নেহরু ক্রিপস মিশন ও ভারত ছাড়ো প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন এবং ওই সালের ৯ই আগস্ট কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটিতে বিপুল ভোটাধিক্যে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৬-২০ আগস্ট অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের সভায় কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হয়। সারা দেশে গান্ধিজি পরিচালিত ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আগস্ট বিপ্লব আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গদেশে '৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন তীব্র রূপ নেয় মেদিনীপুর ও দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে। দিনাজপুর

জেলার বালুরঘাটে এই দুঃসাহসিক ঘটনা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। প্রথম থেকেই ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আগস্ট বিপ্লব অহিংস পথে না গিয়ে সহিংস আন্দোলনে পরিণত হয়। গান্ধিজি ও কংগ্রেস নেতারা এই দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন নাই। ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল এ আন্দোলনে সামিল হন। শুধু এম. এন. রায় পরিচালিত র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের মতাদর্শ অনুযায়ী এই আন্দোলনে যোগ দেয় নাই। দিনাজপুরের কমিউনিস্ট পার্টি সে কারণে এ আন্দোলন থেকে বিরত থাকে।

দিনাজপুর শহরের বহু বিপ্লবী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যরা ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের আগেই রাজনৈতিক ডাকাতি, নরহত্যা ও নিরাপত্তা বন্দী রূপে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার হন। এঁদের মধ্যে আর. সি. পি. আই-য়ের (আগে সি. এল. আই) নৃপেন রায়, অরুণ ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, গোপালী চ্যাটার্জী, অজিত রায়, বিমল চ্যাটার্জী, হীরেন গোস্বামী, কমলা চক্রবর্তী, কামাখ্যা ভট্টাচার্য, মহেন্দ্রনাথ সরকার, গোপেশ ভট্টাচার্য, রমেশ বিশ্বাস, চিত্ত দে, অমল ঘোষ, নগেন দাস, নরেন দাস, পশুপতি চক্রবর্তী, রবি ভট্টাচার্য, সত্যেন ঘোষ, কানু মণ্ডল, তারাপদ ধর, মনোরঞ্জন সেন, কটরু বর্মণ, নিধিরাম রায়, নিমাই সমাজদার, ঊষারঞ্জন মিত্র, স্বর্ণকমল মিত্র, সুশীল চক্রবর্তী, মহেন পাঠক ও অনিল ঘোষ। আগস্ট আন্দোলনের সভা ও সভায় আপত্তিকর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিত্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বাবু রায়, সমর রায়, কুমার রায়, বিশ্বনাথ প্রসাদ, সুশীল দাস এই সময় গ্রেপ্তার হন। মেয়েদের মধ্যে নিরুপমা চ্যাটার্জী ও শিবানী মিত্র (সি. এল. আই-এর এঁরা সদস্যা)। এই সময় কংগ্রেসের যামিনীকান্ত গোস্বামী, রাধেশ ভট্টাচার্য, লোকেন্দ্র সেন, সন্তোষ গাঙ্গুলী ও বিভূতি দে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে বিনা বিচারে আটক হন। আর. এস. পি-র সুধীর অধিকারী ও অনন্ত সরস্বতী গ্রেপ্তার হন। দিনাজপুরের কংগ্রেস নেতা অনিল বিশ্বাস আত্মগোপন করে আগস্ট বিপ্লবের কাজ করার সময় গ্রেপ্তার হয়ে নিরাপত্তা বন্দী হন।[২৬] এ সব কারণে দিনাজপুর শহরে 'ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সাফল্য লাভ করতে পারে নাই।

বালুরঘাটে 'ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন সরোজ রঞ্জন চ্যাটার্জী। এতবড় গণআন্দোলন সংগঠিত করার পশ্চাতে ছিল বালুরঘাট ও আশপাশ অঞ্চলের এক ব্যাপক কৃষক শ্রেণি, যারা ছিল এই আন্দোলনের মূল শক্তি। আন্দোলনে অংশ নেয় ৭ হাজার রাজবংশী কৃষক, ৩ হাজার ওঁরাও চাষি, অন্যান্য ১ হাজার।[২৭] বালুরঘাটের কংগ্রেস, অনুশীলন, আর. এস. পি. ও ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিটি রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনে অংশ নেন। মূল নেতৃত্বে থাকেন সরোজরঞ্জন চ্যাটার্জী। তাঁর বাড়িতেই আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি ও পরিকাঠামো ঠিক করার জন্য একটি সভা হয়। সভায় উপস্থিত হন কালীচরণ সান্যাল, পুলিন বিহারী দাসগুপ্ত, বিশ্বরঞ্জন সেন, শৈলেন দাস, দীনেশ দাস, রমা সমাজদার এবং হিলির প্রতাপ মজুমদার। পুলিন বিহারী দাসগুপ্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকায় তিনি গোপনে আন্দোলন বিষয়ে ছাত্রদের ও গ্রামে গ্রামে আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য সভা করেন। বালুরঘাট হাইস্কুলের সুবীর সেন, গোপাল সরকার, রুণু গুহ, রাধামোহন মহন্ত, বীরেন

দে সরকার, অবনী তলাপাত্র, হেমেন ভট্টাচার্য, বেনু গুহ এইসব ছাত্ররা একদিন টিফিন পিরিয়ডে বেরিয়ে হাইস্কুল মাঠে জড়ো হয়ে বন্দেমাতরম, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, ইংরেজ ভারত ছাড়ো শ্লোগান দেয়। ১২ সেপ্টেম্বর অপর একটি মিটিং-এ বালুরঘাট শহর দখল করে স্বাধীনতার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই সভায় উপস্থিত হন সরোজ রঞ্জন চ্যাটার্জী, পুলিন বিহারী দাসগুপ্ত, বিশ্বরঞ্জন সেন, শৈলেন দাস, নিত্যানন্দ পাল, আবদুল জব্বার মিঞা, ফাল্গুনী মিত্র, বীরেন দে সরকার, চিত্ত বোস, বেনু গুহ, রাধামোহন মহন্ত ও সুটকা বাগচী। বালুরঘাট শহর দখল করে স্বাধীনতার ঘোষণার পরিকল্পনা এঁরাই মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন।[২৮]

ঘটনার আগের দিন ১৯৪২ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর পোর্শা, পত্নীতলা, তপন, ধামইরহাট, হিলি, জলঘর, ভাড়িলা, বালাপুর, লস্করহাট বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে কৃষকের দল ছুটেছে ডাঙ্গীর খেয়াঘাটে। গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ মানুষই ছিল মুসলিম লীগের সমর্থক। দলে দলে কৃষক কোথায় ছুটেছে কৌতূহলী হয়ে তাদের কেউ জিজ্ঞেস করলে দলপতিরা উত্তরে দেয় তারা বালুরঘাটে যাচ্ছে ধান আনতে। কৃষকদের বেশির ভাগেরই কাধে বাঁক, হাতে বস্তা ও লাঠি আবার কারও কাছে তীর ধনুক। ওইদিন রাতে সরোজরঞ্জন বিধবার ছদ্মবেশ ধারণ করে ডাঙ্গীর খেয়াঘাটে উপস্থিত হয় এবং স্বরূপ ধারণ করেন।[২৯] ঘটনার দিন ১৯৪২ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ভোরে সাইকেলে করে নিরঞ্জন বিশ্বাস, নিত্যানন্দ পাল, হেমেন ভট্টাচার্য ও গোপাল সরকার বালুরঘাট শহরে একটি ইস্তাহার বিলি করেন। সেই ইস্তাহারে মহিলাদের সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি থেকে বের হতে নিষেধ করা হয়। ডাঙ্গীর খেয়াঘাটে জড়ো হওয়া কর্মীদের মিছিল নিয়ে যাত্রার প্রাক্কালে, সকাল ৭টায় একটি উঁচু ঢিবিতে দাড়িয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে সরোজ রঞ্জন বলেন, আমার প্রিয় সহকর্মী ও সহযোদ্ধা বন্ধুগণ, ভারতবর্ষ আমাদের দেশ, আমরা এদেশের স্বাধীনতা হারিয়েছি, ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে। সেই হারানো স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার অধিকার আছে কি নাই? সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার কণ্ঠে দৃপ্ত ঘোষণা, আছে। কিন্তু কেমন করে? ইংরেজের কামান বন্দুক আছে, পুলিশ ও সেনা বাহিনী আছে। কিন্তু আমাদের কি আছে? ওমনি হাজার হাজার মানুষের সামনে একজন দরিদ্র আদিবাসী কৃষক ফুলচাঁদ মুর্মু হুংকার দিয়ে বলে ওঠে, কেনে? হামা ঘরের নাঠি আছে। নাঠি পিঠা করে সপলোক ঠাণ্ডা কোরে দেমো! সরোজ রঞ্জন বলেন, না। আমাদের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র আমাদের সংকল্প। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করবো, না হয় মরবো কিন্তু পিছু হটবো না। আমাদের যুদ্ধ জিগীর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।' হাজার হাজার কণ্ঠে আকাশ বিদীর্ণ হয়। চাষির দল বলে, হো, হো, হামরা করিমো, কি মরিমা। ভারত মাতা কি জয়। বন্দেমাতরম্। সরোজরঞ্জন বলেন, আমরা দুর্গ ভাঙ্গবো, দখল করব। এখন আমার সঙ্গে যারা যাবেন তাদের অনেকেই হয়ত নাও ফিরতে পারেন। আপনারা যারা মরদ তারা আমার সঙ্গে চলুন আর যারা মরদ নয় তারা এখনি ফিরে যান। ওমনি কৃষকেরা বলে, না-না। হামরা সগলাই মরদ। মরিতো তোমার সাথে মরিমোঁ, বাঁচিতো তোমার সাথে বাঁচিমো। হামাঘরের যুদ্ধে

ভারত শ্রমিক-কৃষক পার্টির প্রথম সম্মেলন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ শহরে সারা ভারত কৃষক সম্মেলন হয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার কৃষক সমিতি। ১৯৩৭-৩৮ সাল থেকেই দিনাজপুর জেলার গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি গড়ে ওঠে। কালী সরকার, বিভূতি গুহ, সুশীল সেন, শচীন্দু চক্রবর্তী, বসন্তলাল চ্যাটার্জী, অজিত রায়, জনার্দন ভট্টাচার্য, গুরুদাস তালুকদার, হাজী মহাম্মদ দানেশ প্রমুখ নির্মম বাস্তব জীবন থেকে কৃষকদের টেনে আনে কৃষক সমিতিতে। কৃষকরা অনুভব করে এ-জীবন পাল্টানো যায়। ব্যাপক জাগরণ দেখা দেয় কৃষকদের ভেতর। শ্লোগান ওঠে, 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক', 'জমিদারী প্রথা ধ্বংস কর', 'লাঙ্গল যার জমি তার' ইত্যাদি। প্রচার অভিযান, সভা-সমিতি ও সমাবেশের মাধ্যমে কৃষক সমিতি প্রথমে ছোট ছোট দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামে। ১৯৩৯ সালের শুরু থেকে এই আন্দোলন দিনাজপুরের কৃষক সমাজকে এক নতুন অভিজ্ঞতায় দীপ্ত করে। ওই সনের শেষের দিকে শুরু হয় আধিয়ার আন্দোলন। এ সব আন্দোলনের ভেতর দিয়ে কৃষক সমিতির ছত্রছায়ায় তৈরী হয় হাজার হাজার ভলান্টিয়ার বাহিনী। দিনাজপুর জেলায় এই কৃষক জাগরণে ভূ-স্বামীর দল আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। জমিদার-জোতদার ও রায়ত মহাজনদের ধান হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। হাট মেলার তোলাবাটি, পশুর লেখাই খরচ এসব আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারা পুলিশ ডাকে। শুরু হয় দমন পীড়ন আর কৃষকদের উপর শত শত লুঠের মালা। বহু কৃষক গ্রেপ্তার হয়।

১৯৩৯ সালের শেষের দিকে দিনাজপুর জেলায় হাটের ও মেলার জমিদার বা ইজারাদাররা ব্যাপারিদের কাছ থেকে অত্যধিক হারে তোলা আদায় করে। সামান্য তরিতরকারী থেকে আরম্ভ করে কাপড়-চোপড় ও গরু-মহিষ পর্যন্ত সবকিছু বিক্রির জন্য প্রতি হাটে তাদের এই খাজনা দিতে হয় এবং এর ফলে তোলাবাটি চাপের বিরুদ্ধে কৃষকদের মধ্যে এবং বিক্রেতাদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাধে। কৃষক সমিতি তখন তোলাগণ্ডির হার কমানোর জন্য আন্দোলন শুরু করে। তোলাবাটি আন্দোলন অচিরে ব্যাপক ও বিস্তৃত রূপ নেয়। হাটে হাটে, মেলায় মেলায়, হাজার হাজার মানুষের মিছিল। মিছিলের আওয়াজে আর দাপটে হাট-মেলা তোলপাড় হয়ে যায়। কৃষকদের মধ্যে ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করা হয়। প্রত্যেক ভলান্টিয়ারের হাতে একখানা করে বাঁশের লাঠি থাকে। তোলাবাটি জুলুমের বিরুদ্ধে শ্লোগান ওঠে—কৃষকদের দ্রব্যের তোলাবাটি নাই, গরু-মহিষ-ছাগলের লেখাই কমাতে হবে। সংঘবদ্ধ কৃষক ও জনতার কাছে জমিদারের লোকেরা অসহায় হয়ে পড়ে। জোতদার, জমিদার, হাটের মালিকরা পুলিশ ডাকে। সংঘর্ষ বাদে। কৃষকরা মরিয়া, সংঘর্ষ ও বাধাবিঘ্নে ভয় পায় না। জমিদাররা বাধা দিলে কৃষকরা হাট ভেঙ্গে নিয়ে কৃষকদের হাট বসায়। এমনি ঘটনা ঘটে দিনাজপুর জেলার লাহিড়ী হাট, পতিরাজ হাট, হরিরামপুর হাট ও ফুলবাড়ি হাটে। দিনাজপুর জেলার 'বাহিন' জমিদারের রায়গঞ্জ কাছারিতে হরিরামপুর হাটমালিক ও বাহিন জমিদারের ইজারাদারকে কৃষকেরা হাটে তোলাবাটি-র জুলুমের জন্য দুই ঘন্টা আটক করে রাখে, পরে 'বাহিন' জমিদার কৃষকদের দাবি মানতে বাধ্য হয়। তোলাবাটি জুলুমের বিরুদ্ধে পতিরাজ জমিদারবাবুর কাছে কৃষকেরা বিরাট মিছিল সহ দাবি পেশ করে এবং

পতিরাজের হাটমালিক শেষপর্যন্ত কৃষকদের দাবি মেনে নেয়। পতিরাজ হাটের রাস্তায় ছিরামতি নদীর উপর বাঁশের পুল পাড়ানির জন্য ইজারাদাররা কৃষকের উপর জমা পয়সা আদায়ে অত্যাধিক জুলুম করে এবং সেই জুলুমবন্ধের জন্য কুশমণ্ডি অঞ্চলের কৃষকেরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করে এবং জয়যুক্ত হয়। কুশমণ্ডি থানার সরলা হাটে পশু বেচাকেনার লেখাই খরচ কমে যায়।

তোলাবাটি আদায় থেকে জমিদারদের একটা মোটা অঙ্কের আয় কমতে থাকে। হাটে হাটে তোলাবাটি আন্দোলনে কৃষকরাই অনেকখানি সফল হয়। এবার তোলাবাটি আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে মেলাগুলিতে। দিনাজপুর জেলায় বড় বড় মেলা বসত। একমাস ধরে বিশাল মেলাগুলিতে তোলাবাটি, খাজনা, পশু বেচাকেনার লেখাই, বেশ্যা তাঁবু বসিয়ে পয়সা উপার্জন, এসব মিলে চাষিদের লুণ্ঠনের বেশ একটা আয় জমিদার প্রভুদের। কৃষক সমিতি আঘাত হানে লুণ্ঠনের এই প্রাণকেন্দ্রে। তোলাবাটি ও লেখাইয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন চরমে ওঠে। মেলায় মেলায় কৃষক সমিতি ঘাঁটি বসায়, ক্যাম্প বসে জমিদার-পুলিশেরও। দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গি থানার ডেমডেমির কালীর মেলাই ছিল সমগ্র বঙ্গদেশে প্রথম তোলাবাটি আন্দোলনের পীঠস্থান। প্রচুর গরু-মহিষ ওঠে এ মেলায়। বড় বড় বিভিন্ন ধরনের দোকান বসত। কৃষক সমিতি তোলাবাটি বন্ধ ও গরু-মহিষের ছাপাই কমানোর শ্লোগান দিয়ে এ মেলায় আন্দোলনের সূচনা করে। মেলার মালিক পক্ষের হয়ে পুলিশ বাধা দেয়। জারি হয় ১৪৪ ধারা। কৃষকেরা এক রাত্রিতেই মেলা ভেঙ্গে গরু-মহিষ, দোকান-পাট সহ এক মাইল দূরে নিজেদের জায়গায় মেলা বসায়। সেখানে কৃষক সমিতির সীল দিয়ে বিনা ছাপায় গরু-মহিষ বিক্রী হয়। এ মেলা থেকে পরবর্তীতে 'কৃষক সমিতির হাট' নামে জেলায় কয়েকটি নতুন হাট বসে। এরকম একটি হাট ছিল কালিয়াগঞ্জ থানার অধীনে সুরল গ্রামে। ঠাকুরগাঁর আলোয়খোয়া মেলায় তোলাবাটি আন্দোলন তরঙ্গ শীর্ষে ওঠে। মেলায় ১৪৪ ধারা জারি হওয়া সত্ত্বেও জমিদার বাহিনীর সঙ্গে কৃষকের সংঘর্ষ হয়। ফলে, গরুর হাট জমিদারের জায়গা থেকে ভেঙে নিয়ে নদীর ওপারে জলপাইগুড়ি জেলায় বসানো হয়। দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অধীনে পতিরাম ঠাকুর মেলায় তোলাবাটিকে কেন্দ্র করে গোলযোগের আশঙ্কা দেখা দেয়। এ মেলার মালিক ছিলেন রঘুনন্দন ঠাকুর। তিনি আগেই থানার দারোগা-পুলিশ ডেকে এনে মেলায় টহল দেবার ব্যবস্থা করেন। ভলান্টিয়ার দেখলেই দারোগা ও পুলিশ তাদের শাসায়। ভলান্টিয়ারের দল এর ফলে উৎসাহিত হয়। শেষে জমিদারের সঙ্গে কৃষক সমিতির নেতাদের আলোচনার পর তোলাবাটি বন্ধ করে দেয় এবং পশু কেনা-বেচায় লেখাই খরচ অর্ধেক করে দেয়। গঙ্গারামপুর হাট ছিল 'গুড়ের হাট' নামে পরিচিত। এখানে প্রচুর গুড়ের আমদানী হয়। এই গুড় বিক্রেতাদের কাছে তোলাবাটির হার ও জুলুম ছিল অত্যাধিক। জমিদার হাড়ি প্রতি ১ আনা করে তোলা আদায় করেন। ওই হাটে ক্ষেমেশ চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে তোলাগণ্ডি আন্দোলন শুরু হয়। কৃষকেরা জমিদারকে তোলা দিতে অস্বীকার করে এবং হাট ভেঙ্গে হাটের পশ্চিমদিকে বকুল তলায় হাট লাগায়। অবস্থা বেগতিক দেখে জমিদার হরগোপাল নন্দী চৌধুরী নারায়ণপুরে গিয়ে ক্ষেমেশ চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করেন এবং আপস মীমাংসায় হাড়ি

প্রতি ১ আনার পরিবর্তে ১ পয়সা তোলা আদায় স্থির হয়। কুশমণ্ডি থানার অধীনে শিয়োল হাটে এক হাজার লাঠিধারী ভলান্টিয়ার জমায়েত হয়। জমিদারের লোকেরা খবর দিয়ে হাটে পুলিশ আনে। পুলিশ এসে প্রথমে ভলান্টিয়ারের কাছ থেকে লাঠিগুলি চেয়ে নেয়। প্রত্যেক ভলান্টিয়ার লাঠিগুলি পুলিশের কাছে জমা দেবার পর পুলিশ ওই লাঠি দিয়ে ভলান্টিয়ারদের পিটিয়ে হাট থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং ভলান্টিয়ারদের অনেকেই পালিয়ে যায়। এরপরের হাটে লাঠিধারী সংঘবদ্ধ ভলান্টিয়ার দেখে ওই হাটে পুলিশ পুনরায় বাধা দিতে সাহস পায়নি। ফলে তোলা আদায় বন্ধ হয়ে যায়।

লাহিড়ী স্টেটের বোঁচাগঞ্জ মেলায় আন্দোলনের শুরুতেই জমিদার দারোগা ও পুলিশের সাহায্যে ভলান্টিয়ারদের নানারকম ভয় দেখায়। স্বেচ্ছাসেবকরা তাতে বিন্দুমাত্র দমে না। তোলাবাটি বন্ধের ব্যাপারে জমিদারের তরফ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে কৃষক সমিতি মেলা ভেঙ্গে অন্যত্র নিয়ে যাবার উদ্যোগ করে। সে সময় জমিদারের নায়েব কৃষক নেতাদের ডেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি গেট দিয়ে ঢুকিয়ে কাছারি ঘরের গেটের দরজা বন্ধ করে দেয়। দরজার বাইরে দাড়িয়ে বুলেট ভর্ত্তি ক্রসবেল্ট লাগানো রাইফেলধারী জমিদারের দুই সিপাহী। ঘরের ভেতরে নায়েব মশায় কৃষক নেতাদের খুন করে গুম করার ভয় দেখায়। অন্যদিকে, দরজা খুলে কৃষক নেতাদের বাইরে বের করে দেবার জন্য ভলান্টিয়ারের দল চীৎকার করতে করতে হাতের লাঠির ঘায়ে গেটের দরজা ভেঙ্গে ফেলবার উপক্রম করে। ঘরের ভেতরে কৃষক নেতাদের অনমনীয় মনোভাব দেখে শেষমেষ নায়েব তোলাবাটি বন্ধ ও লেখাই খরচ অর্ধেক করতে রাজী হয়। নবাবগঞ্জ থানার অধীনে বুড়াশিবের মেলায় তোলাবাটি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ এ মেলায় কৃষক সমিতির ৭ জন আসামীকে ধরে নিয়ে যায়। কৃষক নেতাদের ধরে নিয়ে যাবার সময় ভলান্টিয়াররা বাধা দেয় এবং এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে লাঠি ও তীর ধনুকধারী ভলান্টিয়ার ইনক্লাব ধ্বনি আর নাগরা বাজাতে বাজাতে ছুটে আসে। পুলিশ আসামীদের নিয়ে ছুটতে ছুটতে কোনও ক্রমে আবতাবগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে আশ্রয় নেয়। দুই জন আসামী নেতাকে ইতিমধ্যে ভলান্টিয়ার বাহিনী ছিনিয়ে নেয়। নবাবগঞ্জ থানার দারোগাবাবু ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। আসামীদের ধরে সদলবলে এ. এস. আই. বোর্ডের ঘরে বন্দী করে। দারোগাবাবু গরম মেজাজে ভলান্টিয়ারদের শাসান। ভলান্টিয়াররা তখন দারোগাকে আক্রমণ করে। দারোগা ঘোড়া ছুটিয়ে কোনরকমে প্রাণে বাঁচেন। পরে পুলিশের সঙ্গে ভলান্টিয়ার বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ হয়। ওই অসংগঠিত যুদ্ধে ভলান্টিয়াররা হেরে যায়। এরপর শুরু হয় কৃষকদের উপর নির্যাতন। একমাস ধরে জমিদার-জোতদার, মহাজন আর তাদের দোসর পুলিশ, অত্যাচার চালায়। হাতি দিয়ে ঘরবাড়ি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়, আগুন জ্বালিয়ে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। তিনশো কৃষক গ্রেপ্তার হয় এবং তিনজন জেলখানায় মারা যায়।[৩৪]

হাটের ও মেলার তোলাবাটি আন্দোলন সফল হবার পর কৃষকদের চিন্তা ও চেতনার মোড় ঘুরে যায়। কমিউনিস্ট পার্টির ওপর তাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য বেড়ে যায়। ক্রমান্বয়ে কয়েকটি আন্দোলনে সফলতা লাভের পর কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ বেড়ে যায়।

পার্টির নেতারা দেখে কৃষকরা সংগঠিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে বেশ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এবার পার্টি বড় বড় জমির মালিক বা জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যাওয়া ঠিক করে। আধিয়ারদের ওপর বড় বড় রায়ত মহাজন বা জোতদার নানা কৌশলে অমানবিক শোষণ চালায়। এর ফলে জোতদার আর আধিয়ার-শ্রেণি বিরোধের চেতনা, আধিয়ারদের মধ্যে তীব্র আকার ধারণ করে। ধানকাটার মরসুম, অগ্রহায়ণ মাস এসে পড়ে। পার্টি শ্লোগান তোলে, নিজ খামারে ধান তোল, কর্জা ধানের সুদ নাই, আধিয়ারের কাছে আবওয়াব নেওয়া চলবে না, আধিয়ারকে জমি হতে উচ্ছেদ করা চলবে না, বেগার প্রথার অবসান চাই, আধিয়ারের ওপর শারীরিক নির্যাতন চলবে না ইত্যাদি। আধিয়ার কৃষকরা মিছিল করে হাটে-বাজারে যায় আর এইসব শ্লোগান তোলে। পার্টি ও কৃষক নেতারা সভা-মিটিং করে। কৃষকদের এই ন্যায্য দাবির প্রতি সমর্থন জানানোর জন্য মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের আবেদন জানানো হয়। দিনাজপুর শহরের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে সাড়া পাওয়া গেলেও কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ নেতাদের কাছে সাড়া পাওয়া যায় না। চাষের মরসুমে জোতদাররা তাদের যে ধান কর্জ দেয় তার ওপর অতিরিক্ত হারে সুদ আদায় করে, মণে আধমণ হিসাবে অর্থাৎ 'দেড়া' বাড়িতে। আধিয়ারা এই সুদের হার কমাতে চায়। শুরু হয় আধিয়ারি আন্দোলন (১৯৪০-৪১)

কৃষকেরা ধান কাটতে শুরু করে এবং নিজ নিজ বাড়িতে ধান তোলে। জোতদাররা কৃষকদের দলবদ্ধ দেখে বাধা দেবার সাহস পায় না। আন্দোলন জোতদারদের আতঙ্কিত করে তোলে। তারা দেখে তাদের ধান হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। পুলিশ ডাকে। শুরু হয় দমন পীড়ন, আধিয়ার জোতদার সংঘর্ষ আর কৃষকের নামে শত শত লুঠের মামলা। কৃষকদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। তারা স্ত্রী-পুরুষ দলবদ্ধ হয়ে এই গ্রেপ্তারে বাধা দেয় এবং তা সত্ত্বেও বহু কৃষক গ্রেপ্তার হয়। ফলে কৃষকরা আরও মরীয়া হয়ে ওঠে। আন্দোলন বিদ্রোহের রূপ নেয়। কৃষকদের সংগঠিত শক্তি দেখে সরকারি কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন। সরকারি চেষ্টায় সরকারি কর্মচারীর মধ্যস্থতায় জোতদার ও কৃষকদের মধ্যে আপস মীমাংসা হয়। আধিয়ারের সুবিধামত মধ্যস্থ জায়গায় জোতদার খামার করে এবং সেখানে ফসল তোলা হয়। জোতদাররা কর্জ ধানের সুদ নেয় না, যেহেতু ধান কর্জা দেবার সময় শুকনো থাকে আর কর্জা শোধের সময় ধান কিছুটা ভিজে ভিজে থাকে, সে জন্য প্রতি ২০ কাঠায় তিন কাঠা হিসাবে অতিরিক্ত ধান দেওয়া হয়, আধিয়ারের কাছ থেকে কোনরকম আবওয়াব নেওয়া বন্ধ, বেগার নেওয়া বন্ধ ও জোতদার আধিয়ারকে শারীরিক নির্যাতন যেন না করে আধিয়ার-জোতদারদের এই আপস কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়। সেখানে জোতদারদের প্রতিনিধি এবং আধিয়ারের প্রতিনিধিরা দস্তখত করেন। এই আপসনামা ছাপিয়ে কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়। জোতদার-আধিয়ারদের বিরুদ্ধে যে সব মামলা রুজু করে তাও তুলে নেওয়া হয়। হাজতে থাকা কৃষকেরা মুক্তি পায়। কৃষকদের আবার একদফা বিজয় হয়। আধিয়ার আন্দোলন সবচেয়ে তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করে দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমায়।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের প্রথম দিকে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি থানার

অধীনে লালপুর ডাঙ্গায় দিনাজপুর জেলা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে কৃষকনেতা মুজফফ্‌র আহমেদ, কৃষক প্রজাপার্টির এম. এল. এ. আবদুল ওয়াহেদ, দিনেশ লাহিড়ী প্রমুখ যোগদান করেন। সম্মেলনে জমিদারী প্রথা বিনা খেশারতে উচ্ছেদ, জোতদারদের শোষণ, অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা ইত্যাদি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪০ সালের ৮ ও ৯ জুন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা'র চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যশোহরের পাঁজিয়াতে। সম্মেলনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় দিনাজপুরের তোলাবাটি ও আধিয়ার আন্দোলন কৃষকদের বিশেষ করে আধিয়ারদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি করে। কৃষক সমিতি কৃষকদের একান্ত আপন বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান হয়ে দাড়ায়। কৃষক সভার হাজার হাজার সদস্য নারী-পুরুষ সকলেই কৃষক বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক হয় এবং লাল ঝাণ্ডা ও লাঠি নিয়ে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি তুলে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় এবং পারস্পরিক অভিবাদনের সময় তারা বলে কমরেড, ইন্‌কিলাব।

ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে (১৯৩৮) ল্যাণ্ড রেভেন্যু কমিশনের (১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২১শে মার্চ) প্রকাশিত রিপোর্টের রায় থেকে জানা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে কৃষকসভার দাবি কমিশন মেনে নেওয়ার ফলে যশোরের পাঁজিয়া সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত প্রাদেশিক কৃষকসভা জানায়, ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ মুখ্যত জমিদারদের স্বার্থেই কাজ করেছে এবং জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবি নিয়ে আরো জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তাঁরা আহ্বান জানান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার গার্ণার নামে অপর এক সাহেবকে দিয়ে আরও একটি কমিশন বসান। কমিশনের রিপোর্টে গার্ণার জমিদারী প্রথাকে উচ্ছেদের প্রশ্নটি কিছুদিন মুলতুবী রাখেন। ফলে কৃষক সমিতি ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেয়। গার্ণার কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ পাবার দাবি নিয়ে চাষীরা সংঘবদ্ধ হতে থাকে।

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. *দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ,* স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা ১৪০৪, পৃ. ১৩০।

২. যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, *মাসিক দিনাজপুর পত্রিকা* : আশ্বিন ১৩১২ সাল, পৃ. ৪৮, ৫২, ৯৩, ১১১ এবং *পৌষ-মাঘ* সংখ্যা ১৩১২, পৃ. ১৪, ১৯, ২১; বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, *দিনাজপুর জেলার রাজনৈতিক ইতিহাস*, পৃ. ৪৪।

৩. *মাসিক দিনাজপুর পত্রিকা*, ফাল্গুন, ১৩১২, পৃ. ৩৩, ৩৪, ৩৫।

৪. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭; *মূল্যায়ন*, নরহরি কবিরাজ সম্পাদিত, নববর্ষ সংখ্যা, ১৯৮৯, পৃ. ৫৯।

৫. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
ধনঞ্জয় রায়, 'দিনাজপুর জেলায় অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতির কথা (১৯০৫ - ১৯৩৮)', *মূল্যায়ন*, নরহরি কবিরাজ সম্পাদিত, নববর্ষ সংখ্যা, ১৯৮৯, পৃ. ৫৯।

৬. *হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ভারতের বিপ্লব কাহিনী* (প্রথম খণ্ড), পৃ. ৭৭।

৭. দীনেশ রায়, সাক্ষাৎকার, তারিখ ২২. ৫. ১৯৮৮।

৮. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সাক্ষাৎকার, ১৩.৪.১৯৮২। দীনেশ রায় ২২. ৫. ১৯৮৮। পরেশ নিয়োগী, ১৮.৬.১৯৮৪। ধীরেন ব্যানার্জী, ২৮.১.১৯৭৯; বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১, ৬২ এবং *মূল্যায়ন*, নরহরি কবিরাজ সম্পাদিত, নববর্ষ সংখ্যা, ১৯৮৯, ধনঞ্জয় রায়, 'দিনাজপুর জেলার অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতির কথা', পৃ. ৫৩-৭৩।

৯. চিন্ময় চৌধুরী, *অগ্নিযুগের বিপ্লবী মামলা*, পৃ. ২০৮, ২০৯; বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪; *মূল্যায়ন*, নববর্ষ, ১৯৮৯, ধনঞ্জয় রায়, 'দিনাজপুর জেলার অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতির কথা', পৃ. ৬৩, ৬৪।

১০. চিন্ময় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫, ২০৬, ২০৭; বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩; সতীশচন্দ্র পাকড়াশী, *অগ্নিদিনের কথা*, পৃ. ৯৬; সাক্ষাৎকার আবদুল কাদের চৌধুরী, ১০ই অক্টোবর, ১৯৯৫; সুধীরকান্ত অধিকারী, ১৮.৪.১৯৮৮; 'দিনাজপুর জেলার অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতির কথা', *মূল্যায়ন*, নববর্ষ ১৯৮৯, পৃ. ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪। বিপ্লবী সুধীরকান্ত অধিকারী সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন হিলি রেল স্টেশনে দার্জিলিং মেল ট্রেনের ডাক লুঠের ঘটনার আগে ১৯৩৩ সালের ৮ অক্টোবর গোপনে বালুবাড়ির চন্দ্রকান্ত অধিকারীর বাগানবাড়িতে একটি গুপ্ত সভা হয়। ওই সভায় ঠিক হয় যে হিলি স্টেশনে মেল ব্যাগে যে টাকা আসে ওই টাকার ব্যাগ লুঠ হবে। রাত্রি ৮/৯ টার সময় ১ ঘণ্টার মত ওই সভা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, বরদা চক্রবর্তী, সীতানাথ দে, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও সুধীরকান্ত অধিকারী। এঁদের মতামতের উপরেই হিলি স্টেশনে ডাক লুঠের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অনুশীলন সমিতির নির্দেশে সীতানাথ দে ৎ সুধীরকান্ত অধিকারী এই সিদ্ধান্তের পরদিন দিনাজপুর থেকে কাশীতে সংগঠনের কাজে রওনা হন। উল্লেখ্য যে, ১৯৩২ সালে বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা সীতানাথ দে পলাতক অবস্থায় দিনাজপুরে আসেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিপ্লবীদের পরম বন্ধু কালীতলার ডাক্তার মনি মৈত্র অতি গোপনে তাঁকে চিকিৎসা করে সুস্থ করেন। রচনাকার।

১১. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫।

১২. ধনঞ্জয় রায়, 'দিনাজপুর জেলার অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতির কথা (১৯০৫-১৯৩৮)' *মূল্যায়ন*, নরহরি কবিরাজ সম্পাদিত, ১৯৮৯, নববর্ষ সংখ্যা, পৃ. ৬৪ থেকে ৭৩।

১৩. যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, *মাসিক দিনাজপুর পত্রিকা*, পৌষ-মাঘ ১৩২৭, পৃ. ৫২, ৫৩।

১৪ আমার পিতৃদেব মতিলাল রায়ের কাছে শুনেছি সেদিনের নানা স্মৃতি কথা। বড়বন্দরস্থিত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ির পাশেই ছিল আমাদের বাড়ি। বাবার স্মৃতি তর্পণে জেনেছি যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, অনিল বিশ্বাস, জ্যোতিষ সেন, বসন্তকুমার চ্যাটার্জী, নির্মাল্য সেন প্রমুখ আরও কয়েকজন কর্মীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের একটি গ্রুপ ফটো যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে তোলা হয়। ১৯৯৫ সালে দিনাজপুরে গিয়ে সে ফটো খোঁজ করেও পাইনি। রচনাকার।

১৫. ধনঞ্জয় রায়, 'দেশনায়ক যখন উত্তরবঙ্গে', *দৈনিক বসুমতী*, ২০ জানুয়ারি, ২০০২, পৃ. ৩; বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪, ৫৫।

১৬. ধনঞ্জয় রায়, উত্তরবঙ্গ (উনিশ ও বিশ শতক), পৃ. ১৭৮; 'পুরনো সেই দিনের কথা এবং বালুরঘাট', কালীকর, *দধীচি*, উত্তরাধিকার বালুরঘাট, পৃ. ৪৬।

১৭. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

১৮. সাক্ষাৎকার : মণীন্দ্র চক্রবর্তী, করদহ, তারিখ ২২.১১.১৯৮৭ ; শেখ গমীর উদ্দিন সরকার, বোল্লা, তারিখ ২৮.১১.১৯৮৮ ; নিত্যরঞ্জন চৌধুরী, ভিখাহার, তারিখ ২২.১১.৮৭।

১৯. ধনঞ্জয় রায়, *বিশ শতকের দিনাজপুর মন্বন্তর ও কৃষক আন্দোলন*, পৃ.১৩।
২০. ধনঞ্জয় রায় (সম্পাদিত), *উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন*, পৃ. ১১০; ১৯৪৬-৪৭ সালে তেভাগা সংগাম চলাকালে ঠাকুরগাঁ মহকুমা হাকিমের দপ্তরে এক কৃষক সমাবেশে জাল মহম্মদ প্রজার গাছকাটা আন্দোলনের বিষয়টি শচীন্দু চক্রবর্তীকে বলেছিলেন (কৃষক নেতা শচীন্দু চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২৩.২.১৯৯৪) রচনাকার।
২১. ধনঞ্জয় রায়, *বিশ শতকের দিনাজপুর মন্বন্তর ও কৃষক আন্দোলন*, পৃ. ১৪; বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।
২২. ধনঞ্জয় রায়, *বিশ শতকের দিনাজপুর মন্বন্তর ও কৃষক আন্দোলন, পৃ.* ১৫,১৬ ; নির্মল চন্দ্র চৌধুরী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশী সম্প্রদায়*, পৃ. ৬৬, ৬৭।
২৩. ধনঞ্জয় রায়, *'গঙ্গারামপুরের কৃষক বিদ্রোহ', মূল্যায়ন*, ২৩ বর্ষ শারদীয় ১৩৯৪, পৃ. ১০৯, ১১০।
২৪. মোহাম্মদ শাহ, 'স্থানীয় সরকারে মুসলিম বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব ঃ দিনাজপুর ১৯১৩- ১৯৪০', *দিনাজপুর ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ৯১, ৯২।
২৫. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।
২৬. ঐ, পৃ. ১, ৭২, ৭৩।
২৭. *ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গ*, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে প্রকাশিত, ১৯৯২, পৃ. ২২।
২৮. দীপংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পালা বদলের পালা, উত্তরাধিকার বালুরঘাট', *দধীচি*, পৃ. ১৬৫।
২৯. 'বালুরঘাটে ভারতছাড়ো আন্দোলনের এক ঝলক', রাধামোহন মহন্ত, *সাপ্তাহিক আত্রেয়ী*, ৪০ বর্ষ ১ সংখ্যা।
৩০. *সাপ্তাহিক আত্রেয়ী*, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৪১, ৪২ সংখ্যা (৩৯ বর্ষ)।
৩১. দীপংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পালা বদলের পালা, উত্তরাধিকার বালুরঘাট', *দধীচি*, পৃ. ১১৬, ১১৭।
৩২. ঐ, পৃ.১১৭।
৩৩. ধনঞ্জয় রায়, 'দিনাজপুরের জমিদার ও বিশ শতকের সামন্ত বিরোধ আন্দোলন', *বালুরঘাট বার্তা*, শারদীয় সংখ্যা, ১৪০১, পৃ. ১৮
৩৪. ধনঞ্জয় রায়, *বিশ শতকের দিনাজপুর কৃষক আন্দোলন*, পৃ. ২২, ২৩, ২৪।

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষক অভ্যুত্থান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : ১৯৪২ - ১৯৪৫

১. আকাল, নতুন বণিকশ্রেণি ও অতি মুনাফা

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশের সর্বত্র জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য ভারতের বাইরে থেকে ভোগ্যপণ্যের আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ না থাকায় জিনিসপত্রের মূল্য অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন নতুন নতুন এয়ারপোর্ট, যুদ্ধোপকরণ তৈরির জন্য শিল্প, রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ প্রভৃতি কাজে হাতে দেওয়া হয়। ফলে বাজারে পণ্যের সরবরাহ না বেড়ে টাকার যোগান বেড়ে যায় এবং মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। যুদ্ধের সময় সাধারণ সরবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, দেশের মধ্যে ছোট ছোট রেলপথগুলি বন্ধ হয়ে যায়। সরকার পোড়ামাটি (Denial Policy) অনুসরণ করার ফলে জলপথ ও স্থলপথে পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলেও জিনিসপত্রের দাম চরমে ওঠে। যুদ্ধের সময় ফাটকাবাজি, দালালি ও কন্ট্রাক্টারি করে অনেকে অল্প সময়ে প্রচুর টাকা রোজগার করেন। একশ্রেণির মানুষের হাতে প্রচুর টাকা জমে ওঠার দরুন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। দেশে কালোবাজারি ও মজুতদারি অসম্ভব বেড়ে যায়। এসবের ফলে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় শোষণমুখী চরিত্র এবং ওই ব্যবস্থাপুষ্ট অসাধু ব্যবসায়ী ও কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্য, আকালের বছরেই জন্ম দেয় সামাজিক ভাঙনের মারাত্মক প্রক্রিয়া।

১৯৪২ সালের মে-জুন মাস থেকে বাংলার সব জেলাতেই ধানের দাম বাড়তে শুরু করে। জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৪২) অক্ষ শক্তির অংশীদার হিসাবে তার সশস্ত্র অগ্রগতি সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ত্বরান্বিত করেছিল এবং জাপানি আক্রমণের ফলে ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতে চালের আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিযুক্ত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য ইংরেজ শাসকরা বাঙলায় উৎপন্ন চালমজুতের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ সরকারের এই 'ডিনায়েল পলিসি' অনুসারে সমুদ্র তীরের অঞ্চলগুলি থেকে প্রায় ১ লক্ষ মণ চাল সরানো হয়েছিল ইংরেজ সৈন্যদের জন্য। এমনকি নৌকা ও মটর লঞ্চগুলিও নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল যেন বাঙলার অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে খাদ্য না পৌঁছাতে পারে। তাই দেখা

যায়, ১৯৪৩ সালের গোড়া থেকে যখন চালের দাম হু হু করে বেড়ে যেতে থাকে তখন শতকরা ৭৫ জন চাষির ওই দামে চাল কেনা নাগালের বাইরে চলে যায়। এই চাল শেষ পর্যন্ত জমা হয় আড়ৎদার, চোরাকারবারি, মজুতদার, সরকারি এজেন্ট এবং মিলমালিকদের হাতে এবং নতুন বণিক শ্রেণির সৃষ্টি হয়।

১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুণ সরকার আগে থেকেই এজেন্ট মারফত হাট থেকে চৌদ্দ আনা একটাকা মণের ধান দুই টাকা মণ দরে কিনতে থাকে। অধিক মূল্যের প্রলোভনে সাধারণ কৃষকরা তাদের সব ধান বিক্রি করে দেয়, ফলে গ্রামাঞ্চলে ধানের টান ছিল। ধানের টান থাকা সত্ত্বেও জোতদার - জমিদারদের গোলায় ধান ছিল প্রচুর। ধানের অভাবে পোর্শা, পত্নীতলা, ধামইরহাট, তপন ও বালুরঘাট থানার বিভিন্ন অঞ্চলে চলছিল তীব্র খাদ্য সংকট। বহু ভুখা মিছিল সম্মিলিতভাবে এ সময় জোতদার-মহাজনদের কাছে গিয়ে ধান কর্জ চাইলে নানা অজুহাতে কর্জ ধান থেকে কৃষকদের তারা বঞ্চিত করে শাস্তি দেয়। এরই বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে খাঁপুরের চিয়ার-সাই-শেখ প্রায় ১০ হাজার কৃষকের একটি ভূখা মিছিল বালুরঘাট সদরে নিয়ে গিয়ে তাদের দাবি জানিয়ে এসেছিল। এই সময় দিনাজপুর জেলায় ধানচালের ব্যবসায় ফাটকাবাজি, চোরাকারবারি, মজুতদারি করে নতুন এক বণিক শ্রেণির আবির্ভাব হয়। হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা এই নতুন বণিক শ্রেণি আকালের বছরে প্রচুর ধান-চাল বিক্রি করে অতি মুনাফা করে। গুজরাতি হাতি ও গুজরাতি সামিয়ানা কেনার জন্য এদের আকুলতা। একদিকে অনাহারী মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির, অপরদিকে এই নতুন গজিয়ে ওঠা নতুন বণিকদের মধ্যে চলছে ফুলবাড়ির লালপুর ডাঙ্গায় হাতির বাইচ খেলার প্রতিযোগিতা। আর গজিয়ে ওঠা নতুন মুসলমান বণিকেরা তখন ওই জরি বসানো গুজরাতি সামিয়ানা টাঙিয়ে ঘন ঘন ধর্মীয় জলসায় মেতে থাকেন।

১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে দিনাজপুর জেলার ৩০টি থানার মধ্যে ঠাকুরগাঁ মহকুমার বালিয়াডাঙ্গি, অটোয়ারী, পীরগঞ্জ, এই ৩টি থানা এবং বালুরঘাট মহকুমার পত্নীতলা, তপন, পোরসা, ধামইরহাট, এই চারটি থানাসহ মোট ৭টি থানার প্রায় ৯শো বর্গমাইল এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দিনাজপুর জেলায় ওই সাতটি থানায় যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল তার মূলকারণ খাদ্য ঘাটতি নয়, কারণটি ছিল লীগ সরকার, জোতদার ও মহাজনদের ষড়যন্ত্র। ঠাকুরগাঁ ও বালুরঘাট এ দুটি মহকুমা ছিল মুসলিম লীগের শক্তিশালী ঘাঁটি। এরমধ্যে ঠাকুরগাঁ মহকুমায় ছিল মুসলিম জোতদারদের আধিপত্য বেশি। এই জোতদারদের বেশির ভাগই মুসলিম লীগের সমর্থক। ঠাকুরগাঁর ন'পাড়া ইউনিয়ন বোর্ডে সোলেমান মিঞা নামে এক প্রভাবশালী লীগ সমর্থক ইস্পাহানি কোম্পানির তরফে প্রচুর ধান কিনেছিল। গভর্ণমেন্টের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রি সুরাবর্দী সাহেবের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ ছিল এই গ্রামের। সোলেমন মিঞা তার প্রভাব খাটিয়ে এলাকা থেকে যত বেশি সম্ভব ধান সংগ্রহ করছিল। ধান সংগ্রহের বিষয়ে ভয় ও জুলুম দেখাতেও তার দ্বিধা ছিল না। এভাবে জুলুম দেখিয়ে বীরগঞ্জ থানা থেকে তিন মাইল দূরে ঠাকুরগাঁ সদরে দু'জন মুসলিম জোতদারের গোলা থেকে প্রচুর ধান সংগ্রহ

করে ঠাকুরগাঁ সদরে জড়ো করে। বীরগঞ্জ থানা থেকে ৫ মাইল দূরে বটতলী হাটের কাছে ছিল জোতদার বিলকু মিঞা। সোলেমন মিঞা গভর্ণমেন্টের মাধ্যমে তাঁরও ধান সিজ করে। এ ঘটনায় এলাকার মানুষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। কারণ, বিলকুমিঞা সমাজে একজন দয়ালু মানুষ রূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি রহিমুদ্দিন হাইস্কুল নামে ওই গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এরকম একজন সমাজসেবীর ধান সিজ করার ফলে এলাকায় ভীষণ গোলমাল ছড়িয়ে পড়ে এবং তার ওপর দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক।

বিলকু মিঞার সিজ করা ধান সুরাবর্দীর এজেন্টরা বা সরকারি কর্মীরা গাড়ি এনে যাতে নিয়ে যেতে না পারে তার জন্য গ্রামবাসী রাস্তা কেটে দেয় এবং রাস্তার দুই ধারে বাঁশঝাড়ের জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেয়। গ্রামবাসীরা পরে গোলার তালা খুলে ওই ধান নিয়ে যায়। সোলেমন মিঞার উদ্যোগে ঠাকুরগাঁতে যে ধান সংগ্রহ করে জমা করা হয়েছিল, সেই ধান সরকার শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে নি। বাধ্য হয়ে তা অল্পমূল্যে বিক্রি করতে হয়েছিল। এ ঘটনায় ওই অঞ্চলের মুসলিম লীগ সরকারের সমর্থকদের মধ্যে লীগ সরকারের প্রতি আস্থা নষ্ট হয়ে যায়।[১]

ঠাকুরগাঁ মহকুমার গড়েয়া গ্রামটি ছিল পাটের প্রধান কেন্দ্র। দুর্ভিক্ষে এখানে বেশ কিছু লোক মারা যায়। গ্রামের বড় জোতদার প্রিয়নাথ দাস চৌধুরী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুণ সামরিক বাহিনীর জন্য এর ১০/১২টি ধানের গোলা সরকার আগে থেকেই সিজ করে রেখেছিল। মন্বন্তরের সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জোতদার প্রিয়নাথ দাস চৌধুরীকে এক আদেশ দিয়ে বলে রেখেছিল, "Dont remove the paddy"। এদিকে প্রিয়নাথ দাসের ধানের গোলাগুলি সরকার যাতে সিজ করে না রাখে তার জন্য কৃষকরা রাজশাহী বিভাগের কমিশনার মিস্টার গ্রাহাম ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এম. ইসলামকে টেলিগ্রাম করে অগ্রিম জানিয়ে দেন। কৃষকরা বলেন, প্রিয়নাথ দাস চৌধুরীর ওই গোলাগুলি সরকার যদি সিজমুক্ত না করেন তাহলে কৃষকরা নিজ হাতে গুদামের তালা ভেঙ্গে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষকে বাঁচানোর জন্য ওই ধান তাদের মধ্যে বিতরণ করে দেবে। প্রেরিত টেলিগ্রামটিতে একটি নির্দ্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ ছিল। কয়েকদিন পরে নির্দ্দিষ্ট টেলিগ্রামের তারিখটি পার হয়ে যাওয়ার পর ওই অঞ্চলের এক বিশাল কৃষকবাহিনী ডাক্তার বিভূতি দে-র নেতৃত্বে সিজ করা ধানের গোলা ভেঙ্গে প্রচুর ধান নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিয়েছিল।

ঠাকুরগাঁ-র মহানপুরে জনৈক জোতদারের ৭/৮ হাজার মণ ধান জোতদারের ম্যানেজার হেমন্তকুমার দাস বিক্রী করে দেয় মিল মালিক মাধোলাল আগরওয়ালার কাছে। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর লোকজন ধান নেবার জন্য বস্তা, দাড়িপাল্লা ও গরুর গাড়ী আনে। ধান মাপার কাজ শুরু হবে। মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে হেমন্ত দাস গোলার ধান বিক্রী করে দিচ্ছে। মহানপুরের আশপাশ গ্রাম থেকে যেমন শিবপুর, ন'পাড়া, জয়নন্দ ইত্যাদি এলাকার কৃষকেরা দলে দলে ঘটনাস্থলে জমায়েত হয়। কৃষকদের সম্মিলিত শক্তির কাছে জোতদারের লোকজন বাধা দিতে পারে না। সাঁওতাল নেতা কুড়িয়া মণ্ডল ও জয়কৃষ্ণ বর্মণের নেতৃত্বে কৃষক বাহিনী প্রথমে গোলার ম্যানেজার

হেমন্ত কুমার দাসের হাত দুটি দড়ি দিয়ে বাঁধে তারপর তালার চাবি কেড়ে নেয়। পরে গোলার তালা খুলে কৃষকরা সমস্ত ধান বের করে নিয়ে যায়। ধান লুণ্ঠনের পর সরকারি উদ্যোগে ব্যাপক ধরপাকড়ের প্রস্তুতি চলে। জোতদার নিরবে থাকার দরুণ এ ঘটনায় কেউ ধরা পড়ে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরের বছর (১৯৪৪ সন) ধানের আবাদ ভাল হলে কৃষকরা যে যতখানি ধান নিয়েছিল, সেই ধান নিজেরাই ওই গোলায় এনে শূন্য গোলা আবার ভর্তি করে দিয়ে যায়।[২]

ঠাকুরগাঁ-র পশ্চিমাংশ থেকে এ সময় (১৯৪৩) খাদ্যের অভাবে বহু আধিয়ার নামমাত্র মূল্যে জমি বিক্রি করে নিঃস্ব ভূমিহীন দাসে পরিণত হয়ে গ্রাম ত্যাগ করে কাজের সন্ধানে ভুটানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। দুর্ভিক্ষের বছরে ঠাকুরগাঁ সদরে কৃষক সমিতির উদ্যোগে একটি বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভা থেকে কৃষক কর্মীদের নিয়ে একটি দল মহকুমা হাকিমের সঙ্গে দেখা করে সরকারি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। দিনাজপুরের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বীণা সেন, বাণী মিত্র, অলকা মজুমদার প্রমুখের নেতৃত্বে গ্রাম ও শহরের প্রায় পাঁচ'শ মহিলাকর্মী খাদ্য ও রিলিফের জন্য ডি. এম.এর কাছে ডেপুটেশন দেন। আকালের বছরে দিনাজপুরের কৃষকেরা ভুলে গিয়েছিল হিন্দু-মুসলমান শ্রেণিভেদ। তারা সংঘবদ্ধ হবার সচেতনতা লাভ করেছিল। কৃষক রমণীরা প্রতিবাদী মানসিকতা ফিরে পেয়েছিল। যারা মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস পেতো না দুর্ভিক্ষ তাদের লড়াইয়ের শক্তি জুগিয়েছিল। দুর্ভিক্ষের বছরে দিনাজপুর জেলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে দিনাজপুরের পুলহাটে লঙ্গরখানা খোলা হয়। তাঁরা চাল-ডাল সংগ্রহ করে নিজ হাতে রান্না করে হাজার হাজার মানুষকে খাইয়েছিল। দুধ ও বার্লি বিতরণ করে দুর্ভিক্ষ পীড়িত শিশুদের রক্ষা করে। শিশুদের জন্য কাপড়ের থান সংগ্রহ করে সমিতির মহিলা সদস্যারা ফতুয়ার মত জামা তৈরী করে বিতরণ করেন। কম্বল, নেপাক্রিন, কুইনিন প্রভৃতিও বিতরণ করেন। স্নেহলতা গাঙ্গুলী, সাবেরা খাতুন, সাবিত্রী সেন, দীপ্তি বাগচী, মানসী রায়, আশালতা চক্রবর্তী, আশা সেন, গ্রামের সদস্যাদের মধ্যে কণ্ঠমণি বর্ম্মনী, রোহিণী বর্ম্মনী প্রমুখের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা স্নানাহার ভুলে গিয়ে রিলিফের কাজ করে। ঠাকুরগাঁ মহকুমার কৃষককর্মী রাজেন সিং, রামলাল সিং, কম্পরাম সিং, বাঁধাল সিং, ভুলিরাম বর্মণ, গেদেরা মহামেদ, রিলিফের কাজে এসব কর্মীদের শারীরিক অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছিল। পুষ্টির অভাবে অনেকের শরীর ভেঙে যায়।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের পর থেকে ধান-চালের দাম বেড়ে যায় বিশেষ করে রেলস্টেশনের কাছের হাটগুলিতে। ওই ধান রেলযোগে যেখানে সেখানে চলে যায়। রেলস্টেশনের কাছের হাটগুলিতে ১০ টাকা পর্যন্ত আর দূরের হাটগুলিতে ৫/৬ টাকা মণ দরে ধান বিক্রি হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে গৃহস্থ ভয় পায়। গোলার ধান চলে গেলে অনাহারে মরতে হবে। এই আতঙ্কে অনেকেই আর ধান বিক্রি করে না। এ সময় দিনাজপুর জেলায় সাধারণ চালের প্রতি মণ ছিল ১৬ টাকা থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত। ধান-চালের ব্যবসায় ফাটকাবাজি, চোরাকারবারি, মজুতদারি অসম্ভব বেড়ে

যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক সভা জেলার বিভিন্ন স্থানে মজুত উদ্ধার আন্দোলন শুরু করে। জেলায় সবচেয়ে বড় মজুত উদ্ধার আন্দোলনের ঘটনা ঘটেছিল বালুরঘাট থানার অধীনে পতিরামের খাঁপুরে। সেখানে জমিদার অসিত মোহন সিংহ রায়ের কাছারির মাস মাহিনার চাকর ছিল ক্ষেতমজুর চিয়ারসাই শেখ, খাঁপুর কৃষক সমিতির নেতৃস্থানীয় একজন। গ্রামের শেষ প্রান্তে রাস্তার পাশেই তার বাড়ি। সিংহরায় জমিদারীর কাছারি থেকে গাড়ি বের করতে হলে চিয়ারসাইয়ের বাড়ির রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তা নেই। একদিন শেষরাত্রে সে শুনতে পেল অনেক গরুর গাড়ীর কিচির-মিচির আওয়াজ। সন্দেহে চিয়ারসাই তড়াক করে লাঠি হাতে রাস্তায় বেরিয়ে এল। দেখল সিংহ রায় কাছারি থেকে সারিবন্দী ধান বোঝাই গাড়ি চলেছে হিলিতে চোরাবাজারে বিক্রয়ের জন্য। লাঠি বাগিয়ে সে রুখে দাঁড়াল — 'খবরদার, দাঁড় করাও গাড়ী, একটি গাড়ীও না যায়।' চিয়ারসাইকে ডিঙিয়ে যায় এমন সাহস ওই অঞ্চলে কারও ছিল না। এরপর শুরু হয় চিয়ারসাইকে কখনও হুমকি—কখনও তোয়াজস্তুতির পালা। কোন কিছুতেই টলবার পাত্র চিয়ারসাই নয়। এদিকে সকাল হয়ে এল। খাঁপুর, কৈগ্রাম, গুটিন আশপাশের গ্রাম থেকে সংবাদ পেয়ে চিয়ারসাই-এর দলবল সব লাঠি হাতে এসে দাড়াতে আরম্ভ করল তার পাশে। অসিতমোহন সিংহ রায়ের রাতের অন্ধকারে আর ধান পাচার করা সম্ভব হল না। এ ঘটনার সংবাদ পৌঁছায় স্থানীয় নেতা পতিরামের কৃষ্ণদাস মহন্তের কাছে। তিনি খাঁপুরে এলেন। জমিদারবাবু তাঁকে ডেকে পাঠালেন কাছারি বাড়ির দোতালায় তাঁর খাস কামরায়। অসিত মোহনের আঙ্গুলে হীরের আংটি ঝলমল করছে। কৃষ্ণদাস মোহন্তকে দেখে জমিদার অসিত মোহন ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে একেবারে কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'চিয়ারসাই আমার চাকর। সে কিনা আমার গাড়ী আটকাল।' মোহন্ত বললেন, 'দেশে দুর্ভিক্ষ, মানুষ না খেয়ে মরছে। ওই ধান আপনার বিক্রি হবে সরকারি দরে।' সমস্ত দিন ওই ধান বিলি করে সন্ধ্যার পর তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। দিনাজপুর জেলার কৃষকদের মধ্যে এই ঘটনা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।[৩]

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে সরবরাহ মন্ত্রি সোহরাওয়ার্দী আসেন জন সংহতির আবেদন নিয়ে। দিনাজপুর বড়মাঠে আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণে তিনি বলেন, "আমাকে সরবরাহ মন্ত্রি বলিয়া আপনারা জানেন, আসলে আমি সর্বহারাদের মন্ত্রি। মানুষের সেবা করার জন্য আমি আল্লাহর কাছে শক্তি কামনা করি।" এই সময়কাল (১৯৪২-১৯৪৫) ছিল বাংলার আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক অস্থিরতা ও বিপ্লব বহ্নির যুগ। এই অস্থিরতা ও বিপ্লব বহ্নি সূচিত হয় ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সোভিয়েতের উপর আক্রমণ (১৯৪১), সামুদ্রিক তুফানে মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণার প্রলয়ংকর ধ্বংসলীলা (১৯৪২), আগস্ট আন্দোলন (১৯৪২) ও দুর্ভিক্ষ মহামারী (১৯৪৩) থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ায় দিনাজপুর জেলায় রাজনৈতিক বন্দীরা সব ছাড়া পেতে থাকেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হবার পর পাকিস্তানই যে মুসলমানদের উন্নতির একমাত্র উপায় লীগ নেতারা এই প্রচার শুরু করেন। দিনাজপুর

জেলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এই প্রচার শুরু হয় যে 'পাকিস্তান' অর্থ হিন্দু জমিদারের উৎপীড়ন থেকে মুসলিম চাষির মুক্তি। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ যখন এককভাবে বাংলার প্রাদেশিক সরকার গঠন করেন, সে সময় থেকেই লীগ নেতাদের প্রভাব বাড়তে শুরু করে এবং পাকিস্তানই চূড়ান্ত লক্ষ্য চিহ্নিত হয়। এরই পরিণামে কংগ্রেস-লীগ মতান্তর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্ককে আরো জটিল করে তোলে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু মহাসভা অখণ্ড হিন্দুস্থানের ইস্যু নিয়ে মুখর হয়ে উঠে। এ সময় দিনাজপুরে আসেন কমিউনিস্ট নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (১৯৪৪) ও ভবানী সেন (১৯৪৫)। মুসলিম লীগ প্রার্থীর পক্ষে জনমত সংগ্রহ করতে বালুরঘাটে আসেন এ. কে. ফজলুল হক (১৯৪২)। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলায় সুরেন্দ্র নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে ছাত্র ফেডারেশনের শাখা স্থাপিত হয় (১৯৪৪, ৮ মে)। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে এপ্রিল ফুলবাড়ি বন্দরে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলের মেম্বার ও কর্মকর্তা নির্বাচিত হন মনসুর হাবিব (সাধারণ সম্পাদক) বগলা গুহ ও শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (সহযোগী সম্পাদক) এবং কাউন্সিল মেম্বার মজফ্‌ফর আহমেদ, বঙ্কিম মুখার্জী, শীচন ঘোষ, আবদুর রাজ্জাক খাঁ, কৃষ্ণবিনোদ রায়, রণধীর দাসগুপ্ত, বিভূতি গুহ ও সুধীর মুখার্জী। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার স্যার জন উডহেডকে চেয়ারম্যান করে একটি দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কমিশনের রিপোর্টে অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে অন্যতম ছিল স্থায়ী মূল্যনীতি নির্ধারণ ও জারি করা।

২. মুসলিম লীগের অগ্রগতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক বিকাশ হয় মুসলিম লীগের দ্রুত অগ্রগতি। ১৯৪০ সালে জিন্নার নেতৃত্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দাবি করেন ও পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এরই পরিণামে কংগ্রেস-লীগ মতান্তর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্ককে জটিল করে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার মুখে গড়ে তোলা হয় মুসলিম লীগ বাহিনীর জাতীয় রক্ষী দল। মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করার দিকে সঠিক পথেই এগিয়ে যান জিন্নাহ। গান্ধির নেতৃত্বাধীন 'হিন্দু' কংগ্রেসের সঙ্গে সমমর্যাদার দাবি তোলেন তিনি। এই অগ্রগতির পথ সুগম করে দেওয়ায় ব্রিটিশদের ভূমিকা ছিল বেশ স্পষ্ট। ১৯৪৩ সালে লীগের নেতারা কৃষক প্রজাপার্টির ফজলুল হককে শেষ পর্যন্ত গদি থেকে সরিয়ে দিলেন। একাজে সহযোগিতা করলেন ইস্পাহানিদের আর্থিক শক্তি। এ ভাবেই বাঙলার মুসলমান রাজনীতিবিদ্‌দের বাধ্য করা হয় সারা ভারত মুসলিম লীগের পথে চলতে।[৪]

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মৌলানা কাদের বক্সের উদ্যোগে দিনাজপুর জেলায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। মৌলানা কাদের বক্সকে সভাপতি ও মৌলানা রহিমউদ্দিন আহমেদ ও মৌলানা মফিজউদ্দিন আহমেদকে যুগ্ম সম্পাদক করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। সদস্যরা ছিলেন মৌলানা গমিরউদ্দিন কবিরাজ, মৌলানা নূরুল হুদা চৌধুরী,

ডাক্তার ছলিমুল্লা প্রভৃতি। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে মৌলানা ফয়জু খাঁ, মৌলানা মোয়াজ্জেম হোসেন, মৌলানা আশরাদ আলী, মৌলানা আবদুদত ওয়াফ, মৌলানা ফজলুর রহমান, মৌলানা, রিয়াজউদ্দীন, মৌলানা সুতাসিন সহ আরও অনেককে নিয়ে দিনাজপুর জেলায় মুসলিম লীগের একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। সোহরাওয়ার্দী এ সময় (১৯৪৫ নভেম্বর) দিনাজপুরে আসেন, তিনি মুসলিম লীগের কর্মীদের একটি সভায় বক্তৃতা দেন, ভাষণে বলেন, "যদি বাঁচতে চাও পাকিস্তানের বাণী প্রচার কর। যদি মা, বাপ, ভাই-বোনদের সুখী দেখতে চাও পাকিস্তান কায়েমের জন্য জোর কদমে এগিয়ে এসো। গ্রাম-গঞ্জে যাও লোককে পাকিস্তানের গান শোনাও।" সোহরাওয়ার্দী দিনাজপুর জেলার বিরল, পার্বতীপুর ও ঠাকুরগাঁয়ে ভাষণ দেন। এর কিছু দিন পরে 'জমিয়ত -ই-ওলামায়ে' হিন্দের নেতা মৌলানা আজাদ সোবাহানী দিনাজপুরে আসেন। জনসভায় তিনি ভাষণে বলেন, "সেইদিন খুব বেশি দূর নহে, যেদিন আমরা মরণ-পণ করিয়া শক্তি শিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম হইব .... পাকিস্তান আজ আমাদের লক্ষ্য ...... আমি আজ আপনাদের সামনে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যদি এইভাবে ঐক্য বজায় রাখিয়া চলিতে পারি, তাহাতে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন আসিবে আমরা উক্ত পরিবর্তনের মধ্যেই পাকিস্তান লাভ করিব।"[৫] দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত মৌলানা হাসান আলী, মৌলানা হাফিজউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, মৌলানা সৈয়দ তোজাম্মল, বালুরঘাটের মৌলানা শ্যামসুদ্দিন আহমদ প্রমুখ কংগ্রেসে থাকার সময় যাঁরা লীগ বিরোধী অবস্থানের জন্য গর্ববোধ করতেন, সেদিন তাঁরা লীগ নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জানান। লীগ নেতৃত্ব তাঁদের সমর্থনকে 'পুনরুজ্জীবন' আখ্যা দিয়েছিল। দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর ছিল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা এবং মুসলিম লীগের প্রভাবিত অঞ্চল। এখানে ছিল রেলের একটি বড় জংশন। মুসলিম লীগ সমর্থিত এখানকার বড় জোতদাররা পার্বতীপুরে একটি 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড' তৈরি করেন।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে জেলায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজ স্থাপনের পর মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে জাতীয় প্রেরণার ঢেউ ওঠে। বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্র লীগের দিনাজপুর জেলা শাখা (১৯৪২) প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান ছাত্ররা এ সময় নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়। তারা চিন্তা ভাবনা, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি থেকে হিন্দু-অনুকরণ বর্জন করে । মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠনে যাঁরা সক্রিয় আন্দোলনে যুক্ত হন তাঁদের মধ্যে এম. এম. রিয়াজুল ইসলাম, শামসুল হক, দবিরুল ইসলাম, মাহমুদ মোকাররম হোসেন, মোস্তাফা নুরুল ইসলাম, সৈয়দ সফিকুল হোসেন, তালেব আলী, শাহ মহম্মদ ইসহাক, দলিলউদ্দিন আহমদ, শাহ মোঃ ইউসুফ, শামসুদ্দিন আহমদ, তাহের উদ্দিন আহমদ, মহম্মদ ইউসুফ আলী, শাহ জামাল বিশ্বাস, মির্জা রুহল আমীন, আব্দুল হক, আবদুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ। এ সময় (১৯৪৪) মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দদের উপস্থিতিতে দিনাজপুর জেলায় মুসলিম লীগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

দিনাজপুর জেলায় মুসলিম লীগের এই অগ্রগতির ফলে দিনাজপুরের মুসলমানদের

একটা বড় অংশের মধ্যে পাকিস্তানের সাড়া বেশ মনে ধরেছিল। পাকিস্তান হলেই হিন্দু জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের শোষণ শেষ হয়ে যাবে লীগ নেতারা রাজনীতির বিষয়কে এভাবে হাজির করছিল। এখানকার মুসলমান সমাজে এ ধারণার জন্ম দিচ্ছিল যে, হিন্দু ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবী শ্রেণির হাত থেকে তাঁরা রক্ষা পাবে এবং ছোট ছোট মুসলিম ব্যবসায়ী শ্রেণি বেড়ে উঠতে পারে। তাছাড়া মুসলমানদের উদীয়মান শিক্ষিত শ্রেণি, বুদ্ধিজীবী যারা ছিল, হিন্দু বৃত্তিজীবীদের হাত থেকে রক্ষা পেলে চাকরির ক্ষেত্রে তারা বিস্তর সুযোগ সুবিধা পাবে। এসব আবেদন নিয়ে লীগ নেতারা এই সময় জাতীয় সম্ভাবনার এসব আবেদন প্রচারে ব্যস্ত থাকেন। এ সময় (১৯৪৫) মুসলিম ব্যাঙ্ক ও বিমান কোম্পানি তৈরির পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জুন মহম্মদ আলি জিন্না সর্বাগ্রে পাকিস্তান প্রস্তাব নেওয়ার কথা বলায় গান্ধিজি বিস্মিত হন। মুসলিম লীগের এই অনড় মনোভাবে (১৯৪৫, ১৪ জুলাই) সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হয়। এর ফলে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে কংগ্রেস যেমন 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'-র চূড়ান্ত স্লোগান দিয়েছিল, তেমনি কংগ্রেসেরই ওই স্লোগানই ফিরে আসে লীগ নেতাদের ঘোষণায়, 'কংগ্রেসকে দিয়ে হিন্দু সরকার গঠন করানো হলেই মুসলমানদের সংগ্রাম শুরু হয়ে যাবে।'[৬]

৩. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা

দিনাজপুর জেলার লোক সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে। এ সময় উমাপতি দেবনাথের রচিত *ভাসান যাত্রা* প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধু অধিকারীর *লক্ষ্মীমঙ্গল কাব্য*, শশিশেখর সরকার এর *চণ্ডীমঙ্গল কাব্য*, সূর্যকান্ত গোস্বামীর *অষ্টগোপাল পাঁচালী* এবং মোহন চন্দ্র মোহন্তের রচিত ইতু *লক্ষ্মী পাঁচালী* প্রকাশ পায়। বইগুলি দিনাজপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কবি মানুল্লা মণ্ডল রচিত *কান্তনামা* পুঁথিটি (১৮৪৪) বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৯১৩) নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। টাঙ্গাইলের অধিবাসী রামপ্রাণ গুপ্তের জমিদারি ছিল দিনাজপুর জেলায়। সেই সূত্রে তিনি দীর্ঘকাল দিনাজপুর সদরে বসবাস করেন। মালদহের লেখক গোলাম হোসেনের বিখ্যাত *রিয়াজ উস্ সালাতন্* পুস্তকটির অনুবাদ করেন। তাঁর রচিত অনান্য পুস্তক *মোঘল বংশ, পাঠান রাজবৃত্ত, ইসলাম কাহিনী, প্রাচীন ভারত, হজরত মহম্মদ* ও *ব্রতমালা*। ১৮৯৬ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বইগুলি প্রকাশিত হয়। দিনাজপুরের কবি কমললোচন রায়-এর *ব্রতদর্পণ* (১৮৩৬) গ্রন্থটি ছিল হরিভক্তি বিলাসের কাব্যানুবাদ। দিনাজপুর রাজের রাজপুরোহিত মহেশচন্দ্র তর্ক চূড়ামণির প্রকাশিত কাব্যগুলি *নিবাতবধ কাব্য, রস কাদম্বিনী, কাব্যপেটিকা, ভগবচ্ছতক, দিনাজপুর রাজবংশনম্, ভূদেব চরিত, ব্যবস্থাপনা, ধীরানন্দ তরঙ্গিণী*। বইগুলি মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা গিরিজানাথ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় দিনাজপুরে। এ সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক হন যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। যেদিন দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের নির্দ্ধারিত তারিখ ঠিক হয় সে সময় চট্টগ্রামে অক্ষয়কুমার

সরকারের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনেরও দিন স্থির হয়। দিনাজপুরে 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের' অনুষ্ঠিত দিন একই সময়ে নির্দ্ধারিত হওয়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তাব্যক্তিরা অস্বস্তিতে পড়েন। দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গে সাহিত্য সম্মেলনের নির্দিষ্ট দিনটি চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্মেলনের জন্য পরিবর্তন করার জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দিনাজপুরের মহারাজাকে অনুরোধ করে একটি পত্র লেখেন ঃ

"মহামান্য মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর,

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় সমীপেষু।"

সবিনয় নিবেদন,

"আগামী ইস্টার ছুটিতে চট্টগ্রামে সাহিত্যাচার্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকারের নেতৃত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম যে, ঐ সময়েই দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এক অধিবেশন হইবে।

"বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের যুক্ত বঙ্গের সাহিত্যিক সমবেত হন — ইহাই প্রার্থনীয়। কিন্তু একই সময়ে দুইস্থানে অধিবেশন হইলে কোনটাতেই উপস্থিত সদস্যের সংখ্যা আশানুরূপ হইবে না।

"সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু যদি একই সময়ে দুই স্থানে দুইটি সম্মেলন হয়, তাহা হইলে কার্যতঃ তাহাই হইবে। সমস্ত বঙ্গের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র মহারাজা বাহাদুরের নেতৃত্বে সাহিত্যিকদের এইরূপ কার্য হওয়া অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইবে। আমরা সকলে মহারাজ বাহাদুর ও দিনাজপুরের জনসাধারণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা করি, আপনারা অনুগ্রহ পূর্বক উত্তরবঙ্গে সাহিত্য সম্মেলনের দিন পরিবর্তন করুন।

"আপনাদের কার্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে পত্র প্রেরিত হইয়াছে কিন্তু সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি আপনারা উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দিন পরিবর্তন করেন তাহা হইলে আমরা বিশেষ অনুগৃহীত হইব। ইতি ১০ই ফাল্গুন। ১৩১৯ সাল।"

ভবদীয় প্রফুল্লচন্দ্র রায়।[৭]

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্মেলনের অনুষ্ঠান শেষ হবার পর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দিনাজপুরে এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন আশুতোষ চৌধুরী। সম্মেলনে যোগদান করেন বিনয় সরকার, যোগীন্দ্রনাথ সমাজদার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, আচার্য যদুনাথ সরকার, জলধর সেন প্রমুখ বাংলার সারস্বত সমাজ।[৮]

নাট্যকার হরিচরণ সেন রচিত এবং দিনাজপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত বইগুলি *মায়ের ডাক, অরুন্ধতী, অদৃষ্ট, লজ্জা, দুর্গাবতী* ইত্যাদি। ১৯২১-২২ সালে পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়। শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা *ভক্তিমূলক কাব্য* (১৯২১), *পাগলের*

পাগলামী (১৯২১), *জেঠামশায়* (১৯২২), *আনন্দময়ী* (১৯২২) প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। *দিনাজপুর বিবরণ* নামে দু'খণ্ডে একটি বই লেখেন সুরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯১৬ - ১৭ সালে দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত হয়। মৌলানা আবদুর রহমান সৈদীর *বারমিঠাই* (১৯৩১), মহম্মদ তৈমুর-এর *শেষ মহাপুরুষ* (১৯৩১), নাট্যকার শিবপ্রসাদ করের *স্বর্ণলঙ্কা* (১৯৩৯), *প্রতিষ্ঠা* (১৯৩৯), নরেন্দ্রমোহন সেনের উপন্যাস *বিক্ষোভ* (১৯২০), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিনাজপুরের প্রেক্ষাপটে রচিত *উপনিবেশ* (৩ খণ্ড) উপন্যাস (১৯৪২-১৯৪৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সময় দিনাজপুর জেলার সাহিত্য সংবাদ ও সংস্কৃতি মূলক পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে *আভাস* (১৯১৬), *ফুলহার* (১৯১৬), *পল্লী দীপিকা* (১৯৩৪), *আত্রাই* (১৯৩৭), *ঠাকুর গাঁ দর্পণ* (১৯৪১), *নওরাজ* (১৯৪১), *সন্ধানী* (১৯৪৪), *সত্যাগ্রহী* (১৯২৪), *জাগরণ* (১৯৩৪) প্রভৃতি ছিল অন্যতম।

সংস্কৃতি

দিনাজপুর জেলা মুখ্যত বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও নানা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বন্ধনে গড়া। এর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রয়েছে দিগন্ত প্রসারিত ফসলের মাঠ, অসংখ্য নদী উপনদী, খাল-বিল, পশু-পাখি সবুজে ভরা অজস্র গাছপালা, রূপালি বালুচরে ঘেরা নয়ন ভুলানো রূপ। বর্ষ চক্রের আবর্তে ঘুরে ঘুরে এখানে আসে ষড়ঋতু। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রকৃতি সজ্জিত হয় নানা সাজে। এই নিরাবরণ রূপমাধুর্য জীবন রসে সিক্ত করে তোলে এখানকার মাটি ও মানুষকে। এখানকার গ্রামীন সংস্কৃতি মূলত শ্রম নির্ভর জীবনধারায় রসসিক্ত। এখানকার জলমাটি হাওয়া ভিন্নভাবে তৈরি করেছে মানুষের জীবনযাত্রা, উপভাষা, সুর, ছন্দ, গাথা, কথা সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং তার রুচি, তার কল্পজ্ঞান, তার শৈল্পিক চিন্তাধারা ও চেতনার মানবিক প্রকাশ। দিনাজপুর জেলার লোকসংস্কৃতির সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে লোক সংগীত। এসব লোক সংগীতের মধ্যে বন্ধু পাঁচালী, বন্ধুয়ালা, জলমঙ্গা, বিষহরা, চৈতা, সৈতপীর, খন, করম, যুগী, জং, চোর-চুরণী, গমীরা, মহিপালের গান খজাগর, জিতুয়া, কুয়ালী, চণ্ডীয়ালা, কস্মী, সাধুআলি, বিরহআলা, লোকান ইত্যাদি। লোকপালা গানের মধ্যে হালুয়া-হালুয়ানি, বুলোসরী, ঢাকোশ্বরী, বুধাসরী, সতী-হ্যাবলা, লতিফ-জৈগন, নবানু-ঢেলা, সাইকেল সরী, ম্যায়া বন্দকী প্রভৃতি। দিনাজপুর জেলার অনিন্দ্যচিন্তার ফলরসে পুষ্ট লোকনৃত্য কলার মধ্যে রয়েছে শিকনিঢাল নৃত্য, মোখা নাচ, পালটিয়া নাচ, মনসার ভাসান নৃত্য ইত্যাদি। কবিগান, কৃষ্ণযাত্রা, কথকতা, পাঁচালী গান এসবও দিনাজপুর জেলার সুজলা মাটির রসসিক্ত লোকজ গান।

বাংলার শহরে সংস্কৃতির অন্যতম মাধ্যম ছিল প্রসেনিয়াম ভিত্তিক নাট্য চর্চা, উচ্চাঙ্গ সংগীত ও পুরাতনী গান। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর শহরে 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার হল' প্রতিষ্ঠিত হয়। হরিচরণ সেন ছিলেন এর উদ্যোক্তা। ১৯০৯ সালে বালুরঘাটে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বালুরঘাট থিয়েট্রিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন', ১৯২০ সালের ১৭ই মে এই ড্রামাটিক ক্লাবটিই 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির' নামে পরিচিত হয়। রাধাচরণ ভট্টাচার্য, উমেশচন্দ্র ব্যনার্জী, যদুনাথ রায়, চিন্তাহরণ মুখার্জী, শশাঙ্ক শেখর রায় প্রমুখ ছিলেন

এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ত্রৈলোক্যলাল বাগচী, বঙ্কবিহারী সরকার, গিরীন্দ্রনাথ গুহ চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সতীশচন্দ্র গুহঠাকুরতা, রাজ কিশোর দে ও হরিশ চন্দ্র মুখার্জীর নেতৃত্বে ঠাকুরগাঁও-এ প্রথম প্রসেনিয়াম ভিত্তিক নাট্যচর্চার জন্ম হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ভূপাল চন্দ্র সেন, যামিনী সেন, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, গিরিজা মোহন নিয়োগী ও ক্ষিতীশ চন্দ্র রায়চৌধুরী ও মারহামাত হোসেন প্রমুখের মাধ্যমে 'দিনাজপুর নাট্য সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। জনা, প্রিয়ংবদা, বিল্বমঙ্গল, কংসবধ, কর্ণার্জ্জুন, চন্দ্রগুপ্ত, রাজা প্রতাপাদিত্য, আলমগীর, কেদার রায়, শাজাহান, রাজা নন্দকুমার, সরলা, প্রফুল্ল, মণীষা বিভিন্ন নাটক এসব মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়। জ্যোতিষ গুপ্ত, শিবপ্রসাদ কর, তৃপ্তি মিত্র, কুমার রায়, রাজেন তরফদার, নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ফণী মুখার্জী, সুরেশ বসাক, সহদেব চৌধুরী সহ আরো অনেকে এসব নাটকে অভিনয় করেন। সে সব মঞ্চায়নের মান কলকাতার নাটকের তুলনায় কোনও অংশে কম ছিল না। ওই সব নাটকের প্রযোজনা ও অভিনয় রীতি ছিল কলকাতার পেশাদার মঞ্চে গিরিশ যুগের কাছাকাছি। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বালুরঘাটের যশস্বী নাট্যকার মন্মথ রায় *বঙ্গে মুসলমান* নামে একখানি নাটক লেখেন এবং নাটকটি 'বালুরঘাট নাট্য মন্দির'-এ ওই সালে মঞ্চস্থ হয়।

দিনাজপুর জেলায় ১৯৪২ - ৪৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ বিভিন্ন স্কুল-কলেজে দেশাত্মবোধক গান ও গণসংগীত অনুষ্ঠান করেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখা কর্তৃক বিজন ভট্টাচার্য্যের 'নবান্ন' নাটকটি দিনাজপুরে মঞ্চায়ন করেন। দুর্ভিক্ষ ও ৫০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও ক্ষুধার ভয়াবহ চিত্র বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে মঞ্চে পরিবেশন করে 'নবান্ন' বাংলার নাট্য ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করে। বালুরঘাটের নাট্যকার মন্মথ রায় রচিত মুক্তির ডাক (১৯২৩), কারাগার (১৯৩০), এসব নাটকও সে সময় নাট্য রচনার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ১৯৩৩ সালে দিনাজপুরে নাটক দেখতে আসেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই লেখা 'দুইপুরুষ' নাটক শিবপ্রসাদ করের পরিচালনায় তখন 'দিনাজপুর নাট্য সমিতি'তে মঞ্চস্থ হয়। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'দিনাজপুর নাট্য সমিতি' মঞ্চে তাঁর লেখা 'নিষ্কৃতি' উপন্যাসের নাট্য অভিনয় দেখতে আসেন (১৯২০)। 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার' হলে শরৎচন্দ্রকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। দিনাজপুর জেলার শিল্পীদের অভিনয় দেখে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "দিনাজপুরের শিল্পীরা শুধু অভিনয়ে দক্ষ নন, ওঁরা কলমেও সমান সিদ্ধহস্ত।"[৯] তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 'দুইপুরুষ' নাটকে অভিনেতা শিবপ্রসাদ করের নুটুবিহারীর চরিত্রে অভিনয় দেখে বলেছিলেন, "দিনাজপুরের নাট্যমঞ্চের কোন তুলনা নেই বাংলার ইতিহাসে। আমার লেখা নাটকের এমন অপূর্ব অনবদ্য মঞ্চায়ন শুধু দিনাজপুরের মঞ্চেই সম্ভব-অন্য কোথাও নয়। আমি যা নই, আমার নাটকে যা নাই নাটকীয় চরিত্রের সেই অনাবিষ্কৃত অসাধারণত্বের সত্ত্বা আমি যেন আজ খুঁজে পেলাম দিনাজপুরের মঞ্চে নিজের লেখা নাটক দেখতে এসে। শিল্পীর চোখে প্রকৃত নিজকে দেখতে পেয়ে আজ ধন্য হলাম আমি। দিনাজপুরের শিল্পীরা আমার নমস্য।"[১০] দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে

১৯৩৪-৩৫ সালে যতীন গোঁসাই, মানু গোঁসাই, কালীনন্দী প্রমুখের চেষ্টায় নাট্য অভিনয়ের সূচনা হয়। রায়গঞ্জের যতীন্দ্রমোহন গোস্বামী নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস ও দুর্গা দাস ব্যানার্জীর সঙ্গে অভিনয় করেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে 'রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে স্থায়ী নাট্যমঞ্চ তৈরি হয়। নির্মল ঘোষ, সুকুমার গুহ, ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র সেন, কল্যাণ কুমার গোস্বামী, প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, পাঁচকড়ি সেন, কিষাণলাল ঘোষ, ডাক্তার যতীন দে প্রমুখ ছিলেন এর উদ্যোক্তা। রায়গঞ্জের যতীনমোহন গোস্বামী, স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে সখের যাত্রা দল গড়ে তোলেন (১৯০২)। গোঁসাইবাড়ির চকমেলানো উঠোনে যাত্রা পালা মঞ্চস্থের জন্য স্থায়ী মঞ্চ তৈরি হয়। রায়গঞ্জের কামাখ্যা চ্যাটার্জী ছাত্র অবস্থায় কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে নটসূর্য শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে নারী-চরিত্রে অভিনয় করেন। বাংলা চলচ্চিত্রের সেরা নায়ক ও গায়ক রবীন মজুমদার রায়গঞ্জেরই সন্তান ছিলেন। দিনাজপুর জেলায় চল্লিশের দশকে বালুরঘাটের যাত্রা অগণিত মানুষকে আবেগতাড়িত করে তুলেছিল। জেলার বাইরেও কিশোরীমোহন বিশ্বাসের 'বাসন্তী অপেরা', বিমলেন্দু অধিকারীর 'বাজারের দল', বিনোদবিহারী রায়চৌধুরীর 'মদন মোহন নাট্য সংস্থা', অবনীকান্ত সরকার ও মাধবচন্দ্র মালাকারের 'বান্ধব অপেরা' যাত্রা শিল্পে কলকাতার যাত্রা দলগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়েছিল। দিনাজপুর জেলায় সংগীতের ক্ষেত্রে পঞ্চানন ভট্টাচার্য, গোবিন্দচন্দ্র রায়, ভূপাল সেন, বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, খেতু বাবু, ওস্তাদ কসির উদ্দিন, সি. জি. রব্বানী, মজিবর রহমান, মাহতাবউদ্দিন, বুদ্ধদেব সরখেল, আভা গুপ্ত, সঞ্জীব বাগচী প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৬ সালে দিনাজপুর সদরে ও রায়গঞ্জে দীপালী উৎসবের সূচনা হয়।

খেলাধুলা

দিনাজপুর জেলায় বিশেষ করে ফুটবল খেলায় নরনারায়ণ শীল্ড টুর্ণামেন্ট ছিল সাড়া জাগানো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরে স্থাপিত হয় ডিস্ট্রিক স্পোর্টিং ক্লাব। এ ক্লাবই পরবর্তীতে টাউন ক্লাবে পরিণত হয় (১৯০১)। এই ক্লাবের মাধ্যমেই ওই সময় দিনাজপুর জেলায় ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রবর্তন হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর নরনারায়ণ শীল্ড টুর্ণামেন্ট শুরু হয়। প্রায় এক'শ ভরির উপরে সোনা রূপা দিয়ে তৈরি এই শীল্ডটি দেন হরিপুরের জমিদাররা। জমিদার নরনারায়ণ রায়চৌধুরীর স্মৃতি স্মরণে এই শীল্ডের প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলার প্রচলন করে কমলাকান্ত রায় ও নিশিকান্ত চৌধুরী। কলকাতার শীর্ষস্থানীয় ফুটবল টীম মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব, কালীঘাট, এরিয়ান ক্লাব, এ খেলায় অংশ নেয়। তাছাড়া, বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রথম শ্রেণি ফুটবল টীমগুলি এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সাড়া জাগায়। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে কলকাতা থেকে আসে ফুটবলের দুই শক্তিশালী দল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। দিনাজপুর শহরের বড় মাঠে ওই দুই দলের প্রীতি ম্যাচটি ছিল সে সময়ের সব চেয়ে আকর্ষণীয় ফুঠবল ম্যাচ। ওই সময় (১৯৩৪ - ১৯৪৫) দিনাজপুর জেলার খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন জগদীশ কর,

হরিয়া বোস, তসকিনউদ্দিন, তসলিম, আবদুল সামাদ, গুপীরঞ্জন দাস, বাগী রায়, এফ. আর. আহমদ প্রমুখ। ফুটবল ছাড়াও দিনাজপুরে টেনিস খেলার প্রচলন ছিল। সে সময়ের একজন ভাল টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন অতুল বড়াল। খেলাধুলার ক্ষেত্রে রায়গঞ্জ করোনেশন বিদ্যালয়টি ছিল দিনাজপুর জেলার একটি বিশেষ নাম। বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রশিক্ষক অরুণ চন্দ্র ঘোষ ছিলেন এর মধ্যমণি। এ্যাথেলেটিক্স, দেহ সৌষ্ঠব, ভারত্তোলন, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় প্রচুর পুরস্কার বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে আনতেন রবি ভৌমিক, অনিল নাগ, সুভাষ গুহ, যতীন সাহা, অশ্বিনী ভৌমিক, জ্যোতি চক্রবর্তী, পূর্ণ সরকার, খগেন বমর্ণ, কেশব সাহা প্রমুখ। রায়গঞ্জের প্রদীপ ভৌমিক সে সময় উত্তর বঙ্গশ্রী আখ্যায় ভূষিত হন। রায়গঞ্জে টাউন ক্লাব গঠিত হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় বিভিন্ন খেলাধূলার দায়িত্ব পালন করেন রায়গঞ্জের টাউন ক্লাবের সদস্যরা। চল্লিশের দশকে রায়গঞ্জে কুলদাকান্ত শীল্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতায় বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন নামি দামি দল খেলতে আসে। 'কুলদাকান্ত শীল্ড' টুর্নামেন্টের ফুটবল খেলা দিনাজপুর জেলার সে সময়ের সাড়া জাগানো ফুটবল খেলা।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বালুরঘাটে টাউন ক্লাব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অমূল্য রতন চক্রবর্তী, সুরেশ- রঞ্জন চ্যাটার্জী, সুরেন বাগচী, রসিকলাল গুহ, সরোজরঞ্জন চ্যাটার্জী, ফ্যালা গুহ প্রমুখ যুক্ত ছিলেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে 'ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব' গিরিজা দাস, নরেশ ব্যানার্জী, অমলাপতি চ্যাটার্জী এঁদের উদ্যোগে গঠিত হয়। টাউন ক্লাব ও ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব চির প্রতিদ্বন্দ্বী এই দু দলের খেলার দিন বালুরঘাটে উন্মাদনার জোয়ার ছিল নজির বিহীন। রংপুর, ফার্সিপাড়া, নওগাঁ, বগুড়া ও জলপাইগুড়ি থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দল এখানে খেলতে আসত। বালুরঘাটে সে সময়ের বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে গিরিজা দাস, বিমলাপতি চ্যাটার্জী, ভোলা মিত্র, জংলা সোম, মনু সেন, রেবতী ঘোষ, রমেশ রায়, মহীতোষ বাগচী, হরিপদ বসু, শান্তিরঞ্জন দাসগুপ্ত, এঁরাই ছিলেন অন্যতম। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী ডিভিশন ইন্টার স্কুল টুর্ণামেন্টের 'কুমুদিনী কাপে' বালুরঘাট হাইস্কুলের ছাত্ররা দিনাজপুরে খেলতে যায়। প্রথম দিনে ভাল খেলে জয়লাভ করে এবং পরের দিন দিনাজপুর জেলা স্কুলের মুখোমুখি হয়ে ১-০ গোলে পরাজিত হয়। এ পরাজয়কে মেনে নিয়ে পরাজয়ের কারণ ও খেলার বিবরণ দিয়ে সহ অধিনায়ক মহারাজা বসু স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের সামনে কবিতা পাঠ করেন,

"গোলে আছেন ছানাবাবু, পান না তিনি পজিশন,
ব্যাকে আছেন গ্রীজা বাবু, দেখেন তিনি মোশান।
হাফ ব্যাকে গোবিন্দবাবু, ড্রিবিল করতে জানেন,
বল মারতে গেলে তিনি, উল্টে উল্টে পড়েন।"

১৯৪০ সালে বগুড়া করোনেশন স্কুলের সঙ্গে বালুরঘাট হাই স্কুলের কুমুদিনী কাপ টুর্নামেন্টের খেলা হয় টাউন ক্লাব মাঠে। ওই খেলা পরিচালনা করেন ভবেশ ব্যানার্জী। বালুরঘাট হাই স্কুলের ফুটবল টীম (১৯৪০-৪১) ঐতিহ্যমণ্ডিত বরদাকান্ত শীল্ড, কুমুদিনী কাপ, তৈয়ব শীল্ডের খেলায় বিজয়ীর গৌরব অর্জন করে।[১১]

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১. ধনঞ্জয় রায়, *বিশ শতকের দিনাজপুর মন্বন্তর ও কৃষক আন্দোলন*, পৃ. ৩৩,৩৪।
২. ধনঞ্জয় রায়, *উত্তরবঙ্গ (উনিশ ও বিশ শতক)*, পৃ. ২২৯।
৩. ধনঞ্জয় রায়, *বিশ শতকের দিনাজপুর মন্বন্তর ও কৃষক আন্দোলন*, পৃ. ৪১, ৪২।
৪. সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত (১৮৮৫ - ১৯৪৭)*, পৃ. ৪১৬, ৪১৭।
৫. ধনঞ্জয় রায়, *উত্তরবঙ্গ (উনিশ ও বিশ শতক)*, পৃ. ২৪৬, ২৪৭।
৬. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচল্লিশের দাঙ্গা*, পৃ. ৪৬।
৭. যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, *উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন* (ষষ্ঠ অধিবেশন), সংকলিত, ১৩২৪, পৃ. ৪১, ৪২।
৮. ধনঞ্জয় রায়, 'বুদ্ধিজীবীদের উত্তরবঙ্গ চর্চা', *দৈনিক বসুমতী*, ২১ মার্চ ১৯৯৯, পৃ. ৩।
৯. *মাসিক দিনাজপুর পত্রিকা*, আষাঢ়, ১৩২৭, পৃ. ৯, ১০।
১০. ঐ, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৪০ সাল, পৃ. ২৮, ২৯
১১. ভবানী প্রসাদ, 'খেলাধুলার ইতিবৃত্ত', *দধীচি*, উত্তরাধিকার বালুরঘাট, পৃ. ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাধীনতা ও দেশভাগ ঃ ১৯৪৬ - ১৯৪৭

১. নির্বাচন

১৯৪৬ সালের কাউন্সিল নির্বাচনকে ঘিরে বাংলার সর্বত্রই অগ্নিগর্ভময় পরিস্থিতি। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগ যখন একক ভাবে বাংলার প্রাদেশিক সরকার গঠন করলেন, সে সময় থেকে লীগ নেতাদের প্রভাব বাড়তে শুরু করে। পাকিস্তানই চূড়ান্ত লক্ষ্য চিহ্নিত হয়। বিশেষ করে লীগের যুব সংগঠনের কাছে পাকিস্তান অর্থ হয়ে উঠে হিন্দু হানা থেকে মুসলিম মুক্তির আর মুসলিম স্বতন্ত্র চেতনার প্রতীক। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের বড়লাট ওয়াভেল স্বাধীনতা শব্দের বদলে ভারতবর্ষকে অবিলম্বে স্বায়ত্ত - শাসন দেওয়া হবে বলে। ঘাষণা করেন (১৯ সেপ্টেম্বর)। ইংরেজ যে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্যে প্রতিশ্রুতি দেয় সেই স্বাধীনতার প্রকরণ ও সীমানা স্থির করার জন্য ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যে লড়াই কখনও কাউন্সিল ঘিরে কখনও 'ভাইসরয়ের' সঙ্গে মীমাংসাসূত্র আলোচনার অবকাশে উত্তপ্ত বাক-বিতণ্ডা ও পারস্পরিক দোষারোপের মাধ্যমে সূচিত হয়। এই লড়াই অনেক সময়েই আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়।[১] ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে আইন পরিষদের নির্বাচনকে ঘিরে দিনাজপুর জেলায় মূলত দুটি রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসকে নিয়েই সবচেয়ে বড় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। লীগ এখানকার মুসলমান নাগরিকদের একমাত্র প্রতিনিধি বলে নিজেকে দাবি করে। তাদের প্রচারের মূল বিষয় ছিল কংগ্রেস হিন্দু সংগঠন, তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিন্দু। তাঁরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রচার করে হিন্দু ও মুসলমান দুটি আলাদা জাতি। এরকম রাজনৈতিক ভবিষ্যতকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। হিন্দু নেতারা এসব ঘটনা দেখে লীগ নেতাদের নানান কাণ্ডকীর্তির কথা তুলে ধরতে লাগলেন। ফলে দু'পক্ষেরই নির্বাচন প্রচার সাম্প্রদায়িক প্রচারে পরিণত হয়। মুসলিম লীগের পক্ষে এ সময় দিনাজপুরে আসনে (১৯৪৬) হোসেন সোহরাওয়ার্দী, তমিজউদ্দিন খাঁ, মওলানা আক্রম খাঁ, খাজা নাজিমুদ্দীন, মোহন মিঞা চৌধুরী, লাল মিঞা চৌধুরী, জালালউদ্দিন হাশেমী প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। স্থানীয় বিশিষ্ট নেতারা হলেন, মৌলানা হাসান আলী, মৌলানা কাদের বক্স, মৌলানা সিরাজউদ্দিন চৌধুরী, মৌলানা নূরুল হুদা চৌধুরী সহ আরো অনেকে লীগ প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার করেন। নির্বাচনের আগে (১৯৪৬) দিনাজপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং মুসলিম লীগ প্রার্থীরূপে নির্বাচনে লড়াই

করেন। শুধুমাত্র 'পাকিস্তান' স্লোগান দিয়েই ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে আইন পরিষদের নির্বাচনে ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৪টি আসন লীগের দখলে চলে যায়। দিনাজপুর জেলার মুসলিম লীগ প্রার্থীদের মধ্যে ওই সময় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন মৌলানা হাসান আলী, মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মৌলানা হাফিজউদ্দিন চৌধুরী এবং মৌলানা মোজাফ্ফর হোসেন চৌধুরী। কংগ্রেস প্রার্থীদের মধ্যে জয়ী হন নিশীথনাথ কুণ্ডু ও হরেন রায়। সিডিউলকাস্ট ফেডারেশনের পক্ষে জয়ী হন প্রেমহরি বর্মন ও শ্যামাপ্রসাদ বর্মন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী রূপনারায়ণ রায়ের জয়। সে সময় আইনসভায় বাংলা বিধান সভায় তিনজন কমিউনিস্ট নেতা নির্বাচনে জয়ী হন। এঁরা হলেন জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ এবং রূপনারায়ণ রায়। রূপনারায়ণ রায় ছিলেন দরিদ্র এক রাজবংশী পরিবারের সন্তান। দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি কেন্দ্র থেকে তিনি নির্বাচিত হন। তিনিই ছিলেন বিধান সভায় প্রথম কৃষক সদস্য।[২] রূপনারায়ণ রায় বিধানসভায় নির্বাচন প্রার্থী রূপে দাঁড়ানোয় সারা দিনাজপুর জেলায় কৃষকদের মধ্যে এই নির্বাচন এক বিরাট জাগরণ ও বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই প্রথম মাত্র অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন অশিক্ষিত পাঁচ-ছয় বিঘা জমির মালিক দিনাজপুরের অজ পাড়াগাঁয়ের পলিয়া গরিব কৃষক বিধান সভার নির্বাচনে দাড়াল দিনাজপুরের সমস্ত জাঁদরেল শিক্ষিত প্রভাব প্রতিপত্তিশালী জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে। গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা বাদ দিয়ে লাল নেকড়া পাটকাঠির আগায় বেঁধে আওয়াজ দিল, 'কৃষকের ছেলে রূপনারায়ণকে ভোট দাও', 'গরুর গাড়ী মার্কা বাক্সে ভোট দাও', 'লালঝাণ্ডাকে ভোট দাও'।[৩]

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে রায়গঞ্জে উত্তরবঙ্গ কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিন ধরে চলে এই সম্মেলন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ রায়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন লীলা রায়। খগেন দাসগুপ্ত, ড. অতীশ বসু, অমর নন্দী, প্রফেসর বিনয় সেন, শশধর কর, প্রফুল্ল ত্রিপাঠী, দেবেন ঝাঁ, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে যোগদান করেন। কংগ্রেসের এই সব নেতৃবৃন্দ পরে দিনাজপুর শহরে এবং কংগ্রেস মাঠে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। ১৯৪৬ সালের ৯ই আগস্ট দিনাজপুরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। দিনাজপুর শহরে নিত্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়, কংগ্রেস মাঠে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন বিপ্লবী পূর্ণদাস। পরে তিনি রায়গঞ্জেও একটি বড় জনসভায় ভাষণ দেন।[৪]

২. সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে আইন পরিষদের নির্বাচন শুধুমাত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে মুসলিম লীগ ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৪টি আসনে জয়ী হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে লীগ নেতারা এরপর সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ১৯৪৬ সালে ভারতীয়দের মধ্যে ক্ষমতা ও হস্তান্তরের বিষয় নিয়ে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত হয়। পাকিস্তান

ও অখণ্ড হিন্দুস্থানের দাবিতে হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায় পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই বম্বেতে জিন্না সাহেব নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলারদের নিয়ে একটি সভা আহ্বান করেন। ওই সভায় প্রথম গৃহীত হয় যে পাকিস্তান অর্জনের জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা 'ডিরেক্ট অ্যাকশন' করতে হবে। জিন্না এক বিবৃতিতে বললেন, 'একদিন ব্রিটিশ মেশিনগান আর কংগ্রেস অসহযোগের অস্ত্র দিয়ে আমাদের শাসিয়েছে, এবার আমাদের হাতেও অস্ত্র এসে গেছে।' বাংলার লীগ সভাপতি নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন, 'আর দেরি নয়, সময় এসে গেছে।' ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ঘোষণার ভয়াবহ পরিণামের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের রক্তযুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধ।

দিনাজপুর জেলার পার্ব্বতীপুর ছিল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা এবং মুসলিম লীগের প্রভাবিত অঞ্চল। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে 'ইসলাম বিপন্ন' ধুয়ো তুলে মুসলিম জোতদাররা এখানে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করেন। স্লোগান দেয় 'তেভাগা নয় — লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।'[৫]

দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমার অধীনে ছিল আটোয়ারী, বালিয়াডাঙ্গী ও রানি শংকৈল থানা। এগুলির কাছে ছিল পূর্ণিয়া জেলার চোপড়া, ইসলামপুর ও গোয়াল পোখর থানা। দাঙ্গার ভয়ে (১৯৪৬ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জোতদাররা এখানে বাইরে থেকে লোক এনে মজুত রেখে দেন। এইসব অঞ্চলে দাঙ্গার ভয়াবহতা এতই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে স্থানীয় সরল মুসলমানের প্রাণেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

স্বাধীনতার দুদিন আগে (১২ আগস্ট,১৯৪৭) দিনাজপুর সদরে দুই কিশোরের খুন হওয়ার ঘটনাকে নিয়ে জেলার সমস্ত অঞ্চলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ ও দুই সম্প্রদায়ের নেতাদের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে উত্তেজনা প্রশমিত হয় ও এলাকায় শান্তি ফিরে আসে।

দিনাজপুরে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে সে সময় বড় ধরনের কোনও চিড় ধরেনি। রাজনীতিগতভাবে ভোটের স্বার্থে কখনও কখনও তর্ক-বিতর্ক ও উত্তেজনা দেখা দিলেও কিছু ছোট ছোট ঘটনা ছাড়া বড় ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি। জেলার হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নেতারা সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে এসে সমস্যার সুরাহা করেছেন।

৩. মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রামকে মুসলিম লীগ তাদের শাসন তান্ত্রিক সংগ্রামের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে মিত্রপক্ষের কৌশলে ভারতবর্ষের অবস্থান গুরুত্ব পায় এবং একই ভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন দেশের স্বাধীনতার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে ব্রিটিশ শাসকরা

বুঝতে পারেন তাদের পক্ষে ভারতবর্ষের ক্ষমতায় থাকা আর সম্ভব নয়। ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ঘোর বিরোধী। সমস্যা সমাধানে ব্রিটিশ সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায় ১৯৪৬ সালে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফর্মূলা দেওয়া হয়। মুসলিম লীগের দাবি অনুযায়ী একটি পৃথক এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তানের প্রশ্নটি মন্ত্রী মিশন পরীক্ষা করে দেখেন। পাকিস্তানের নীতি গৃহীত হলে পরবর্তীতে সীমানা সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করতে মুসলিম লীগ সম্মতি প্রকাশ করে। এসব বিবেচনা করে ভারতবর্ষে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে গ্রুপিং ব্যবস্থার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' ঘোষণা করায় কলকাতা, নোয়াখালী এবং বিহারে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। এ সময় নানা ঘটনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ভারতবর্ষের সর্বত্র হিন্দু এবং মুসলিম দুটি সাম্প্রদায়িক বিরোধী শিবির তৈরি হয়। একটি শিবির চায় অবিভক্ত ভারত, অপর একটি শিবির চায় বিভক্ত ভারত। এসময় পাঞ্জাবের ভয়াবহ দাঙ্গা (১৯৪৭, জানুয়ারি) সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বিরোধ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। এই রকম পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে কোনও সমঝোতারই যখন কোন মীমাংসা খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন ক্লিমেন্ট এ্যাটলির নেতৃত্বে শ্রমিক দলীয় ব্রিটিশ সরকার (১৯৪৭, ২০ ফেব্রুয়ারি) ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের আগেই ব্রিটিশ শাসনের অবসানের কথা ঘোষণা করেন এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য এক বা একাধিক হাতে ক্ষমতা অর্পণের পদ্ধতি উদ্ভাবনের ব্যাপক ক্ষমতা দিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে শেষ ভাইসরয় এবং গর্ভণর জেনারেল নিযুক্ত করে পাঠান। মাউন্ট ব্যাটেন কার্যভার বুঝে নেওয়ার আগেই দেশবিভাগ সমেত স্বাধীনতার সূত্রটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪ শে মার্চ থেকে ৬ই মের মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ১৩৩টি বৈঠকের পর ভারত বিভাগই একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান বলে সিদ্ধান্ত নেন।[৬] কংগ্রেসের প্রতিনিধি রূপে পণ্ডিত নেহরু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে বলেন যে, কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের সমর্থক হলেও বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ দুটি বিভক্ত করা হলে ভারত বিভাগ মেনে নেবেন। ভি.পি. মেনন (উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মকর্তা) মাউন্টব্যাটেনের কাছে প্রস্তাব করেন যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের আগেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে সর্দার প্যাটেল ও নেহরু ডোমিনিয়ান স্টেটাস মেনে নেবেন। মেননের এই খসড়া নেহেরু ও প্যাটেল (কংগ্রেস), জিন্না ও লিয়াকৎ আলিখান (মুসলিম লীগ) এবং বলদেব সিং (শিখসমাজ) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মে মেননকে সঙ্গে নিয়ে মাউন্টব্যাটেন খসড়া প্রস্তাব সহ লণ্ডনে রওনা হন। হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্ট অচিরেই দেশবিভাগ সহ ডোমিনিয়ন স্টেটাস ও স্বাধীনতার এই নয়া পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন। দেশবিভাগ সহ ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত মেনন-পরিকল্পনাটি কতৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করার পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে লণ্ডনে হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্নমেন্ট এ বিষয়ে

প্রকাশ্যে একটি বিবৃতি দেন। এই বিবৃতির মাধ্যমে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গে সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। কিন্তু ৩রা জুনের এই বিবৃতিটি ঘোষিত হওয়ার আগেই মাউন্টব্যাটেন গোটা বিষয়টি আরও একবার ঝালিয়ে নেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জুন ভাইসরয় বেতার ভাষণ দেন এবং তারপরেই নেহরু, জিন্না ও বলদেব সিংয়ের বিবৃতি রেডিও মারফৎ সম্প্রচার হয়। সেকুলার নেহরু নবভারতের জন্মলগ্নে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে উপমহাদেশের ৪০ কোটি মানুষের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে সকল প্রকার হিংসা ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে আগামীদিনের নবীন রাষ্ট্র গড়ে তোলার শপথ নেন। জিন্না উপমহাদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য বিশেষ করে মুসলমান জনগণের কাছেই আবেদন জানান।[৭] নেহরু তাঁর ভাষণে 'জয় হিন্দ' বলে আগামী দিনকে বর্তমানেই প্রতিষ্ঠা করতে ভোলেননি, যেমন ভোলেননি জিন্না, তাঁর বক্তৃতা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়েই শেষ হয়। ইতিহাস জানে উপমহাদেশের ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত সমস্যা মাউন্টব্যাটেন অভাবনীয় দক্ষতা ও দ্রুততার সঙ্গেই সমাধান করেছিলেন। তাঁর শেষ সিদ্ধান্তের নাম ছিল 'দেশ বিভাগ'।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে জুন গভর্নর জেনারেল বাংলার সীমান্ত নির্ধারণ কমিশন গঠন করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ভাইসরয় বাংলা এবং পাঞ্জাব-বাউন্ডারি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে স্যার সাইরিল র‍্যাড ক্লিফকে নিযুক্ত করেন। বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনের প্রকাশ্যসভা বসে কলকাতার বেলভডিয়ার প্রাঙ্গণে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুলাই থেকে ২৪শে জুলাই পর্যন্ত এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুলাই বাংলা কংগ্রেস বাংলা প্রদেশের প্রস্তাবিত সীমানা পেশ করেন। এই পরিকল্পনায় দিনাজপুর জেলার পূর্বদিকের ৬টি এবং দক্ষিণে দুটি থানা বাদ দিয়ে বাকী এলাকাগুলি দাবি করেন। দিনাজপুর জেলার সীমানা নির্ধারণ কালে ৩০টি থানায় মোট জনসংখ্যা ছিল ১৯ লক্ষ ২৬ হাজার ৮শো ৩৩ জন। এর মধ্যে মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৬৭ হাজার ২শো ৪৬ জন এবং অমুসলিম ৯ লক্ষ ৫৯ হাজার, ৫শো ৮৭ জন।[৮] দিনাজপুর জেলার ত্রিশটি থানার মধ্যে তখন পনেরোটি থানাই ছিল অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনের চেয়ারম্যান র‍্যাডক্লিফ দিনাজপুর জেলাকে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে প্রায় সমানভাবেই ভাগ করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাসে জেলার ত্রিশটি থানার মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৫০.১৯৮ শতাংশ এবং ৪৯.৮০২ শতাংশ। ত্রিশটি থানার মধ্যে ১০টি অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ থানাগুলির মধ্যে দিনাজপুর সদর মহকুমায় ছিল ৬টি, রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার, বংশীহারী ও কুশমণ্ডি। এর সঙ্গে যুক্ত করা হয় তপন, গঙ্গারামপুর, কুমার গঞ্জ এবং ঈশ্বরদী ও পাব্বর্তীপুর রেললাইনের পশ্চিমদিকে বালুরঘাট। মোট ১০টি থানা পশ্চিম দিনাজপুরের অংশে যোগ করে দেওয়া হয়। প্রধান রেললাইনের পূর্বদিকে বালুরঘাটের অংশ পড়ে। যা হিলি রেলস্টেশনের সঙ্গে যুক্ত সেই অংশটি পূর্বদিনাজপুরের (পূর্ববাংলা) সঙ্গে যুক্ত করা হয়। বালুরঘাট মহকুমার অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ধামইর

হাট, দিনাজপুর সদরের বিরল এবং ঠাকুরগাঁও মহকুমার বোঁচাগঞ্জ, বীরগঞ্জ ও কাহারুল এই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি পূর্বদিনাজপুরের (পূর্ববাংলা) সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়। বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনের রিপোর্ট ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগস্ট প্রকাশিত হয়। তার আগেই মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ১২ আগস্ট সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সীমানা প্রকাশ ও বাস্তবায়নের সাপেক্ষে ধারণাগত সীমার ভিত্তিতে মুসলিম-অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলি গ্রহণ করতে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সরকারকে নির্দেশ দেন। সে অনুসারে সমগ্র দিনাজপুর জেলা সাময়িকভাবে পূর্ববাংলার সরকারকে হস্তান্তর করা হয়। মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং দিনাজপুর জেলার থানাগুলিতে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগস্ট র‍্যাডক্লিফের রিপোর্ট প্রকাশের পর ধারণাগত সীমার ভিত্তিতে দিনাজপুর জেলার যেসব এলাকা ও থানাগুলিতে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল সেগুলি ভারতকে হস্তান্তর করা হয়।[৯]

৪. তেভাগা আন্দোলন

অখণ্ড বাংলার দিনাজপুর জেলায় আধিয়ার-কৃষকের তেভাগার মরণজয়ী সংগ্রাম এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। নানা ঘটনায় উদ্বেল তখন আসমুদ্র হিমাচল। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার পথে পথে চলছে রসিদ আলি দিবসের দুর্জয় অভিযান। বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহ এক নতুনপথের ইঙ্গিত দিয়ে যায়। ২৯শে জুলাই কলকাতার শ্রমিকশ্রেণী লড়াইয়ের মাঠে নামলেন। হল সাধারণ ধর্মঘট, সশস্ত্র বাহিনীর ইউনিটগুলির ধর্মঘট। আঘাত নেমে আসে নির্মম দাঙ্গারূপে আগস্ট মাসে। অন্যদিকে, ফ্যাসিবাদের পরাজয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভ, চীনের গণ-মুক্তিবাহিনীর দুর্বার অগ্রগতি। দেশের সমসাময়িক বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রবাহ বিন্দু বিন্দু ভাবে সিন্ধুর মত তেভাগা লড়াইয়ের গতিপথে বেগ ও বিস্তার সঞ্চার করে। ঠিক এই রকম এক সঙ্কট মুহূর্তে (১৯৪৬-৪৭) বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি ডাক দেয় তেভাগা সংগ্রামের। প্রাদেশিক কৃষক সভার 'পাঁজিয়া' সম্মেলনের রিপোর্টে বলা হয় 'বর্গাচাষীরা আজ মারা যাইতেছেন। কাজেই ভূমি রাজস্ব কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ফসলের দুই তৃতীয়াংশ পাইবার দাবি লইয়া চাষিরা আজই সংঘবদ্ধ হইয়া প্রবল সংগ্রাম শুরু করিয়া দিন।' ১৯৪৩-এ ললিতাবাড়ি সম্মেলনেও ভাগচাষি আন্দোলনের প্রোগ্রামের মধ্যে বলা হয় 'উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের এক ভাগ মলিককে দেওয়া হইবে, এই ভিত্তিতে সমস্ত চাষিকে সংঘবদ্ধ করা।' ১৯৪৩ সালের মে মাসে খুলনার মৌভাগ প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের অধিবেশনে বলা হয় 'যত শীঘ্র সম্ভব ভাগচাষিদের ফসলের তিনভাগের দুইভাগ অধিকার দিয়া অথবা সমস্ত রকম খরচ অর্ধেক বহন করিলেই মালিক অর্ধেক ফসলের ভাগ পাইবে, এই মর্মে আইন হওয়া প্রয়োজন।' পাঁজিয়া সম্মেলনে কৃষক সমিতি তেভাগার আভাস দেয়, নালিতাবাড়ি সম্মেলনে তা স্পষ্ট হয় এবং মৌভাগ সম্মেলনে তা আরও স্পষ্ট হয়ে যায়।

১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে কৃষকরা অন্য কোনও উপায় না পেয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য তাদের একমাত্র সম্বল হালের গরু বেচে দিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধকালে সকল জিনিসের দাম বহুগুণ বেড়ে যায়। হালের গরুর দামও তিন চারগুণ বাড়ে। কৃষককে এই বেশি দামেই নতুনভাবে হালের গরু করতে হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির যুগে তাঁকে বেঁচে থাকতে হলে আর কর্জা শোধ দিতে হলে উৎপন্ন ফসলের ২/৩ অংশ আধিয়ারের এবং ১/২ অংশ জোতদারের। জোতদাররা দুর্ভিক্ষের সময় কল্পনাতীত দামে ধান বিক্রি করে প্রচুর লাভবান হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তেভাগার দাবি ছিল যুক্তিযুক্ত। সুতরাং তেভাগার দাবি কৃষকদের কাছে মনঃপূত হয় এবং মনের দিক থেকে তারা তেভাগা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেয় যে, পরবর্তী ফসলের মরসুমেই তেভাগা সংগ্রামের সূচনা হবে। পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রামের কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। কৃষকদের স্লোগান ওঠে, 'আধি নাই তেভাগা চাই', 'নিজ খোলানে ধান তোল', 'জান দিব তো ধান দিবো না', 'দুনিয়ার কৃষক এক হও', 'কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ', 'ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ', আর হাটে বাজারে শহরে তেভাগার গান ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের মত ঝাঁপিয়ে পরে বাংলার ৬০ লক্ষ কৃষক।

তেভাগার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রেক্ষাপট রচিত হয় দিনাজপুর জেলায়। এ জেলায় স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রধান ছিল রাজবংশী, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুসলমান প্রভৃতি স্থানীয় মানুষেরা। জমিদার এবং জোতদারদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল অন্যান্য জেলা থেকে আসা হিন্দু ব্যবসায়ীর দল। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি নিজ খোলানে ধান তোল, আধি নাই তেভাগা চাই এবং কর্জ ধানের সুদ নাই এই তিনটি দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামে। আন্দোলনের পরিকল্পনায় সমগ্র জেলাটিকে ছ'টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। অঞ্চলগুলি ঠাকুরগাঁও পূর্ব অঞ্চল, দায়িত্বে থাকেন কৃষকনেতা বিভূতি গুহ ও অজিত রায়। ঠাকুরগাঁও পশ্চিম অঞ্চল, দায়িত্বে থাকেন কৃষক নেতা জনার্দ্দন ভট্টাচার্য। চিরিরবন্দর অঞ্চল, দায়িত্বে থাকেন কৃষকনেতা সুধীর সমাজপতি এবং শচীন্দু চক্রবর্তী। ফুলবাড়ি ও পতিরাম অঞ্চল, দায়িত্বে থাকেন কৃষকনেতা কালী সরকার এবং রূপনারায়ণ রায়। কৃষকনেতা সুনীল সেন থাকেন জেলা সদরের দায়িত্বে। পরে তিনি ঠাকুরগাঁও পশ্চিম অঞ্চলে আন্দোলন পরিচালনা করেন।[১০]

স্টেটসম্যান পত্রিকায়[১১] একটি সংবাদে প্রকাশিত হয় "বিগত শতকের পর শতক ধরে যে মূক ছিল, আজ এক স্লোগানের চিৎকার ধ্বনিতে সে রূপান্তরিত। সঙ্গীদের নিয়ে সে মাঠ ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেকের কাঁধে রাইফেলের মত করে ধরা লাঠি, আর মিছিলের পুরোভাগে একটি লাল পতাকা — এ দেখে অনুপ্রাণিত হতে হয়। বাঁশবনের নৈঃশব্দের মধ্যে মুষ্টিবদ্ধ হাত কপালের কাছে তুলে তারা যখন নিচু স্বরে 'ইনক্লাব' এবং 'কমরেড' বলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে তা শুনে কেমন যেন ভয় ভয় করে।" (বাংলা অনুবাদ)

দিনাজপুর জেলায় সবজায়গাতে ধান কাটা শুরু হয় এবং জোর কদমে এগিয়ে চলে। সর্বত্রই প্রবল উদ্দীপনা। সশস্ত্র পুলিশ কৃষক ভলান্টিয়ারদের ধান কাটায় মাঠে নামে। প্রচণ্ড দমন-পীড়ন নেমে আসে। কৃষকের প্রথম রক্ত ঝড়ে দিনাজপুরের মাটিতে।

১৯৪৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারী দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দরে সশস্ত্র পুলিশের গুলিতে শিবরাম মাঝি ও সমিরুদ্দিন নিহত হন। বঙ্গদেশে তেভাগা সংগ্রামের প্রথম শহীদ। সমিরুদ্দিন ছিলেন ক্ষেতমজুর আর শিবরাম ছিলেন গরিব সাঁওতাল আধিয়ার। পুলিশের হাতে রাইফেল আর কৃষকের হাতে লাঠি, বল্লম ও তীর ধনুক। কৃষকদের একটিই দাবি — কমরেড, বন্দুক দাও। এই আবেদনে পার্টি নীরব থেকে যায়। এই সময় মুসলিম লীগের তরফ থেকে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে একটা দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা হয়। কংগ্রেসের নেতারাও আন্দোলনের বিরুদ্ধে এ সময় প্রচারে নামে। হাজারে হাজারে কৃষক গ্রেপ্তার হয়, সেই সঙ্গে কৃষক নেতারাও। দিনাজপুরে শিবরাম ও সমিরুদ্দিন মারা যাবার পর ১৯৪৭ সালের ১২ই মার্চ কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু বলেছিলেন, "আমি নিশ্চিন্ত যে, দিনাজপুরে সমিরুদ্দিন এবং শিবরামের মত মানুষরা যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের এই প্রাণদান ব্যর্থ হবে না। পুলিশের বুলেট যখন তাঁদের দেহকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, তখনও তাঁরা জানতেন যে, জীবনদান করেও যদি তাঁদের দাবি পূরণ হয়, তবে আগামী দিনে তাঁদের সন্তানেরা ভালভাবে বাঁচতে পারবে এবং তাঁদের প্রিয়জনদের চোখের জল ঘোচাতে তাই কয়েক দানা শস্যের জন্য তাঁরা প্রাণদান করেন।"

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারি বালুরঘাট থানার অধীনে খাঁপুর গ্রামে পুলিশের নৃশংস আক্রমণে মোট ২২ জন কিষাণ ও কিষাণী প্রাণ হারান। তেভাগার দাবিতে তারা কয়েকমুটো ধানের জন্য বীরের মতন প্রাণ দেন। মরতে তাঁরা একটুও ভয় পান নি। বালুঘাট থানার অধীনে পতিরাম ত্রিমোহিনী যাবার পথে খাঁপুর গ্রাম। পুলিশ ১২১ রাউণ্ড গুলি চালায় সেখানে। বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে সেদিন শহীদ হন, চিয়ারসাই শেখ, যশোদা রানি সরকার, কৌশল্যা কামারণী, গুরুচরণ বর্মণ, হপন মার্ডি, মাঝি সরেন, দুখনা কোলকামার, পুরনা কোলকামার, ফাগুয়া কোলকামার, ভোলানাথ কোলকামার, কৈলাশ ভুঁইমালী, খোতো বর্মণ, নগেন বর্মণ, ভুবন বর্মণ, ভবানী বর্মণ, গুচান মুর্মু, নারায়ণ মুর্মু ও গহনুয়া মাহাতো। তেভাগার দাবি সেদিন নিপীড়িত আধিয়ার কৃষকদের মনে কত গভীর রেখাপাত করেছিল, সে সম্পর্কে ছোট একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই বোঝা যায়। খাঁপুরে গুলি চালনায় যেসব কৃষক গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল, তাঁদের কে বালুরঘাট হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার মৃত্যু পথযাত্রী একজন কৃষককে তাঁর শেষ ইচ্ছা জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি চান? ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠে সংগ্রামী কৃষকটি উত্তর দেন — 'তেভাগা চাই'। পরমুহূর্তেই সেই কৃষকটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তেভাগা আন্দোলনে দিনাজপুর জেলায় পুলিশের গুলিতে মারা যান ৪০ জন কৃষক, গ্রেপ্তার হন ১২শো এবং আহত হন প্রায় ১০ হাজার। দিনাজপুর জেলায় ৩৫টি পুলিশ ক্যাম্প বসেছিল। গুলি চলে ঠুমনিয়া, চিরিরবন্দর, খাঁপুর ও ঠাকুরগাঁয়ে। মুসলিম লীগের মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি বিধান সভায় তাঁর বিবৃতিতে স্বীকার করেছিলেন যে, কেবলমাত্র খাঁপুর গ্রামেই তাঁর সশস্ত্র পুলিশ ১২১ রাউণ্ড গুলি চালিয়ে ২০ জনকে হত্যা করেছিল।

৫. পনেরোই আগস্ট

এই উপমহাদেশে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা এল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট আমরা হিন্দু-মুসলমান রূপে চিহ্নিত হলাম। একটি রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার পরিণামে সামাজিক মানুষের উৎপাটিত হওয়ার যে বীভৎসরূপ, গৃহচ্যুত হওয়ার যন্ত্রণা, চোখের সামনে প্রিয়জনকে নিহত হতে দেখার নিদারুণ মানসিক আঘাত প্রাচীন শেকড় উন্মূল করে দিলো। আশ্রয়ের সন্ধানে গৃহচ্যুত মানুষের মরিয়া অভিযান, রাস্তায়, স্টেশনের প্লাটফর্মে আর উদ্বাস্তু শিবিরে তাদের মনুষ্যেতর জীবন যাপন এবং যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনের জোড় লাগানোর সংগ্রাম, নানারকমের মানবিক ট্রাজেডি সমস্তই গভীরতর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার শেকড়কেই জোগান দিয়েছিল। দেশভাগে যে সব আর্থিক ও সামাজিক বিরোধ মিটে যাওয়ার কথা ছিল তার নিষ্পত্তি হল না। শহর ও গ্রামে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীরা আমূল সামাজিক পরিবর্তন থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই পৃথক করার কাজে সফল হয়েছিল। ব্রিটিশ চলে যাওয়ায় যে আমলাতন্ত্র ও পুলিশ তারা গড়ে তুলেছিল প্রায় একই রকম থেকে গেল ঠিকই কিন্তু আগের তুলনায় আরো অত্যাচারী ও নির্মম বলে প্রমাণ হতে পারত। মহাত্মার জীবনের শেষ কয়েক মাসে শুধু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই বিচ্ছিন্নতা ও যন্ত্রণার জন্য দায়ী ছিল না। নিহত হবার ঠিক আগে তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, "দেশকে এখনও সামাজিক, নৈতিক ও আর্থনীতিক স্বাধীনতা লাভ করতে হবে সাত লক্ষ গ্রামের নিরিখে। কংগ্রেস কতক পচা শহর তৈরি করেছে যা নিয়ে যায় দুর্নীতির দিকে আর কতক প্রতিষ্ঠান, যেগুলি শুধু নামেই সাধারণের জন্য ও গণতান্ত্রিক।"[১২] রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসকে বরং ভেঙে দেওয়া উচিত এবং তার জায়গায় সত্যিকারের উৎসর্গিত, আত্মত্যাগী ও গঠনমূলক গ্রাম কর্মীদের নিয়ে একটি লোকসেবক সঙ্ঘ তৈরি করা উচিত।[১৩] অনেক দায়বদ্ধ বামপন্থী এ স্বাধীনতা বিদ্রুপের চোখে দেখেছিলেন। ১৯৪৮-৫১ তে কমিউনিষ্টরা যে শ্লোগান তুলেছিল, 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হৈ' এই শ্লোগান মানুষের মনে দাগ কাটে নি। তার কারণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিল উপনিবেশ ভাঙার প্রক্রিয়ার সূচনা যা অপ্রতি':রাধ্য ছিল বলে প্রমাণ হয়েছে বিশেষ করে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে। নেহরুর নেতৃত্বে ভারত ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিল একটি স্বাধীন বিদেশ-নীতি। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তিত হয়েছিল (১৯৫০, জানুয়ারি)। রাজন্যবর্গ ও জমিদারদের সরিয়ে দিয়ে ধার্য হয় জমির উর্ধ্ব সীমা। রাজ্যগুলির ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠনের পুরনো আদর্শ অর্জিত হয়েছিল (১৯৫৬)। বুনিয়াদি শিল্প গড়ে তোলার জন্য সরকারি উদ্যোগে পরিকল্পিত হতে শুরু করে বিভিন্ন উন্নয়ন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশভাগের কারণে এসব কিছু বলা মাত্রই আপনা আপনি হয় নাই। এর জন্য ছিল কঠিন গণসংগ্রাম।

১৫ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দিনাজপুর জেলার ৩০টি থানার মধ্যে ১০টি থানা অন্তর্ভুক্ত হয় ভারত ইউনিয়নভুক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সঙ্গে। বাকী ২০টি থানা পূর্ব পাকিস্তানের অধীনভুক্ত হয়ে পূর্ব দিনাজপুর জেলা নামে পরিচিত হয়। ভারত

ইউনিয়ন ভুক্ত পশ্চিম দিনাজপুরের থানাগুলি হল, বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, তপন, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, ইটাহার, কুশমণ্ডি ও বংশীহারী। জেলাভাগের সময় একটি মাত্র মহকুমা ছিল বালুরঘাট মহকুমা। ১৯৪৮ সালের ১৪ই জুলাই ৬টি থানা নিয়ে গঠিত হয় রায়গঞ্জ মহকুমা। ১৯৪৮ সালের ৭ই মে বালুরঘাট মহকুমার অধীনে হিলি থানা গঠিত হয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর নবগঠিত পশ্চিম দিনাজপুর জেলার আয়তন ১ হাজার ৩শো ৮৪ দশমিক ৮ বর্গমাইল (১৩৮৪.৮ বর্গমাইল)। মোট গ্রামের সংখ্যা ২ হাজার ৩শো ৩টি। নবগঠিত জেলার লোকসংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮শো ৮২ জন।[১৪]

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পশ্চিম দিনাজপুর যা পেয়েছিল তার মধ্যে ১ লাখ ১৫ হাজার ৫শো ১০ জন উদ্বাস্তু (১৯৪৭-৫১), হিলি ও রাধিকাপুর সীমান্ত দিয়ে এপার থেকে চিরতরে চলে যাওয়া ১৪ হাজার মুসলিম বাসিন্দা (১৯৪৭-৫১)। রেলপথ পায় রাধিকাপুর থেকে রায়গঞ্জ থানার সীমাপর্যন্ত বিস্তৃত এবং যার সমাপ্তি ঘটে বিহারের বারসই জংশনে। জেলার সীমানায় এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল মোট ৪৬ কিলোমিটার এবং এর পুরোটাই মিটার গেজ। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দীর্ঘ কাস্তের ফালির মত প্রায় ২৭৫ কিলোমিটার সড়কপথ ও আত্রাই, পুনর্ভবা, টাঙন, নাগর এবং কুলীক এসব নদীর কিছু অংশ। সেই সঙ্গে পেয়েছিল ব্যাপক অত্যাচার, দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি, জোতদার, ব্যবসায়ী, কংগ্রেসের কিছু হিন্দু নেতা, কমিউনিষ্ট পার্টির কিছু হিন্দু নেতা এবং শান্তাহার দাঙ্গার পর (১৯৫০-৫১) অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষ ও কৃষক। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মতে, "সরকারের তরফ থেকে যথোপযুক্ত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের মত বিপর্যয় দেখা দিতে পারত।" এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অধীনভুক্ত পূর্বদিনাজপুরে হিন্দুদের ভূমিকা শেষ হয়ে যায়। দিনাজপুরের হিন্দু চাষিরা প্রথমে দেশ ত্যাগের কথা চিন্তা করেনি। পার্টিশনের সাড়ে তিন-চার বছর পর শান্তাহার দাঙ্গার (১৯৫০-৫১) গোড়া থেকে প্রাণের ভয়ে তারা দিনাজপুর ছেড়ে ভারতে আসতে শুরু করে। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার ক্ষত ধুতে ধুতে ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট তারা যে পুরস্কার পান তা হল দ্বিখণ্ডিত দেশ আর বুকভরা কান্না। ১৯৪৮ সালে রায়গঞ্জ থানার খলসী গ্রামের চারণ কবি রাধাবল্লভ সরকার দেশভাগের বেদনা বুকে জড়িয়ে নিয়ে যে গান বাঁধলেন ঃ

মহাকাল ইটা কি হইল। স্বরাজ স্বরাজ বুলতে বুলতে
দ্যাশ স্বাধীন হইল।
কাঁচি পাক্কি সোনো ভাগ হয়্যা, বর্ডার জনম নিল।
দ্যাশ স্বাধীন হইল।
উপারেতে আল্লাহ আকবার, কহছে ধ্বনি হরদম
ই পারেতে মগায় কহে, বন্দে মাতরম্
দ্যাশ স্বাধীন হইল।

উল্লেখসূত্র ও টীকা

১ লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ,* পৃ. ৯, ১৪।
২ ধনঞ্জয় রায় সম্পাদিত, *উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন,* পৃ. ৯৪।
৩ ঐ, পৃ. ৯৪, ৯৫।
৪ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, *দিনাজপুর জেলার রাজনৈতিক ইতিহাস,* পৃ. ৭৭, ৭৮।
৫ ধনঞ্জয় রায়, *উত্তরবঙ্গ (উনিশ ও বিশ শতক),*পৃ. ২৪৭।
৬ সুমিত সরকার, *আধুনিক* ভারত *১৮৮৫- ১৯৪৭,* পৃ ৪৫৭।
৭ লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬।
৮ R. A. Dutch, *Census of India 1941* . Vol IV, Delhi. 1942, pp 37-40.
৯ লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত। পৃ. ১১১, ১১২।
১০ ধনঞ্জয় রায় সংকলিত, *উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন,* পৃ. ৩।
১১ *The Statesman*, 19th March, 1947.
১২ সুমিত সরকার, প্রাগুক্ত। *(১৮৮৫-১৯৪৭),* পৃ. ৪৬২।
১৩ ঐ, পৃ. ৪৬২
১৪ ধনঞ্জয় রায়, *বিশ শতকের দিনাজপুর মন্বন্তর ও কৃষক আন্দোলন,* পৃ.৫৮।

নির্বাচিত আকরপঞ্জি

(দিনাজপুর প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ রচনায় প্রতিটি পুস্তক প্রবন্ধ বা নথির হদিশ যথাস্থানে সূত্র নির্দেশনামা ও টীকায় দেওয়া হয়েছে। এই পঞ্জিতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত আকর গ্রন্থগুলির উল্লেখ করা হল।)

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *গৌড়ের কথা*, কলকাতা, ১৩৯০।

অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)* কলকাতা,২০০০।

গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা স্বদেশী গান*, দিল্লি, ১৯৯৩।

গৌতম ভদ্র, *ইমান ও নিশান*, কলকাতা, ১৯৯৪।

দীনেশচন্দ্র সরকার, *পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত*, কলকাতা, ১৯৮২।

দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, কলকাতা, ১৯০১।

— *বৃহৎবঙ্গ*, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩।

ধনঞ্জয় রায় (সম্পাদিত), *তেভাগা আন্দোলন*, কলকাতা, ২০০০।

— *বিশ শতকের দিনাজপুর : মন্বন্তর ও কৃষক আন্দোলন*, কলকাতা, ১৯৯৭।

— *উত্তরবঙ্গ (উনিশ ও বিশ শতক)*, কলকাতা, ২০০২।

নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, কলকাতা, ১৯৯৯।

নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব) , কলকাতা, ১৪০২।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, *দিনাজপুর জেলার রাজনৈতিক ইতিহাস*, রায়গঞ্জ, ১৩৯২।

ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, *শূন্য পুরাণ*, কলকাতা, ১৯৭৭।

রজতকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, কলকাতা, ১৯৯৪।

রজনীকান্ত চক্রবর্তী, *গৌড়ের ইতিহাস*, ১ম, ২য় খণ্ড, মালদহ, ১৯৮৩।

রমাপ্রসাদ চন্দ, *গৌড় রাজমালা*, কলকাতা, ১৯৭৫।

রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), কলকাতা, ১৩৬৪ ও ১৩৮০।

লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশ বিভাগ*, কলকাতা, ১৯৯৯।

শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), *দিনাজপুর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা, ১৯৯৬।

শান্তিময় রায়, *ভারতের মুক্তিসংগ্রামে মুসলিম অবদান*, কলকাতা, ১৯৭২।

শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *দাঙ্গার ইতিহাস*, কলকাতা, ১৪০৫।

সতীশচন্দ্র, *মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি*, কলকাতা, ১৯৭৮।

সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলকাতা, ১৯৭২।

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক*, কলকাতা, ১৯৯৮।

সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৪৭*, কলকাতা, ১৯৯৫।

নির্দেশিকা